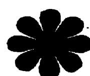
হেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী

(পঞ্চম ভাগ)



বসুমতী -- সাহিত্য -- মন্দির
১৬৬, বহবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গ্রন্থাবলী-সিরিজ

হেমেন্দ্রগ্রন্থাবলী

[পঞ্চম ভাগ]

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত



শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-যন্ত্রে"
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

[মুল্য ১৲ এক টাকা]

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

জননী

[উপন্যাস]

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

জননী

১

বৈশাখের রাত্রিশেষে দিবসের সঞ্চিত তাপ আকাশে ও বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া ধরণী যখন কেবল অল্পকাল-স্থায়ী স্বস্তি লাভ করিতেছিল, ঠিক সেই সময় ত্রয়োদশ বর্ষবয়স্কা কন্যা রেণুকে ও ত্রয়োদশ বর্ষের রোগজীর্ণ শীর্ণ দেহখানিকে ফেলিয়া কাত্যায়নী মহা-প্রস্থান করিলেন। এই মৃত্যুর জন্য দীর্ঘকাল হইতে তিনি যেমন প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, গৃহের আর সকলেও তেমনই প্রস্তুত ছিলেন। বাস্তবিক, মৃত্যু যেন অপ্রত্যাশিতরূপে বিলম্বিতই হইয়াছিল; তাহার আগমন-বিলম্ব চিকিৎসকদিগকেও বিস্মিত করিয়াছিল।

কিন্তু যে স্থানে স্নেহ অনাবিল ও গভীর, সে স্থানে প্রত্যাশিত দুর্ঘটনাও বেদনা দিয়া যায়। মাতৃহীনা কাত্যায়নীর ভগিনী মৃণালিনীর আর্ত্তনাদে সেই জন্যই বেদনার আন্তরিক বিকাশ দেখা গেল। আর রেণুর কণ্ঠ দিয়া ক্রন্দনের ধ্বনি বাহির না হইলেও তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বাড়ীর গৃহিণী—কাত্যায়নীর স্বামী সুধীরচন্দ্রের বিধবা পিসীমা, কাঁদিবেন কি না, তাহাই ভাবিতেছিলেন; কেন না, তাঁহার বিশ্বাস, যাহার জন্য কেহ কাঁদে না, তাহার "গতি" হয় না; কিন্তু মৃণালিনী ভগিনীর "গতির" উপায় করিলেন দেখিয়া তিনি আর অকারণ উদ্যম ব্যয় করিলেন না; সুধীরকে বলিলেন, "সুধীর, বাবা, যা হ'বার, হয়ে গেল; এই বারে কাযের উদ্যোগ কর। বাসি করতে নেই।"

পাড়ায় একটা যুবক-সঙ্ঘ ছিল; সুদিনে বিজ্ঞ সাংসারিকগণ সঙ্ঘের সদস্যদিগকে "অকেযো" বলিয়া অবজ্ঞা করিলেও দুর্দ্দিনে তাহাদিগের অযাচিত সাহায্য লাভ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। এই সঙ্ঘের সঙ্গে সুধীরের ঘনিষ্ঠতা ছিল; সঙ্ঘ হইতে সন্তরণ-প্রতিযোগিতা, সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসে যে তের অনুষ্ঠান হইত, সে সকলেই সুধীরচন্দ্র অর্থসাহায্য দিতেন। যাহাকে দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষকাল গৃহে রুগ্না পত্নীর দিনে দিনে তিলে তিলে মৃত্যু লক্ষ্য করিতে হয়, তাহার পক্ষে অপরের আনন্দসম্ভোগও আনন্দের বিষয়। যে যাহাতে বঞ্চিত, সে তাহার মর্য্যাদা বুঝে। সঙ্ঘের যুবক সদস্যগণ সংবাদ পাইয়াই প্রস্তুত হইয়া আসিল এবং যথাসম্ভব শীঘ্র শব দাহস্থানে লইয়া যাইবার আয়োজন শেষ করিল। সপ্তদশ বৎসর পূর্ব্বে শঙ্খধ্বনিতে যে গৃহে নববধূ কাত্যায়নীর শুভাগমন ঘোষিত হইয়াছিল, আজ যুবকদিগের কণ্ঠোচ্চারিত "বল, হরি; হরিবোল" ও তাহাদিগের আনীত কীর্ত্তনীয়াদিগের—

"হরি বল; হরি, বল; হরি, বল, ভাই;
হরিনাম বিনা জীবের আর গতি নাই"

গান—সেই গৃহ হইতে তাঁহার শেষ যাত্রার সংবাদ পল্লীকে জানাইয়া দিল। এই সপ্তদশ বৎসরের মধ্যে ত্রয়োদশ বৎসর গৃহে রোগের ভোগই ছিল। প্রথম ও একমাত্র সন্তান রেণুর জন্মের পর যে কাল সূতিকা রোগ মাতৃদেহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাকে সর্ব্ববিধ চিকিৎসা এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়ন সে আশ্রয়চ্যুত করাইতে পারে নাই; কাত্যায়নীর সমগ্র জীবনীশক্তি নিঃশেষ করিয়া তবে তাহার তৃপ্তি হইয়াছিল।

শববাহীদিগের সঙ্গে সুধীর শ্মশানে চলিল। পিসীমা পুরাতন ভৃত্য ভগবানকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভগা, কাপড় নিয়ে সঙ্গে যা"—তাহার পর চাপা গলায় বলিলেন, "হাতে বাঁধান নোয়া আর দু'গাছা ক'রে সোণার চুড়ী আছে, খুলে গঙ্গাজলে ধুয়ে আনিস।" কথাটা মৃণালিনী শুনিতে পাইলেন। তিনি পিসীমা'কে বলিলেন, "আমার চাকরকে ব'লে দিন, একখানা গাড়ী নিয়ে আসুক।"

পিসীমা বলিলেন, "এখুনি যা'বে? তা' যেতে হ'বে বই কি? চান করতে হ'বে, তবে ত ঘরে যেতে পারবে।"

মৃণালিনী বলিলেন,—"রেণুকে কি আমি নিয়ে যা'ব?"

"সে কেমন ক'রে হ'বে, বাছা? সুধীর ত ঘাটে গেল; তা'কে না ব'লে আমি কি মেয়েকে পাঠাতে পারি? বাড়ী ঘর যেন হা হা করছে, আমিই টি'কতে

পারছি না—সে এসে, মেয়েটাও না থাকলে, দাঁড়া'বে কেমন ক'রে?"

"আচ্ছা।"—বলিয়া মাসীমা এক বার মাতৃহীনা রেণুর দিকে চাহিলেন। যে মেয়ে জন্মাবধি মা'র সবল আশ্রয় পায় না, সে আপনাকে আপনি রক্ষা করিবার শক্তি হৃদয়ের মধ্য হইতেই লাভ করে। রেণু তখন চক্ষুর জল মুছিয়াছে। কিন্তু তাহার অশ্রুহীন্ নেত্রের কাতর দৃষ্টিতে যে বেদনা, তাহা মাসীমা'র অনুভব করিতে বিলম্ব হইল না।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "গাড়ী এনেছি।"

মৃণালিনী উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিসীমাও উঠিলেন—রেণুও উঠিল। মৃণালিনী সস্নেহে রেণুর মুখচুম্বন করিলেন—তিনি কান্দিয়া ফেলিলেন; সেই দুর্লভ স্নেহের সহানুভূতিতে রেণু আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না। মেঘ যতক্ষণ শীতল বাতাসের স্পর্শ না পায়, ততক্ষণ তাহার বাষ্প বৃষ্টিরূপে বিগলিত হইয়া পড়ে না। মাসীমা'র বুকে মুখ গুঁজিয়া রেণু কান্দিল। তখন মৃণালিনীই তাহাকে শান্ত করিলেন।

পিসীমা বলিলেন, "আহা, বিছানায় প'ড়ে ছিল—তবুও তা'র সংসার সে জুড়ে ছিল।" বলিয়া তিনি অঞ্চলে শুষ্ক চক্ষু মুছিলেন এবং মৃণালিনীকে বলিলেন, "বাছা, আমি বুড়ো মানুষ—যেমন সর্ব্বদা আসতে তেমনই এস; মেয়ে এখন তোমার।"

মৃণালিনীর মনে হইল, "আর বাড়ী মাড়াতে ইচ্ছা করি না"—কিন্তু তিনি তাহা বলিতে পারিলেন না—রেণুর প্রতি তাঁহার স্নেহ তাঁহাকে তাহা বলিতে দিল না। নহিলে—উচিত কথা বলিতে তিনি কখন দ্বিধানুভব করেন না। তিনি রেণুকে বলিলেন, "মা, আমি আসব; তুই যা'বি—আমি নিয়ে যা'ব।"

পিসীমা বলিলেন, "তা' আর যা'বে না? বলতে গেলে, তোমারও এই ত আপনার! সুধীর যেমন আমার ভাইপো, ও তোমার তেমনই বোনঝি; কত আপনার!"

মৃণালিনীর গাড়ী দ্বার ছাড়াইতে না ছাড়াইতে পিসীমা ঝিকে ডাকিলেন, "কুমুদা—আর, ঘর-দোর ধুয়ে ফেল, আর দেখ, কাল সকালে পুরুত ঠাকুরকে আসতে ব'লে আসিস—দেখতে হ'বে 'দোষ পেয়েছে' কি না। গেরস্তর কল্যাণ সকলের আগে।"

"তা'ত বটেই" বলিয়া কুমুদা সম্মার্জ্জনীর সন্ধানে গেল। তাহার মনে পড়িল, তাহার শাশুড়ী যখনই রাগ করিত, তখনই তাহার মৃত্যু কামনা করিয়া বলিত, "শতেকখোয়ারী, কবে তোর মরা মুখ দেখব?"—আর পাড়ার কেহ তাহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলে স্বর আরও চড়াইয়া বলিত, "কেন? বৌ বই ঝি ত নয়—এক দিক্ দিয়ে একে বা'র ক'রে নিয়ে যা'বে, আর এক দিক্ দিয়ে আমি বরণ ক'রে বৌ তুলব।"

ঝাঁটা ও বালতীভরা জল লইয়া আসিয়া ঘর ধুইতে ধুইতে কুমুদা পিসীমা'কে বলিল, "হ্যাঁগা পিসীমা, বলি, দাদা বাবুর বিয়ে দেবে ত?"

পিসীমা বলিলেন, "এখনও পুড়িয়ে ফিরল না, এর মধ্যেই ঐ কথা! তোদের ছোট লোকের ঘরে অমন হয় ব'লে কি সব ঘরে হয়?"

ঝাঁটার খর-খর শব্দের সঙ্গে আপনার খর-খরে স্বর মিলাইয়া কুমুদা বলিল, "এ আর ছোট লোক ভদ্দর লোক কি? এ ত সব ঘরেই সমান। দাদা বাবুর বয়েস কি যে, আর বিয়ে করবে না?"

"না, তা' নয়; তা'র পর এই তের বছর ত ব্রহ্মচারী হয়েই কাটালে। তবে এখনকার ছেলে, ওদের বুঝ আলাদা।"

"হ'কগে বুঝ আলাদা। তুমি জিদ ক'রে ধর—দেখবে কেমন না দাদাবাবু মত করে?"

"সুধীর ছেলে ভাল; আমার কথা ঘাড় নীচু ক'রে শুনে। আমি ত বলবই।"

কুমুদা কি বলিতে যাইতেছিল; পিসীমা দেখিলেন, সে জানালার নিম্নে উচ্চ স্থানটি ধৌত করে নাই—তিনি বলিলেন "তোর কি আচার-বিচার কোন দিন হ'বে না? ঐখানটায় জল দিলি নে! মা গো—মা; যে জিনিষটে না দেখব, সেইটাই হ'বে না। এমন ক'রে কি মানুষ পারে?"

কুমুদা তিরস্কার ভোগ করিয়া আর দাদা বাবুর বিবাহের চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিল না—সম্মার্জ্জনীসঞ্চালনেই মন দিল।

রেণু পিসীমা'র সঙ্গে আসিয়াছিল—তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল। পিসীমা'র ও কুমুদার কথা সে শুনিয়াছিল। তাহার জ্ঞানোন্মেষ হইতেই তাহার মা রুগ্না; কাযেই তাঁহার সক্রিয় স্নেহের প্রবল পরিচয় সে কখন পায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ঝড় না হইলেও যেমন বাতাসের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না, তেমনই মা'র স্নেহের সেরূপ পরিচয় না পাইলেও তাহার সম্বন্ধে সে কোন দিন সন্দেহ করিতে পারে না। সে স্নেহ যে তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া ছিল এবং সে-ই যে সে স্নেহের অবলম্বন ছিল, তাহা সে সর্ব্বদাই অনুভব করিত। মা'র নয়নের দৃষ্টি যে ভাবে কন্যার

গতিবিধির অনুসরণ করিত, যেরূপে তিনি তাহার সব কাযের সন্ধান লইতেন—সে সব যে মাতৃহৃদয়ের অপরিমেয় স্নেহেরই পরিচায়ক, সে বিষয়ে কি কখন সন্দেহ থাকিতে পারে? মা দীর্ঘকাল রোগভোগ করিয়াছিলেন; রেণু শুনিতে পাইয়াছিল, পিসীমা'কে পাড়ার এক বৃদ্ধা এক দিন বলিয়াছিলেন, "কি ভোগটাই ভুগছে! যেমন সহ্য, তেমনই বুঝ। কিন্তু মরণ হ'লে অব্যাহতি পায়।" পিসীমা বলিয়াছিলেন,—"সে আর বলতে! নিজেও অব্যাহতি পায়, সুধীরকেও অব্যাহতি দেয়। বাছা আমার রোগের সেবা করেই জীবন কাটালে।" শুনিয়া বৃদ্ধা উত্তর করিয়াছিলেন, 'তা'ই বটে। উনি বলেন, যদি রাত-দিন দুশ্চিন্তা না থাকত, তবে সুধীর এত দিন হাইকোর্টের জজ হ'ত। আগের জন্মে বৌ খুব তপস্যাই করেছিল যে, অমন স্বামী পেয়েছে।" কথাগুলা রেণু এক দিন মাসীমা'কে বলিয়াছিল; শুনিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, "এরা ত তা' বলবেই; যেতে যা'বে আমার; আর তোর যা' যা'বে, তা' আর কারও যা'বে না। আমার আছে ঐ বোন; আর তোর—জানিস ত, কথায় বলে 'মা'র কোলে ব'সে বাপের আদর পাই'। মা গেলে" —তাঁহার শেষ কথা কয়টা অশ্রুর উচ্ছ্বাসে আর কণ্ঠ হইতে বাহির হয় নাই।

সেই দিন হইতে রেণুর মনে হইয়াছিল, মা মরিতে পারেন এবং মা'র মৃত্যু তাহার পক্ষে দারুণ দুর্ঘটনাই হইবে। আজ সেই দুর্ঘটনাই ঘটিয়াছে। তাই শোকের সঙ্গে সঙ্গে সে অজ্ঞাত আশঙ্কা অনুভব করিয়া যেন ভীতিত্রস্তা হইতেছিল।

পিসীমা যে মা'র উপর প্রসন্ন ছিলেন না, তাহা সে জানিত। তিনি যখন তখন বলিতেন, "কি অদৃষ্ট করেই এসেছিলাম; সারাজীবন খেটে খেটে ম'লুম। সুধীরের বিয়ে দিলুম, ভাবলুম—এই বার আমার বিশ্রাম। তা' নয় রোগের সেবা কর!" কিন্তু সেবা গ্রহণ করিতে কাত্যায়নীর যে কত কুণ্ঠা ছিল, তাহা রেণু জানিত। আর তাহা জানিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে পাছে পিসীমা বিরক্ত হয়েন সেই ভয়ে সুধীরও তাঁহাকে সেবা হইতে যথাসম্ভব অব্যাহতি দিত। সেবার জন্য কাত্যায়নীকে কখন পিসীমা'র উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতে হয় নাই। সে দিকে আর এক জনের বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ছিল—তিনি মৃণালিনী। মৃণালিনী ও কাত্যায়নী দুই ভগিনীতে যে স্নেহ ছিল, তাহা দুর্লভ। উভয়ে অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন। পিতা এই কন্যাদ্বয়কে তাহাদিগের মাতামহীর নিকট রাখিয়া চাকরীস্থানে গিয়াছিলেন—স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। যাইবার পথে মেঘনার বক্ষে ঝড়ে নৌকাডুবী হয়। মাতামহী কন্যা-জামাতাকে হারাইয়া নাতিনী দুই জনকে অসীম স্নেহে বুকে টানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহশীল বলিয়া তাঁহার পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূরা তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। তিনি তাহা গ্রাহ্যও করেন নাই। অতিরিক্ত স্নেহে পালিতা পিতৃমাতৃহীনা নাতিনীরা পাছে শ্বশুরবাড়ীতে কষ্ট পায়, সেই ভয়ে তিনি বহু সন্ধান করিয়া উভয়েরই এমন ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে বধূ হইয়া কাহারও অধীন থাকিতে হয় নাই—কাহারও শাশুড়ী ছিলেন না। আর কাহারও অর্থকষ্ট ছিল না। দুই নাতিনীর বিবাহ দিয়া দিদিমা সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থবাসিনী হইয়াছিলেন; কেন না, পুত্ররা যে তাঁহার উপর বিরক্ত, তাহা তিনি জানিতেন। দিদিমা তাঁহার কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াছিলেন, বটে, কিন্তু নাতিনীদিগের ভাগ্য যেন অভিশপ্ত ছিল। মৃণালিনীর কোন অভাব ছিল না—স্বামীর ভালবাসা, অনন্যসাধারণ ঐশ্বর্য্য—এ সব পাইয়াও যাহার অভাব কিছুতেই পূরে না, তিনি সেই অভাব ভোগ করিয়াছিলেন—সন্তান তাঁহার মাতৃহৃদয়ের ক্ষুধা তৃপ্ত করে নাই। তাহার পর দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্বামীকে হারাইয়াছেন। আর কাত্যায়নী প্রথম সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই রোগে কাতর হইয়াছিলেন। স্বামীকে হারাইবার পর মৃণালিনী যেন আর শূন্য গৃহে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। তিনি এক দিকে গৃহদেবতার সেবা, আর এক দিকে ভগিনীর সেবা করিয়া সময় কাটাইতেন। প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি এক জন দাসীকে ভগিনীর কাছে পাঠাইতেন এবং স্বয়ং ঠাকুরের কায করিতে যাইতেন। মধ্যাহ্নে হবিষ্যান্ন গ্রহণের পর তিনি স্বয়ং ভগিনীর কাছে আসিতেন এবং ঠাকুরের সন্ধ্যারতির সময় ফিরিয়া যাইতেন। তাঁহার আর এক জন দাসী রাত্রিতে ভগিনীর কাছে থাকিত। রেণুকে তিনি আপনার কন্যার মতই দেখিতেন। তিনিই রেণুকে শিক্ষা দিতেন এবং সেই শিক্ষার ফলে রেণু এক দিকে যেমন ধৈর্য্যের ও সহিষ্ণুতার অনুশীলন করিয়াছিল, অপর দিকে তেমনই তাহার আত্মসম্মানজ্ঞান প্রবল হইয়াছিল। সেই সব গুণ যেমন সে শিক্ষায় অর্জ্জন করিয়াছিল,

তেমনই তাহার স্বভাবজ ভাব ছিল—দারুণ অভিমান।

আজ কুমুদার সঙ্গে পিসীমা'র কথায় রেণুর শোকার্ত্ত হৃদয় অভিমানে ভরিয়া উঠিল। তাহার মা'র শব হয়ত এখনও চিতায় উঠে নাই। আর ইহাঁরই মধ্যে তিনি যে গৃহের গৃহিণী ছিলেন, সেই গৃহে আর এক জনকে আনিয়া তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা আলোচিত হইতেছে! কেন—তিনি কাহার কি অনিষ্ট করিয়াছেন যে, কেহ তাঁহাকে আবর্জ্জনা বলিয়া মনে করিবে? মাসীমা সত্যই বলিয়াছিলেন—মা'র মৃত্যুতে তাহার যে ক্ষতি হইবে, তাহা আর কাহারও হইবে না।

পিসীমা'র কথায় আজ একটা কথা রেণুর মনে উদিত হইল—বাবা কি ভাবিতেছেন? মা'র প্রতি কর্ত্তব্যপালনে সে কোন দিন পিতার কোনরূপ ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারে নাই। সে কথা মাসীমাও বলিতেন। তথাপি—তথাপি মা'কে সে অনেক বার বলিতে শুনিয়াছে, তাঁহাকে লইয়া সুধীরচন্দ্রকে কেবলই কষ্ট পাইতে হইয়াছে। পিতা কি কখন তাহা মনে করিয়াছেন?

সেই সম্ভাবনায় রেণু শিহরিয়া উঠিল। এক বার তাহার মনে হইল—যদি তাহাই হয়? নৌকা-যাত্রী যদি রাত্রিকালে সুপ্তোত্থিত হইয়া দেখে—আকাশে ঘনঘটা, ঝড় উঠিয়াছে, কূল দেখা যায় না, নৌকায় নাবিকরা নাই—তবে তাহার মনের অবস্থা যেরূপ হয়, রেণুর মনের অবস্থা তেমনই হইল। সে আর ভাবিতে পারিল না।

সেই সময় পিসীমা ডাকিলেন, "রেণু!"

রেণু তাঁহার পশ্চাৎ হইতেই উত্তর দিল শুনিয়া তিনি ফিরিয়া দেখিলেন এবং তাহাকে নিকটে দেখিয়া যেন কুণ্ঠিতা হইলেন। সে তাঁহার কথা শুনিতে পায় নাই ত?

কুণ্ঠা অতিক্রম করিয়া পিসীমা বলিলেন, "চল, দিদিমণি, তোমাকে স্নান করিয়ে দিই গে।"

রেণু বলিল, "আমি আপনি স্নান ক'রে আসছি; তুমি স্নান কর গে।" বলিয়া সে আর কোন কথার জন্য অপেক্ষা না করিয়া স্নানের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সম্মার্জ্জনীহস্তে কুমুদা পিসীমা'র দিকে চাহিয়া বলিল, "বোধ হয়, সব কথা শুনতে পেয়েছে।"

পিসীমা চাহিয়া দেখিলেন, রেণু চলিয়া গিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, "পেয়েছে ত কি হয়েছে? কি অন্যায় কথাটা বলেছি যে, রাগে গরগর ক'রে চ'লে গেল? বলে এক পোটকা মেয়ে—তার আবার রাগ দেখ। পোড়া কপাল আমার—আমার কি ওকে ভয় ক'রে চলতে হ'বে? আমি ত কাশী যেতে চাই, সুধীর যেতে দেয় না—আর এত দিন রোগা বউকে ফেলে যেতেও পারিনি, লোক কি বলবে? এই বার সুধীরের বিয়ে দিয়েই চ'লে যা'ব। আর বিয়ে না করে—ও যা' ভাল বুঝবে, করবে।"

কুমুদা বলিল, "তা'ত বটেই। আর দেখ পিসীমা, মেয়ে-ছেলের অত রাগও ভাল নয়। যদি সৎমার মন যুগিয়ে চলতে হয়, তখন? আর তাও যদি না হয়—পরের ঘরে ত যেতেই হ'বে। বলে—

'সে বড় কঠিন ঠাঁই;
গুরুশিষ্যে ভেদ নাই।'

আমি খুব জানি।"

২

মা'র মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কুমুদার সহিত পিসীমা'র কথোপকথন রেণুর মনে শঙ্কা-সহচর কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছিল—পিতাও কি মাতার মৃত্যু অব্যাহতি বলিয়া মনে করিয়াছেন? সে ইহা জানিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত। মৃণালিনীর কাছে সে কোন কথা গোপন করিত না; কিন্তু এ কথা তাঁহার কাছেও প্রকাশ করিল না। ভগিনীর মৃত্যুর পরও মৃণালিনী সমভাবে রেণুর তত্ত্ব লইতেন; প্রতিদিন তিনি হয় মধ্যাহ্নের পর রেণুর কাছে যাইয়া অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত থাকিতেন, নহিলে তাহাকে আনাইয়া লইতেন ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাখিয়া আপনি পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেন। তিনিও যথাসম্ভব সুধীরচন্দ্রের মনের ভাব জানিবার চেষ্টা করিতেন।

বাস্তবিক স্ত্রীর মৃত্যুতে সুধীরচন্দ্র কি মনে করিয়াছিলেন? দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষকাল তিনি মৃত্যুকে স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে রাখিবার জন্য চিকিৎসায়, শুশ্রূষায় ও উৎকণ্ঠায় চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সে হিসাবে তিনি আদর্শ স্বামীর কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াছেন; কোন দিন তাঁহার ব্যবহারে এতটুকু বিরক্তির বা অসহিষ্ণুতার পরিচয় মৃণালিনীর সতর্ক দৃষ্টিও লক্ষ্য করিতে পারে নাই। কিন্তু যৌবনের সক্রিয় প্রেমকে নিষ্ক্রিয় করা, আসঙ্গলিপ্সাকে রোগীর সেবায় পরিণত করিয়া তাহাতেই সন্তোষ সন্ধান করা দুষ্কর ও সাধন-সাপেক্ষ। কেহ সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; কেন না,

যে অশান্ত, তাহাকে শান্ত করিলে; যে স্বভাবতঃ চঞ্চল, তাহাকে স্তব্ধ করিলে, তাহার স্বভাব আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। যে শক্তিতে তাহাকে দমিত করিয়া রাখিতে হয়, সে শক্তি যদি একটু ক্ষুণ্ণ হয়, তবে বাঁধের ক্ষুদ্র ছিদ্র পাইলে জলধারা যেমন অবাধে বাঁধ নষ্ট করিয়া দেয়, স্বভাব তেমনই অবাধে সংযমকে নষ্ট করিয়া দেয়। সেই জন্যই ত্যাগের এত মর্য্যাদা।

ত্যাগের নিকট মানুষ স্বভাবতঃই মস্তক নত করে বলিয়াই পিসীমাও কিছু দিন সাহস করিয়া সুধীরচন্দ্রের কাছে তাহার পুনরায় বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিতে পারিলেন না। অথচ তিনিই গৃহের সর্ব্বেসর্ব্বা—তিনি ছাড়া সে প্রস্তাব আর কেহ করিতে পারে না। সুধীরচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুর সংখ্যা অল্পই ছিল। কারণ, যে ত্রয়োদশ বর্ষকাল সে স্ত্রীর সেবা করিয়া কাটাইয়াছে, সে সময়ের মধ্যে অনেক বন্ধুর সহিত বন্ধুত্বে এমন ভাবে মরিচা পড়িয়াছে যে, তাহাকে নূতন করিয়া উজ্জ্বল করা অসম্ভব। সে সময়টা সে তাহার ব্যবসার কায করিয়া আসিয়াই গৃহকোটরে প্রবেশ করিত। বন্ধুত্ব যেমনই কেন হউক না, তাহার মধ্যে আদান-প্রদানের উপকরণ থাকে; এক পক্ষ কেবলই বন্ধুর কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে, অপর পক্ষ বন্ধুত্ব সম্ভোগ করিয়া যাইবে, এমন হয় না। বিশেষ আজকাল বন্ধুত্ব বিদেশী আদর্শে ব্যক্তিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া পরিবারে ব্যাপ্ত হয় না—বন্ধু-পরিবারের সুখ-দুঃখের অংশ বন্ধু-পরিবার গ্রহণ করিতে পারে না; উৎসবে বন্ধুকে আহ্বান করা হয়, বিপদের অংশ লইবার জন্য ডাকিতে সাহস হয় না। কাযেই যাঁহারা সুধীরচন্দ্রের বন্ধুপদবাচ্য, তাঁহারা তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আন্তরিক মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিলেন না; কেবল আপনাদিগের মধ্যে বলাবলি করিলেন, "সুধীরের প্রকৃতিতে ত সন্ন্যাসীর কোন লক্ষণ দেখা যায় না; ও যে অবিবাহিত থাকিবে, এমন মনে হয় না। তবে লোকটির সবই একটু অনন্যসাধারণ, সুতরাং বলা যায় না।"

যাঁহারা তাহার "বন্ধু", তাঁহাদিগের মধ্যে তাহার প্রতি ঈর্ষ্যার ভাবও যে ছিল না, এমন নহে। সে জন্মাবধি অভাবের অতীত; পরীক্ষায় সে জয়মাল্য পাইয়াই গিয়াছে; তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শ্রমশীলতা ব্যবসায়ে তাহাকে সাফল্য দান করিয়াছে; এ সবই অনেকের ঈর্ষ্যার কারণ হইয়াছিল। বাস্তবিক, জীবনে একবিষয় ব্যতীত সে অসাফল্য ভোগ করে নাই—সে পত্নীতে। কিন্তু সে অসাফল্যকেও সে যেন সাফল্য বলিয়া মনে করিবার জন্যই ব্যস্ত ছিল। সে নূতন করিয়া ভাগ্যপরীক্ষা করিবে কি না—যাহা পায় নাই তাহা পাইবার চেষ্টা করিবে কি না, দেখিবার জন্য কাহারও কাহারও কৌতূহল হইয়াছিল।

স্ত্রীকে হারাইয়া সুধীরচন্দ্র কন্যার প্রতি অধিক মনোযোগ দিল। মৃণালিনী তাহা সুলক্ষণ মনে করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু পিসীমা তাহা দুর্লক্ষণ মনে করিলেন।

এ দিকে কুমুদা পিসীমা'কে বলিতে লাগিল, দাদা বাবুর বিবাহ দিতে আর বিলম্ব করা কিছুতেই সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, অভাব যত দিন অভাব বলিয়া মনে হয়, তত দিনই তাহা পূরণ করিবার জন্য আগ্রহ থাকে, মানুষ তাহাতেই অভ্যস্ত হইলে আর তাহার তীব্রতা অনুভব করে না। কুমুদা সমাজের যে স্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনযাপন করিয়াছিল, সে স্তরে স্ত্রীলোকের মনে পুরুষের ত্যাগ ও সংযম সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা নাই এবং পুরাণে তাপসদিগেরও পদস্খলনের উপাখ্যান তাহারা মানুষকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য কল্পিত মনে না করিয়া স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়াই মনে করে। তাই কুমুদা পিসীমা'কে বলিত "দেখ পিসীমা, গরিবের কথা বাসি হ'লে খাটে। বলে, মুনি ঋষি তপস্বীরা বড় পারলে, তা'র ত দাদা বাবু—ঐ বয়েস। তুমি দেখে নিও, শেষে একটা কেলেঙ্কারী হ'বে। এ ত আর সে কাল নয়, এখন হিন্দুর মেয়ের আর খৃষ্টানের মেয়ের তফাৎ বুঝা যায় না; মা গো—পায়ে জুতো, চোখে চশমা, হাতে বই, মাথায় ঘোমটা নেই—সমস্ত মেয়েরা যেন মাষ্টারনীর মত যায়, দেখে আমার যে কি হাসি পায়।"

শুনিয়া পিসীমা ভয় পাইতেন।

শেষে এক দিন গঙ্গাস্নানে তাঁহার সহযাত্রীদিগের মধ্যেও ঐ কথার আলোচনায় যখন তিনি কুমুদার মতের সমর্থন পাইলেন, তখন তিনি এক দিন কুমুদাকে বলিলেন, "পুরুত ঠাকুরকে কাল বিকেলে সুধীর ফেরবার আগে এক বার আসতে ব'লে আসিস। বুঝলি?—সুধীর ফেরবার আগে।"

কুমুদা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"সবাই ত বল্‌ছে, সুধীরের বিয়ে না দিলে ভাল দেখায় না। তাই পুরুত ঠাকুরকে এক বার বলব।"

বাম করতল বাম গণ্ডে রক্ষা করিয়া কুমুদা চক্ষুতে বিস্ময়ের ভাব আনিয়া বলিল, "সে ও কথা!

বিয়ে ঠিক না হ'লে পুরুতেরই বা দরকার কি, নাপিতেরই বা দরকার কি?"

"তুই কি বলিস?"

"রাঢ়ে বঙ্গে যা' হয়, তা'ই কর—ঘটক-ঘটকী ডাকাও—মেয়ে ঠিক কর।"

"আমি ভাবছি, পুরুত ঠাকুরকে বলব, তাঁ'র ত পাঁচ জায়গায় যাতায়াত, তিনি যদি কোন ভাল ঘরে ভাল মেয়ের সন্ধান দিতে পারেন। ভাল ঘর চাই, বুঝলি, কুমুদা, ভাল ঘর নইলে কি এসে সতীন-কাঁটা নিয়ে শান্তিতে সংসার করতে পারবে? আহা, মা-মরা মেয়ে, বাপও ঐ মেয়ে-অন্ত প্রাণ।"

কুমুদা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "নে'ও কথা! মেয়ে কি ঘরে রাখবে? না—মেয়ে ঘরে রাখবার? তোমাদের ভদ্দর লোকের ঘরে সব শোভা পায়; আমাদের গরিবের ঘরে অত বড় মেয়ে অইবুড় থাকলে নিন্দেয় ঢি—ঢি পড়ে যায়। মেয়ের কি বিয়ে দেবে না?"

"তা' দেব না! এত দিন বৌমার অসুখেই ব্যস্ত ছিলুম—ও দিকে আর মন দিতে পারিনি! বলে—

'যা'র নদীর কূলে বাস,
তার ভাবনা বার মাস'

ক' বছর ত 'কখন কি হয়' অবস্থা ছিল; তা'র মধ্যে মেয়ের বিয়ে ত আর হয় না।"

"সে ত জানি। কিন্তু এখন ত আর সে বালাই নেই। এখন চেষ্টা ক'রে মেয়ের বিয়ে দাও। মেয়ের মাসীকে বল—আর তুমিও দাদা বাবুকে বল, ঘটক-ঘটকী ডাকিয়ে সম্বন্ধ আনতে বল। সঙ্গে সঙ্গে দাদা বাবুর জন্যেও মেয়ে দেখতে বল।"

কুমুদার বুদ্ধিতে পিসীমা'র কোন দিন প্রত্যয়ের অভাব হয় নাই; কেন না, বাজার করিয়া সে যে টাকায় চারি আনা রাখে, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেও তিনি কোন দিন তাহাকে "হাতে নাতে" ধরিতে পারেন নাই—হীরা মালিনীর মত যেমন তাহার "কথায় হীরার ধার"—বেসাতির হিসাবেও সে তেমনই হীরা মালিনীর দোসর। কিন্তু পিসীমা কুমুদার কথা মনে মনে মানিলেও মুখে আপনার পরাভব স্বীকার করিতে চাহিলেন না; তাই বলিলেন, "সুধীরকে ব'লে ঘটক-ঘটকীদের আনতে বলব; তা'র আগে পুরুত ঠাকুরকে ব'লে দেখি—যদি তিনি কোন সন্ধান দিতে পারেন। তাঁ'কে আসতে ব'লে আসিস—সুধীর ফেরবার আগে। বুঝলি?"

কুমুদা বলিল, "বুঝেছি, পিসীমা, বুঝেছি। কাণের মাথা ত খাইনি যে, তোমার কথাও শুনতে পাব না!"

পিসীমা জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আমার কথায় যদি কাণ ঝালাপালাই হয়, তবে শুনিস কেন? যেখানে তা' শুনতে হয় না, সেখানে গেলেই ত পারিস।"

"যাইনে কেন জান? যেখানে যা'ব সেখানেই ঐ। তোমরা সবাই সমান গো—সবাই সমান।"

পিসীমা জানিতে পারেই নাই, তাঁহাদিগের কথা কুমুদার মত আরও এক জন শুনিতে পাইয়াছিল। সে—রেণু। কেবল রেণু নহে, তাহার সঙ্গে মৃণালিনীও ছিলেন। তিনি আসিয়াছেন দেখিয়া রেণু তাঁহাকে আনিবার জন্য নামিয়া গিয়াছিল। উভয়ে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিবার সময় এই সব কথা শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া মৃণালিনী শঙ্কিত দৃষ্টিতে রেণুর দিকে চাহিলে রেণু বলিয়াছিল, "মাসীমা ও কথা নতুন নয়, আমার কাছে পুরান হয়ে গেছে।"

মৃণালিনী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যা'র যায়, তা'রই যায়—লোকের কিছুই নয়।"

সে দিন আর মৃণালিনী অন্য দিনের মত পিসীমা'র সঙ্গে দেখা করেন নাই। তিনি যতক্ষণ ছিলেন, রেণুর সঙ্গেও অধিক কথা বলেন নাই, যেন কেমন অন্যমনস্ক ছিলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর পিসীমা যেন তাঁহার আগমন-সংবাদ জানিতে পারেন নাই এইভাবে রেণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেণু, তোমার মাসীমা'র খবর কি? আজ এলেন না—কোন খবর দিয়েছেন?"

রেণু বলিল, "কেন, তিনি ত এসেছিলেন!"

পিসীমা বলিলেন, "এসেছিলেন! আমি এ বাড়ীর দাসী বাঁদী যে, কে আসে যায়, সে খবরও জানতে পাই নে! আসুক সুধীর—আমি বলব, আমাকে ছেড়ে দিক; আমি কাশী যাই। তা'র সংসার নিয়ে পরকালের কায পর্য্যন্ত ভুলে থেকে খুব ফল পেলুম! আর নয়।"

রেণু বলিল, "তুমি কেন রাগ করছ? আমি মাসীমা'কে ব'লে দিচ্ছি, তিনি যেন আর না আসেন।"

"কি মেয়ে গো! আমি কি অন্যায় কথা বলেছি যে, তা'তে এমন কথা হয়? আচ্ছা, আমি দশজনকে জিজ্ঞেস করি; বলুক তা'রা আমার কি দোষ।"

ঝগড়া করা রেণুর অভ্যাস ছিল না—সে প্রকৃতিও তাহার ছিল না। সে জানিত, গ্রামোফোনে দম

দিয়া চালাইলে যেমন শব্দ বাহির হইতেই থাকে, পিসীমা তেমনই বকিতে আরম্ভ করিলে বকিয়াই চলেন। সে তাঁহার আরও কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া বাবার বসিবার ঘরে যাইয়া টেলিফোন ধরিয়া মাসীমা'কে ডাকিল। মৃণালিনী তখন কেবল বাড়ীতে উপনীত হইয়াছেন; রেণুর কণ্ঠস্বর পাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি রে, রেণু!"

রেণু বলিল, "আপনি আর এ বাড়ীতে আসবেন না।" তাহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল।

"কেন? কি হয়েছে?"

"আপনি দেখা ক'রে যা'ন-নি ব'লে দিদি নানা কথা বল্‌ছেন।"

মৃণালিনী একটা বড় সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা—তিনি শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে জানিতেন। তিনি স্থির ভাবে বলিলেন, "এই কথা! ও নিয়ে তুই মাথা ঘামাস না। ও সব কথায় আমি কাণ দিই না।"

"কিন্তু আর কোন্ অধিকারে আপনি এখানে আসেন?" মা'র কথা মনে করিয়া রেণুর চোখ জলে ভরিয়া উঠিল—আজ মা-হারা বলিয়াই তাহার দুঃখ। তাহার গলার আওয়াজে মৃণালিনী তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাই আপনাকে সামলাইয়া তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "তোর অধিকারে। যত দিন তুই আছিস, তত দিন আমি যা'ব—কেউ আমাকে অপমান করতে পারবে না—সুধীরও না। তুই কাঁদিস না।"

তিনি টেলিফোন ছাড়িয়া দিলেন। রেণুও টেলিফোন ছাড়িয়া দিল; কিন্তু তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিতে লাগিল। সে সেই ঘরেই বসিয়া রহিল।

কখন যে সুধীর আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা রেণু জানিতেই পারে নাই। সুধীর দেখিল, কন্যা কান্দিতেছে। হায় মাতৃহারা কন্যা! তাহার জন্য সুধীরের পিতৃহৃদয় বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল; আর ঝড়ে জল যখন চঞ্চল হয়, তখন পুষ্করিণীর তল হইতে যেমন কত উপাদান ভাসিয়া উঠে, তেমনই তাহার মনে আজ কত দিনের কত কথা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সে সযত্নে কন্যার চক্ষু মুছাইয়া বলিল—"বড্ড একা একা ঠেকছে, রেণু? মাসীমা আজ আসেন-নি?"

রেণু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আসিয়াছিলেন।

সুধীর স্থির করিল, সে আরও একটু আগে আদালত হইতে ফিরিবার চেষ্টা করিবে এবং মৃণালিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া রেণুর জন্য আর এক জন মহিলা শিক্ষক নিযুক্ত করিবে—পড়াইবার জন্য তত নহে, যত তাহার কাছে থাকিবার জন্য।

সুধীরের মনের ভাব যখন এইরূপ, তখন তাহা পিসীমা'র প্রস্তাবের অনুকূল হইতে পারে না। তাই সে দিন সন্ধ্যার পর সুধীর আহার করিতে বসিলে তিনি যখন একটা জিনিষ আনিবার ছল করিয়া রেণুকে পাঠাইয়া রেণুর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন সুধীর বলিল, "এখনই!"

পিসীমা বলিলেন, "আর ত তেরো পার হয়ে চৌদ্দে পড়তে চল্‌ল।"

"কালাশৌচের বছরটা কাটুক, তা'র পর দেখা যা'বে।"

"অরক্ষণীয়া মেয়ে—তা'তে বাধে না।"

"আমি ত অরক্ষণীয়া ব'লে মনে করছি না।"

"সে কি বলিস?"

পাশ কাটাইবার অভিপ্রায়ে সুধীর বলিল, "ইচ্ছা হয়, খোঁজ খবর নিতে থাক—বল্‌লেই ত আর মনের মত সম্বন্ধ পাওয়া যা'বে না।"

পিসীমা তাহার সংসারের ভার লইয়া আছেন—কাত্যায়নী রুগ্না বলিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে পারে নাই, সেই জন্য সুধীর তাঁহার কাছে কিছু কুণ্ঠিত ছিল। বিশেষ মনের বর্ত্তমান অবস্থায় সে তাঁহার বিরক্তিব্যঞ্জক "বকুনী" সহ্য করিতে প্রস্তুতও ছিল না। তাই "সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে"—রকমে ঐ উত্তর দিল।

ততক্ষণে জিনিষ লইয়া রেণু ফিরিয়া আসিয়া বাবার কাছে বসিল। পিসীমা'কে বাধ্য হইয়া সে কথায় পূর্ণচ্ছেদ দিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে সুধীরের বিবাহের প্রস্তাব করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা আর হইল না।

তাহার পর রেণুকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য মৃণালিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া সুধীর আর এক জন মহিলা শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিল; আর পিসীমা পুরোহিত ঠাকুরকে বলিলেন, তিনি ঘটক-ঘটকীদিগের দ্বারা সুধীরের বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করিতে থাকুন এবং রেণুর বিবাহের জন্য পাত্র সন্ধান করুন।

কুমুদা যখন শুনিল, পিসীমা সুধীরচন্দ্রের কাছে রেণুর বিবাহের প্রস্তাব করায় সে বলিয়াছে "এখনই!" তখন সে বলিল, "নাও কথা! দাদা বাবুর কি বুদ্ধি খারাপ হয়েছে! আমি ত ন' বছরে ঘর করতে গিয়েছি গো!"

শুনিয়া পিসীমা বলিলেন, "তোদের ছোটলোকের ঘরে যা' হয়, ভদ্দর লোকেরও তাই হ'বে ?"

"তা' কেন হ'বে ! ভদ্দর লোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে উঠে যা'বে ; মেয়েরা স্বয়ম্বরা হ'বে।"

"তুই চুপ কর।"

"তা' করছি ; কিন্তু—তুমি দাদা বাবুর বিয়ের কথা বল্‌তে দাদা বাবু কি বল্‌লে ?"

"সে কথা আজ পাড়তেই পারি-নি।"

"কেন গা ?"

"মেয়ে যে বাপের কাছ ছাড়ে না !"

"তা' হ'ক গে। তুমি আর দেরী ক'র না—সুবিধে দেখে ব'লে ফেল। মনটা ত তৈরী করতে হ'বে !"

"তা'ই হবে।"

কুমুদা পিসীমা'কে বুঝাইতে লাগিল, সুধীরের বিবাহের উদ্যোগ না করায় তিনিই অপরাধী হইতেছেন ; কেন না, তিনি উদ্যোগী হইয়া বিবাহ না দিলে সে ত আর নিজে বলিতে পারিবে না ! পিসীমা তাহাই বুঝিলেন বটে, কিন্তু তবুও সুধীরের ভাব দেখিয়া সে প্রস্তাব করিবার জন্য আবশ্যক সাহস সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তবে তিনি সাহস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৩

পিসীমা যে কাযটা খুব সহজে শেষ হইবে মনে করিয়াছিলেন, তাহা তত সহজে সম্পন্ন হইল না। শতরঞ্চ খেলার ঘোড়ার কিস্তি দিয়া "মাৎ" করা সহজ হয় না। ঘটক-ঘটকী—বিশেষ ঘটকীরা গতায়াত করিতে লাগিল—পিসীমা তাহাদিগকে গাড়ীভাড়া দিতে মুক্তহস্ত হইলেন, কিন্তু তেমন মনের মত সম্বন্ধ পাওয়া যাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। সম্বন্ধ হয় সুধীরের, নহে ত মৃণালিনীর, নহে ত উভয়েরই অপসন্দ হয়। এক এক জন ঘটকী ত বলিতেই লাগিল,—"স্পষ্ট ক'রে বল, মেয়ের বিয়ে এখন তোমরা দেবে না। নইলে যে সব সম্বন্ধ পেলে লোক লুফে নেয়, সে সবও তোমাদের কাছে ভাল বোধ হয় না !" এক জন ঘটকী উপহাসের সঙ্গে বলিল, "মেয়ে ভাল। তা' ভাল মেয়ে যে আর নেই এমন ত নয় ! দেওয়ার কথাও ত খুলে বল না—দেবে তা' জানি, কিন্তু ক' হাজার দেবে তা'ও বল না। আবার এমন কথাও শুনতে পাই, নগদ দিতে তোমাদের আপত্তি আছে।"

সেই কথায় পিসীমা রাগ করিয়া বলিলেন, "তোমার যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! তুমি ভাল সম্বন্ধ আন—দেখবে টাকায় আটকায় কি না।"

বাস্তবিক কিরূপ সম্বন্ধে সে সন্তুষ্ট হইতে পারে, সুধীর তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না এবং সেই জন্যই মৃণালিনীর মতের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছিল। মৃণালিনীর মতের উপর সে যে নির্ভর করিতে পারে, সে বিশ্বাসও তাহার ছিল ; কারণ, সে জানিত—মৃণালিনী রেণুকে আপনার কন্যার মতই স্নেহ করেন এবং তিনি অসাধারণ বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্না। তিনি প্রত্যেক সম্বন্ধের সুবিধা অসুবিধা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিতেছিলেন। তিনি জানিতেন, নিখুঁৎ সম্বন্ধ পাওয়া যায় না ; কিন্তু তবুও রেণুর প্রতি অসাধারণ স্নেহবশে তিনি স্থির করিয়াছিলেন, যতটা সম্ভব নিখুঁৎ সম্বন্ধ দেখিবেন।

কাযেই বিলম্ব হইতে লাগিল। আর বিলম্বের সঙ্গে সঙ্গে পিসীমা বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তিনি কুমুদাকে বলিতে লাগিলেন, "এ যেন ঠক বাছতে গাঁ উজাড় ! আধিক্যেতা দেখে আর বাঁচিনে। বলে, এই এতখানি বয়েস, কত সম্বন্ধই দেখলাম ! এক কথা মেয়ের অদৃষ্ট। তা' না—কোন সম্বন্ধই পসন্দ হয় না !"

তাঁহার বিরক্তির আর একটা কারণ ছিল—রেণুর বিবাহ না হইলে তিনি চাপিয়া সুধীরের বিবাহের চেষ্টা করিতে পারিতেছিলেন না ; গোপনে কথা কহিতে হইতেছিল। ভয়ও ছিল, পাছে জানিতে পারিলে সুধীর বাঁকিয়া বসে বা মৃণালিনী কোন কথা বলেন। মৃণালিনীকে পিসীমা বহুদিনের ব্যবহারে বিশেষ রূপ জানিয়াছিলেন। সাধারণতঃ তিনি শিষ্ট শান্ত—কিন্তু যে স্থানে তাঁহার মতের সহিত অন্যের মতের অনৈক্য হইত, সে স্থানে তিনি নিজ-মত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেন, তাহা অসাধারণ। রেণুর বিবাহ-সম্বন্ধ লইয়াই পিসীমা'র মতের সহিত তাঁহার মতের কয় বার সংঘর্ষ হইয়াছে এবং প্রতি বারই তিনি পিসীমা'র মত চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু পিসীমা কুমুদার ও তাঁহার গঙ্গার ঘাটের পরিচিতাদিগের নিকট শুনিতে লাগিলেন, সুধীরের বিবাহের ব্যবস্থা শীঘ্র শীঘ্র করাই কর্ত্তব্য ; কেন না, যত দিন যাইবে, তত তাহার আপত্তি ও লজ্জা হইবে। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "শুভস্য শীঘ্রং" —শাস্ত্রবাক্য। আর সেই শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ দিতে লাগিলেন, লঙ্কার রাবণ প্রবল প্রতাপশালী

ছিল—সে ইন্দ্রকে তাহার ঘোড়ার ঘেসেড়া করিয়াছিল; সে স্থির করিয়াছিল, স্বর্গে যাইবার জন্য সিঁড়ি করিবে—শুভ কায শীঘ্র শীঘ্র করে নাই বলিয়াই তাহা হয় নাই—রামের সঙ্গে যুদ্ধে সে মারা পড়ে। সে যদি সিঁড়িটা প্রস্তুত করিয়া যাইত, তবে কি আর কোন ভাবনা থাকিত? তাহা হইলে আর কোনরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না; জপ, তপ, যোগ—এ সকলের কোনই প্রয়োজন হইত না—সিঁড়ি ধরিয়া সরাসরি স্বর্গের দ্বারে উপনীত হইয়া কৃতার্থ হওয়া যাইত। রাবণ "গচ্ছং গচ্ছ" করিয়াই কেবল লোকের সুবিধা করিতে পারে নাই।

এই সব পরামর্শে ও দৃষ্টান্তে পিসীমা'র উৎসাহ হইলেও, শেষ কালে—সুধীরের কাছে প্রস্তাব করিবার সময় তাঁহার সাহস অন্তর্হিত হইত। তিনি ভাবিতেন, কোনরূপে মেয়েটার বিবাহ হইয়া যাইলেই হয়; তখন তিনি জিদ করিবেন—সুধীরকে বিবাহ করিতেই হইবে। কিন্তু মেয়ের বিবাহের জন্য তিনি যত চেষ্টাই কেন করুন না, কোন প্রস্তাবই শেষ অবধি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল না।

আর এইরূপে যত বিলম্ব হইতেছিল, মৃণালিনীর ও রেণুর উপর পিসীমা'র রাগ ততই বাড়িতেছিল। সুধীরের জন্যও তিনি অনেকগুলি পাত্রীর সন্ধান পাইয়াছিলেন। পাইবারই কথা; কারণ, সেরূপ পাত্র লাভ করিবার জন্য শতকরা ৯৯ জন কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতা লালায়িত হইবেন। কিন্তু একে একে প্রায় সব সম্বন্ধই সরিয়া যাইতেছিল; কারণ, সে সব পাত্রীরই বিবাহের সাধারণ বয়স অতিক্রান্ত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের অভিভাবকরা পাকা কথার—অন্ততঃ ভিত্তিযুক্ত আশার অভাবে বিলম্ব করিতে পারিলেন না—অন্য পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিয়া দায় হইতে উদ্ধার পাইলেন।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল—রেণুও চতুর্দ্দশ পার হইয়া পঞ্চদশ বর্ষে উপনীত হইল। মৃণালিনী যে তাহাকে সুপাত্রে ন্যস্ত করিবার জন্য কত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, পিসীমা অবশ্য তাহা জানিতেন না; কারণ, মৃণালিনীর ব্যাকুলতা অকারণ বাগাড়ম্বরে কখন আত্মপ্রকাশ করিত না; পরন্তু তিনি বলিতেন, "না হয়, দেরীই হ'বে—তা'ই ব'লে অপাত্রে মেয়ে দিতে পারব না। মা-মরা মেয়ে, বাপের বাড়ীতে যে দু'দিন জুড়া'বার জায়গা পা'বে, তা'ও না; ওকে যেখানে সেখানে দেওয়া যায় না।"

পিসীমা এক শনিবারে অপরাহ্ণে সুধীরের বসিবার ঘরে আসিলেন। তিনি সে ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিতেন না; কারণ, যে ঘর সাত মাসে এক দিন ধৌত করা হয় না, সে ঘরে প্রবেশ করিলে স্নান করিতে হয়—গঙ্গাস্নান করিলেই ভাল হয়। পিসীমা'র উপস্থিতির মত একটা অঘটন সংঘটনে সুধীর অতিমাত্র বিস্মিত হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কি, পিসীমা?"

পিসীমা বলিলেন, "এই এলুম, বাছা।"

সুধীর মনে মনে বুঝিল, আসিবার কোন বিশেষ কারণ আছে; সে কথা পিসীমা "ক্রমশঃ প্রকাশ্য" ভাবে প্রকাশ করিবেন। সে বলিল, "তা' আমাকে ডাকলে না কেন? এ ঘরে তুমি ত বসবে না!"

পিসীমা বলিলেন, "তা' হ'ক গে। আমি বলছি, রেণুর বিয়ের কি করছ?"

"চেষ্টা ত তুমিও করছ, ওর মাসীমাও করছেন, আমিও যতটা সাধ্য করছি।"

"তা' বটে; কিন্তু কিছুই হচ্ছে না!"

"ঐ একটা মেয়ে, ওকে ত যে-সে ঘরে বরে দিতে পারব না।"

"সে আর বলতে!" বলিয়া পিসীমা যেন অশ্রু মুছিতেছেন, এইভাবে শুষ্ক চক্ষুতে অঞ্চলের কাপড়টা ঘষিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, "আমিও ত' আর পারি নে।"

বিস্মিত হইয়া সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"আর কি দেহ বয়, বাবা? তা' ছাড়া সংসার নিয়ে ভগবানের নাম করবার সময়ই ক'মে যায়।"

"তবে না হয়, আর এক জন লোক বাড়াও।"

পিসীমা বলিলেন, "তা'র মানে, সংসারে আরও চুরী বাড়াও! সে হ'বে না।"

"তবে কি করতে চাও?"

"রেণুর বিয়ে হয়ে গেলেই আমি তোর বিয়ে দেব।"

প্রস্তাবটি এমনই অপ্রত্যাশিত যে, সুধীর কি বলিবে, তাহা পিসীমা'র কথা শুনিয়াই স্থির করিতে পারিল না। তাহার পর সে মনে করিল, কথাটাকে গাম্ভীর্য্য দান না করিয়া হাসিয়া লঘু করিয়া দেওয়াই ভাল। তাই সে বলিল, "রেণুর মা ত রেণুর বয়স সংসার দেখতে পারেনি। তবে আজ হঠাৎ তা'র অভাবে সংসার অচল হ'বে কেন, পিসীমা?"

"শুন, কথা। সে যত দিন ছিল, তত দিন সংসার তা'রই ছিল। কথায় বলে—

'যতক্ষণ শ্বাস,
ততক্ষণ আশ'

তের বছর রোগীর সেবা ক'রে কাটিয়েছিস; আমি কি তখন কোন কথা বলতে পেরেছি? কিন্তু কিছুতেই ত তা'কে রাখতে পার্‌লুম না! এখন ত সংসার রাখতে হ'বে।"

"সে ভাবনা এখন কেন, পিসীমা?"

"ভাবব না! হরির ইচ্ছেয় তোর নামডাক দিন দিন বাড়ছে; লোক বলে, যদি দুশ্চিন্তার চাপ না থাকত, তবে তুই এত দিনে জজ হ'তে পারতিস। তাই হ'ক—আমার বাবার বংশ উজ্জ্বল হ'ক। এমন সংসার—কে দেখবে; গিন্নী না হ'লে কি সংসার চলে?"

"সে ঠিক চ'লে যা'বে, পিসীমা। এ তুমি দেখবে 'নেই-রাখালের খোদাই রাখাল'। এই যে রেণু, জন্মাবধি ওর মা রুগ্না—তা'র পর মা'কে হারালে, ওকে কে দেখছে?"

"বালাই! ওর কিসের অভাব? বলে, যা'র বড় নেই সেই বাপ তুই দেখছিস।"

আর অধিক তর্ক করিবার প্রবৃত্তি সুধীরের ছিল না। কেন না, এ বিষয়ের অধিক আলোচনা সে ভাল মনে করিতেছিল না। কিন্তু পিসীমা-ত ছাড়িবার পাত্র নহেন! তাই সুধীর কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। এই সময় টেলিফোনের ঘণ্টাটা বাজিয়া তাহাকে অব্যাহতি দিল।

তাহার হাতে যে কয়টা বড় মামলা ছিল, তাহার মধ্যে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সেইটার সম্বন্ধে নজীর প্রভৃতি দেখিবার জন্য তাহার সহকারী উকিলকে লইয়া মক্কেলের কর্ম্মচারীর আসিবার কথা ছিল। তাঁহারা টেলিফোনে জানাইয়া দিলেন, তাঁহারা আসিতেছেন। ভৃত্যকে যে উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, টেলিফোন ছাড়িয়া উঠিয়া যাইয়া সুধীর সেই উপদেশ দিল—"লকুয়া, সন্তোষ বাবু আর এক বাবুকে নিয়ে আসছেন; এলেই বসিয়ে আমাকে খবর দিস্।" সে পিসীমা'র সঙ্গে তর্ক হইতে অব্যাহতিলাভের জন্যই ব্যস্ত হইয়াছিল; ঘরে ফিরিয়া অকারণে মনোযোগ সহকারে মামলার কাগজের বাণ্ডিলের ফিতা খুলিয়া আবার বাঁধিতে ও কয়খানা বই গুছাইয়া লইতে ব্যস্ত হইল।

পিসীমা তাহার ভাব বুঝিলেন; মনে করিলেন, এক দিনের কায যথেষ্ট হইয়াছে—তিনি কথাটা পাড়িয়াছেন, সুধীরও তাহাতে উগ্রভাবে কোন আপত্তি জানায় নাই—এখন সুযোগ বুঝিয়া আবার কথা বলিবেন।

পিসীমা "ডিঙ্গী মারিয়া' পাপোশখানা ডিঙ্গাইয়া যখন বারান্দায় আসিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, সুধীরের বসিবার ঘরের পাশের ঘর হইতে কে যেন সরিয়া গেল। তবে কি রেণুই সে ঘরে আসিয়াছিল, এবং তাঁহার কথা শুনিয়াছে? তিনি ত তাহাকে তাহার নূতন মহিলা শিক্ষকের সঙ্গে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছিলেন! তিনি আপনার মহলে যাইবার পূর্ব্বে রেণুর পড়িবার ঘরে উঁকি দিলেন—কেহই ঘরে নাই। মানুষ যখন ভয় পায়, তখন সে আপনাকে আপনি সাহস দেয়। পিসীমা তাহাই করিতে লাগিলেন, আপনাকে আপনি বুঝাইতে লাগিলেন, "যদি শুনেই থাকে, তা'তে কি? আমি কি কোন অন্যায় কথা বলেছি? সবাই ত বলছে—সুধীরের বিয়ে না দিলে অন্যায় হ'বে। আমার পোড়া কপাল—ভাই গেল, ভাজ গেল—তবু সংসার মাথায় নিয়ে আছি। ছেলেটাকে কোলে ক'রে মানুষ করেছি, মায়ায় ছাড়তে পারছি না; আর লোক আমাকেই দুষছে। এই ত সে দিন গঙ্গার ঘাটে—এক ঘাট লোকের মধ্যে গোপালের মা বল্‌লে, 'তুমি করছ কি, দিদি—এখনও ছেলের বিয়ে দিচ্ছ না! দেখতে দেখতে যে বছরও কেটে গেছে! তুমি উদ্যোগী হয়ে বিয়ে না দিলে, ও কি নিজে উপযাচক হয়ে বলবে, বিয়ে করবে?' আমি তা'র কোন উত্তর দিতে পার্‌লুম না। আর আমি কি মরতে মরতেও এই সংসারের আঁস্তাকুড় ঘেঁটে মরব? দু' দণ্ড স্থির হয়ে ভগবানের নাম করব, তা'র অবসরও পাই না।"

পিসীমা আপনার মহলের বারান্দায় পা দিতে না দিতে কুমুদা বলিল, "কোথায় গেছলে, পিসীমা?"

পিসীমা বলিলেন, "চুলোয়। কেন?"

"মাসকাবারের জিনিষ এসেছে। তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—দেখবে, তবে ত তুলব।"

"মা গো মা! দু' মিনিট স্বস্তি নেই। তাই ত বল্‌ছি, আমি কি চার কাল এমনি ক'রে সংসার আগলে থাকব?"

"আমি ত তাই বলি, পিসীমা; দাদা বাবুর বিয়ে দাও। বৌ এসে সংসার করুক; তুমি তীর্থধর্ম্ম কর—আমিও তোমার সঙ্গে যা'ব।"

"তাই বল্‌তেই ত গিয়েছিলুম।"

কুমুদার চাকাপানা মুখে হাতীর চোখের মত চোখ্ দুইটায় আনন্দ যেন ফুটিয়া উঠিল। সে হাসিবার চেষ্টায় মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "বলেছ, পিসীমা? বলেছ, দাদা বাবুকে?"

"বলেছি।"

"তা' দাদা বাবু কি বল্‌লে?"

"সে শুনবি পরে। এখন চল, মাসকাবারের জিনিষ দেখে-নি; আমি তোলাবার ব্যবস্থা করছি, তুই এক বার চুপিচুপি পুরুত ঠাকুরকে ডেকে আন —যেন সুধীর জান্‌তে না পারে।"

কুমুদা বাক্যব্যয় না করিয়া পিসীমার আদেশ পালন করিতে গেল এবং পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকিয়া আনিল।

তখন সুধীর মক্কেলের কায লইয়া ব্যস্ত।

পিসীমা পুরোহিত ঠাকুরকে বসিবার জন্য এক-খানা কুশাসন দিয়া বলিলেন, "আমি ত আজ সুধীরকে বললুম, 'বাবা, তুমি বিয়ে কর, আমি আর সংসার ঘাঁটতে পারব না'।"

পুরোহিত ঠাকুর পিসীমা'কে তুষ্ট রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন; কেন না, পিসীমা'র ভক্তি মাসে একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ব্যতীত সময় সময় "সিধার" রূপ ধরিয়া পুরোহিত ঠাকুরের গৃহে দেখা দিত। তিনি বলিলেন, "বলেছেন? তা' আবার বলবেন না! আপনি বাবুর মা'র বাড়া—বাসুকি যেমন এই পৃথিবী মাথায় ক'রে আছেন, আপনি তেমনই বাবুর সংসারটা মাথায় ক'রে আছেন।"

কথাটা, বোধ হয় পিসীমা'র ভাল লাগিল না—তিনি কি সাপ?

তাঁহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া পুরোহিত ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা' বাবু কি বললেন?"

পিসীমা বলিলেন, "বল্‌লে, সে ভাবনা এখন কেন?"

"আপত্তি ত করেন-নি?"

"বিয়ে করবে না—এমন বলা বলে-নি।"

"তবেই হ'ল। শাস্ত্রে বলে—'মৌনে সম্মতি লক্ষণা।' অর্থাৎ কি না—কথা না বললে সে-ই হচ্ছে সম্মতি।"

"তা' কথা ত অনেকেই বল্‌লে!"

"ঐ মানে হচ্ছে, কথা ত বল্‌বেনই—উকীল কি না! আপত্তি না করলে সে-ই সম্মতি।"

কুমুদা বলিল, "একে বারেই কি বলবে, 'হাঁ, পিসীমা, আমি বিয়ে করব'—সেধো, খাবি? না—হাত ধুয়ে ব'সে আছি।' দেখবে দু'দিন বললেই আর কোন আপত্তির কথাও উঠবে না।"

পিসীমা বলিলেন, "হরির ইচ্ছেয় তা'ই হ'ক।"

পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "আপনার দেবদ্বিজে যে ভক্তি, তা'তে আপনার আশীর্ব্বাদে তা' হবেই।"

"তবে আপনি আর একটু চেপে মেয়ের সন্ধান করুন।"

"সে আর বলতে?"

মৃণালিনী কখন আসিয়াছিলেন, পিসীমা জানিতে পারেন নাই। এখন তিনি আসিলে সরাসরি রেণুর কাছেই যাইতেন—ফিরিয়া যাইবার সময় কোন দিন বা পিসীমা'র সঙ্গে দেখা হইত, কোন দিন বা হইত না—রেণুকে বলিয়া যাইতেন, "পিসীমাকে বলিস, আমি আজ আর দেখা ক'রে যেতে পারলাম না; তাড়া আছে।"

আজ যাইবার সময় তিনি দেখা করিয়া যাইবেন বলিয়া পিসীমা'র ঘরের দিকে আসিয়াছিলেন। ঘরে এক জন পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই সময় পুরোহিত ঠাকুরের ও কুমুদার কথা এবং পিসীমা'র কথার কতকাংশ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। শুনিয়া তিনি আর অগ্রসর হয়েন নাই, যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিলেন, তেমনই নিঃশব্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন—কেবল বুকের মধ্যে দুশ্চিন্তা লইয়া গিয়াছিলেন—ভগিনীর মৃত্যুশোক যেন আজ নূতন হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। যে ভয় তিনি আপনার কাছেও যেন আপনি প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছিলেন, আজ যে তাহাই সম্মুখে!

ভাবিতে ভাবিতে মৃণালিনী গৃহে ফিরিলেন—তাঁহার বুকের মধ্য হইতে যেন ক্রন্দন উঠিতে লাগিল।

এ দিকে পিসীমাও তাড়াতাড়ি পুরোহিত ঠাকুরকে বিদায় দিয়া ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করিলেন —মাসকাবারের জিনিষ গুছাইতে হইবে।

তখনও সুধীরের মামলা সম্বন্ধে পরামর্শ শেষ হয় নাই।

৪

সে রাত্রিতে পিসীমা'র কথা লইয়া কয় জনই মনে তোলাপাড়া করিলেন। সুধীর যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে বিশেষ কিছু না থাকিলেও কুমুদার ও পুরোহিত ঠাকুরের ব্যাখ্যা তাহাকেই পিসীমা'র সাফল্যের আশার ভিত্তি করিয়া দিয়াছিল। তিনি সেই ভিত্তির উপর কল্পনার তাজমহল রচনা করিতে-

ছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, সুধীরের বিবাহে সম্মতি আছে। তিনি মনে মনে বলিলেন, "তা' থক্‌বে না? চিররুগ্ন বৌ'কে নিয়ে সংসার করা ত নয় —কেবল ভোগই ভুগেছে; যেন কেবল নাকানি-চোবানি খেয়েছে। একে পুরুষ মানুষ সেবা নিতেই পারে—সেবা করতে জানে না; তা'তে এই বয়স। কি কষ্টটাই পেয়েছে! এ বার বিয়ে ক'রে সুখে সংসার করুক।"

কোন একটা বিষয় লইয়া অধিক ক্ষণ চিন্তা করার ক্ষমতা পিসীমা'র ছিল না; বিশেষ চিন্তার তীব্রতা-জনিত অনিদ্রা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল! বরং দিনের কাযের পর রাত্রিতে বালিশে মাথা রাখিতে না রাখিতে তিনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হইতেন। আজও অনেক ক্ষণ চিন্তা করিতে না করিতে নিদ্রা তাঁহার চিন্তার সূত্র ছিন্ন করিয়া দিল।

পিসীমা ঘুমাইলেন, কিন্তু পার্শ্বের কক্ষে রেণু তত শীঘ্র ঘুমাইতে পারিল না। পিসীমা অসময়ে পিতার বসিবার ঘরে যাইতেছেন দেখিয়া সে অনুমান করিয়াছিল, একটা অসাধারণ কিছু ঘটিয়াছে। তাই সে যাইয়া পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল—তথায় দাঁড়াইয়া পিসীমা'র ও পিতার সব কথা শুনিয়াছিল। পিসীমা যে তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা সে জানিত; কিন্তু তাহার পিতার বিবাহ দিবার জন্য তাঁহার ব্যস্ততা যে অন্তঃসলিলা প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা সে পূর্ব্বে এতটা বুঝিতে পারে নাই। সংসারের বিষয় বুঝিবার বয়স তাহার হইয়াছিল। তবুও পিসীমা'র এই প্রস্তাব তাহার কাছে কতকটা অতর্কিত আঘাতের মত বোধ হইল। পিতা যদি আবার বিবাহ করেন, তবে মাতৃহীনা কন্যার পিতৃগৃহে আর কি অধিকার থাকিবে? মাসীমা'র কথার যে গুরুত্ব সে এত দিন উপলব্ধি করিতে পারে নাই, আজ সে গুরুত্ব তাহার নিকট প্রতিভাত হইল। এ গৃহ তাহার পরের গৃহ হইবে। পিতার স্নেহও আর তাহাকেই ঘিরিয়া প্রবাহিত হইবে না। মা'র অভাব কত বড় অভাব, তাহা আজ যেন সে নূতন করিয়া বুঝিতে পারিল। তাহার বুকের মধ্যে সে যেন রুদ্ধ ক্রন্দন শুনিতে পাইল—আপনি চমকিয়া উঠিল। পিতৃগৃহে কন্যার অধিকার স্নেহের অধিকার। তাহাতে পুত্রের যে অধিকার সমাজ স্বীকার করিয়াছে, কন্যার সে অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। অথচ পুত্র আর কন্যা—একই পিতার সন্তান, একই মা'র গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া একই মাতার স্তন্যে পালিত হয়। লোক আত্মজাকে সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে! স্নেহের অধিকার কি অধিকার নহে? তাহা কি আর সব অধিকার অপেক্ষাও অধিক অধিকার নহে? সে যখন কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন সমাজের ব্যবস্থা তাহাকে নতমস্তকে গ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু তাহার পর? বিমাতার সম্বন্ধে যে ধারণা সে কথা-সাহিত্য হইতে পাইয়াছে, তাহাতে বিমাতার নিকট সে কি ব্যবহার আশা করিতে পারে? মা যখন নাই, তখন মাতৃস্নেহ সে কোথায় পাইবে—পাইবার আশা কেন করিবে—কেমন করিয়া করিবে? কিন্তু বিমাতা কি তাহাকে পিতৃস্নেহেও বঞ্চিত করিতে পারিবেন? মাতৃহারা হইয়া সে স্নেহ পাইয়াছে—মাসীমা'র কাছে। আর পিতৃস্নেহ তাহার হৃদয়ে আশীর্ব্বাদের মতই বর্ষিত হইয়াছে। সে যে সেই স্নেহে বঞ্চিত হইবার কথা কল্পনাও করিতে পারে না! তাই তাহাতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া সে কান্দিয়া ফেলিল। তাহার হৃদয় যদি অভিমান-প্রবণ না হইত, তবে সে আপনাকে আপনি সান্ত্বনা দিয়া শান্ত করিতে পারিত না। তাহার প্রবল অভিমানই তাহাকে শান্ত করিল। সে তাহার পিতার একমাত্র কন্যা—তাহার মাতার স্মৃতি—পিতৃস্নেহ যদি এমনই ক্ষণভঙ্গুর হয় যে, বিমাতা আসিয়া আঘাত করিলেই তাহা চূর্ণ—বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তবে তাহার অভাবে সে কাতর হইবে কেন? যে স্নেহে তাহার জন্মগত অধিকার, তাহা সে কখন কান্দিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে না—না—না। সে যে বিষম অপমান—সে যে বিষম লজ্জা!

পিতার স্নেহে সে বঞ্চিত হইবে, ইহা রেণু যেন মনেও করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু মাসীমা'র মনে যে সে শঙ্কা স্থান পাইয়াছিল, তাহা মনে করিয়া সে-ও শঙ্কিতা হইল। তাহার পর সে পিসীমা'কে সুধীর যাহা বলিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিল—"নেই-রাখালের ক্ষোদাই রাখাল।" মাসীমা'কেও সে সময় সময় সেইরূপ কথা বলিতে শুনিয়াছে। মাসীমা'র সন্তান হয় নাই; তাই অনেকে তাঁহার স্বামীকে আবার বিবাহ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি সে পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার স্ত্রীর চোখের জলে আমার সব সুখ ছাই হয়ে যা'বে। ছেলেমেয়ে যদি হ'বার হ'ত আমার স্ত্রীরই হ'ত।" যে স্বামী তাঁহাকে প্রাণের অপেক্ষাও অধিক ভাল-বাসিতেন, তাঁহাকে হারাইয়া মাসীমা কেমন করিয়া বাঁচিবেন, কাত্যায়নী তাহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া-ছিলেন। তবুও মাসীমা বাঁচিয়া আছেন—তিনি

এখন গৃহদেবতার সেবায় অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি বলিতেন, "এক দেবতাকে হারিয়েছি, যে ক' দিন থাকতে হ'বে, আর এক দেবতার সেবা ক'রে কাটাব।" তিনি বলিয়া থাকেন, "মনে বল যিনি দিতে পারেন, তিনিই দেন।" রেণু মনে করিল, যদি দুর্ভাগ্য অনিবার্য্য হয়, তবে তাহা সহ্য করিবার মত বলও সে পাইবে। সে যেন সান্ত্বনা পাইল। তখন তাহার নেত্রে নিদ্রার স্পর্শ অনুভূত হইল। সে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু অন্য দিন সে যেমন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হয়, আজ তেমন হইল না—আজ বার বার তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইতে লাগিল; আর বার বার সে নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। স্বপ্নে সে তাহার মাতাকে দেখিতে পাইল। মা রোগশয্যায়—মৃত্যুশয্যায় থাকিয়াও যখন তাহার দিকে চাহিতেন, তখন তাঁহার দৃষ্টিতে যে মাতৃস্নেহ ক্ষরিত হইত, তাঁহার দৃষ্টিতে সেই স্নেহের প্রকাশ। তাঁহার মুখে তখনও যেমন কোন কথা থাকিত না—এখনও তেমনই কোন কথা নাই। চিররুগ্না জননী—সন্তানকে আপনি লালন-পালন করিতে—বক্ষে ধরিতে পারেন নাই, কেবল তাহাকে দেখিয়াই হৃদয়ের তৃষ্ণা তৃপ্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন—সে যেন অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। তাঁহার স্নেহ যে বাক্যের অতীতই হয়। শরতের ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের মধ্য দিয়া রবিকর যেমন বার বার ফুটিয়া উঠে, তাহার ভাঙ্গা ভাঙ্গা নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নে মা'র মূর্ত্তি তেমনই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। রেণু ভাবিল, মা যে আজ তাহার দুশ্চিন্তার সময় তাহাকে দেখা দিলেন, তাহার কি কোন বিশেষ সার্থকতা আছে? তিনি কি তাহার উৎকণ্ঠার দিনে তাহাকে লোকান্তর হইতেও শান্তি দিতে আসিতেছেন? আজ সে যখন ভয় পাইয়াছে, তখন কি তিনি অভয়ারূপে আসিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয়-ভৃঙ্গার পূর্ণ করিয়া আনিয়া তাহাকে সাহস দিতেছেন? তিনি যে তাহার মা—যে মা স্বর্গ হইতেও বড়, যে মা স্নেহ দিয়াই আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেন, বিনিময়ে কিছু চাহিবার বা পাইবার কথা কল্পনাও করিতে পারেন না।

সে রাত্রিতে মৃণালিনী যেন দুশ্চিন্তার কণ্টক-শয়নে দীর্ঘযামা যামিনী অতিবাহিত করিলেন। অকালে বিধবা হইয়া তিনি জীবনকে নূতন পথে পরিচালিত করিতেছিলেন—ইহকালকে যথাসম্ভব অবজ্ঞা করিয়া পরকালের সঙ্গে আপনার যোগসাধনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, তিনি ভালবাসার মধ্য দিয়া ভক্তিতে উপনীত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার নারীত্ব দেবত্বে মিলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মানুষের হৃদয় দুর্ব্বল। সে যে ইহকালকে অবজ্ঞা করিতে পারে না, সে মধ্যে মধ্যে তাহা প্রবলভাবেই বুঝাইয়া দেয়। আজও তাহাই হইয়াছিল। রেণু তাঁহার বড় স্নেহের—তাহার মা'র মৃত্যুর পর তাহারই প্রতি স্নেহহেতু তিনি তাঁহার ভগিনীর ভগিনীশূন্য গৃহে যখন তখন যাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। তিনি যেন তাহাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার দুঃখ-সম্ভাবনা আজ তাঁহাকে এমনভাবে পীড়িত করিতে লাগিল যে, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, কে যেন তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। তাঁহার সহিত রেণুর যে সম্বন্ধ, তাহাতে তিনি তাহাকে কেবল মাতার স্নেহই দিতে পারেন—তাহাকে শাসনও করিতে পারেন না; তাহা কেবল প্রস্রবণের বারির মত স্নেহ প্রদান করিয়াই সার্থকতা লাভ করে।

মৃণালিনী বিষয়টি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। বিবাহিত জীবনে কয় বৎসর মাত্র সুধীর স্ত্রীর সহিত স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারিয়াছিল। তাহার পর ত্রয়োদশ বর্ষ-ব্যাপী রোগীর সেবা ও শেষ কয় বৎসর কেবলই উৎকণ্ঠা। সে সময়ের মধ্যে সুধীরের মনে কি হইয়াছিল, কেহ জানে না; কিন্তু তাহার ব্যবহারে অসাধারণ ভালবাসারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল—সে ভালবাসা যদি কর্ত্তব্যনিষ্ঠারই রূপান্তর হয়, তবুও তাহা প্রশংসনীয়। তাহার পর সব ফুরাইয়াছে। কিন্তু কর্ত্তব্যের কি অবসান হইয়াছে? কে বলিবে? হিন্দুর লোকাচার স্ত্রীর কর্ত্তব্যকে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ বলে না—মৃত্যুর রেখা অতিক্রম করিয়া তাহাকে লইয়া যায়—ইহকালের সহিত পরকালের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া প্রেমের প্রোজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু সেই লোকাচারই স্বামীর কর্ত্তব্যকে তত উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করে নাই! যাঁহারা মানব-চরিত্র নখদর্পণে দেখিতেন, তাঁহারা কেন এই প্রভেদে সম্মতি দিয়াছেন, তাহা কে বলিবে? হয়ত তাঁহারা নারীর মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করিবার জন্যই তাহা করিয়াছেন। লোকাচারের দিক্ হইতে দেখিলে সুধীর যদি আবার বিবাহ করে, তবে তাহাকে কি দোষ দেওয়া যায়? যে তৃষ্ণা সে তৃপ্ত করিতে পারে নাই; সে যদি তাহা তৃপ্ত করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহাও অস্বাভাবিক বলা যাইবে না। বিশেষ তাহার সংসারে আর কেহ নাই। তাহার নবীন বয়স, তাহার সম্মুখে যশ

সংসারের খুঁটিনাটি কায পুরুষের পক্ষে ধৈর্য্যচ্যুতিকর। সংসারে অবলম্বন কেবল পিসীমা—তিনিও বৃদ্ধা এবং তিনিই তাহার বিবাহের জন্ম ব্যগ্র। এ অবস্থায় সুধীর যদি আবার বিবাহ করে—। কিন্তু এত দিনের বিবাহিত জীবন, তাহার স্মৃতি কি মানুষ মুছিয়া ফেলিতে পারে? পুরুষের হৃদয় কিরূপ? সাংসারিক সুবিধা কি ভালবাসা অপেক্ষা বরণীয়?

মৃণালিনী রেণুর জন্মই হৃদয়ে বেদনানুভব করিতে লাগিলেন। তাহার মা তাহার কি ছিলেন, এখন সে তাহা বুঝিবে। কাত্যায়নী দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষকাল রোগশয্যায় পড়িয়া ছিল—তবুও স্বামী ও সংসার তাহার ছিল; সংসারে রেণু তাহার পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া বিরাজিত ছিল। আজ সে আর নাই; কাযেই রেণুর জন্ম ভাবনা। মৃণালিনীর মনে হইল, এখন রেণু সুপাত্রে অর্পিতা হইলে তবেই সব রক্ষা হয়। তাহার সংসারে সে তাহার অধিকার-প্রতিষ্ঠা করিবে—স্বামীর ভালবাসায়, পুত্র-কন্যায় তাহার মাতৃশোক-ক্ষত দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু বিবাহ—সে ত সর্ব্বদেশে সব সমাজেই কতকটা অনিশ্চিতভাবে ভাগ্যপরীক্ষা, আমাদিগের সমাজে সেই ভাগ্যপরীক্ষা আরও অনিশ্চিত। কি হইবে কে বলিতে পারে? রেণুর জন্ম দুর্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আজ মৃণালিনীর মনে ভগিনীর জন্ম শোক প্রবল হইয়া উঠিল।

মৃণালিনী সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না।

আরও এক জন বিনিদ্ররজনী যাপন করিল। সে—সুধীর। আজ যে ঝড় উঠিয়াছে, সে ঝড় যে উঠিতে পারে, তাহা সে জানিত; কিন্তু জানিয়াও তাহার দিকে দৃক্পাত করে নাই—আকাশের দিকে চাহিয়া দেখে নাই। পিসীমা আজ আসিয়া ঝটিকার প্রথম আবির্ভাবে বিতাড়িত শুষ্ক পত্রের দিকে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ঝড়বেগ যে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিবে তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে। সে শৈশবে পিতৃহীন, তাহার মাতাই সংসারের সব ভার পিসীমা'র সঙ্গে ভাগ করিয়া বহন করিয়াছিলেন। পিসীমা বাল-বিধবা ভ্রাতার সংসারেই ছিলেন। সুধীরকে তিনি তাহার মাতার সহিত সমান স্নেহে পালিত করিয়াছেন। সুধীরের বয়স যখন উনিশ বৎসর, তখন মা ও পিসীমা তীর্থে গিয়াছিলেন—তীর্থস্থানেই মা'র মৃত্যু হয়। টেলিগ্রাম পাইয়া সুধীর তথায় যাইয়া তাঁহার শেষ সেবা করিতে পারিয়াছিল। পিসীমাই তাহার বিবাহ দেন। তিনি কাত্যায়নীকে সংসারের ভার দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রোগ কাত্যায়নীকে সে ভার গ্রহণ করিতে দেয় নাই। তাহার পর ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী রোগভোগ—তাহার পর সব শেষ—মৃত্যুর ফুৎকারে ক্ষীণ জীবনশিখা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। সংসারের কোন বিষয় সে কোন দিন জানে নাই। মা কোন দিন সংসারের কোন বিষয়ে তাহার পরামর্শ চাহিলে সে বলিত, "আমাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। এ সব বিষয়ে আমি তোমার বিধবা মেয়ে—কিছুই জানি না।" পিসীমা এই দীর্ঘকাল জরাজীর্ণ শরীরে তাহার সংসারের ভার বহন করিয়াছেন। আজ তিনি যদি সে ভার ফেলিয়া দিতে চাহেন, তবে কি হইবে? সে কথা সে এত দিন ভাবে নাই। আজ তাহাকে ভাবিতে হইল।

এক বার তাহার মনে হইল, রেণুর বিবাহ দিয়া জামাতাকে কাছে রাখিলে হয় না? কিন্তু সে প্রস্তাবে তাহার আপনার মনই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; তাহাতে কি কন্যার মর্য্যাদা থাকে? তাহার মনে হইল, কাত্যায়নী আরও কিছুকাল রোগশয্যায়ই থাকিল না কেন? কিন্তু সে চিন্তাও তাহার ভাল লাগিল না; রোগভোগের শেষ কয় বৎসর সে যেরূপ অসহায় হইয়াছিল, তাহাতে তাহার পক্ষে জীবন ভারমাত্র হইয়াছিল; তাহাকে কি সুধীর নিজ স্বার্থহেতু আরও অধিক দিন সেই অবস্থা ভোগ করিতে দেখিলে সুখী হইত?

সে এই জীবনে কি পাইয়াছে? স্ত্রীর সেবা সে পায় নাই, কিন্তু ভালবাসা যে পাইয়াছে, তাহাতে তাহার কোন দিন সন্দেহ হয় নাই।

ভাবনার শেষ না পাইয়া সুধীর শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল এবং চিন্তার স্রোতঃ ভিন্নপথে প্রবাহিত করিবার জন্ম মোকর্দ্দমার কাগজ লইয়া বসিল। তাহার মনের উপর তাহার অসাধারণ প্রভুত্ব ছিল। বিশেষ স্ত্রীর দীর্ঘকালব্যাপী রোগের সময় কর্ত্তব্যবুদ্ধি সে প্রভুত্ব আরও প্রবল করিয়াছিল। সে মামলার কাগজ লইয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে নজীর দেখিবার জন্ম একখানা পুস্তকের প্রয়োজন হইল। সেই প্রয়োজনে সুধীর ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দার ও সিঁড়ির আলো জ্বালিয়া নিম্নতলে বসিবার ঘরে পুস্তক আনিতে গেল। পদশব্দে কুমুদার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে পিসীমা'কে ডাকিল, "ওগো পিসীমা, নড়ে কে?" পিসীমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া লকুয়াকে ডাকিলেন। লকুয়া উঠিয়া দেখিল, সুধীর আলমারী খুলিয়া পুস্তক লইতেছে। সে বলিল, "বাবু।"

"বাবু!"—বলিয়া পিসীমা বাহিরের মহলে আসিলেন। তখন সুধীর পুস্তক লইয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছে। সে উপরে উঠিয়া আসিলেই তিনি বলিলেন, "রাত ক'টা?"

সুধীর বলিল, "তিনটে।"

"এই নিষুতি রাত্তিরেও কি জেগে আছিস্?"

"একটা মোকর্দ্দমার নথী—"

"হ'ক গে মোকর্দ্দমা! এ কি? এমন করলে কি শরীর টিকবে?"

কতকটা অপরাধীর মত ভাবে সুধীর বলিল, "এই নথী দেখা হ'লেই শোব।"

পিসীমা বলিলেন, "আমি জানি, এমনই ক'রে তুই দেহ পাত করছিস। আমারই পোড়া কপাল! আমি আর এখানে থাকব না; আমার কাশী যাবার ব্যবস্থা ক'রে দে।"

"আচ্ছা, আমি বল্‌ছি, যত কাযই কেন থাকুক না, আর কোন দিন এত রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে থাকব না।"

"সে হ'বে না। আমি এই মাসেই বৌ আনব; নইলে হ'বে না"

"সুধীর কথাটা উড়াইয়া দিবার জন্য বলিল, "সর্ব্বনাশ—রাত জাগবার লঘু অপরাধে তুমি আমার এমন গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা করছ যে, এ একেবারে মূলা চোরের ফাঁসির মত বিচার হচ্ছে, পিসীমা।"

"আমি হাসি-তামাসায় ভুলব না। আমি কালই ঘটক-ঘটকীদের ব'লে দেব।"

পিসীমা'র কণ্ঠস্বর শুনিয়া কি হইয়াছে দেখিবার জন্য রেণু বারান্দায় আসিয়াছিল। পিসীমা তাহা লক্ষ্য করেন নাই; কিন্তু সুধীর তাহাকে দেখিতে পাইল এবং দেখিতে পাইয়া ঘরে যাইয়া বহিখানা টেবলের উপর ফেলিয়া তাড়াতাড়ি আলো নিবাইয়া দিয়া শয্যায় শয়ন করিল।

পিসীমা অগত্যা আপন মনে বকিতে বকিতে আপনার মহলে ফিরিয়া যাইলেন। তিনি যাইবার সময় কুমুদা তাঁহাকে বলিল, "পিসীমা, মাসীমা জেগেছে—সে কি ভাব্‌লে?" সে রেণুকে মাসীমা বলিত।

পিসীমা বলিলেন, "কি আবার ভাববে? কচি খুকীটি ত নয় যে, কিছু বোঝে না!"

৩

সুধীরের সংসারে যেন কেমন একটা গোল হইয়া গেল। পিসীমা'র মনের ভাব যেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, রেণুর মনের ভাবও তেমনই পরিবর্ত্তিত হইল। বার্দ্ধক্যের একটা বৈশিষ্ট্য—যেটা করিবার কথা মনে পড়ে, সেটা করিবার জন্য ব্যাকুলতা দেখা যায়। পিসীমা সুধীরের বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

কুমুদা পিসীমাকে বুঝাইল, "পিসীমা, তুমি গোড়া শক্ত না ক'রে কায করছ। আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, আগে তোমার নাতনীর বিয়ে দিয়ে ফেল, তা'র পর কায সহজ হয়ে আসবে। তুমি দেখবে 'গরীবের কথা বাসী হলে খাটে'।"

পিসীমা তাহা বুঝিলেন; বলিলেন, "চেষ্টা ত কর্‌ছি, কিন্তু যে মাসী! কোন-সম্বন্ধই পসন্দ হয় না। কি যে চা'ন, তা'-ও ত বুঝতে পারি না।"

সেই সময় রেণু এক জন মহিলাকে সঙ্গে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া পিসীমা মুখের ভঙ্গীতে যতটা আনন্দ প্রকাশ করা সম্ভব তাহা করিয়া বলিলেন, "এস, এস, মা এস।" তিনি কুমুদাকে বলিলেন, "ওরে শীগ্‌গির গালচেখানা পেতে দে।"

"গালচে কেন?" বলিয়া আগন্তুক মহিলা মেঝের উপরেই বসিয়া পড়িলেন।

পিসীমা বলিলেন, "কেমন, সব ভাল ত?"

"ভাল আর কি বলব, কাকীমা, জানেনই ত নীরুর—"

"তা' আর জানিনে! বলে বেটার বিয়ে দিয়ে—সোনার সংসার, চাঁদের হাট; তারই মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! দেখ না, আমার সুধীরেরই বা কি।" —বলিয়া পিসীমা শুষ্ক নেত্রে অঞ্চল ঘষিয়া কান্দিবার ভাণ করিলেন।

মহিলাটি পিসীমা'র ভাশুরের পুত্রবধূ। পিসীমা বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে আসিলে যখন শ্বশুরের সম্পত্তি চুল চিরিয়া ভাগ করিয়া লইবার জন্য মামলার আয়োজন হইয়াছিল, তখন এই ভাশুরই এক দিন পিসীমা'র গহনার বাক্স আর দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আনিয়া পিসীমা'র পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার উইল দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, পিসীমা'র পুত্র হয় নাই বলিয়া সেই উইলের নির্দ্দেশানুসারে তিনি বাড়ীতে থাকিলে কেবল খোরপোষ পাইতে পারেন, আর কিছুই নহে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "কিন্তু আমার ভাই নাই—বৌমার যা'তে কোন কষ্ট না হয়, তা' করা আমার কর্ত্তব্য! তিনি বাড়ীতে চলুন—বাড়ীর গৃহিণীপনা করুন। যদি তা' তাঁ'র মত

না হয়, তবে এই তাঁ'র গহনার বাক্স থাকল, আর এই থাকল, তাঁ'র জন্য দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ। এ ছাড়া তিনি যত দিন বেঁচে থাকবেন, পঞ্চাশ টাকা ক'রে মাসহারা পা'বেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললে আমার ছেলেদের কখন কল্যাণ হ'বে না।"

যিনি এমন ব্যবহার করেন, তাঁহার সহিত কলহ করা যায় না। পিসীমা আর শ্বশুরালয়ে বাস করিতে যায়েন নাই বটে, কিন্তু "কাযকর্ম্মে" তথায় যাইতেন।

তাহার পর ভাশুর গিয়াছেন—এক পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া তাঁহার স্ত্রীও গিয়াছেন। আগন্তুক মহিলা সেই পুত্রের স্ত্রী। পাঁচ বৎসর হইল ইনি বিধবা হইয়াছেন।

ইঁহারও একটি মাত্র পুত্র। বর্ষাধিক হইল পুত্র-বধূর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি তিন বৎসরের কন্যা ও ছয় মাসের শিশু পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। পিতামহী তাহাদিগকে লইয়া বিব্রত হইয়াছেন—তাঁহার পক্ষে তাহাদিগকে রাখিয়া বাহির হওয়াই দুষ্কর। তবুও কাত্যায়নীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি এক দিন পিসীমা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার মনে একটা কথা জাগিতে-ছিল—রেণুকে তিনি শৈশবাবধি দেখিয়া আসিতেছেন, মেয়েটির যেমন রূপ তেমনই গুণ; এই মাতৃহারা কন্যাটিকে তিনি যদি পুত্রবধূ করিতে পারেন! কিন্তু দুই কারণে তিনি সে প্রস্তাব করেন নাই। প্রথম —নীরেন্দ্র বিবাহ করিতে অসম্মত ছিল; সে বলিয়া আসিয়াছে, "মেয়ের আর ছেলের সৎমা এনে তা'দের দুঃখের পথ ক'রে দেব না।" দ্বিতীয়—তিনি শুনিয়াছিলেন, সুধীর বলিয়াছে, কালাশৌচের বৎসর কাটিলে পরে কন্যার বিবাহ দিবে। কিন্তু তিনি রেণুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসিয়াছেন। এখন তিনি ঘটকীদিগের কাছে শুনিয়াছেন, রেণুর বিবাহের চেষ্টা হইতেছে; তাই তিনি আজ পিসীমা'র কাছে আসিয়াছেন।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাতী-নাতিনীকে নিয়ে এলে না কেন?"

আগন্তুক মহিলা বলিলেন, "তা'রা ছাড়তে চায় না বলেই ত আস্‌তে পারি নে। আজ নীরু তাদের শিবপুরে বাগান দেখাতে নিয়ে গেছে। তাই ভাবলুম, অনেক দিন কাকীমা'কে দেখি-নি—দেখে আসি। আর এই মা-মরা মেয়ে, ওর মুখখানা মনে পড়লে আমার বুক ব্যথায় ভরে উঠে।"

পিসীমা আবার অশ্রুমোচনের ভাণ করিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, "এখন এর জন্যে একটি ভাল পাত্র দেখে দাও, মা। আমি নিশ্চিন্ত হই।"

তাহার বিবাহের কথার আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় রেণু বলিল, "মাষ্টার বোধ হয় এসেছেন।"—সে চলিয়া গেল।

তখন মহিলাটি আসল কথা পাড়িলেন, "কাকীমা, আমার বড় ইচ্ছা রেণুকে আমি নিয়ে যাই।"

পিসীমা বলিলেন—"সে ভাগ্যি কি মেয়ের হবে?" বলিয়াই তিনি বলিলেন—"কিন্তু—"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে পিসীমা'র দিকে চাহিলেন!

পিসীমা বলিলেন, "ওঁর মাসীকে ত জান। কোন সম্বন্ধই তাঁ'র পসন্দ হয় না। সবতা'তেই নাক সিঁটকে আছেন। তিনি কি বল্‌বেন তা' ত বল্‌তে পারি না।"

"ভবিতব্য হয়, ত' কেউ ঠেকাতে পার্‌বে না। এখন আমি এক বার নীরুকে কোন রকমে রেণুকে দেখাতে চাই। সে বলে, সৎমা আনলে ছেলেমেয়ের কষ্ট হ'বে। আমি তা'কে বলেছি, আমি এমন মেয়ে আনব যে, সে এদের আপনার ক'রে নেবে।"

"তা' ছাড়া, বৌমা, তুমি রয়েছ। তা'দের অযত্ন কে করতে পারে? তা'রা পর্ব্বতের আড়ালে আছে। ভাবনা কি?"

"তা' এক দিন দেখাবার কি হ'বে?"

"সে ব্যবস্থা আমি করব। আমি সুধীরকে বলব, তুমি এসেছিলে—আমি তোমাকে দেখতে যা'ব; রেণুকে একা রেখে যেতে পারব না, সঙ্গে নিয়ে যা'ব।"

"উনি সম্মত হ'বেন?"

"খুব হ'বে। ও এত সব বুঝে না। মন ত নয় —যেন গঙ্গাজল। আমি বললে কখ্‌খন 'না' বলবে না।"

"তা'ত বটেই। আপনি মা'র বাড়া পিসী।"

এই প্রচ্ছন্ন তোষামোদে পিসীমা খুবই সন্তুষ্ট হই-লেন; বলিলেন, "আমি ঠিক ক'রে, তোমাকে আগে খবর দিব। ওর মাসীর ত ঠিক নেই; হুম্ ক'রে কবে এসে পড়ে। সেইটা দেখতে হ'বে।"

"তিনি কি আপত্তি করবেন?"

"না। তবে কি জান—বলবেন 'তুমি ঘুরে এস, আমি রেণুর কাছে আছি।' সে আমি ঠিক ব্যবস্থা করব।"

পরামর্শ শেষ করিয়া পূর্ণিমা বিদায় লইলেন। যাইবার সময় তিনি রেণুর ঘরে যাইলেন। রেণু

তখন তাহার শিক্ষয়িত্রীর কাছে একটা নূতন নক্সা বুনিবার জন্য রেশমের রং মিলাইতেছিল; উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, "মা, চললুম।"

রেণু বলিল, "এখ্খুনি!"

"হ্যাঁ, মা, কণা আর অশোক নীরুর সঙ্গে বেড়াতে গেছে—এসে যদি দেখে, আমি বাড়ী নেই, তবে বড্ড রাগ করবে। কাকীমা'কে এক দিন যেতে বলছি; তুমিও যেও না, মা! কত দিন ত যাও-নি! তোমার মাসীমা কেমন আছেন?"

"ভাল আছেন। এই তাঁ'র ঝি এসেছিল। আজ দু'দিন আসতে পারেন-নি হয়ত কাল আসবেন।"

পূর্ণিমা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে এক বার পিসীমা'র দিকে চাহিলেন; তাহার পর রেণুকে বলিলেন, "তা' আর আসবেন না! পেটের সন্তান নেই—তোমাকেই সন্তানের মত স্নেহ করেন। অত বড় বাড়ী, ঐ ঐশ্বর্য্য—ভোগ করবার লোক নেই, এ কি কম দুঃখের কথা?"

তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া যাইলে পিসীমা আপনার মহলে ফিরিয়া যাইলেন।

কুমুদা বলিল, "কি বল, পিসীমা?"

পিসীমা বলিলেন, "বলব আবার কি? দেখেছিস ত ঐশ্বর্য্য। এক ঘরের এক বৌ হ'বে—রাজরাণী হ'বে। এখন অদেষ্টে থাকলে হয়।"

"বাড়ী ঘর ত আমি দেখেছি; বৌদিদির দিদির বাড়ীরই মত। টাকার কথা তুমি জান।"

"তা' আর জানি না? আমার শ্বশুরের সবই ত ঐ ছেলে পেয়েছে।"

"কেবল দোজবরে।"

"তা'তে কি হয়েছে? অমন বয়েসে যে আজ-কাল কোন কোন ছেলে বিয়েই করে না। দোজবরের আর বিয়ে হয় না—না?"

"তা' কেন হ'বে না? তবে তোমাদের আজ-কালের ভদ্দর লোকের কথা, আমরা কি জানব? দু'টি ছেলেমেয়েও ত আছে।"

"তাই কি?"

কুমুদা বুঝিল, আর এ প্রসঙ্গের আলোচনা করা সুবুদ্ধির কায হইবে না। সে চুপ করিল।

পরদিন পিসীমা সুধীর আদালতে যাইবার সময় বলিলেন, "তো'কে বলতে ভুলে গেছি, কাল বৌমা এসেছিল।"

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

"আমার ভাশুরের বৌ।"

"নীরেনের মা?"

"হাঁ। কত ক'রে ব'লে গেল, 'কাকীমা এক দিন যেও; আমি নাতী-নাতিনীকে নিয়ে আসতে পারি না'।"

"তা' এক দিন যেও।"

"আমি বললুম, 'রেণু একলাটি থাকে, আমিও তাই যেতে পারি না।' তা' বল্লে, 'রেণু কি আমারই পর'।"

"ওর মাষ্টার ত থাক্‌বেন।"

"সে হ'বে না—বার বার ব'লে গেছে, রেণুকে নিয়ে যেতে হ'বে।"

সুধীর মূল ষড়যন্ত্রের বিষয় কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে কোন কথা বলিল না।

তখন পিসীমা বলিলেন, "গাড়ী যখন তোকে আদালত থেকে আনতে যা'বে, তখন আমাদের নামিয়ে দিয়ে যা'বে; তুই আসবার সময় আমাদের তুলে নিয়ে আসবি। তা'হলে যাওয়াও হ'বে, শীগ্‌গির চ'লে আসাও হ'বে।"

"আচ্ছা"—বলিয়া সুধীর চলিয়া গেল।

পিসীমা তাঁহার মন্ত্রী কুমুদাকে ডাকিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "যা', বৌমা'কে বলে আয়, আমি আজই বিকেলে যা'ব।"

কুমুদার পরিশ্রমকে বড় ভর ছিল। আবার 'অতটা পথ যাইতে হইবে বলিয়া সে বলিল, "তুমি যা'বে তোমার ভাশুরপোর বাড়ী; তা' আবার আগে খবর দেওয়া কেন?"

"তো'র যদি এক রত্তি বুদ্ধি আছে! আমি যদি আগে খবর না দেই, তবে হয়ত নীরু বাড়ীতেই থাকবে না। তা' হ'লে ত যাওয়াই মিথ্যে হ'বে।"

এ কথার উত্তর চট্ করিয়া কুমুদার মাথায় আসিল না। সে বলিল, "আমার সব কায পড়ে আছে। কেন, তা'দের বাড়ী ঐ যে ফোঁ না কি কথা বলার কল আছে, ও নেই?"

"তোর সঙ্গে আর বকতে পারিনে। আমি কি ফোণ করতে পারি? ফোণ করতে হ'লে ত রেণুকেই বলতে হ'বে! তা' কি হয়?"

"না; তা' হয় না। কিন্তু আমার যে অনেক কায পড়ে আছে!"

"না হয়, তুই ট্রেরাম গাড়ীতে যা"—বলিয়া পিসীমা আলমারী খুলিয়া একটা সিকি বাহির করিয়া কুমুদার হাতে দিলেন। সিকি-প্রাপ্তি যেন ঐন্দ্রজালিক দণ্ডের স্পর্শে কুমুদার সব আপত্তি দূর করিয়া দিল। সিকিটি অঞ্চলে বাঁধিয়া সে পদব্রজেই নীরেন্দ্রের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল।

এদিকে কিন্তু পিসীমা যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বেই মৃণালিনী রেণুকে দেখিতে আসিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া পিসীমা মনে মনে বলিলেন, "এ আপদ কবে দূর হ'বে?"—মুখে বলিলেন, "এসেছ! আর একটু পরে এলে আমাদের সঙ্গে দেখা হ'ত না! এই আমি মনে করছিলুম, দু'দিন আসনি কেন?"

"কোথায় যা'বেন?"

"আমার ভাশুরপোর বাড়ী। বৌমা এসে অনেক ক'রে যেতে ব'লে গিয়েছেন।"

"তা যাবেন বই কি। আপনি না ফেরা অবধি আমি থাকব।"

"রেণু যে আমার সঙ্গে যা'বে।"

"ও—যা'বে?"

"আমার সঙ্গে যা'বে। তাতে দোষ কি?"

"না—দোষের কথা বল্‌ছি না; পরের বাড়ী বড় কোথাও ত যায় না।"

"পর কিসে, মা? আমার যদি কপাল না পুড়ত, তবে ত আমি ওখানেই থাকতুম! তোমার বাড়ী যেমন ওর মাসীর বাড়ী, আমার বাড়ী তেমনই সুধীরের পিসীর বাড়ী। বড্ড কি পরের বাড়ী?"

মৃণালিনী বুঝিলেন, পিসীমা আজ রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া আছেন। তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি অন্যায় কিছু বলিনি।"

"আমি সুধীরকে বলেছি—সে যেতে ব'লে গিয়েছে। আর কোন কথা আছে?"

"না।"—মৃণালিনী তাহার পর দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই না।"

অন্য ক্ষেত্রে হইলে পিসীমা এত সহজে জয়ের আনন্দ লাভ করিতে পারিতেন না। মৃণালিনীর সহিত যুক্তিতে আঁটিয়া উঠা সহজ নহে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি পরাভব স্বীকারই অনিবার্য্য জানিতেন। কেন না, যে দিন ভগিনীর শব এই গৃহ হইতে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তিনি পর—এ গৃহ তাঁহার পরের গৃহ। তিনি কেবল রেণুকে বড়ই আপনার করিয়াছেন বলিয়া পরের গৃহকেও পরের গৃহরূপে ব্যবহার করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি সাতিশয় বুদ্ধিমতী; তাই রেণুর জন্য অনেক অপ্রিয় ব্যবহারও সহ্য করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পিসীমা'র ধৈর্য্যচ্যুতি ও "উষ্মা" তিনি নিতান্তই অকারণ বলিয়া মনে করিলেন। তবে ইহার কারণ কি? পিসীমা যে রেণুকে তাঁহারই স্নেহ-যত্নের খাস মহলের প্রজা মনে করিয়া তাহার সম্বন্ধে অপরের কোনরূপ অধিকার সহ্য করিতে অসম্মত, তাহাও সময় সময় তাঁহার মনে হইয়াছে। আর সেই জন্যই তিনি আপনার স্নেহের অধিকার যথাসম্ভব গোপন রাখিয়া আসিয়াছেন। তবে আজ পিসীমা সহসা এমন ভাবে ক্রোধের বিস্ফোরক নিক্ষেপ করিলেন কেন?

পিসীমা'র "উষ্মার" কারণ মৃণালিনী বুঝিতে পারিলেন না, রেণুও পারিল না। রেণু তাঁহার ব্যবহারে বড়ই বিরক্তি বোধ করিল। তাই "রেণু, কাপড় বদ্‌লে নেও"—বলিয়া পিসীমা তাঁহার মহলে যাইলেই রেণু মৃণালিনীকে বলিল, "মাসীমা, আমি যা'ব না।"

মৃণালিনী বলিলেন, "কেন?"

"না।"

"সুধীর যেতে ব'লে গেছে, না গেলে হয়ত রাগ করবে।"

"কিছু রাগ করবেন না; আমি সব বুঝিয়ে বলব।"

"গেলিই বা।"

"আপনি কি আমার জন্য অপমান সহ্য করবেন?"

—অভিমানে ও অপমানে রেণুর কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মৃণালিনী বুঝিলেন, এখনই সতর্ক না হইলে ব্যাপারটা জটিল হইয়া দাঁড়াইবে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "অপমান কিসের? বুঝতে পারছিস না, বুড়ীর বয়স বাহাত্তর হয়েছে। ও সব বাজে বকুনীতে অত কাণ দিতে নেই।"

রেণু তবুও বুঝিল না।

মৃণালিনী বলিলেন, "চল—আলমারী খুলব—কাপড়জামা বেছে বার ক'রে নিবি।"

তিনি বাছিয়া রেণুর কাপড় ও জামা বাহির করিয়া দিলেন এবং তাহার "কাপড় ছাড়া" হইলে, চুলটা আঁচড়াইয়া দিয়া তাহার অঙ্গে যে সব অলঙ্কার ছিল, সেগুলির উপর আরও কয়খানি পরাইয়া দিলেন।

রেণু বলিল, "অত সেজে আমি যেতে পারি না।"

মৃণালিনী বলিলেন, "সে কি কখন হয়! কথায় বলে, 'পর-রুচি পরনা'—কোথাও যেতে হ'লে বেশটা ভাল চাই।"

পিসীমা আসিয়া ডাকিলেন, "কি, রেণু, হ'ল? দাঁড়িয়ে আছে।"

মৃণালিনী রেণুকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন এবং তাহাকে তাহার গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আপনার গাড়ীতে বাড়ী ফিরিলেন।

রেণু অপ্রসন্ন মনে পিসীমা'র সঙ্গে যাত্রা করিল।

৬

রেণুকে লইয়া পিসীমা যখন তাঁহার ভাশুরপোর বাড়ী উপস্থিত হইলেন; পূর্ণিমা তখন পৌত্র ও পৌত্রীকে দুগ্ধপান করাইয়া তাহাদিগকে বেড়াইতে যাইবার কাপড় পরাইয়া দিতেছিলেন। তাহারা পিতার সহিত বেড়াইতে যাইবে। পিসীমা'কে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং রেণু তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইলে "থাক্ মা, থাক" বলিয়া তাহার দুই গণ্ডে হাত বুলাইয়া তাহাকে লইয়া যাইয়া খাটের উপর বসাইলেন।

কণা ও অশোক নবাগতাদ্বয়ের দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল। পিসীমা অশোককে কোলে লইতে যাইলে সে পিছাইয়া গেল। পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অচেনা লোকের কাছে বুঝি যায় না?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "ওর খেয়াল।"—তিনি যাইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন এবং কণাকে বলিলেন, "কণা, প্রণাম কর।"

কণা একটু অগ্রসর হইয়া পিসীমা'কে প্রণাম করিল এবং তাহার পর রেণুর কাছে যাইয়া তাহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, রেণু তাহার কচি হাত দুইখানি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি, খুকুমণি?"

"কণা"—বলিয়া বালিকা তাহার মুখের দিকে চাহিল; তাহার হাত হইতে আপনার হাত ছাড়াইয়া লইবার কোন চেষ্টা করিল না। রেণু তাহাকে তুলিয়া আপনার পাশে বসাইয়া তাহার খেলানার সম্বন্ধে নানা অপ্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং কণা তাহাকে সে সব সংবাদ নিঃসঙ্কোচে দিতে লাগিল।

পিসীমা অত্যন্ত মৃদু স্বরে পূর্ণিমাকে কি বলিলেন এবং পূর্ণিমা বারান্দায় যাইয়া চাকরকে কি বলিয়া আসিলেন।

পূর্ণিমা একখানি চিরুণী দিয়া অশোকের মাথার রেশমের মত নরম কোঁকড়া চুল আঁচড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

এই সময় "ছোট ঠাকুরমা এসেছেন?"—বলিয়া নীরেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল এবং পিসীমা'কে প্রণাম করিল।

"এস, দাদা, এস! ভাল আছ ত?" বলিয়া পিসীমা অত্যন্ত আত্মীয়তা দেখাইলেন।

নীরেন্দ্র বলিল, "ভালই আছি, ঠাকমা।"

পিসীমা বলিলেন, "দাদা, এই ছেলেমেয়ে 'মানুষ' করতে হ'বে। বৌমা কি পারবে?—এই সংসার ত দেখতে হ'বে। তাই'ত বৌমা বলছিল। তা' দাদা তুমি অমত কর না।"

অপরিচিতার সম্মুখে পিসীমা এই কথা বলায় লজ্জায় নীরেন্দ্রের কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তাভ হইয়া উঠিল। সে আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

অশোকের সজ্জা শেষ করিয়া পূর্ণিমা বলিলেন, "কাকীমা, আমি রেণুর জন্য একটু মিষ্টি নিয়ে আসি।"

রেণু বলিল, "আমি ত এখন কিছু খাই না।"

"সে কি হয়?"—বলিয়া পূর্ণিমা বাহির হইয়া যাইলেন। এদিকে ঝি আসিয়া পালকের ঝাড়ন দিয়া ঝাড়া মেঝের একটা অংশ আবার ঝাড়িয়া—তাহার উপর জলের হাত বুলাইয়া লইয়া আসন পাতিয়া দিল।

"একটু মিষ্টি" বলিয়া পূর্ণিমা রূপার থালায় সাজাইয়া যে ফল ও মিষ্টান্ন আনিলেন, তাহা যদি "একটু" হয়, তবে "বেশী" কি, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে!

রেণু খাইতে আপত্তি করায় পূর্ণিমা যাইয়া তাহাকে হাত ধরিয়া আনিয়া আসনে বসাইলেন। সে কণাকে ডাকিলে কণা আসিয়া তাহার কাছে বসিল; কিন্তু পূর্ণিমা বলিলেন, "ও এই দুধ খেয়েছে, মা; এখন খেলে অসুখ করবে।"

পিসীমা পূর্ণিমাকে বলিলেন, "নাতনী যে সুন্দরী হয়েছে—ওর বিয়ের জন্য আর ভাবতে হ'বে না।"

"তাই আশীর্ব্বাদ করুন, কাকীমা। যেমন মা-মরা মেয়ে তেমনই ভাল ঘরে বরে পড়ে, তবে আমার বুকটা জুড়ায়। এমন লক্ষ্মী মেয়ে! কোন কথা এক বার বই দু' বার বলতে হয় না।"

পিসীমা'র কথাটা খুবই সত্য—কণা ও অশোককে তাহাদের পিতার ও পিতামহীর কাছে দেখিলেই মনে হইবে—যেন সুন্দরের ঝাড়।

তাহার পরই পিসীমা বলিলেন, "বৌমা, শুন।"—তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইলেন এবং পূর্ণিমা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সুযোগ পাইয়া রেণু তাড়াতাড়ি পার্শ্বে রক্ষিত পিকদানীতে হাত ধুইয়া জলের হাতে মুখ মুছিয়া ফেলিল। "ও মা, কিছুই যে খেলে না!"—বলিয়া দাসী সে বিষয়ে পূর্ণিমার মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার

চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কারণ, পার্শ্বের ঘরে পিসীমা তখন তাঁহাকে অতি নিবিড় পরামর্শে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

ভৃত্য আসিয়া যে ঘরে রেণু ছিল, সেই ঘরে পূর্ণিমাকে না পাইয়া পার্শ্বের ঘরে গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "মা, দাদা বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কণা আর খোকা বাবু কি এখন বেড়াতে যা'বে ?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "হাঁ যা'বে।" বলিয়া তিনি রেণু যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে আসিলেন। পিসীমাও সঙ্গে আসিলেন।

অল্পক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া বলিল, "মা, গাড়ী এসেছে।" সে অশোককে লইয়া যাইবার জন্য হাত বাড়াইল।

পিসীমা আবার বলিলেন, "বৌমা, শুন।" বলিয়া তিনি বারান্দায় আসিলেন। পূর্ণিমা তথায় আসিলে তিনি বলিলেন, "নীরু কি ছেলেদের নিয়ে বেড়া'তে যা'বে ?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "হাঁ।"

"সুধীর যে আমাদের নিতে আসবে! এই এল ব'লে। এখন যেন নীরু বেরিয়ে না যায়।"

"ঐ দেখ, কাকীমা, আমার মনেই ছিল না। কিন্তু এই ত এলে—এক্ষুণি যাওয়া কেন? না হয় নীরু ছেলেদের নিয়ে বেড়িয়ে এলে সেই গাড়ী তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

"না, বাছা। আমি সুধীরকে তা'ই ব'লে দিয়েছি। সেই জন্যেই ত মাসী আর ফোঁস করতে পারলে না। সে কি না—"

"এসে শুনব। আমি নীরুকে ব'লে আসি।"—বলিয়া পূর্ণিমা চলিয়া যাইলেন।

কিন্তু তিনি ফিরিয়া আসিলে পিসীমা মৃণালিনীর সঙ্গে তাঁহার কথা অলঙ্কৃত করিয়া বলিবার সুযোগ পাইলেন না। কারণ, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—সুধীর আসিয়াছে।

পিসীমা'র পুনঃ পুনঃ পূর্ণিমার সহিত গোপন পরামর্শ রেণুর মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সে অপ্রসন্ন হইয়াই পিসীমা'র সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহার পর পিসীমা'র ব্যবহারে তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, যদি পূর্ণিমার তাঁহার সহিত কোন গোপনীয় বিষয়ে পরামর্শই ছিল, তবে পিসীমা অকারণ জিদ করিয়া—মৃণালিনীকে অপমান করিয়া তাহাকে সঙ্গে আনিলেন কেন? তাহাকে মাসীমা'র কাছে রাখিয়া তিনি একা আসিলেই ত পারিতেন। সুধীর আসিয়াছে শুনিয়া সে যেন নিষ্কৃতি পাইল।

পিসীমা'র মনে হইতে লাগিল, সুধীর যদি আর একটু বিলম্বে আসিত! তাহা হইলে তিনি মৃণালিনীকে কেমন শুনাইয়া দিয়াছেন, তাহা পূর্ণিমাকে বলিয়া বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিতেন।

তাই পূর্ণিমা যখন বলিলেন, "যদি রেণু যায়, তবে আপনি না হয়, থাকুন"—তখন তাঁহার মনের ভাবটা "ন যযৌ ন তস্থৌ" রকমের হইল। কিন্তু যাহারা ষড়যন্ত্র করে, তাহাদিগের মনে সকারণের মত অকারণ ভয়ও সর্ব্বদাই দেখা যায়। যদি রেণু তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া থাকে, আর সুধীরকে তাহা বলিয়া দেয়! অথবা তিনি নাই দেখিয়া সে যদি সুধীরকে বলে, তিনি তাহার মাসীমা'র প্রতি অকারণ "উষ্মা" প্রকাশ করিয়াছেন! নাঃ—সে সব সম্ভাবনার পথ মুক্ত রাখা কখনই সুবুদ্ধির কায নহে। তাই তিনি মৃণালিনীকে "শুনানর" কথাটা বলিবার প্রলোভন সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "না। আজ আসি। আর এক দিন আসব।"

বলিয়াই তিনি পূর্ণিমাকে বলিলেন, "শুন, বৌমা। তুমি নীরুর কাছে কথাটা পেড়। আমি সুধীরকে বলব। এখন—ভবিতব্য, যা'র হাঁড়িতে যে চাল দিয়েছে।"

"তা' ত বটেই"—বলিয়া পূর্ণিমা পিসীমা'কে প্রণাম করিলেন।

তাহার পর তিনি পিসীমা'র সঙ্গে যাইলেন।

নীরেন্দ্র সুধীরকে ও পিসীমা'কে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া উভয়কে প্রণাম করিল। পিসীমা বলিলেন, "বেঁচে থাক, দাদা। আমার শ্বশুরের বংশের তুমি শিবরাত্তিরের শল্‌তে।"

গাড়ী চলিল।

পিসীমা বলিলেন, "বৌমা কেবলই কাঁদছিল—বলে, বাড়ী যেন খাঁ-খাঁ করছে—"

সুধীর কেবল বলিল—"হুঁ।"

পিসীমা আর কোন কথা পাড়িলেন না—সময়টা সুবিধাজনক মনে করিলেন না।

সন্ধ্যার পর কুমুদা পিসীমা'কে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল, পিসীমা।"

পিসীমা বলিলেন, "হওয়া কি মানুষের হাত—আজ ত দেখা হ'ল। এখন আমি সুধীরকে বলি; বৌমাও নীরুর মত করাবার চেষ্টা করুন।"

"ছেলের বুঝি বিয়েতে মত নেই?"

"বুদ্ধি দেখ! তবে কি শুন্‌ছিস? যে জ্বালা আমার, সেই জ্বালা বৌমা'র।"

"নেও কথা! ঐ ত সব বয়েস, বিয়ে করবে না! না বাপু, তোমাদের ভদ্দর ঘরের মর্ম্ম বোঝাই ভার! সংসার ধর্ম্ম করতে হ'বে না? রোগ আছে—ভোগ আছে, তখন কি ঝি-চাকরই করবে?"

"ওরা বলে, ছেলে-মেয়েদের সৎমা এনে দেব!"

কুমুদা গালে হাত দিয়া বলিল, "নাও কথা; ছেলেমেয়ের কায ছেলেমেয়েরা করবে। ইস্ত্রীর অভাব কি তা'রা ঘোচাতে পারে?"

"মেয়েটাকে পার করতে পারলে আমি যেমন করেই হ'ক সুধীরের মত করাব। হাঁ—দেখ কুমুদা, একটা কথা বলি—নীরুর মেয়েটাকে দেখেছিস ত?"

"তা' আর দেখিনি? আজই যে দেখে এলাম। কি সুন্দর মেয়ে, বাপু। আমরা মনে করতাম, তোমার নাতনীই সুন্দরী। তা' সে ভুল ভেঙ্গে গেল।"

"কেন, সে কি আমার নাতনী নয়? মেয়েটা রেণুকে পেয়েই এমন নেটিপেটি হয়ে গেল যে, সে আশ্চর্য্য।"

"ভাল লক্ষণ গো, ভাল লক্ষণ। বোধ হয় ওখেনেই বিয়ে হবে।"

"তোর যেমন, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!"

"দেখো গো, দেখো। তখন বলবে, কুমুদা বলেছিল।"

তাহার পর কুমুদা বলিল, "মেয়ের মাসীকে কিছু বলেছ?"

"এখনি কি বলব? দেখলি ত আজকের ব্যাপার?"

"তা' তুমি আজ খুব কড়া কড়া শুনিয়ে দিয়েছ। যেন জোঁকের মুখ চুণ!"

"মাসী খুব চালাক, কথা গায় মাখলে না। কিন্তু দেখেছিলি, বোনঝির মুখখানা?"

"তা' আর দেখিনি? পিসীমা—

'ওল কচু মান
তিনই সমান।'

বোনঝি কি মাসী ছাড়া হ'বে?"

"সে যা' বলেছিস!"

"দেখতে পাও না—কেমন আড় আড় ছাড় ছাড় ভাব! যেন এত আদর এত যত্ন কিছুই মনের মত হয় না।"

"আর মাসী আছে, কাণে মন্তর দেবার গুরু।"

"সে আর বলতে!"

সেদিন পিসীমা'র ব্যবহারটা মৃণালিনীর কাছে রহস্যের মত বোধ হইয়াছিল। তাই রহস্য ভেদ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি পরদিন আবার সুধীরের বাড়ীতে আসিলেন এবং গতদিনের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রেণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পিসীমা'র পুনঃ পুনঃ পূর্ণিমার সঙ্গে গোপনে পরামর্শের কথা শুনিয়া মৃণালিনীর মনে নানা সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি তখনও ষড়যন্ত্রের মূলের সন্ধান পাইলেন না।

মৃণালিনী তথায় থাকিতে থাকিতেই পূর্ণিমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৃণালিনী আসিয়াছেন জানিয়া তিনিই পিসীমা'কে বলিলেন, "চলুন, কাকিমা, আলাপ ক'রে আসি।"

পিসীমা'র তাহাতে বড় আগ্রহ ছিল না। কিন্তু পূর্ণিমা বলিলেন, "আপনি ত বলেছেন, ওঁকেই ভয়, দেখি লোকটি কেমন।"

"তা' চল। বলে—ভক্তি যা'কে করিনে তাকেও ভয় করতে হয়।"

পিসীমা পূর্ণিমাকে লইয়া যখন রেণুর ঘরে উপস্থিত হইলেন, তখন মৃণালিনী রেণুর চুলটা বাঁধিয়া দিবার আয়োজন করিতেছিলেন। পিসীমা মৃণালিনীকে বলিলেন, "তুমি এসেছ শুনে বৌমা দেখা করতে এলেন।"

"আসুন"—বলিয়া মৃণালিনী তাঁহাকে বসিতে আহ্বান করিলেন।

রেণু তাঁহাকে দেখিয়া মাথার উপর কাপড় তুলিয়া দিয়াছিল; তাই পূর্ণিমা বলিলেন, "আমাকে দেখে আর লজ্জা করতে হ'বে না। এস, আমি তোমার চুলটা বেঁধে দিই।"

তিনি মৃণালিনীর নিকট হইতে চিরুণী লইয়া রেণুর চুল আঁচড়াইতে প্রবৃত্তা হইলেন।

মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতক্ষণ এসেছেন?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "এক্ষণি।"

পিসীমা বলিলেন, "আমারও যে জ্বালা, বৌমা'রও তা'ই; ঘরের বাইরে পা দেবার কি উপায় আছে?"

"নীরু ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে গেলে তবে একটু অবসর।"

মৃণালিনী বলিলেন, "তা' ত বটেই।"

পিসীমা বলিলেন, "বলছি, ডাগর মেয়ে দেখে জিদ ক'রে নীরুর বিয়ে দাও। নইলে কি চলে? আজকাল ছেলেরা আবার বিয়ে করতে চায় না বটে, কিন্তু সে কি চলে?"

মৃণালিনীর ভয় হইল, কথাটা আরও অগ্রসর হইলে ভাল হইবে না; তাই কথাটার মোড় ফিরাইবার জন্য তিনি পূর্ণিমাকে বলিলেন, "রেণু বলছিল, মেয়েটি যেমন ছেলেটি তেমনই সুন্দর।"

"সে কথা যদি বললে, কাল মেয়েটি ত রেণুকে পেয়ে আর বৌমা'র কাছেও গেল না।"

মৃণালিনী অল্প সময়ের পরিচয়েই বুঝিলেন, পূর্ণিমার প্রকৃতি মধুর, কিন্তু তিনি পাকা গৃহিণী। এত দিনের মধ্যে পিসীমা'র সহিত তাঁহার শ্বশুরালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কোন পরিচয় তিনি পায়েন নাই, কাযেই তিনি মনে করিলেন, পূর্ণিমার এই অতর্কিত ঘনিষ্ঠতার মধ্যে কোন একটা উদ্দেশ্য আছে। মৃণালিনী এই সন্দেহ করিলেন; আর সেই জন্য যাইবার সময় তিনি রেণুকে বলিয়া যাইলেন, "এই ঘন ঘন গতায়াতের কারণটা আবিষ্কার করতে হ'বে। তুই একটু লক্ষ্য রাখিস। বেশী দিন কারণ গোপন থাকবে না।"

মৃণালিনী যাহা বলিয়া যাইলেন, তাহাই হইল; কারণটা জানিতে রেণুর বিলম্ব হইল না। পিসীমা'র একটা দারুণ দৌর্ব্বল্য ছিল, তিনি যে বিষয়টি যত গোপন রাখিবেন স্থির করিতেন—সেই বিষয়টিরই তত অধিক আলোচনা করিতেন এবং তাঁহার আলোচনার পাত্র কুমুদা তাহা "গোপনে" সকলের কাছেই বলিত।

সেই সূত্রে রেণু জানিতে পারিল, তাহার জন্যই একটা ষড়যন্ত্র হইতেছে। জানিয়াই তাহার অভিমানপ্রবণ হৃদয় অভিমানে পূর্ণ হইয়া গেল। তাহাকে দেখাইবার জন্যই পিসীমা তাহাকে পূর্ণিমার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন! কি লজ্জা! সে পিসীমা'র ও পূর্ণিমার কথায় জানিয়াছে, বিপত্নীক নীরেন্দ্র আবার বিবাহ করিতে অসম্মত। তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য পিসীমা ও পূর্ণিমা পরামর্শ করিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন। ছিঃ—ছিঃ। নীরেন্দ্র তাহার সম্বন্ধে কি মনে করিয়াছে?

রেণুর মনে হইল, তাহার মা বাঁচিয়া থাকিলে কখন এমন হইতে পারিত না। আজ মা'র জন্য তাহার বুক বেদনায় ও চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। মা-হারা হইয়াও কন্যা বাঁচিয়া থাকে কেন?

তাহার মনে হইল, তাহার মা বাঁচিয়া থাকিলে কখনই তাহাকে এমন ভাবে অপমান করিতে পিসীমা'র সাহস হইত না।

পিসীমা'র উপর তাহার মন একেবারে বিরূপ হইয়া গেল। তিনি যে তাহাকে বিদায় করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা সে বুঝিয়াছিল; কিন্তু তিনি যে, যে কোন উপায়ে তাহাকে বিদায় করিতে চাহেন, তাহা সে এত দিন বুঝিতে পারে নাই। সে কি এমনই গলগ্রহ? তাহাকে এমন ভাবে অপমানিত করিবার অধিকার পিসীমা'র কোথা হইতে আসিল?

সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভিমানবিক্ষুব্ধ মনে আর একটা সন্দেহ সমুদিত হইল—এ অপমান পিসীমাই করিয়াছেন ত! এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে সে যাঁহার কন্যা, তাহার সেই পিতাও নাই ত? তিনি কি পিসীমা'র উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই? এই ব্যাপারে কি তাঁহারও সম্মতি ছিল?

রেণুর বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল—তাহার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছে না।

৭

দর্পণের কাচে যখন বাষ্প সঞ্চিত হয়, তখন তাহাতে কোন দ্রব্যের প্রতিবিম্ব যেমন বিকৃত দেখায়—মনে যখন অভিমান সঞ্চিত হয়, তখন তাহাতে কোন বিষয়ের বিচার তেমনই বিকৃত হয়। রেণুর মনে দারুণ অভিমান সঞ্চিত হইয়াছিল এবং কাহারও সহিত তাহার কারণের আলোচনা করিবার উপায় না থাকায় তাহা কেবলই বর্দ্ধিত হইতেছিল। পিসীমা'র ষড়যন্ত্রের বিষয় সে মাসীমা'কে বলে নাই। কারণ, সে মনে করিতেছিল, তাহার মা নাই, অদৃষ্ট তাহার প্রতি বিরূপ—সে তাহার দুঃখ কষ্ট অনিবার্য্য মনে করিয়া যথাসাধ্য সহ্য করিবে, সে জন্য অপরকে ব্যথিত করিবার কোন অধিকার তাহার নাই।

যখন রেণু আপনার মনে অভিমান সঞ্চয়ের অনুকূল অবস্থারই সৃষ্টি করিতেছিল, সেই সময় এক দিন সে তাহার পিতার সহিত পিসীমা'র কথোপকথনের কতকাংশ শুনিতে পাইল।

পিসীমা পূর্ণিমার ও কুমুদার পুনঃ পুনঃ সাহসদানের ফলেও এত দিন নীরেন্দ্রের সহিত রেণুর বিবাহের প্রস্তাব সুধীরের কাছে করিতে পারেন নাই; উভয়ের নিকট নানা অছিলায় প্রস্তাব করিতে বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অছিলারও সীমা থাকে। সে সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছিল। বিশেষ কুমুদা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, "পিসীমা, বোধ হচ্ছে, ও সম্বন্ধ তোমার পসন্দ নয়। যদি তা-ই হয়, তবে তা-ই ব'ল দাও, আর ঘুরান ভাল দেখায় না। আপনা-আপনির মধ্যে—তোমার ভাশুরপো-বৌর সঙ্গে ভাঁড়াভাঁড়ি ভাল নয়। যত যাই কেন হ'ক না, ঐ ছেলেই ত তোমার মুখে আগুন দেবে—তোমার শ্রাদ্ধ করবে।" কাযেই ইহলোকের শেষ সীমায় আসিয়া পিসীমা পরলোকের

"গতির" জন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেছিলেন, "এ যাত্রায় ত নারী-জীবনের সবটাই ব্যর্থ হ'ল—পরকালেও কি এই কপালের দুঃখ ভোগ করব?" নীরেন্দ্রের হাতেই যে তাঁহার পারলৌকিক "গতির" দ্বার মুক্ত করিবার চাবি শাস্ত্রকাররা দিয়া গিয়াছেন, তাহা কুমুদা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার পর তিনি সাহসে ভর করিয়া সুধীরের কাছে প্রস্তাবটা উত্থাপিত করিলেন। সুধীর স্নান করিয়া আসিয়াছিল—আহার করিতে যাইবে, এমন সময় পিসীমা আসিয়া বলিলেন, "সুধীর, বাবা—তুই ত' রাত-দিন ব্যস্ত; দু'দণ্ড যে একটা পরামর্শ করব, তা'রও সময় পাইনে। আমিও সংসার নিয়ে সব সময় আসতে পারিনে। এ দিকে দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে—রেণু বড় হচ্ছে।"

সুধীর বলিল, "পিসীমা, চেষ্টার ত ত্রুটি করছি না।—আর কোন সম্বন্ধ এসেছে?"

"বৌমা ক'দিন এসেছিলেন—" বলিয়া পিসীমা সুধীরের মুখের দিকে চাহিলেন; মুখের ভাবটা লক্ষ্য করিবেন।

সুধীর বলিল, "কোন সম্বন্ধের কথা বলেছেন?"

"বলেছে। বল্‌ছে ত—"

"সম্বন্ধটা ভাল হয় ত খোঁজ নিতে হ'বে।"

"আমাদের ত ভালই মনে হয়; এখন তোমার যা' বিবেচনায়।"

"কোথায়?"

"বৌমা বলছে, 'কাকীমা, আমি তোমার কোল থেকে রেণুকে আমার কোলে নিয়ে যাই।' আমি কোন কথা বলিনি।"

সুধীর কোন কথা বলিল না।

পিসীমা বলিলেন, "ওদের সবই ত তোর জানা আছে। বৌমা ত গোবেচারা; পয়সা খুবই আছে; নামডাক ঘর; নীরু ছেলেটি ভাল। দোজপক্ষ কিন্তু কি-ই বা বয়স?"

সুধীর বলিল, "ছেলে-মেয়েও আছে।"

"তা' বটে; কিন্তু সে ঝক্কি ত আর পোহাতে হ'বে না! যে ঠাকমা আছে—সব ভার তা'র। মা-ও অমন ক'রে মানুষ করতে' পারে না।"

সুধীরের মনে হইল, সে পিসীমার উদ্দেশ্য বুঝতে না পারিয়া সে দিন রেণুকে তাঁহার সঙ্গে নীরেন্দ্রের বাড়ী যাইতে অনুমতি দিয়াছিল—ভাল করে নাই।

পিসীমা'র পক্ষে এমন কায করাও ভাল হয় নাই। পিসীমা'র উপর সে বিরক্ত হইল; কিন্তু আপনার উপর তদপেক্ষাও অধিক বিরক্ত হইল।

এই সময় পিসীমা দ্বিতীয় প্রস্তাবটি করিলেন—"রেণুর বিয়ে হয়ে গেলেই আমি তোর বিয়ে দেব। আমি কোন কথা শুনব না।"

সুধীরের মন অপ্রসন্ন হইয়া ছিল। সে বলিল, "পিসীমা, তুমি কি বল্‌ছ?"

"কেন, আমি কি অন্যায় কথা বল্‌ছি? আমার রাজা ভাইয়ের এক ছেলে তুই, পাছে তোর কোন অসুবিধা হয় ব'লে আমি তীর্থধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রে এই এত দিন, বৌমা'র অসুখ হয়ে অবধি, সংসারের পাঁক ঘেঁটেছি। আরও কি ঘাঁটব? সংসার কে দেখবে? তা'র কপালে ছিল না—রাজরাণী হয়ে সংসার করতে পারলে না। তাই ব'লে কি সংসার ভাসিয়ে দিতে হ'বে? তুই যদি সন্ন্যাসী হ'স, তবে আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে।"

পিসীমা অঞ্চলে শুষ্ক চক্ষু মুছিয়া অশ্রুত্যাগের ভাণ করিলেন।

সুধীর বলিল, "দেখ, পিসীমা, ও কথা তুলবার কি এই সময়? রেণুর এখনও পাত্র ঠিক করতে পারলুম না—আর তুমি এই কথা বল্‌ছ!"

পিসীমা'কে আর ঐ কথা উত্থাপন করিবার অবসর না দিয়া সুধীর ঘড়ীর দিকে চাহিল এবং ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল, "নকুয়া, খাবার দিতে দেরী হচ্ছে কেন?"

যে ঘরে সুধীর আহার করিত, সেই ঘরের বারান্দা হইতে পাচক বলিল, "খাবার ত দিয়েছি! কুমুদাকে ক' বার বল্লাম, 'খাবার জুড়িয়ে গেল, বাবাকে খবর দাও'; তা' সে বুঝি বলে নি?"

কুমুদা সুধীরের ঘরের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; তথা হইতে বলিল, "এই ত বল্‌তে বল্‌লে, ঠাকুর!"

সুধীর তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আহারের ঘরের দিকে গেল।

রেণু যখন একটু বড় হইয়াছে, তখন তাহার মা শয্যা লইয়াছিলেন; সে তাহার বাবার সঙ্গে খাইত—সুধীরের খাবারের সঙ্গে তাহার খাবার দেওয়া হইত। আজ রেণু আইসে নাই দেখিয়া সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "রেণু কই?"

কুমুদা বলিল, "আসবার সময় ডেকে এসেছি। দেখলাম, ঘরে নেই।"

সে জানিত না, একখানা বই কিনিবার কথা বলিবার জন্ত রেণু সুধীরের ঘরে যাইতেছিল, পার্শ্বের ঘর হইতে পিসীমা'র কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী দ্বারে পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া সুধীর ও

পিসীমা'র কথোপকথনের কতকাংশ শুনিয়াছিল। তাহার পর সে ঘরের অপর দিকের বারান্দায় যাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া সে আপনাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল—বিক্ষুব্ধ চিত্তকে সবলে সংযত করিতেছিল।

কুমুদা তাহাকে ডাকিতেছে শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি বারান্দা হইতে যাইয়া স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া যে অশ্রু তাহার চক্ষু হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছিল, মুখে ও চক্ষুতে তাহার চিহ্ন লুপ্ত করিবার জন্য জল লইয়া মুখ ধুইয়া ফেলিল; তাহার পরে মুখ মুছিয়া সুধীরের কাছে খাইতে গেল।

রেণু খাইতে বসিল বটে, কিন্তু খাইতে পারিল না। সংসারের ব্যাপারে সে অনভ্যস্তা—মনের ভাব গোপন করিবার বয়স ও শিক্ষা তাহার হয় নাই, কাযেই তাহার পক্ষে মানসিক চাঞ্চল্যের দৈহিক বিকাশ বন্ধ করা সম্ভব নহে। সে প্রায় কিছুই খাইতেছে না দেখিয়া সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "কিছুই যে খাচ্ছিস না, রেণু!"

রেণু কোন কথা বলিল না।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "অক্ষিদে বোধ হচ্ছে?"

রেণু বলিল, "হাঁ।"

"তবে আর জোর ক'রে খেয়ে কায নেই; যতটুকু ইচ্ছে হয় খা।"

পিসীমা বলিলেন, "ও কিছু নয়। তাই ব'লে খা'বে না?"

সুধীর বলিল, "জোর ক'রে খেলে অসুখ করবে। যদি খেতে ইচ্ছে না হয়, আঁচিয়ে ফেল্‌গে।"

রেণু নিষ্কৃতি পাইয়া পিসীমা আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই উঠিয়া চলিয়া গেল।

পিসীমা যেন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, এমনই ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "হঠাৎ কেন অক্ষিদে হ'ল? বাছার শরীর ত ভাল নয়—ভেতরটা যে বড় দুর্ব্বল! সেই জন্যেই ত ভাবনা।"

সুধীরের মনটা ভাল ছিল না, তাহার উপর রেণুর অসুস্থতা তাহাকে বিচলিত করিল। সে-ও তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

আদালতে যাইবার সময় সে রেণুর ঘরে যাইয়া বলিল, "রেণু, ডাক্তারকে ডাকব কি?"

রেণু বলিল, "কেন? কোন দরকার নেই।"

"যদি শরীর ভাল বোধ না হয়, তবে ড্রাইভারকে বলিস, গাড়ী নিয়ে গিয়ে আমাকে নিয়ে আসবে।"

"তুমি কেন ভয় পাচ্ছ, বাবা?"—বলিয়া রেণু সুধীরকে সাহস দিল। কিন্তু তাহার সে কথার মধ্যেও যে দারুণ অভিমান ছিল, সুধীর তাহা বুঝিতে পারিল না।

সুধীর চলিয়া যাইলে রেণু দাসীকে ডাকিয়া বলিল, "আমি এখন একটু শোব। যদি মাসীমা আসেন তবে, আর নইলে শিক্ষয়িত্রী এলে আমাকে ডেকে দেবে!"

সে ভিতরের বারান্দার দিকের দ্বার এবং পার্শ্বের ঘর ও তাহার মধ্যবর্ত্তী দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। ঘরটা তাহার মনেরই মত কতকটা অন্ধকার হইল। তাহার পর সে শ্রান্তভাবে আপনার শয্যায় পড়িল। মনের চাঞ্চল্য তাহার দেহে অবসাদ সৃষ্টি করিয়াছিল।

বর্ষার বাতাসে আকাশে মেঘ যেমন এলোমেলো ভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, তাহার মনে ভাবনা তেমনই ভাবে সঞ্চালিত হইতেছিল—অভিমানের বাতাসই সেগুলিকে সঞ্চালিত করিতেছিল।

আজ পিতার উপর অভিমান তাহার আর সব চিন্তাকে অভিভূত করিয়াছিল। পিসীমা'র কথায় সুধীর কত বিরক্ত হইয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু সুধীর যে পিসীমা'র প্রস্তাবে বিরক্তি প্রকাশ করে নাই, তাহাতেই তাহার মনে সমুদ্ভূত সন্দেহের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। পিসীমা'র ষড়যন্ত্রের বিষয় যে সুধীর জানিত না, তাহা সে কেমন করিয়া মনে করিবে? মানুষের মন যখন কোন বিশ্বাসে অভিভূত হয়, তখন সে সেই বিশ্বাসের সমর্থক যুক্তিই দেখে। সুধীরই যে সে দিন তাহাদিগকে পূর্ণিমার গৃহ হইতে আনিয়াছিল, তাহাও রেণু ষড়যন্ত্রের বিষয় তাহার জ্ঞাত থাকার পোষক প্রমাণ বলিয়া মনে করিল।

সে ভাবিতে লাগিল, সে কি তাহার পিতার এমনই গলগ্রহ যে, তিনি তাহাকে বিদায় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন—কেবল বিদায় করিবার পথের সন্ধান করিতেছেন? ইহাই নারী-জীবন! সে যদি কন্যা না হইয়া পুত্র হইত, তবে ত তাহাকে তাহার পিতা গলগ্রহ বলিয়া বিবেচনা করিতেন না—করিতে পারিতেন না!

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, তাহার মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলেও কি অবস্থা এইরূপ হইত? তিনিও নারী। তাঁহাকেও কি সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা কে বলিবে? হয়ত তাঁহাকেও বুকের মধ্যে ক্ষত লইয়াই জীবন কাটাইতে হইয়াছে! কে বলিতে পারে? তবুও তিনি মা—তিনি আর কিছু না পারিলেও স্নেহ ও সহানুভূতির পূত ধারায় দুহিতার মনের ব্যথা প্রক্ষালিত করিয়া দিতে

পারিতেন। তিনি নিজ গুণে—হয়ত অবারিত ভালবাসার সঙ্গে অসাধারণ ত্যাগ মিশাইয়া স্বামীর জীবনে ও স্বামীর সংসারে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি তাঁহার কন্যাকে আশ্রয় ও অভয় দিতে পারিতেন।

কিন্তু অবারিত ভালবাসা ও অসাধারণ ত্যাগ দিয়া নারী স্বামীর জীবনে ও স্বামীর সংসারে যে স্থান লাভ করে, তাহার মূল্য কি? তাহার অধিকারের বিশ্বাস কি মৃগতৃষ্ণিক মাত্র নহে? নহিলে তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় কেন? তাহা যে মুছিয়া যায়—তাহার প্রমাণ সে ত পাইতেছে। নীরেন্দ্র বিপত্নীক, তাহার পুত্রকন্যা আছে—তাহারা তাহার লোকান্তরিতা পত্নীর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধের বন্ধন, তবুও তাহাকে আবার বিবাহ করাইবার জন্য তাহার মাতা অতিমাত্র ব্যাকুলা এবং লোক তাহার পক্ষে আবার বিবাহ করাই একান্ত স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেছে। ইহাই কি ইহকালের সহিত পরকালের সম্বন্ধ? কেবল নীরেন্দ্র কেন, যে সুধীর দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষ কাল রুগ্না পত্নীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য নিষ্ঠাসহকারে পালন করিয়াছে, স্ত্রীর স্মৃতির প্রতি কি তাহার কোন কর্ত্তব্যই থাকিতে পারে না? পিসীমা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন এবং হয়ত সে নিজেও বিবাহের প্রস্তাব অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছে না! তবে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধের ভিত্তি কি—মূল্য কতটুকু?

কিন্তু নারীর পক্ষে কি? তাহার মাসীমা'কে তাঁহার স্বামী কি বিলাসের মধ্যে রাখিয়াছিলেন, তাহা সে দেখিয়াছে—আর তাহার পর? স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই বিলাসের আবেষ্টন তিনি জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহার মহত্ত্ব যেন সেই আবরণমুক্ত হইয়া আরও মহৎ বলিয়া বোধ হইতেছে। কেবল বিলাস নহে, সুখ ও সুখের সব আশাও তিনি যেন স্বামীর চিতায় দগ্ধ করিয়াছেন; এখন কেবল কর্ত্তব্যবোধে সংসার—স্বামীর সংসার বলিয়াই, রক্ষা করিতেছেন। তিনি সে সংসারের সর্ব্বাধিকারী হইলেও দেব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্ত যেমন তাহার সেবকমাত্র হইয়া থাকেন তেমনই সেবিকা হইয়া আছেন। যেন তিনি তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাসই করিতে পারেন না।

আর তাহার মা? জ্ঞানোন্মেষ হওয়া পর্য্যন্ত সে তাঁহাকে রুগ্নাই দেখিয়াছে। তবুও তাহার মনে আছে, যত দিন তিনি একেবার শয্যা গ্রহণ করেন নাই, ততদিন দুই বেলা স্বামীর আহারের ব্যবস্থা তিনি নিজে করিতেন এবং স্বামীর আহারের সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন। তিনি শয্যা লইলে সুধীরের আহার্য্য তাঁহার ঘরেই দিতে হইত। পিসীমা এই ব্যবস্থায় তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস কল্পনা করিয়া বিরক্ত হইতেন; তবুও কাত্যায়নী সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করেন নাই। মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি এক দিন ভগিনীকে বলিয়াছিলেন, "দিদি, ওঁকে সুখী করতে পারিনি, কেবল বিব্রতই করেছি। এখন আমি অব্যাহতি পেলে উনিও অব্যাহতি পা'ন; কিন্তু তবুও মনে হয়, বুঝি আমি গেলে ওঁকে দেখবার কেউ থাকবে না। কি ভুল!"—সে কথা রেণু যখন শুনিয়াছিল, তখন তাহার গূঢ় অর্থ সে বুঝিতে পারে নাই, সে কথা শুনিয়া কেন মাসীমা চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই, তাহাও বুঝিতে পারে নাই। আজ সেই কথা যখন তাহার স্মরণ হইল, তখন দীর্ঘকাল অব্যবহারে মলিন রৌপ্যের পাত্র যেমন মার্জ্জনায় উজ্জ্বল হয়, তেমনই তাহার প্রকৃত অর্থ সে উপলব্ধি করিল। স্বামীর প্রতি ভালবাসা দুই ভগিনীর সমান ছিল।

মাসীমা'র ও মা'র কথার পর পিসীমা'র কথা তাহার মনে হইল। পিসীমা'র উপর তাহার বিরক্তি ঘটনাবশে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। তবু এ বিষয়ে তিনিও মাসীমা'র ও মা'র মত নারীর বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। তিনি বাল-বিধবা। কিন্তু তিনিও স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া আসিয়াছেন; রেণু শুনিয়াছে, সে বিষয়ে তিনি পিতামাতার নিষেধও শুনেন নাই, অশ্রুপাতেও বিচলিত হয়েন নাই।

রেণু ভাবিতে লাগিল। পুরুষের পক্ষে যাহা আদর্শ, স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহাই আদর্শ নহে কেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না; ব্যবস্থাবৈষম্য তাহার নিকট অস্বাভাবিক মনে হইল। তবুও সে সংস্কারবশে ও আদর্শহেতু মনে করিল, বিরাট সমাজ যাঁহারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধিতে সে সন্দেহ করিবে না, তাঁহাদিগের ব্যবস্থার ত্রুটি-সন্ধান সে করিবে না। সে তাহার মাসীমা'র ও মা'র আদর্শই তাহার জীবনের আদর্শ মনে করিবে; বিশ্বাস করিবে—ত্যাগেই নারীর অধিকার, সেবাই তাহার কর্ত্তব্য। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা—এ সকলের জন্য হৃদয়ের যে ক্ষুধা, তাহা সে সংযত ও সংহত করিবে। পারিবে কি? কেন পারিবে না?

তাহার এই সঙ্কল্প যে তাঁহার পিতার উপর অভিমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা সে

নিজেই অনুভব করিতে পারিল না। পদ্ম যখন জলের উপর শত দলে বিকশিত হয়, তখন সে, বোধ হয়, অনুভব করিতে পারে না, তাহার মূল জলতলে পঙ্কমধ্যে রহিয়াছে।

সঙ্কল্প স্থির করিয়া রেণু যেন মনে বল পাইল—তাহার মনের যন্ত্রণার অবসান হইল।

যখন সে শয্যা হইতে উঠিল,—দেখিল, মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে, তখন অপরাহ্ণ। সে মুখ প্রক্ষালিত করিয়া ভাবিল, তাহার শিক্ষয়িত্রী আজ আসিলেন না কেন? তিনি কি তবে ফিরিয়া গিয়াছেন?

সে দ্বার মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, মাসীমা, শিক্ষয়িত্রী ও পিসীমা কথা বলিতেছেন; কুমুদাও তথায়।

রেণুকে দেখিয়া মৃণালিনী বলিলেন, "শুনলুম, তোর শরীর ভাল নেই, তাই আর তোকে ডাকিনি। কিন্তু না দেখেও যেতে পারি নে, তাই ব'সে আছি। এখন কেমন আছিস?"

রেণু বলিল, "কিছুই হয় নি, মাসীমা; ক্ষিধে ছিল না।"

পিসীমা বলিলেন, "খাবার আনি?"

রেণু বলিল, "না।"

"সে কি কথা? ভাতের পাতে ত কেবল বসেছিলে, রেণু; কিছুই খাওনি; এই এত বড় বেলা কি না খেয়ে থাকতে আছে? সে হ'বে না।"—বলিয়া তিনি খাবার আনিবার জন্য গমন করিলেন।

তিনি যাইবার সময় কুমুদাকেও ডাকিয়া লইয়া যাইলেন—খাবার দিবার পাত্র আনিয়া দিবে।

তিনি যাইবার পর মৃণালিনী ও শিক্ষয়িত্রী রেণুর ঘরে প্রবেশ করিলেন; যাইবার পথে মৃণালিনী বলিলেন, "শুনলেন কথা? ওঁর ভাশুরপোর ছেলে কি না।"

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "তাই ত!"

"এ সম্বন্ধ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।"

মৃণালিনী স্বভাবতঃ সাবধান; তাঁহার পক্ষে রেণুর সম্মুখে এ কথার আলোচনা না করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আজ তিনি এতই বিচলিত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্নেহ তাঁহাকে এমনই ব্যথিত করিয়াছিল যে, তিনি অভ্যস্ত সতর্কতা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া শিক্ষয়িত্রী ঘড়ীর দিকে চাহিলেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া মৃণালিনী বলিলেন, "আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।" তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার ড্রাইভারকে ব'লে এস, এঁকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

শিক্ষয়িত্রী বিদায় লইবার পরই পিসীমা রেণুর খাবার গুছাইয়া লইয়া আসিলেন। তিনি খাবার রাখিয়া ফিরিয়া যাইলেই কুমুদা বলিল, "দেখলে, পিসীমা, তুমি কথাটা পাড়তে না পাড়তে কেমন ফোঁস ক'রে উঠল?"

পিসীমা বলিলেন, "সে আমার জানাই ছিল। ওঁর কোন সম্বন্ধই পসন্দ হয় না। ভাল, বাপু, পারিস—ভাল সম্বন্ধ আন। তার ত কোন চিহ্নও দেখছি নে।"

"সে যা' করবেন, তা আমি জানি। তা'ই ত আমি বলছি, পিসীমা, 'যা'র কর্ম্ম তা'রে সাজে'—ও সব মাসী মেসো—শুনতেই ভাল, কাযে কিছু নয়।"

"সে যা' বলেছিস! কোন ত কায নেই; বোনঝির উপর স্নেহ ত উপছে পড়ছে; ভাল একটা সম্বন্ধ দেখতে পারেন না!"

এ দিকে পিসীমা চলিয়া যাইবার পর রেণু বলিল, "মাসীমা, আপনি মাষ্টারের সঙ্গে কি বলছিলেন?"

মৃণালিনী বলিলেন, "সে একটা কথা।"

এমন কথা বলিলে রেণু পূর্ব্বে কখন আর তাহা শুনিতে চাহিত না। আজ কিন্তু সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল; সে বলিল, "পিসীমা'র (সেও তাঁহাকে 'পিসীমা' বলিত) শ্বশুর-বাড়ীর কথাই ত বল্‌ছিলেন।"

"হাঁ।"

"তিনি বুঝি কোন কথা বলেছেন?"

"হাঁ।"

"আপনি কি বলেছেন?"

রেণু দৃঢ়তা সহকারেই এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। তাহার ব্যবহারে মৃণালিনী বিস্মিতা হইলেন। ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, "সে দিন যখন তো'কে ওঁর ভাশুরপোর বাড়ী নিয়ে গেলেন, তখনই ওঁর ব্যবহার আমার কাছে যেন কেমন ঠেকেছিল। কোন কারণ নেই—আমার উপর রাগ করলেন। তখন ত বুঝতে পারিনি পেটে-পেটে কি মতলব ছিল! তখন যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতুম, ঐ মতলব, তবে কখন তোকে যেতে দিতুম না। এ কি কথা!"

রেণু বলিল, "আপনি ও কথায় থাকবেন না।"

মৃণালিনী বিস্মিতভাবে রেণুর দিকে চাহিলেন—এ কি? তিনি বলিলেন, "তা' হ'বে না। আমি বলেছি, আমি সুধীরকে বলব, এ সম্বন্ধ হ'বে না। তোর একটা ভাইবোনও হয়নি—তুই কি পরের ছেলে মানুষ করতে পারিস! কিসের দুঃখ যে তুই ঐ ঘরে যা'বি?"

রেণু মনে মনে বলিল, যাহার মা নাই, তাহার আবার কিসের দুঃখ! সে ত দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে বলিল, "মাসীমা, আপনি আর কোন কথা বলবেন না।"

কথা বলিতে বলিতে রেণুর কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল, তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

মৃণালিনী বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে চাহিলেন। কি বেদনাজনিত অভিমানে অভিমানিনী রেণু এই কথা বলিয়াছে, তাহা তিনিও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তাহার অভিমানকে লজ্জা বলিয়া মনে করিলেন।

মৃণালিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন—এ সম্বন্ধেও তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইবে! পিসীমা'র উপর তাঁহার চিত্ত আরও অপ্রসন্ন হইল। যদি কিশোরীর তরুণ হৃদয়ের পটে ভালবাসা নীরেন্দ্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে, তবে সে পিসীমা'র ষড়যন্ত্রে। সে ভালবাসার স্বরূপ কি?

কিন্তু তবুও—রেণু যখন তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়াছে, তখন তিনি আর কি করিবেন?

তিনি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

সুধীর আদালত হইতে ফিরিয়া আপনার ঘরে যাইবার পূর্ব্বে রেণুর ঘরে আসিল; জিজ্ঞাসা করিল, "রেণু, কেমন আছিস?"

মৃণালিনীকে দেখিয়া সে বলিল, "সকালে ওর অসুখ দেখে গিয়েছিলুম, কোন কাযে মন বসে নি।"

রেণু বলিল, "ভালই আছি।"

পিসীমা যে খাবার দিয়া গিয়াছেন, সে তখনও তাহা স্পর্শ করে নাই। তাহা দেখিয়া সুধীর বলিল, "খাবার ত প'ড়ে রয়েছে! কিছু খাস নি?"

রেণু বলিল, "খা'ব।"

"যদি এ সব খেতে ইচ্ছা না হয়, আমি পাঁউরুটি টোষ্ট ক'রে পাঠাচ্ছি। পিসীমা'র যেমন; কখন কি খাবার দিতে হয়, তা'ও দেখবেন না!"

বলিয়াই সুধীর মেয়ের জন্য টোষ্ট প্রস্তুত করিতে চলিয়া গেল।

সুধীর চলিয়া যাইবার পরই মৃণালিনী বলিলেন, "আমি আজ যাই।"

মৃণালিনীর মুখ যে চিন্তায় অন্ধকার হইয়াছিল, তাহা রেণু লক্ষ্য করিয়াছিল। তিনি যাইবার জন্য উঠিলে সে বলিল, "মাসীমা, আমায় ক্ষমা করবেন"—বলিয়াই আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল এবং আপনার এই দৌর্ব্বল্যবিকাশ গোপন করিবার চেষ্টায় দ্রুতপদে ঘরের অন্য দিকের বারান্দায় চলিয়া গেল।

মৃণালিনীর বুকের মধ্যটা বেদনায় যেন কর-কর করিয়া উঠিল। তিনি তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। মাসীমা'র বুকে মুখ লুকাইয়া রেণু কাঁদিতে লাগিল—মাসীমা'রও দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিয়া তাহার মস্তকে পড়িতে লাগিল।

সেই সময় কুমুদা খাবারের পাত্র লইতে আসিয়া দেখিয়া গেল—রেণু খাবার স্পর্শও করে নাই এবং তাহাকে বুকে করিয়া মৃণালিনীও কাঁদিতেছেন, রেণুও কাঁদিতেছে। সে যাইয়া সেই সংবাদ পিসীমা'কে দিলে তিনি বলিলেন, "আধিক্যেতা দেখে আর বাঁচি নে! কি অন্যায় কথাটা বলা হয়েছে যে, কেঁদে অনর্থ করছেন! আমি আর ও সব কথায় থাকব না; আজই সুধীরকে বলব, আমাকে কাশীতে পাঠিয়ে দিক্। তার পর যা'র অদৃষ্টে যা' থাকে, তা'ই হ'বে।"

এদিকে মৃণালিনী আপনাকে সংযত করিয়া রেণুকে শান্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, "তুই কাঁদিস নে। আমি কি তোর উপর রাগ করিতে পারি? আমি কাল এসে সব ব্যবস্থা করব।"

তিনি চলিয়া যাইলে রেণু সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—মাসীমা কি ভাবিলেন? তিনি কি বুঝিলেন? সে যে মাসীমা'কে তাহার মনের কথা বুঝাইতে পারে নাই, সে জন্য আজ তাহার আপনার উপর অভিমান হইল। সে আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে লাগিল।

এমন সময় রুটি টোষ্ট করিয়া সুধীর আপনি তাহাকে ডাকিতে আসিল—"রেণু, আমার ঘরে আয়।"

"যাই, বাবা"—বলিয়া রেণু তাড়াতাড়ি চোখ মুখ মুছিয়া সুধীরের কাছে গেল।

তাহাকে দেখিয়া সুধীর উদ্বিগ্নভাবে বলিল, "তোর অসুখ ত সারে নি। আমি ডাক্তারকে ডাকি।"

রেণু—"না" বলিতে না বলিতে সুধীর যাইয়া টেলিফোন ধরিল।

ডাক্তার বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রেণুর অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"বদ হজমেই হয়েছে; সেরে যা'বে।" তিনি যথারীতি ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন এবং ভৃত্য ঔষধ লইয়া আসিল। সুধীর আপনি এক দাগ ঔষধ গ্লাসে ঢালিয়া রেণুকে খাওয়াইয়া দিল এবং বলিল, "রাত্তিরে একটু দুধ খাবি—এখন যা' চুপ ক'রে শুয়ে থাক গে।"

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রেণু যাইয়া আপনার ঘরে শয়ন করিল; আলোটা নিবাইয়া দিল।

শুইয়া সে অপরাহ্নের ঘটনার আলোচনা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—নৌকা সহসা ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া যাইলে যাত্রী যদি ভাসিয়া কূলে উঠে, তবে তাহার যে অবস্থা হয়, তাহার সেই অবস্থা হইয়াছে। কি ঝড়ই বহিয়া গিয়াছে! মাসীমা তাহার সম্বন্ধে কি ধারণা লইয়া যাইলেন! তাহার অভিমানের যে অন্য অর্থও হইতে পারে, তাহা সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই, এখন সে সম্ভাবনা তাহার মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আসিয়া অভিমানের স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু লজ্জা অভিমানকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। সে তাহার জন্য কাহাকেও বিব্রত হইতে দিবে না। ত্যাগই যদি নারীর একমাত্র কায হয়, তবে সে ত্যাগ করিবে—প্রয়োজন হইলে সর্ব্বত্যাগী হইবে। দুঃখই যদি তাহার অদৃষ্টফল হয়, তবে সে দুঃখে কাতর হইবে না। তাহার জন্য পিসীমা'র এত ষড়যন্ত্র করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। যখন পিতাও কন্যাকে গলগ্রহ বিবেচনা করেন, তখন ষড়যন্ত্রে প্রয়োজন কি?

সে কান্দিতেও পারিল না; কিন্তু তাহার বুকের মধ্যে বেদনা ঝটিকাহত সমুদ্রের তরঙ্গের মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

ঝি যখন তাহার জন্য দুধ লইয়া আসিয়া ডাকিল —"মাসীমা!"—তখনও সে আলো জ্বালিল না; দ্বারের কাছে যাইয়া দুগ্ধ পান করিয়া মুখটা ধুইয়াই ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া শয্যায় পড়িল।

পিসীমা "সন্ধ্যা" সারিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়া দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ। তিনি বার দুই ডাকিলেন, "রেণু!" রেণু ইচ্ছা করিয়া উত্তর দিল না। তিনি ফিরিয়া যাইয়া কুমুদাকে বলিলেন, "সব তাতেই বাড়াবাড়ি। হয়েছে একটু অক্খিধে। মানুষের অমন হয়েই থাকে। তা'তেই সারা দিন শুয়ে রইল! বাপও তেমনই—তাড়াতাড়ি ডাক ডাক্তার—আন ওষুধ।"

কুমুদা বলিল, "কিন্তু ডাক্তার ত দেখে ওষুধ দিয়ে গেলেন!"

"তুই রাখ। ও সব ছোঁড়া ডাক্তার কি রোগ চিনে? ওরা যে রোগ ধরতে পারে না, তা'কে বলে হিষ্টিরিয়া। দেখিস নি, বৌমা যখন ব্যথায় ছট্‌ফট্ করত, তখনও ডাক্তাররা বল্‌ত—হিষ্টিরিয়া? হিষ্টিরিয়া আবার কি; সে ত জানি দাঁত 'লাগে', হাত পা ছুঁড়ে।"

"তা' হ'বে। আমরা ত অত সব জানি নে। আমাদের ঘরে এখনও বোদ্যি যা' করে।"

"বিকেলে খাবার দিলুম, তা' ছুঁলে না। কিন্তু বাপের কাছে গিয়ে কাঠ কাঠ রুটি ত গিল্‌তে পারলে!"

যাহার সম্বন্ধে এই সব আলোচনা, সে কিন্তু আহারের কথা মনেও করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনের চাঞ্চল্য তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। নৌকা যখন নোঙ্গর ফেলিয়া থাকে, তখন যেমন নদীর চঞ্চল জল তাহাকে আন্দোলিত করিলেও তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারে না, তেমনই এই চাঞ্চল্য কিছুতেই রেণুর মন হইতে ত্যাগের সঙ্কল্প সরাইতে পারিল না—তাহা তাহার দারুণ অভিমানের রজ্জুতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া রহিল। তাহার অভিমান—তাহার পিতার উপর, তাহার অদৃষ্টের উপর, আর সর্ব্বোপরি তাহার আপনার উপর।

সে রাত্রিতে রেণুও যেমন ঘুমাইতে পারিল না, মৃণালিনীও তেমনই ঘুমাইতে পারিলেন না। এ কি হইল? তাঁহার আপনার সন্তান হয় নাই, হইলেও বুঝি তিনি রেণুকে যত ভালবাসেন তাহাকে তত ভালবাসিতে পারিতেন না! তাঁহার মাতৃহৃদয় তাহাকে অবলম্বন করিয়াই স্নেহে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার জন্মের পর হইতেই কাত্যায়নী অসুস্থ ছিলেন। সে যে মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হইয়াছিল, সে অভাবও যেন তিনি স্নেহ দিয়া পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেন। কত বাড়ী হইতে কত সম্বন্ধ আসিয়াছে, তাঁহার পসন্দ হয় নাই। কিরূপ সম্বন্ধ হইলে যে তাঁহার মনের মত হইত, তাহা যেন তিনি আপনিও বুঝিতে পারিতেন না! সেই রেণুর বিবাহ বিপত্নীক নীরেন্দ্রের সহিত হইবে, রেণুকে সপত্নীর পুত্র-কন্যা "মানুষ" করিতে হইবে,

ইহা তিনি মনে করিতেও পারেন না। ইহা তাঁহার এমনই কল্পনাতীত ছিল যে, পিসীমা'র প্রস্তাব শুনিয়া তিনি জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর এ কি হইল? রেণুর কথা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, মানুষ কি দুর্ব্বল! সে অদৃষ্টের হস্তে ক্রীড়নক ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে দর্পে তিনি পিসীমা'র প্রস্তাব অপমানজনক মনে করিয়াছিলেন, দর্পহারী কি তাঁহার সেই দর্পই চূর্ণ করিয়া দিলেন? রেণুর সুখের জন্য তিনি দর্প আপনি চূর্ণ করিতেও প্রস্তুত; কিন্তু এ বিবাহ হইলে সে কি সুখী হইবে? সে সংসারের কিছুই জানে না, আপনার সুখাসুখের বিষয়ে তাহার মতের মূল্য কি?

মৃণালিনী প্রথমে মনে করিলেন, তাহাকে বুঝাইয়া বলিবেন, এ সম্বন্ধ কোনরূপেই তাহার উপযুক্ত নহে। তিনি বুঝাইলেই সে বুঝিবে, বালক যদি অজ্ঞতাবশে অগ্নিশিখা ধরিতে যায়, তবে তাহাকে নিবারণ করাই মাতার কর্ত্তব্য। তিনি তাহাই করিবেন।

কিন্তু তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল। হিন্দু নারীর চিরাগত সংস্কারই প্রবল হইল; তিনি মনে করিলেন—রেণুর যদি ইহাই মত হয়, তবে ইহাতে হস্তক্ষেপ করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু তবুও তিনি কিছুতেই আপনাকে এই সম্বন্ধে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না এবং পিসীমা'র উপরেই তাঁহার বিরক্তি প্রবল হইতে লাগিল। পিসীমা সে দিন ষড়যন্ত্র করিয়া রেণুকে পূর্ণিমার বাড়ীতে লইয়া না যাইলে ত এ বিপদ ঘটিত না!

শেষে তিনি যেন আপনার মতচাঞ্চল্যে অস্থির হইয়া উঠিয়া—অকূলে কূল পাইবার আশায় স্থির করিলেন, পরদিন যাইয়া রেণুর সঙ্গে আবার কথা বলিয়া—তাহার মনের ভাব বুঝিয়া—কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

ইহাতেও কিন্তু তাঁহার চিন্তার অবসান হইল না; কেন না—তাঁহার চেষ্টা সত্ত্বেও চিন্তা তাঁহাকে ব্যস্ত করিতে লাগিল।

পিসীমা'র প্রস্তাব কেবল সুধীরকেই চিন্তিত করিতে পারিল না। তাহার কারণ, সে সে প্রস্তাব অসম্ভব বলিয়াই মনে করিয়াছিল এবং সেই জন্য তাহাতে মন দেয় নাই। সে কেবল এই প্রস্তাবের জন্য পিসীমা'র উপর বিরক্ত হইয়াছিল; আর সে দিন রেণুকে নীরেন্দ্রের বাড়ীতে যাইতে অনুমতি দিয়াছিল বলিয়া আপনার উপর বিরক্ত হইয়াছিল। নীরেন্দ্রের সহিত রেণুর বিবাহ যে সম্ভব হইতে পারে, তাহা সে ধারণা করিতে পারে নাই। সে কেবল স্থির করিয়াছিল, রেণুর জন্য উপযুক্ত সম্বন্ধের সন্ধানে তাহাকে আরও তৎপর হইতে হইবে এবং পরদিন সে সে কথা মৃণালিনীকে বলিবে। কেন না, এ বিষয়ে সে মৃণালিনীর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছিল। সে রেণুর প্রতি মৃণালিনীর অসাধারণ স্নেহের বিষয় জানিত এবং যে সম্বন্ধ মৃণালিনীর মনঃপূত হইবে, সেই সম্বন্ধই যে সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট হইবে, সে বিষয়েও তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

সেই জন্য আপনার কর্ত্তব্য সহজেই স্থির করিয়া সুধীর চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। কেবল রেণুর অসুস্থতা তাহার মনে একটু উদ্বেগের সঞ্চার করিল।

কিন্তু রেণুর অদৃষ্ট সকলের অজ্ঞাতে তাহার জীবনের গতি কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, তাহার ভবিষ্যৎ কিরূপে গঠিত করিতেছিল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। রেণুর দুর্জ্জয় অভিমান যেন তাহারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হইল।

৯

প্রভাতে সুধীর কন্যার মুখ দেখিয়া চিন্তিত হইল। মানুষ মনের ভাব গোপন করিবার যত চেষ্টাই কেন করুক না, মুখে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বিনিদ্র রজনীর কালিমা রেণুর মুখে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার চক্ষু ঘিরিয়া কালিমাবৃত্তের সৃষ্টি করিয়াছিল। সুধীর কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর শরীর কি আজও ভাল নেই?"

রেণু বলিল, "ভালই আছে।"

কিন্তু তাহার কথায় ও তাহার মুখভাবে যে সামঞ্জস্য নাই, তাহা সে বুঝিল এবং বুঝিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিল ও মৃণালিনীকে এক বার আসিতে টেলিফোন করিল।

ডাক্তার আসিয়া কোন রোগের নিদান নির্ণয় করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু ঔষধের ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "সেরে যা'বে।"

সে দিন আদালত বন্ধ। সুতরাং সুধীর বাড়ীতেই রহিল।

মধ্যাহ্নের অল্প পরেই মৃণালিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রেণুর রোগের নিদান ডাক্তার নির্ণয় করিতে পারেন নাই; তাহা মৃণালিনীও ঠিক ধরিতে পারেন নাই—তবে তিনি বুঝিয়াছিলেন, রোগ দেহে নহে—মনে। পূর্ব্বদিন তিনি যে সন্দেহ লইয়া গিয়াছিলেন, আজ রেণুর মুখভাবে তাহা প্রবল হইল।

তিনি রেণুর কথার যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেন।

মৃণালিনী আসিলে সুধীর তাঁহাকে বলিল, "রেণুর অসুখ সারে নি। কাল মনে করিছিলুম, কিছু নয়—কিন্তু দেখছি, আজ চেহারাটা রোগীর চেহারা হয়েছে। মনে হ'ল, ডাক্তার ধরতে পারে নি। কোন বড় ডাক্তার ডাকব কি?"

মৃণালিনী বলিলেন, "আজ দিনটা থা'ক; কাল যা' হয় করা যা'বে। আমি জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, কিছু বুঝতে পারি কি না।"

তাহার পর তিনি রেণুর বিবাহের কথা পাড়িলেন।

সুধীর বলিল, "আমি কাল রাত্তিরেই স্থির করেছি, আপনাকে আরও একটু চেষ্টা করতে বলব।"

মৃণালিনী বলিলেন, "কাল আমি যখন এসেছিলুম, তখন পিসীমা'ও একটা সম্বন্ধের কথা বলেছিলেন।"

"কোন্ সম্বন্ধ?"

"তাঁ'র ভাশুরপোর ছেলের সঙ্গে।"

সে সম্বন্ধ গ্রহণযোগ্য, মৃণালিনী যে তাহা মনে করিতে পারেন, এ ধারণাই সুধীরের ছিল না। তাই সে বিস্মিত দৃষ্টিতে মৃণালিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "নীরেন্!"

"হাঁ।"

"তাঁর মেয়ে-ছেলে আছে, জানেন ত?"

মৃণালিনী মনে মনে বলিলেন, "সবই জানি, কিন্তু মেয়েকে পিসীমা'র সঙ্গে তা'র বাড়ীতে যেতে দিয়েই যে যত অনর্থের উদ্ভব হয়েছে।" প্রকাশ্যে তিনি বলিলেন, "তা' জানি। কিন্তু ছেলেরা তা'র মা'র কাছেই 'মানুষ' হচ্ছে।"

"তা' হ'লেও, রেণুকে ওখানে দেওয়া—"

"দিতে হবেই, এমন বলছি না। তবে সম্বন্ধটা ফেলনা নয়; শাশুড়ী ভাল, ঘরও জানা; নীরেন ছেলেটি খুব ভাল। জানা ঘর পাওয়া দুষ্কর। তাই ভাবছি!"

"আপনি কি মনে করেন, রেণুর এ সম্বন্ধ করা যায়?"

"তা' কেন মনে করব না?"

"আমি কিন্তু তা' মনে করতে পারছি না।"

রেণুর অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই নিপুণ অস্ত্রচালক যেমন কৌশলে অস্ত্রচালনা করিয়া আত্মরক্ষা করে, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে অপর পক্ষের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করে না, মৃণালিনী তেমনই এতক্ষণ সে কথা প্রকাশ না করিয়া তর্কে সুধীরকে পরাভূত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু সুধীর যখন ঝাড়া জবাব দিল, তখন তাঁহার পক্ষে শেষ অস্ত্রচালনা ব্যতীত উপায় রহিল না। তবুও তিনি বলিলেন, "কেন মনে করতে পারছ না? সম্বন্ধটা মন্দ নয়।"

সুধীর বলিল, "আমার মনে হয়, ভালও নয়—ও সম্বন্ধের কথা আপনি ছেড়ে দিন।"

"ছেড়ে দেওয়া যা'বে না।"

বিস্মিতভাবে সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মৃণালিনী বলিলেন, "সে কথা আমি পরে বলব।"

ব্যাপারটা একান্তই রহস্যময় বলিয়া সুধীরের মনে হইল। যে সম্বন্ধ সে কোনরূপে গ্রহণযোগ্য মনে করিতে পারে না—যে সম্বন্ধ মৃণালিনী নিশ্চয়ই ত্যাগ করিতে বলিবেন বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল, সেই সম্বন্ধ মৃণালিনী ত্যাগযোগ্য নহে বলিয়া মনে করিলেন কেন? রেণু—তাহার একমাত্র সন্তান—তাহার স্নেহের অবলম্বন—তাহার ঐ সম্বন্ধ কি ভাল বলিয়া মনে করিতে হইবে? মৃণালিনী কি বলেন, জানিবার জন্য সুধীর অস্থির হইয়া উঠিল, তাহার স্বাভাবিক ধৈর্য্য যেন সে আর রক্ষা করিতে পারিতেছিল না।

মৃণালিনী রেণুর ঘরে যাইলেন। রেণু বসিয়া ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, তাহার অদৃষ্ট যেন তাহার চারিদিক্ হইতে চঞ্চল সিন্ধুর মত তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল—সে ক্ষুদ্র, সে দুর্ব্বল, সে অসহায়—সে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে? বুঝি তাহার মনের চাঞ্চল্য তাহার মুখের ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার ভাব দেখিয়া মৃণালিনীর বুকের মধ্যে কর-কর করিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, আর দ্বিধা করিবেন না—অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন না; অদৃষ্ট যদি সদয় হয়, তবে এই বিবাহেই রেণু সুখী হইবে; তাহার মা'র আশীর্ব্বাদ তাহাকে দুঃখ হইতে রক্ষা করিবে।

ঝি ঔষধের শিশি ও একটা গ্লাস লইয়া রেণুকে দিতে আসিয়াছিল; মৃণালিনী বলিলেন, "শুধু শুধু কতকগুলো ওষুধ খাইয়ে কায নাই।"

ঝি চলিয়া গেল।

মৃণালিনী রেণুর কাছে বসিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। যখন সে আপনাকে একান্ত বিপন্না মনে করিতেছিল, তখন যেন রেণু আশ্রয়ের সন্ধান পাইল; তাহার মনের ব্যথা অশ্রুরূপে বাহির হইল—মাসীমা'র বুকে মুখ গুঁজিয়া সে ফুলিয়া

ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মৃণালিনী তাহার চুলের মধ্যে অঙ্গুলী চালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারও চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আপনাকে সামলাইয়া মৃণালিনী বলিলেন, "আমি সুধীরকে বলেছি, ও সম্বন্ধ ছাড়া যা'বে না।" বলিয়া তিনি রেণুর পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

শুনিয়া রেণুর শ্বাসরোধের মত হইল। মাসীমাও তাহাকে এত ভুল বুঝিলেন! তবে কি তাহার মা বাঁচিয়া থাকিলে তিনিও তাঁহার দুহিতাকে ভুল বুঝিতেন? সে দারুণ অভিমানে যে সঙ্কল্প করিয়াছিল—ত্যাগেই যখন নারীর অধিকার তখন সে ত্যাগই করিবে, সে সঙ্কল্প বন্যার বারিবেগে বাঁধের মত ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল—আবার অভিমান আসিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া দিল। সে স্থির হইল—যে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিয়াছে, সে জন্য লজ্জিত হইল—আপনার উপর রাগ করিতে লাগিল।

তাঁহার কথার পর রেণু যে স্থির হইল, তাহাতে মৃণালিনীর ভুল তাঁহার কাছে আরও সত্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি পিসীমা'র উপরেও আর রাগ মনের মধ্যে রাখিতে পারিলেন না; মনে করিলেন —ভগবান্ যাহা করেন, ভালর জন্যই করেন; মানুষ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না।

রেণুকে রাখিয়া তিনি সুধীরের কাছে গমন করিলেন। সুধীর তখন মৃণালিনীর কথায় স্পষ্ট রহস্য ভেদ করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। মৃণালিনী, বলিলেন, "ঐ সম্বন্ধটাই পাকা ক'রে ফেল।"

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তোমার তা' শুনবার দরকার কি?"

"দরকার আছে।"

"কোন দরকার নাই।"

"ও কথা আমাকে শুনতেই হ'বে।"

তখন মৃণালিনী বলিলেন, "মেয়ের মত।"

দেহের যে স্থানে অল্প আঘাতেও অধিক বেদনা অনুভূত হয়, সেই স্থানে অতর্কিত গুরু আঘাতে মানুষ যেমন হইয়া পড়ে, সুধীর তেমনই হইয়া পড়িল —কোন কথা বলিতে পারিল না।

অল্প সময়ের মধ্যে আপনার অভ্যস্ত ধৈর্য্য ফিরিয়া পাইয়া সুধীর কাতর ভাবে মৃণালিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "রেণু বালিকা—সে কি তাহার শুভাশুভ বুঝতে পারে?"

মৃণালিনী বলিলেন, "আমরাই কি শুভাশুভ বুঝতে পারি? সে যে ভবিষ্যতের গর্ভে; সেখানে ত আমাদের দৃষ্টি চলে না! আমরা কেবল অভিমান-বশে মনে করি, আমরা সব বুঝি।"

"কিন্তু মেয়ের বিষয়ে বাপের কি কোন কর্ত্তব্য নাই?"

"আছে। সে কর্ত্তব্য ত তুমি ভুল-নি। তুমি রেণুকে উপযুক্ত পাত্রে দিতে চেষ্টার ত্রুটি কর-নি। কিন্তু তা'র অদৃষ্ট যদি তোমার সব চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দেয়, তবে তুমি কি অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হবার কোন আশা করতে পার?"

"তবে কি পরাভব স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় নাই?"

"উপায় যদি থাকবে, তবে এত দিন যা' হয়-নি, সে দিন, তা' হ'বে কেন? তুমিও বারণ করলে না, আমিও বারণ করলেম না—ও নীরেনের বাড়ী গেল কেন?"

"সে দোষ আমার।"

"তোমার কোন দোষ নাই। তোমার পক্ষে পিসীমা'র প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এর মধ্যে যদি কোন ষড়যন্ত্র থেকে থাকে, তুমি তা' জান্‌তে না। জান্‌লে, তুমি যেতে দিতে না; সন্দেহ করলে আমিও আপত্তি করতেম। কিন্তু অদৃষ্ট যদি ঐ ষড়যন্ত্রের মধ্যে না থাকত, তবে সহস্র ষড়যন্ত্রও সফল হ'ত না।"

সুধীর ভাবিতে লাগিল। মৃণালিনীর কথায় সে তুষ্টি লাভ করিল। এতক্ষণ সে আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া আত্মগ্লানিতে কষ্ট পাইতেছিল—সে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

মৃণালিনী বলিলেন, "আমরা মনে করি, চিকিৎসাতে রোগ সেরে যায়; তা'ই যা'রা স্বজনের চিকিৎসা করা'তে পারে না, তাদের দুঃখের অবধি থাকে না—চিকিৎসা করাতে না পারায় অমূল্য মানবজীবন অকালে শেষ হ'ল। কিন্তু কাত্যায়নীর চিকিৎসায় কি তুমি কোন ত্রুটি রেখেছিলে? তবুও ত তা'কে রাখতে পারা গেল না।"

বলিতে বলিতে মৃণালিনীর চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল।

একটু ভাবিয়া সুধীর বলিল, "আমার কিন্তু এ সম্বন্ধ ভাল লাগছে না।"

"সে কথা আর মনে ক'রে কোন ফল নাই।"

"এখন কি করা আপনার মত?"

"ঐ সম্বন্ধই ঠিক করতে হ'বে।"

সুধীর কোন কথা বলিল না দেখিয়া মৃণালিনী বলিলেন, "যা' করবার আমি করব। তুমি আর মন

ভারী ক'রে থেক না। আর ভেবে দেখ, সাধারণতঃ আমরা যে সব দিক্ দেখি, সে সব দিক্ দেখলে সম্বন্ধটা মন্দও নয়।"

"কিন্তু ছেলে মেয়ে—"

"সে ত রেণুও জানে। ও যেমন মেয়ে, তা'তে ও সব মানিয়ে গুছিয়ে নিতে পারবে।"

সুধীর ভাবিতে লাগিল। তাহার মন হইতে সন্দেহের ও শঙ্কার ভাব দূর হইল না। তবে সে মৃণালিনীর বুদ্ধিতে কখন সন্দেহ করিতে পারে নাই; রেণুর প্রতি তাঁহার স্নেহে তাহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। তাই সে মনে করিল, মৃণালিনী যাহা করিবেন, তাহাতে রেণুর অকল্যাণ হইবে না।

মৃণালিনী পিসীমা'র কাছে আসিয়া বলিলেন, "আপনি রেণুর যে সম্বন্ধের কথা বলছিলেন, তা' কি সুধীরকে বলেছেন?"

পিসীমা বলিলেন, "কি বলব, বাছা, বলতে ভয় হয়—আজকাল তোমাদের পসন্দ কিসে হয় কিসে হয় না, তা' আমরা বুঝতেই পারি নে।"

"আমি ভেবে দেখছি, সম্বন্ধটা ফেলনা নয়। ঘর বর সবই জানা—সবই ভাল। কেবল কথা, ছেলে মেয়ে আছে। তা' তারা ঠাকুরমা'র কাছেই 'মানুষ' হচ্ছে। সংসারে আর কোন ঝঞ্ঝাট নাই; অভাবও নাই যে, রেণুকে ছেলে-মেয়ের ঝক্কি পোহাতে হ'বে।"

"তা' ত বটেই।"—সোৎসাহে এই কথা বলিয়া পিসীমা বলিলেন, "তুমি দেখ-নি, আমি ত দেখেছি; ছেলেমেয়ের কোন ঝঞ্ঝাট নেই। দেখতে যেমন চাঁদের মত—তেমনই ঠাণ্ডা। মেয়েটা সে দিন রেণুকে পেয়ে যেন আর ছাড়তে চায় না; রেণু যতক্ষণ ছিল, ওর কাছেই ছিল।"

"আপনার বৌমা কি বলেন?"

"বলে—'সেধো খাবি? না হাত ধুয়ে বসে আছি।' বৌমার দুঃখ, ছেলে বিয়ে করতে চায় না। সেই ত বললে, 'কাকীমা, আপনার রেণুকে আমি নিয়ে যা'ব' তাই ত সে দিন—"

সে দিন তিনি কি জন্য রেণুকে নীরেন্দ্রের বাড়ী লইয়া গিয়াছিলেন, পিসীমা অসতর্ক অবস্থায় তাহা বলিয়া ফেলিতেছিলেন। তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া কথাটা আর শেষ করিলেন না।

মৃণালিনীও আর সে কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন, "ছেলের এখন মত হয়েছে? যদি তা' না হয়ে থাকে তবে, সবই বৃথা।"

"বৌমা কান্নাকাটি করতে লাগল; আমি গিয়ে কত বুঝালুম—তাই এখন আর আপত্তি করছে না।"

"তা'র মত হয়েছে কি না, সেটা এক বার তা'র মা'কে স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করা ভাল। একে আজ-কালকার ছেলে, তা'র আর ত ছেলেমানুষটি নাই।"

"তা' আমি বৌমা'কে কাল আস্‌তে বলি।"

"সে-ই ভাল।"

মৃণালিনী চলিয়া যাইবার পরই কুমুদা পিসীমা'কে বলিল, "একি গো—এ যে 'মেঘ না চাইতে জল!' মাসীর মত এক কথায় হ'ল!"

"হ'বে না ত কি? অমন সম্বন্ধ—তা'র বল্‌তে গেলে যাচা। ছাড়লে কষ্ট পেতে হ'বে।"

"সে আর বলতে"—বলিয়া কুমুদা পিসীমা'র মন রক্ষা করিল। বিবাহটা হইলেই তাহার পাওনা বাড়িবে মনে করিয়া সে আনন্দিতা হইল।

পিসীমা বলিলেন, "যা' ত বৌমা'র কাছে; চুপি চুপি কাল আসতে ব'লে আয়।"

"যাচ্ছি"—বলিয়া কুমুদা বসিয়াই রহিল। পিসীমা তখন উঠিয়া মালার থলি হইতে তাহার বাস-ভাড়ার পয়সা দিলেন। সে চলিয়া গেল।

মৃণালিনীর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ছিল—তাই তিনি রেণুর এই বিবাহে সম্মতি আছে, মনে করিয়া আপনার মত দলিত করিয়া তাহার মতানুবর্ত্তী হইয়া কায করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

কিন্তু সুধীর কিছুতেই এ বিবাহে আগ্রহ অনুভব করিতে পারিল না।

সুধীর আগ্রহ অনুভব না করিলেও বিবাহের কথা অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার প্রধান কারণ—এ বিবাহে পূর্ণিমার আগ্রহ, আর ইহাই রেণুর অভিপ্রেত বলিয়া মৃণালিনীর বিশ্বাস। উভয় পক্ষেরই অনু-সন্ধান লইবার কিছু ছিল না; দেনা-পাওনা প্রভৃতির কোন কথাই ছিল না। এ অবস্থায় কথা শেষ করিতেও বিলম্বের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

পূর্ণিমা যখন তখন আসিতে লাগিলেন—নাতি-নাতিনী সঙ্গে আসিতে লাগিল। তিনি যখনই আসিতেন, রেণুকে বিশেষ আদর করিতেন।

সে আদর কিন্তু রেণুর হৃদয় স্পর্শ করিত না। সে মনে করিত, সে ত্যাগ স্বীকার করিবে—যাহা তাহাকে করিতেই হইবে, তাহা করিয়া যাইবে; আদর, যত্ন—তাহার মা'র চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে; তাহার মাসীমাও যখন তাহাকে ভুল বুঝিয়াছেন, তখন সুখের আশা সে হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে না; তাহার পিতাও বুঝি তাহাকে ভারমাত্র মনে করিয়াছেন। সে মনে করিল,—নারীজন্মেই ধিক্! সে যখন সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন দুঃখভোগই

তাহার নিয়তি। সে সব সহ্য করিবে। এক একবার মনে হইত, তাহার মা ও মাসীমাও কি নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া এমনই ভাবে আপনার স্বতন্ত্র সত্তা নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? কে বলিতে পারে?

সুধীরের ও মৃণালিনীর পক্ষে যে সম্বন্ধে সম্মতি দান অসম্ভব ছিল, সেই সম্বন্ধই স্থির হইয়া গেল। সত্যই অদৃষ্ট ভুলের জালে সকলকে বদ্ধ করিয়া আপনার ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত করিল।

বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিন যত নিকট হইয়া আসিতে লাগিল, ততই রেণু আপনার মনকে পাষাণের মত দৃঢ় করিতে লাগিল; আর বিবাহের ব্যবস্থার ব্যস্ততায় সুধীর আর দ্বিধায় বিচলিত হইবার অবসর পাইল না।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

১০

পিতা তাহাকে ভুল বুঝিলেন—মাসীমাও তাহাকে ভুল বুঝিলেন, তাই অভিমানে রেণু যদি সমস্ত সংসারের প্রতি বিরক্ত না হইত—সে যদি বিরূপ ভাব মনে পোষণ করিয়া স্বামিগৃহে প্রবেশ না করিত, তবে, বোধ হয়, সে অসুখী হইত না; যদিও সে আপনার সব ত্যাগ করিবে, এই সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল, তথাপি পূর্ণিমার আন্তরিক স্নেহ ও সেই স্নেহের প্রয়োজনাতিরিক্ত বিকাশ তাহাকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত। নীরেন্দ্র তাঁহার একমাত্র পুত্র। সে যে বিপত্নীক হইয়া সংসারে কতকটা বীতস্পৃহ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার দুঃখের অবধি ছিল না। তাই তিনি উপযুক্ত পাত্রী দেখিয়া তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে আবার সংসারে আকৃষ্ট করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় নীরেন্দ্র রেণুকে দেখিয়াছিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাঁহার কোমলহৃদয় পুত্রকে রেণু সুখী করিতে পারিবে। রেণুর প্রতি তাঁহার স্নেহ সেই জন্যই আন্তরিক ছিল। আর সে স্নেহের বিকাশে বাহুল্যের কারণও ছিল। তিনি স্নেহে রেণুকে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সপত্নীর সন্তানদ্বয়ের প্রতি তাহার হৃদয়ে মাতৃভাবের বিকাশ করাইবেন, মনে করিয়াছিলেন। রেণু তাঁহার কাছে যে স্নেহ ও যে যত্ন পাইল, তদপেক্ষা অধিক স্নেহ ও যত্ন, বোধ হয়, সে মা ও মাসীমা'র কাছেও পায় নাই। কন্যাহীনা [পূর্ণ]িমা তাহাকে কন্যার মতই দেখিতে লাগিলেন।

পিসীমা সুধীরকে বলিলেন, "রেণু আমাদের আর জন্মে কোন্ পাহাড়ে ব'সে তপস্যা করেছিল, জানি নে; নইলে এমন শাশুড়ী পেত না।"

স্বামীর গৃহে তাহার আদর-যত্নে সুধীরও তৃপ্ত হইল; সে বিষয়ে তাহার যে আশঙ্কার অনিশ্চিত-ভাব ছিল, তাহা দূর হইলে সে স্বস্তি পাইল।

পূর্ণিমার ব্যবহারে মৃণালিনীও তুষ্ট হইলেন বটে; কিন্তু তাহা যে রেণুকে তুষ্ট করিতে পারিতেছে না, তাহা তাঁহার স্নেহসতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। তিনি মনে করিলেন, রেণুর এই ভাবের কোন কারণ নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু তিনি চেষ্টা করিয়াও সে কারণের সন্ধান পাইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, সে স্নেহ গ্রহণ করিবে না বলিয়াই রেণু অভিমানের পাষাণ-প্রাচীর রচনা করিয়া স্নেহের প্রবাহ বাহিরে রাখিতেছিল।

স্বামীর পক্ষেও ভালবাসার ও যত্নের ত্রুটি ছিল না। কোন কোন পুরুষের হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল এবং তাহারা সর্ব্বোতোভাবে আপনাতে কেন্দ্রস্থ হইয়া থাকিতে পারে না। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা পাইবার জন্য তাহাদিগের হৃদয় যেমন ক্ষুধিত হইয়া থাকে, সে সকল দিবার জন্যও তাহারা তেমনই অস্থির আগ্রহ অনুভব না করিয়া পারে না। তাহারা আপনাকে আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া শান্তি পায় না। নীরেন্দ্র সেই প্রকৃতির। বাল্যে সে সর্ব্বতোভাবে মা'র উপর নির্ভর করিত; তাহার স্নানের ব্যবস্থা মা করিতেন, মা আপনি কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে তাহার খাওয়া হইত না, তাহার জিনিষপত্র মা-ই গুছাইয়া রাখিতেন। যৌবনে সে পত্নীর উপর নির্ভর করিত। মা তাহার ভার পুত্র-বধূর হস্তে তুলিয়া দিয়াছিলেন। পুত্র-কন্যার প্রতি তাহার স্নেহের যেন সীমা ছিল না। এমনই ভাবে সংসার পাতাইয়া সে যখন সেই সংসারের সুখে সুখী, তখন সহসা অতর্কিত আঘাত আসিল—সে বিপত্নীক হইল। মা'র আবার তাহার ভার লইয়াই নিশ্চিন্ত হইবার উপায় রহিল না; সঙ্গে সঙ্গে তাহার কন্যার ও পুত্রের—কণার ও অশোকের ভারও তাঁহাকে লইতে হইল। তবে কণার ও অশোকের ভার নীরেন্দ্রও অনেকটা বহন করিত। কিন্তু বাল্যকালে মা'র স্নেহে হৃদয় পূর্ণ হয়; তাহার পর যখন হৃদয়ে প্রেমের তৃষ্ণা দেখা দেয়, তখন সে স্নেহ পাইলেও হৃদয়ের অনেকটা অংশ শূন্য রহিয়া যায়। সে শূন্যকে শূন্য রাখিয়া যাহারা জীবন যাপন করে, তাহাদিগের চিত্তের দৃঢ়তা ও শক্তি অসাধারণ।

তাহারা আত্মস্থ। কিন্তু তাহারা দুঃখকেই বরণ করিয়া লয়—সুখ পায় না। তাহারাও সময় সময় পথিভ্রষ্ট হইতে পারে। নীরেন্দ্র বিপত্নীক হইয়া তাহার হৃদয়ের শূন্যতায় পীড়িত হইতেছিল। সে যে কত বিনিদ্র রজনীতে ভাবিয়া ভাবনার কূল পাইত না, তাহা আর কেহ জানিত না; কেবল তাহার মুখ দেখিয়া পূর্ণিমা তাহা অনুমান করিতেন এবং তাহার জন্য অশ্রুবর্ষণ করিতেন। রেণুকে পাইয়া সে সেই শূন্য পূর্ণ করিবার আশা করিল; তাহার দিকে তাহার রুদ্ধ ভালবাসা সাগ্রহে ঢালিয়া দিল। সে বিবাহ করিতে ভয় পাইয়াছিল—পাছে বিমাতার ব্যবহারে কণা ও অশোক কষ্ট পায়। কিন্তু মা'র প্রতি তাহার বিশ্বাস কখন বিচলিত হয় নাই, নির্ভরশীলতা কখন ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাই পূর্ণিমা যখন বলিয়াছিলেন, তিনি যাহাকে বধূ করিয়া আনিবেন, সে তাহার পুত্র-কন্যার মা হইবে, তখন সে তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল। মা'র কথা যে সত্য না-ও হইতে পারে, এ ধারণাই তাহার ছিল না। পূর্ণিমা বলিয়াছেন, রেণুর মাতার গুণের তুলনা ছিল না; সে-ও মা'র গুণ পাইয়াছে। রেণুকে দেখিয়া নীরেন্দ্রের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছিল। যাহার এত রূপ, প্রকৃতি কি তাহার সেই রূপের আধারে গুণ না দিয়া আপনার সৃষ্টি অসম্পূর্ণ রাখিতে পারেন? বাস্তবিক রেণুর রূপে ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষা স্নিগ্ধতা অধিক ছিল। বিশেষ আশৈশব রুগ্না মাতার কাছে বর্দ্ধিত হইয়া সে ধৈর্য্যের বিশেষ অনুশীলন করিয়াছিল; যৌবনও তাহার ধৈর্য্যে চাঞ্চল্য প্রক্ষেপ করিতে পারে নাই,—তাহার গাম্ভীর্য্য বিচলিত করিতে পারে নাই। অন্য কেহ হয়ত, তাহা অস্বাভাবিক মনে করিত; কারণ, বন্যার জলও যে নদীকে চঞ্চল করিতে পারে না, সে নদীর গভীরতা যেমন শঙ্কার কারণ হয়, তেমনই যৌবন যে নারীর কথায়—দৃষ্টিতে—ব্যবহারে চাঞ্চল্য সঞ্চার করিতে না পারে, তাহার প্রকৃতিগত গাম্ভীর্য্য মানুষকে তাহার সম্বন্ধে শঙ্কিত করে। কিন্তু রেণুর এই ভাবই নীরেন্দ্রের সকল শঙ্কা দূর করিয়াছিল; সে বুঝিয়াছিল—রেণু কখন তাহার পুত্র-কন্যার প্রতি বিমাতার ব্যবহার করিবে না।

নীরেন্দ্রের ভালবাসায় যে কুণ্ঠার ভাব ছিল, তাহা তাহাতে অধিক আকর্ষণ-সংযোগ করিয়াছিল। সব দিয়াও তাহার মনে হইত, বুঝি যতখানি দিতে হয়, ততখানি দেওয়া হইল না। এই কুণ্ঠার ভাবই ভালবাসাকে, চুম্বক যেমন লৌহকে আকৃষ্ট করে, তেমনই, আকৃষ্ট করে। সে ভালবাসাও রেণু গ্রহণ করিবে না স্থির করিয়াছিল। সে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা কিছুই লইবে না—কেবল নারীর যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিয়া যাইবে—ত্যাগ করিবে; সুখের জন্য সে কোনরূপ আগ্রহ হৃদয়ে স্থান দিবে না। তাহার এই ভাব নীরেন্দ্রকে ব্যথিত করিত। সে মনে করিত, সে রেণুকে সুখী করিতে পারিল না; এবং তাহা মনে করিয়া সে আপনি অসুখী হইত।

শাশুড়ীর স্নেহ ও স্বামীর ভালবাসা লইবে না, এই সঙ্কল্পে রেণু মনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইল বটে, কিন্তু এক বিষয়ে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল—সে কণার ও অশোকের প্রতি স্নেহে। পূর্ণিমা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—রেণু তাহাদিগের মা। তাই তাহারা তাহাকে পাইয়া যেন হারানিধি পাইয়া তাহা আবার হারাইবার ভয়ে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহিত না। অশোক যখন তাহার গলা ধরিয়া আধ-আধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিত, "মা, তুমি কোথায় ছিলে?"—তখন সে কিছুতেই বলিতে পারিত না, সে তাহার মা নহে—সৎমা। এই মাতৃহীন শিশুদ্বয় যখন কারণে অকারণে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া—তাহাকে চুম্বন করিয়া ডাকিত—"মা" তখন তাহাদিগের সেই আহ্বান মাতৃহীন রেণুর বুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেন তাহার সঙ্কল্প দুর্ব্বল করিয়া দিত। মাতৃহীনের মা'র স্নেহের জন্য ক্ষুধা কি, সে তাহা বিশেষ জানিত। তাই সে তাহাদিগের সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত না—তাহাদিগের প্রতি স্নেহাকৃষ্ট না হইয়া পারিত না। বুঝি নারীপ্রকৃতির মাতৃভাব তাহার সঙ্কল্পের পাষাণ আবরণ সরাইয়া দিয়া স্নেহের উৎস উৎসারিত করিয়া দিত। সে বিষয়ে রেণু তাহার দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারিত; কিন্তু বুঝিয়াও তাহা ত্যাগ করিতে পারিত না বা ত্যাগ করিতে তাহার আগ্রহ হইত না।

পিসীমা যখনই রেণুকে দেখিতে আসিতেন, তখন ইহা লক্ষ্য করিয়া কুমুদাকে বলিতেন, "দেখলি—পেটে পেটে সব ছিল! কি চালাক! জানে, নীরেন ঐ ছেলেমেয়ে-অন্ত প্রাণ, তাই স্বামীকে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে করবার জন্যে দেখাচ্ছে যেন, ছেলেমেয়ে দু'টো নইলে ও থাকতে পারে না।"

কুমুদা বলিত, "নেও কথা! তা'ও কি তুমি জানতে না?"

"কেমন ক'রে জানব, বাপু; আমরা সোজা মনিষ্যি—অত পেঁচ বুঝি নে।"

"পিসীমা, একে এ কালের মেয়ে; তা'র লেখা-পড়া শিখেছে; তার উপর আবার———"

"তা'র উপর আবার কি?"

"কেন—মাসীমা'র শিক্ষে!"

"সে কথা সত্যি। কি জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ!"

রবিকর যতক্ষণ পর্ব্বতের সঞ্চিত তুষারের দৃঢ়তা দূর করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহা কঠিন থাকে; কিন্তু এক বার যদি সে দৃঢ়তা দূর হয়, তবে তাহা বিগলিত জলধারায় দ্রুত প্রবাহিত হইয়া উষরেও উর্ব্বরতার সঞ্চার করে। কণা ও অশোকের প্রতি যে স্নেহ রেণুর হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা যদি স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হইতে পারিত, তবে কি হইত বলা যায় না। হয়ত তাহার ফলেই রেণুর অভিমান দূর হইয়া যাইত; আর অভিমান দূর হইয়া যাইলে তাহার হৃদয়ে পূর্ণিমার স্নেহ ও নীরেন্দ্রের ভালবাসা প্রবেশ করিতে পাইত—সে স্বস্তি, শান্তি ও সুখ লাভ করিতে পারিত। স্নেহ তাহার দুর্জ্জয় অভিমানকে জয় করিতে পারিলে সে বুঝিতে পারিত, জয়ের গর্ব্বে যে সুখ নাই, অনেক ক্ষেত্রে পরাজয়ের অনুভূতিতে তাহা আছে।

কিন্তু স্নেহ যখন তাহার অভিমানের প্রাচীরে ছিদ্র করিতেছিল, সেই সময় অতর্কিত ঘটনা সে প্রাচীর সমধিক দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করিয়া দিল।

মাতৃত্বের ক্ষীণ প্রারম্ভে দারুণ অরুচি ও বিবমিষা রেণু তাহার মাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিল। সে যখন তাহার ফল দৌর্ব্বল্যে কাতর হইতেছিল, কিন্তু তাহার কারণ পূর্ণিমা ব্যতীত আর কেহ সন্দেহ করিতেও পারেন নাই, তখন এক দিন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। সে দিন স্বল্পাহারের পর ভুক্ত দ্রব্য বমন করিয়া রেণু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ণিমা বলিয়াছিলেন, "মা, তুমি একটু ঘুমোও গে। আমি কণাকে আর খোকাকে দেখছি। সেই কথায় রেণু যাইয়া শয়ন করিয়াছিল এবং শয়ন করিবার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অশোককে ঘুম পাড়াইয়া পূর্ণিমা পার্শ্বের ঘরে যাইয়া রেণুর মাতৃত্বলাভসূচনার সংবাদ মৃণালিনীকে জানাইবার জন্য পত্র লিখিতেছিলেন। এ দিকে অশোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং সে কাঁচাঘুমে জাগিয়া রেণুর জন্য "মা! মা!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে রেণুর ঘরে যাইতে চৌকাঠে পা বাধিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। নীরেন্দ্র পার্শ্বের ঘরে ছিল। পতনশব্দে সে ছুটিয়া আসিয়া অশোককে তুলিল; দেখিল, মর্ম্মরের মেঝেয় লাগিয়া তাহার কপাল কাটিয়া গিয়াছে—রক্ত পড়িতেছে।

অশোকের ক্রন্দনে জাগিয়া রেণু তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার কাছে আসিল।

নীরেন্দ্র স্বভাবতঃ শিশুর ক্রন্দন সহ্য করিতে পারিত না, তাহাতে বড়ই কাতর হইয়া পড়িত; তাহার উপর কণা ও অশোক মাতৃহীন হইবার পর হইতে তাহাদিগের ক্রন্দন যেন তাহার বুকে শেল বিদ্ধ করিত। রেণু অশোককে লইবার জন্য হাত বাড়াইল এবং শিশুও তাহার কাছে যাইবার জন্য ঝুঁকিল বটে, কিন্তু তাহার ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া তাহাতে "টিঙ্কচার আইওডিন" দিয়া তাহাতে কোন "ক্রিম" দিয়া বাঁধিয়া দিবার জন্য নীরেন্দ্র তাহাকে লইয়া গেল। অশোকের কপাল কাটিয়া যাওয়ায় নীরেন্দ্র এমনই বিচলিত হইয়াছিল যে, সে রেণুকে বলিল, "তুমি এদের একটু দেখো; আমার জন্য আমি ব্যস্ত হইনি; বড় আশা করেছি, তুমি এদের মা হ'বে—সেই জন্যই বিয়ে করেছি।"

ততক্ষণে পূর্ণিমা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, "রেণু খেলে ত পাখীর খাবার—তাও পেটে রইল না; তাই ওকে ঘুমুতে বলে, অশোককে ঘুম পাড়িয়ে আমি কেবল পাশের ঘরে গেছি—এর মধ্যেই এই হ'ল! কেন যে মরতে পাশের ঘরে গেলুম!"

মা'র কথা নীরেন্দ্র শুনিল; শুনিয়া বুঝিল, সে রেণুকে যাহা বলিয়াছে, তাহার তাহা বলিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সহসা পুত্রের রক্তপাতে বিচলিত হইয়া সে যাহা বলিয়াছে, তাহা ত আর ফিরাইয়া লইবার উপায় নাই। বাণ যদি একবার ধনু হইতে ত্যক্ত হয়, তবে তাহা যেমন আর ফিরান যায় না, কথাও তেমনই এক বার বলা হইলে আর ফিরান যায় না। সে আপনার অধীরতায় আপনি লজ্জিত হইল বটে, কিন্তু প্রতীকারের কোন পথ পাইল না।

পূর্ণিমা পুত্রের অনুসরণ করিলেন।

অশোক পিতার নিকটে থাকিয়া "মা"কে ডাকিতে ডাকিতে গেল।

রেণু হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িল। নীরেন্দ্রের কথা যেন তাহার কাণের মধ্য দিয়া তাহার বুকে জ্বালা সঞ্চার করিয়াছিল। আপনাকে সংযত করিতে—আপনার চাঞ্চল্য দমিত করিতে তাহার কিছু সময় লাগিল। তাহার পর সে ভাবিতে লাগিল।

রেণু ভাবিতে লাগিল, কিসে সে নীরেন্দ্রের এই তিরস্কার লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র? সে যে কণা ও অশোকের প্রতি স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সেই দৌর্ব্বল্যের জন্য সে আপনাকে ধিক্কার দিল। তাহারা তাহার কে? কেহই নহে। তাঁহারা তাহার স্বামীর কন্যা ও পুত্র। কিন্তু স্বামী তাহাকে কি মনে করেন, তাহা আজ তাঁহার কথাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি তাহাকে তাঁহার ভালবাসা পাইবার অধিকারী—তাঁহার গৃহিণী ও সচিব মনে করেন না; তাহার অধিকার —তাঁহার মৃতা পত্নীর পুত্র-কন্যার মা না হইয়াও তাহাদিগের মাতার অভাব পূর্ণ করা। ইনিই স্বামী—ইনিই পতিদেবতা, তাহার ইহকালের অবলম্বন—পরকাল থাকিলে তাহার গতি! বড় দুঃখেও রেণুর হাসি আসিল। কিন্তু দুশ্চিন্তার অন্ধকার-মেঘসমাগমে সে হাসি বিলয়ভূয়িষ্ঠ বিদ্যুতের মতই মিলাইয়া গেল। হৃদয়ে রহিল কেবল অন্ধকার—আর রহিল, দারুণ অভিমানের জ্বালা।

সে ভাবিল, তবে ইহাই তাহার প্রাপ্য? অবজ্ঞা ও অবহেলা, অকারণ তিরস্কার—এই সব সহ্য করিয়া তাহাকে হাসিমুখে সংসার করিতে হইবে, স্বামীকে তুষ্ট করিতে হইবে, তাঁহার সন্তান পালন করিতে হইবে, তাঁহার সন্তানের জননী হইতে হইবে? এতটুকু ক্রটির জন্যও ক্ষমা নাই!

তাহার অভিমান তাহাকে দৃঢ় করিল। যদি তাহাই হয়, সে তাহাই করিবে। স্বামী বলিয়াছেন—তাহার কায তাঁহার পুত্র-কন্যাকে পালন করা—সে তাহা করিবে; সে কার্য্যে সে এতটুকু ক্রটি হইতে দিবে না। তাহার অধিক আর কোন কর্ত্তব্য সে স্বীকার করিবে না।

সে যখন ইহা স্থির করিতেছিল, তখন অশোকের কপালে ঔষধ ও পটি দেওয়া হইলে পূর্ণিমা তাহাকে লইয়া রেণুর কাছে আসিলেন। রেণুর মনের ভাব বুঝি তিনি তাহার মুখভাবে অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন; তাই তিনি বলিলেন, "ছেলেপিলে অমন পড়েই থাকে। মা, তুমি তা'তে দুঃখিত হইও না।"

রেণু কোন কথা বলিল না।

অশোক তখন বায়না ধরিল—"মা কাছে যা'ব।"—সে পিতামহীর নিকট হইতে ঝুঁকিয়া পড়িল। রেণু হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে লইল। কিন্তু যে স্নেহ তাহার বুককে কোমল করিতেছিল, তাহা আজ আর ছিল না—অভিমানের তাপে বুক কঠিন হইয়া গিয়াছিল। আজ সে যে অশোককে বুকে লইল, সে স্নেহহেতু নহে—কর্ত্তব্য পালন করিবে বলিয়া।

সমস্ত দিন রেণু ভাবিল এবং সে যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার অভিমান ততই প্রবল হইতে লাগিল। যে স্থানে ভালবাসা নাই, সে স্থানে অভিমান কেহ দূর করিতে পারে না; আর অভিমান আর সব আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রেণু শাশুড়ীকে বলিল, "আমি কিছু খা'ব না; ক্ষিধে নেই।"

"অরুচি, বমি—অমন হয়; কিন্তু না খেলে দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। যা' পার খেও।"

"না, মা; আমি খেতে পারব না।"

"তুমি দেখছি ভাবিয়ে তুললে, মা! বেহানকে খবর দিয়েছি; কাল তিনি এলে ভাল ক'রে পরামর্শ করতে হ'বে।"

রেণু কিছুই বলিল না।

কণার ও অশোকের খাওয়া হইলে পূর্ণিমা রেণুকে বলিলেন, "তুমি শোও গে, মা। তা'র পর আমি ডেকে খাওয়াব।"

স্বামীর কন্যা ও পুত্রকে লইয়া রেণু শাশুড়ীর শয্যায় শয়ন করিল; তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল—রেণু ঘুমাইতে পারিল না—জাগিয়া ও ভাবিয়া আপনার বুকের মধ্যে অভিমান পুষ্ট করিতে লাগিল।

রাত্রি নয়টা বাজিয়া যাইলে, সংসারের কায শেষ করিয়া আসিয়া পূর্ণিমা তাহাকে ডাকিলেন; বলিলেন, "বৌমা, আমি চীনে ঘাস দিয়ে দুধ জমিয়ে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে রেখেছি; দু'খানা খা'বে চল।"

রেণু বলিল, "আমি একেবারেই খেতে পারব না, মা। অসুখ করেছে।"

"তবে থাক"—বলিয়া পূর্ণিমা বলিলেন, "আর জেগে থেক না; উঠে ঘুমোও গে, রাত্তির হয়েছে।"

"মা আমি উঠতে পাচ্ছি নে"—বলিয়া রেণু স্বামীর ছেলেটির আরও কাছে সরিয়া যাইয়া তাহাকে জড়াইয়া শাশুড়ীর শয্যায় শুইয়া রহিল।

১১

পূর্ণিমার পত্র পাইয়া মৃণালিনী পরদিন রেণুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাহার অরুচি ও বিবমিষার কথা শুনিয়াই তিনি ভয় পাইলেন; তাহার মাতা এই উভয় লক্ষণে কিরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে পড়িল। সেই দৌর্ব্বল্যের পর প্রসবান্তে পীড়িতা হইয়া তিনি আর ভগ্ন স্বাস্থ্য

ফিরিয়া পায়েন নাই এবং দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষকাল রোগই ভোগ করিয়া শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। সেই স্মৃতি তাঁহার স্নেহসঞ্জাত শঙ্কাকে প্রবল করিয়া তুলিল। তিনি বারবার পূর্ণিমাকে বলিলেন, তিনি যেন রেণুকে বিশেষ সাবধানে রাখেন—সর্ব্বদা তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখেন—ইত্যাদি।

তিনি মনে করিলেন, রেণুকে আপনার কাছে লইয়া রাখিবেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী, মনে করিলেন—সে বিষয়ে তাহার পিতার অধিকার সর্ব্বপ্রধান; অথচ তথায় তাহাকে দেখিবার কেহ নাই, সেই জন্য সুধীরকে বলিয়া তিনি তাহাকে লইয়া যাইবেন। তাই রেণুর গৃহ হইতে তিনি সুধীরের কাছে গমন করিলেন। রেণুর বিবাহের পর হইতে তাঁহার আর সে গৃহে ঘন ঘন গতায়াত ছিল না। তবে ছুটীর দিন হইলেই সুধীর রেণুকে আনিবার প্রস্তাব করিত; সে আসিলে সেই সংবাদ পাইয়া মৃণালিনী প্রায়ই আসিতেন। তদ্ভিন্ন তিনি মধ্যে মধ্যে রেণুকে দেখিতে তাহার বাড়ীতে যাইতেন।

তিনি সুধীরকে রেণুর সম্বন্ধে সংবাদ দিলেন। তাহার পূর্ব্বে পিসীমা সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সুধীর তাঁহার কথায় ততটা আস্থা-স্থাপন করে নাই। বিশেষ কিছু দিন হইতে সে পিসীমা'কে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছিল। যাহারা সমুদ্রযাত্রা করে, জাহাজের এঞ্জিনের অবিরাম ঘর্ঘররব যেমন তাহাদিগের বিরক্তি উৎপাদন করে, পিসীমা'র সেই একই কথার ক্রমাগত পুনরুক্তি তেমনই তাহার পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কেবলই বলিতেন, সুধীরকে বিবাহ করিতে হইবে—নহিলে সংসার চলিবে না। কখন "বাড়ী যেন গিল্‌তে আস্‌ছে"—এই যুক্তি দেখাইয়া, কখন তিনি তীর্থে যাইবেন বলিয়া, কখন অকারণ অশ্রুবর্ষণ সংযোগে তাহার আহারের সময় পিসীমা এই কথা এতবার বলিতেন যে, আহারের সময়টা তাহার পক্ষে ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিতেছিল। পিসীমা বোধ হয়, স্মরণ করিতেন, ঘষিতে ঘষিতে পাতরও ক্ষয় হইয়া যায়।

মৃণালিনীর কাছে সংবাদ শুনিয়া সুধীর বলিল, "আমার ত মনে হয়, তা'কে আনাই দরকার।" মৃণালিনী যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন—তাহার মনেও সেই আশঙ্কা স্বতঃ প্রকাশ পাইল; রেণুর মা'র দৌর্ব্বল্য হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত সব অবস্থার চিত্র যেন তাহার মানসপটে বায়স্কোপের চিত্রের মত এ উহার পর প্রতিফলিত হইয়া গেল। তাহার পর মৃণালিনী যখন তাহাকে সেই সব কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, তখন সুধীর আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

খানিকটা ভাবিয়া সুধীর বলিল, "আমি কালই গিয়ে রেণুকে আনবার ব্যবস্থা ক'রে আসি। এ সময় বাপের বাড়ীতে থাকলে তা'র ইচ্ছামত খেতে ও থাকতে পারবে। শ্বশুরবাড়ীতে নতুন বৌ—তা ত হ'বে না। বিশেষ সে ত কোন কথাই বলবে না।"

মৃণালিনী বলিলেন, "সেই জন্যই আমি ছুটে এসেছি। কিন্তু—"

মৃণালিনী একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "কিন্তু এখানে, তা'কে কে' দেখবে? যা'র দেখবার কথা, সে ত সব ভাবনা থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেছে।"

বলিতে বলিতে মৃণালিনীর গলাটা "ধরিয়া আসিল"—সুধীরও বুকের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করিল।

সুধীর মৃণালিনীর কথার যাথার্থ্য অনুভব করিল। পিসীমা'র সম্বন্ধে তাহার ধারণারও পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তা' হ'লে কি করা যায়?"

মৃণালিনী বলিলেন, "তোমার মত না নিয়ে ত আমি কোন কথা বল্‌তে পারি না; তাই কোন কথা বলি-নি। যদি তোমার মত হয়, আমি রেণুকে নিয়ে যাই।"

রেণুর প্রতি মৃণালিনীর স্নেহের বিষয় সুধীরের অজ্ঞাত ছিল না। সে বলিল, "তাই হ'ক।" বলিবার সময় সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল; স্ত্রীর অভাবে সে কতটা অসহায় হইয়াছে, তাহা সে আজ যেমন বুঝিল, বুঝি এত দিনও তেমন বুঝিতে পারে নাই।

রেণুর বিবাহের পরদিন বর বধূ "বিদায়" হইলে সে এক বার কতকটা এমনই ভাব অনুভব করিয়াছিল; তাহার মনে হইয়াছিল, অব্যক্ত বেদনা যেন তাহার বুকের মধ্যে কুরিয়া দিতেছে। কিন্তু সে দিন তাহাকে অন্য কাযে ব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। পরদিন ফুলশয্যা—তত্ত্বের সব ব্যবস্থা করিতে হইবে; রেণুকে দেখিতে যাইতে হইবে; সব হিসাব চুকাইয়া নির্ঝঞ্ঝাট হইতে হইবে। কায লইয়া সে দিন সে ভাবনা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। আজ তাহা হইল না। তবে সে আপনাকে সামলাইয়া লইল।

মৃণালিনী বলিলেন, "একটা ভাল দিন দেখে আনতে হ'বে।"

"তাই হ'বে। আমি কাল সকালে গিয়ে ব'লে আসব, তা'র পর আপনি নিয়ে যা'বার ব্যবস্থা করবেন।"

মৃণালিনী চলিয়া যাইলে সুধীর ভৃত্যকে ডাকিল, "লকুয়া!" লকুয়া আসিলে সে তাহাকে পুরোহিত ঠাকুরকে আনিবার জন্য পাঠাইল।

আজকাল বাঙ্গালী হিন্দুর সংসারে দ্বৈত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই শাসনের ব্যবস্থায় পুরোহিত ঠাকুরের "ডিপার্টমেণ্ট" মহিলাদিগের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছে। কাযেই পুরোহিত ঠাকুর যে সরাসরি পিসীমা'র কাছে যাইয়া তাঁহাকে ডাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। পিসীমা তাঁহার জিজ্ঞাসায় বিস্মিত হইয়া যখন লকুয়াকে ডাকিলেন, তখন প্রকাশ পাইল—সুধীরই তাঁহাকে ডাকিতে বলিয়াছিল। তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া সুধীর পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করাই পিসীমা'র পক্ষে কষ্টকর হইল। তিনি পুরোহিত ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া সুধীরের কাছে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুরুত ঠাকুরকে লকুয়া গিয়ে ব'লে এসেছে, তুই ডেকেছিস!"

সুধীর বলিল, "আমিই লকুয়াকে পাঠিয়েছিলুম।"

বিস্ময় যেন পিসীমা'র দৃষ্টিতে ফাটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল। তিনি চক্ষু দুইটি অতিমাত্রায় বড় করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

সুধীর বলিল, "রেণুর মাসী তাঁ'কে নিয়ে যা'বেন। তাই যাত্রার একটা দিন দেখবার জন্য আমি ঠাকুর মশাইকে ডাকিয়েছি।"

পিসীমা ভাবিলেন, তিনি কি স্বপ্ন—দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন? পৃথিবী কি তাঁহার পদতল হইতে সরিয়া গিয়াছে? যে সংসারে তিনি এতদিন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসনকার্য্য পরিচালিত করিয়া আসিয়াছেন, বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে প্রবেশের দিন হইতে পিতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র তিন পুরুষের অধিকারকালে যে সংসারে তাঁহার ইচ্ছাই আইন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, সেই সংসারে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও না করিয়া তাহার কন্যাকে শ্বশুরালয় হইতে আনিবার জন্য দিন স্থির করিতে পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকাইয়াছে? কলি বটে! নীলকণ্ঠের যাত্রায় বৃন্দা দূতী হইয়া শ্রীমতীকে বুঝাইয়াছিল—"কৃপণ জন ধনের অংশ, বাঘিনী মুখের মাংস" সহজে দিতে পারে না। কিন্তু হিন্দু-গৃহে যাঁহাদিগকে আমরা লক্ষ্মীস্বরূপিণী মনে করি, যাঁহাদিগের ত্যাগের গর্ব্ব করিয়া তাঁহাদিগকে দেবীর বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করি, যাঁহাদিগের সম্বন্ধে বলিয়া থাকি—সংসার অসার বুঝিয়া তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তীরা বিধবা হইলে স্বামীর চিতায় সহমৃতা হইতেন, তাঁহারা সংসারে কর্ত্তৃত্বের অধিকারের সামান্য অংশ দিতে হইলে কিরূপ ভাব দেখান, তাহা যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা—আর যাহারা ভুক্তভোগী তাহারাই বুঝিতে পারে। ক্ষমতার কণামাত্র ত্যাগের সম্ভাবনায় তাঁহারা সংসারে যে অশান্তির সৃষ্টি করেন, তাহাতে সংসারের অশেষ অকল্যাণই হয়। হিন্দুর সংসারে গৃহিণীর এই ক্ষমতানুরাগ যেন অভিশাপের মত দেখা যায়।

পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "আমি পঞ্জিকা দেখে দিন ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

তিনি পিসীমা'কে বলিলেন, "চলুন, পঞ্জিকাখানা দিবেন।"

এ বার তিনি অগ্রগামী হইলেন; পিসীমা, যেন যন্ত্রচালিত পুতুলের মত, তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

পঞ্জিকা দেখিয়া যোগিনী প্রভৃতি বিচার করিয়া পুরোহিত ঠাকুর পিসীমা'কে বলিলেন, "বাবুকে বলবেন, পরশু সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে ভাল সময় আছে।"

পিসীমা বলিলেন, "আপনি বলে যা'ন।"

পুরোহিত ঠাকুর তাহাই করিলেন।

পিসীমা যেন যাতনায় জ্বলিতে লাগিলেন। সেদিন রাত্রিতে সুধীরের খাবার দেওয়া হইলে পিসীমা আর তথায় বসিলেন না—আপনার ঘরে আসিলেন। তিনি যথারীতি "মালা করিলেন" বটে, কিন্তু মন সে দিকে রহিল না।

তিনি কুমুদাকে বলিলেন, "দেখলি, কুমুদা?"

কুমুদা যাহা জানিত না বা বুঝিত না, তাহাও জানিত না বা বুঝিত না বলিয়া স্বীকার করিত না; বলিত, "তাইত দেখছি।"

আজও সে তাহাই বলিল।

পিসীমা বলিলেন, "ছাই দেখেছিস; দেখেছিস, তোর মাথা আর মুণ্ডু।"

কুমুদা চুপ করিয়া রহিল।

তখন পিসীমা সব কথা তাহাকে বলিয়া যেন মনের ভার একটু লঘু করিলেন। শেষে তিনি বলিলেন, "আমি আর এখানে থাকব না—কাশীতে বা পুরীতে গিয়ে বাস করব।"

কুমুদা বলিল, "তা'তে কা'র ক্ষতি হ'বে? সংসারটা ছারে খারে যা'বে।"

"তা'ই ব'লে কি এত অপমান সহ্য করেও থাকতে হ'বে? তোরা ছোটলোক, সে তোরা পারিস।"

"নেও কথা! এতে কি আবার ছোটলোক ভদ্দরলোক ভেদ আছে না কি?"

"নেই?"

"না—গো, না। কি সাহসে দাদা বাবু এমন কায করলে, তা'ত বুঝতে পেরেছ?"

"কি?"

"ঐ যে গো, মাসী—তাঁ'র বোন নেই, যা'র জোরে জোর সে গেল। তবুও তাঁর' জোর কমে না। বলে—

'গয়ায় এলাম ঘুচাতে পাপ;
সেখানে দেখি সতীনের বাপ।'

তিনিই ত আদর ক'রে বোনঝিকে নিয়ে যা'বেন; আর তা'ই ত এত আয়োজন।"

"তা' ত দেখছি।"

"শুধু দেখলে কি হ'বে? আমি কত দিন থেকে ব'লে আসছি, বিষদাঁত ভেঙ্গে দাও। গরীবের কথা বাসি হ'লে খাটে। তুমি বলতে, 'মুড়কীর রস শুকালেই যা'বে।' এখন দেখ, শুকান ত পড়ে থা'ক —একেবারে কি হয়ে গেল।"

"এখন করা কি?"

"দাদা বাবুর বিয়ে দাও। কত বার ঐ কথা বলব?"

"আমি ত চেষ্টার ত্রুটি করছি নে। কিন্তু সুধীর যে মত দেয় না।"

"অমন সবাই বলে! বলে—

'হাতী ঘোড়া গেল তল,
ভেড়া বলে, কত জল?'

মুনি-ঋষিরাই বড় অটল থাকে, তা' সমস্ত মানুষ। কেন, এই ত দেখলে তোমার ভাশুরপোর ছেলে; বলেছিল, বিয়ে করবে না—ছেলেমেয়ের সৎমা করবে না—তা'র পর? এখন ত তোমার রেণুকে এক দিন ছেড়ে থাকে না!"

"কিন্তু মত যে করাতে পারছি নে।"

"মত করাবার ভাবনা কি? ডাগর মেয়ে দেখে বিয়ে দাও। এখন তোমাদের ভদ্দরলোকের ঘরে ত আর ডাগর মেয়ের অভাব নেই! সময়ে বিয়ে দিলে তিন ছেলের মা হ'ত এমন মেয়ে এখন বিয়ের কনে হয়ে লাল চেলী পরে আসে। দেখে আমার এমন হাসি পায়! তা'র পর দেখবে, বৌ রাস কড়া ক'রে ধরলে, আর কিছু বলতে হ'বে না।"

কুমুদার কথা পিসীমা'র ভাল বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু তবুও তিনি স্থির করিতে পারিলেন না—কেমন করিয়া জিদ করিয়া সুধীরের বিবাহ দিবেন। কিন্তু সে কথা তিনি কুমুদাকে জানিতে দিলেন না। তবে তিনি স্থির করিলেন, সুধীরের বিবাহ দিতেই হইবে; নহিলে মৃণালিনীর বিষদন্ত উৎপাটন করা সম্ভব হইবে না।

পিসীমা'র একটা সুবিধা ছিল, শয্যায় শয়ন করিবার পর তিনি আর কোন কথা অধিকক্ষণ ভাবিতে পারিতেন না। কুমুদা কোন কোন দিন কথা বলিতে বলিতে শুনিত, পিসীমা'র আর সাড়া নাই; সে বলিত, "কি ঘুম! বালিসে মাথা ঠেকাতে তর সয় না!"

সে রাত্রিতে পিসীমা যথারীতি ঘুমাইয়া পড়িলেন; কিন্তু সুধীর ঘুমাইতে পারিল না। সে মনে করিতে লাগিল, মানুষ সামাজিক জীব হইয়াও অভিমানে মনে করে, সে সর্ব্বতোভাবে স্বাবলম্বী হইতে পারে। কিন্তু সে কতটা পরাধীন, তাহা সে আপনি বুঝিতেই পারে না। কাত্যায়নী দীর্ঘকাল রোগশয্যায় ছিলেন—আপনি পরের উপর নির্ভর করিতেন; তবুও তিনি কি ছিলেন, তাহা আজ মৃণালিনীর এক কথায় তিনি বুঝিয়াছেন। রেণুর মা নাই, তাই তাহার পিতা তাহাকে আনিয়া কাছে রাখিতে পারিবে না। কথাটা সত্য; কিন্তু কি কঠোর! পিতায় আর মাতায় কি প্রভেদ!

রেণু তাহার একমাত্র সন্তান। রেণুর জন্মাবধি তাহার মাতা রোগভোগ করিয়া দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষ পরে রোগ ও জীবন উভয় হইতেই অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। তাহার জন্মাবধি রেণু তাহার স্নেহের কেন্দ্র হইয়া ছিল ও আছে। অথচ আজ তাহাকেই আপনার কাছে আনিয়া রাখিবার অধিকার—অধিকার না হইলেও সুবিধা তাহার নাই। গৃহে আনিলে তাহাকে পিসীমা'র উপর নির্ভর করিতে হইবে। অথচ পিসীমা'র রেণুর প্রতি যে ভাব সে লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে সাহস হয় না। কাত্যায়নীর অসুখেও সে তাঁহার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতে পারে নাই। এক উপায়—রেণুকে তাহার মাসীমা'র কাছে রাখা। তাহাকে বাধ্য হইয়া সেই ব্যবস্থাতেই সম্মতি দিতে হইয়াছে। তাহার মাসীমা'র তাহার প্রতি স্নেহ অসাধারণ; কিন্তু তবুও সে তাহার পিতা—মাসীমা তাহার মাতার ভগিনীমাত্র! এই স্থানেই পুরুষকে

নারীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়। রেণু বালিকা এবং বিমাতা হইলেও কণা ও অশোককে কিরূপ স্নেহে আপনার করিয়া লইয়াছে, তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছে। প্রকৃতি নারীর হৃদয়ে স্নেহ ও মাতার দেহে সেই স্নেহের পার্থিব অভিব্যক্তি দিয়াছেন। পিতা না থাকিলে সন্তানের লালন-পালন অসম্ভব হয় না; মাতার অভাব কেহ পূর্ণ করিতে পারে না।

এক একটা ঘটনায় সুধীরের পক্ষে কাত্যায়নীর অভাব যেন অত্যন্ত বেদনাদায়ক হইয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহা যেরূপ তীব্র বেদনার কারণ হইল, সেরূপ বুঝি আর কখন হয় নাই। আজ তাহার মনে হইল—সে একান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছে—এত অসহায় যে, দুহিতার শুশ্রূষা করিবার ব্যবস্থাও সে করিতে পারে না।

সুধীর উঠিয়া ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিল। গৃহে সকলেই তখন সুপ্তিসুখ সম্ভোগ করিতেছে—সে একা জাগিয়া আছে। গৃহের শূন্যতা যেন তাহার ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল। সে আকাশে চাহিল—আকাশ অন্ধকার; সেই অন্ধকার আকাশ হইতে পবন-হিল্লোল—খেচরপক্ষাঘাত-সঞ্চালিত বাতাসের মত তাহার চিন্তাতপ্ত ললাট স্পর্শ করিল। সে ভাবিতে লাগিল।

রাত্রি যেন আর শেষ হয় না। সমস্ত রাত্রি সুধীর কখন ঘরে, কখন বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইল। যখন পূর্ব্বমেঘ উষালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখন সে যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলিল। যে সব দুশ্চিন্তা—যে আশঙ্কা রাত্রিকালে মানুষকে পীড়িত করে, সে সব রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে দূর হইয়া যায়—দূর না হইলেও লঘু হয়। সুধীর সমস্ত রাত্রি যে দুশ্চিন্তার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছিল, প্রভাতে তাহার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

সকালেই সে রেণুর বাড়ীতে গমন করিল এবং তাহার শাশুড়ীর নিকট প্রস্তাব করিল—মৃণালিনী তাহাকে কিছু দিনের জন্য লইয়া যাইয়া কাছে রাখিবেন। পূর্ণিমা সুধীরকে বিশেষ সম্ভ্রমই করিতেন। তবুও কথাটা এক বার নীরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করিলেন; কেন না, তিনি সকল কাযে তাহাই করিতেন। তিনি নীরেন্দ্রের সম্মতি লইবার ছলে, তাহাকে সম্মতি প্রদানের প্রয়োজন বুঝাইয়া দিলেন এবং মাতাপুত্রে যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে নীরেন্দ্র মা'র মতেই মত দিল।

রেণু সব শুনিল—কোন কথা বলিল না। সে কি ভাবিতেছিল।

আদালতে যাইতে হইবে—সকালে মক্কেলও আসিবে; বিলম্ব করিবার উপায় ছিল না; তবুও সুধীর রেণুর বাড়ী হইতে এক বার মৃণালিনীর গৃহে গেল এবং তাঁহার প্রস্তাবে পূর্ণিমার সম্মতির সংবাদ ও পুরোহিত ঠাকুরের নির্দ্দিষ্ট দিনের কথা মৃণালিনীকে জানাইয়া আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিল। মৃণালিনী তাহাকে বলিয়া দিলেন, নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি স্বয়ং যাইয়া রেণুকে লইয়া আসিবেন।

বাড়ীতে ফিরিয়াই সুধীর তাহার কাযে ব্যাপৃত হইল; যেন নিষ্কৃতি পাইল।

সে আহার করিতে বসিলে পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে সকালে বেরিয়েছিলি?"

সুধীর কেবল "হুঁ" বলিল।

রেণুর সম্বন্ধীয় কোন কথার আলোচনা পিসীমা'র সঙ্গে করিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না—আগ্রহ ত পরের কথা।

১২

মৃণালিনী রেণুকে কাছে আনিবার সব ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ও সুধীরের সব আয়োজন রেণু ব্যর্থ করিয়া দিল। সে তাহার শাশুড়ীকে বলিল, "মা, আমি যা'ব না।"

পূর্ণিমা তাহার কথায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"আমার যেতে ইচ্ছা নাই।"

"তোমার বাবা এসে ব'লে গেছেন, মাসীমা'ও বলেছেন; না গেলে কি ভাল দেখাবে? তাঁ'রা হয়ত মনে করবেন, আমিই যেতে দিলুম না।"

"তা' কেন মনে করবেন? এখানে আমার যত্নের ত কোন অভাব নেই যে, মাসীমা'র কাছে গেলে বেশী যত্ন পা'ব। আর কণা আর অশোক, এখন যখন আমাকে আপনার মনে করছে, তখন যদি আবার আমি চ'লে যাই, তবে আবার তফাৎ হয়ে যা'বেই। যাঁদের জন্যে আমাকে প্রয়োজন, তা'দের ছেড়ে যাওয়া কি ভাল হ'বে?"

শেষ কথাটা রেণুর যে দারুণ অভিমানের উৎস হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহার বিষয় পূর্ণিমা জানিতে পারেন নাই—তাই তিনি সে বিষয়ে সন্দেহ করিলেন না। পরন্তু রেণু যে বলিয়াছে, তাহার মাসীমাও তাহাকে তাঁহার অপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে পারিবেন না—ইহাতে তিনি অশেষ

আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। তিনি রেণুর কথায় কোনরূপ অসম্মতি জানাইলেন না এবং নীরেন্দ্রকে সে কথা জানাইতে গমন করিলেন।

মা'র কাছে নীরেন্দ্র যাহা শুনিল, তাহাতে সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিল। কণার ও অশোকের হয়ত যথোচিত যত্ন হইবে না, এই আশঙ্কায় সে চঞ্চল থাকিত। তাহারা—তাহার মাতৃহীন সন্তানরা স্নেহ যত্ন পাইলেই সে যেন কৃতার্থ হইত। রেণু যে তাহাদিগকে মাতৃস্নেহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, ইহাতে রেণুর প্রতি প্রশংসায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। সে বলিল, "সে কথাটা ঠিক।"

পূর্ণিমা বলিলেন, "তুই ভয় করতিস, সৎমা ছেলেদের অযত্ন করবে। আমি ত তখনই বলেছিলুম, আমি যে বৌ আনব, সে কখন তা' করবে না। এখন দেখ্‌ছিস ত?"

নীরেন্দ্র কিছু বলিল না। অন্য কেহ হইলে হয়ত মনে মনে বলিত, "ধোপে টিকলে হয়।" কিন্তু সেরূপ মনে করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ভালবাসার ক্ষুধা সে অনুভব করিতেছিল এবং সেই জন্য সে রেণুকে ভালবাসার পাত্র পাইয়া তাহাকে ভালবাসিবার ও তাহার ভালবাসা লাভ করিবার আগ্রহ মনে পোষণ করিতেছিল। তাই আজ রেণুর কথা শুনিয়া সে মনে করিল, সে সব আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। সে যে কখন রেণুর সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছিল এবং যে দিন অশোক পড়িয়া গিয়াছিল সে দিন সে সন্দেহ কথায় প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা মনে করিয়া সে লজ্জানুভব করিতে লাগিল।

তাহার মনে হইল, সে রেণুকে বলিবে—সে তাহার সম্বন্ধে অন্যায় সন্দেহ করিয়া অপরাধী হইয়াছে। সে কেমন করিয়া তাহা বলিবে, তাহা ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু তাহা বলিবার অবসর সে আর পাইল না। কেন না, যে কারণে রেণু মাসীমা'র কাছে যাইতে অস্বীকার করিল, সেই কারণেই স্বামীর সম্বন্ধে তাহার বিশেষ ভাবান্তর হইল। সেই দিন হইতে সে যেন কণাকে ও অশোককে আঁকড়িয়া ধরিল—এক বারও তাহাদিগকে কাছছাড়া করিত না। এ দিকে তাহার মানসিক চাঞ্চল্যে তাহার দৈহিক বিকার বাড়িয়া গেল—বিবমিষা, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইল। শাশুড়ীর পক্ষে তাহার যত্ন করা অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া পূর্ণিমার একাধিক বার মনে হইল, সে যদি মৃণালিনীর কাছে যাইত, তবে হয়ত ভালই হইত। কিন্তু রেণু যে বলিয়াছিল, তাঁহার কাছে তাহার যত্নের কোনই অভাব নাই, সেই কথায় তিনি এতই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, এমনই গর্ব্বানুভব করিয়াছিলেন যে, কিছুতেই তাহাকে বলিতে পারিলেন না—সে না হয় দিন কয়েক মাসীমা'র কাছেই থাকিয়া আসুক। সে ত নিজেই বলিয়াছে, তিনি তাহাকে যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহার অধিক যত্ন সে আর কাহারও কাছে পাইবে না! অসুস্থ শরীরে শাশুড়ীর বারণ না মানিয়াও রেণু নীরেন্দ্রের মাতৃহীন সন্তানদিগকে মাতার স্নেহ দিবার চেষ্টা করিত।

বড় আশা করিয়া রেণুকে লইতে আসিয়া মৃণালিনী হতাশ হইয়া ফিরিলেন। তিনি রেণুকে আনিতে আসিয়া ফিরিয়া যাইয়া রেণুর প্রতি তাঁহার ভালবাসার বিস্তার ও গভীরতা যেমন উপলব্ধি করিলেন, তেমন বুঝি পূর্ব্বে কখন করেন নাই। রেণুর শৈশবে তিনি মধ্যে মধ্যে তাহাকে আপনার কাছে লইয়া যাইতেন। কিন্তু কাত্যায়নীর রোগ প্রবল হওয়া পর্য্যন্ত আর তাহা করেন নাই। কন্যা তাঁহার কাছে থাকিলেও হয়ত তাহার জন্য কাত্যায়নীর মন চঞ্চল হইবে—এই আশঙ্কায় তিনি আর তাহাকে লইয়া যাইতেন না; বিশেষ তিনি প্রতিদিনই ভগিনীকে দেখিতে যাইতেন এবং যাইয়া রেণুকে কাছে রাখিতেন। ভগিনীর মৃত্যুর পর তিনি রেণুকে দেখিতে যাইতেন—রেণুকে তাহার পিতার কাছে রাখাই ভাল মনে করিতেন। তাহাতে সুধীরের কন্যার প্রতি স্নেহ যেমন শিথিল হইবার সুযোগ পাইবে না, তাহার তেমনই একটা কায থাকিবে। সুধীর কিরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ, তাহা তিনি দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসরকাল তাহার রুগ্না পত্নীর প্রতি ব্যবহারে বিশেষ বুঝিয়াছিলেন—সে যে কন্যার প্রতি ব্যবহারেও সেইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিবে, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

তাহার পর রেণু স্বামীর গৃহে গিয়াছে—পুত্রে ও কন্যায় ইহাই প্রভেদ—ইচ্ছা করিলেও কন্যাকে কাছে রাখা যায় না। এই বার তিনি তাহাকে আপনার কাছে আনিবেন। এই ব্যবস্থায় তাঁহার যত সুখ, তত দুঃখ ছিল। যাহাকে নানা কারণে তিনি এত দিন কাছে আনেন নাই এবং কাছে আনিবার স্নেহসঞ্জাত প্রবল বাসনা প্রহত করিয়াছেন—আজ তাহাকে কাছে আনিয়া রাখিবেন, ইহাতে তাঁহার

অসীম আনন্দ। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতেছিল, তাহাকে কাছে লইবার অধিকার যাহার, সে আজ নাই বলিয়াই তিনি তাহার অধিকার লইতে পারিতেছেন। ভগিনীর কথা মনে করিয়া তাঁহার বুক বেদনায় ভরিয়া উঠিতেছিল। সুখের আশা ও দুঃখ লইয়া তিনি রেণুকে আনিতে যাইয়া পূর্ণিমার কাছে শুনিলেন, সে তাঁহার সঙ্গে যাইতে অসম্মত। এ সংবাদ এমনই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত যে, তিনি ইহাতে অতিমাত্র বিস্মিত—স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু যে স্বাভাবিক ধৈর্য্য তিনি অনুশীলনের দ্বারা পুষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারই দ্বারা বিস্ময় জয় করিলেন।

রেণু কেন যাইতে চাহে নাই, পূর্ণিমা তাহা বলিয়াছিলেন—একটু গর্ব্ব করিয়াই বলিয়াছিলেন; কেন না, তিনি মনে করিয়াছিলেন, তিনি পুত্রবধূকে যে স্নেহ দিয়াছেন, তাহা তাহাকে আর কেহ দিতে পারে নাই; আর তাঁহার শিক্ষায় রেণু তাহার সতীনের ছেলেমেয়েকে আপনার মনে করিতে শিখিয়াছে।

আর কেহ হইলে, রেণুর এই কথায় দুঃখিত হইত—আপনাকে আহত মনে করিত। মৃণালিনী তাহা করিলেন না। রেণু যে আর কাহাকেও তাঁহার অপেক্ষা আপনার ভাবে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেন না; যিনি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা আপনার ছিলেন, তিনি আর নাই। আর রেণু যে ইহারই মধ্যে স্বামীর পুত্র-কন্যার প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছে যে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে না, ইহাও তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি সন্দেহ করিলেন, রেণুর এই কাযের কোন গূঢ় কারণ আছে, সে তাহা প্রকাশ করিতেছে না। পূর্ণিমাকে সে যাহা বলিয়াছে, তাহাতেই ভুলিয়া তিনি তাহার কথাই তাহার কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। কিন্তু মৃণালিনীকে ভুলান তত সহজ নহে। তিনি যে ভাবে—স্বামীর সংসারের ও সম্পত্তির ন্যাসরক্ষক হিসাবে, সে সংসারের ও সম্পত্তির রক্ষণকার্য্য পরিচালিত করিতেন, তাহাতে তাঁহাকে সর্ব্বদাই প্রতারণার ভয়ে শঙ্কিত ও সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত; তোষামোদের আবরণ ভেদ করিয়া তিনি তোষামোদকারীর উদ্দেশ্য ধরিয়া ফেলিতেন।

কিন্তু কি কারণে রেণু এমন কায করিতেছে? ভাবিয়া মৃণালিনী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, কোন বিশেষ কারণেই রেণু এমন করিয়াছে। কিন্তু সে কারণ কি?

তিনি রেণুকে যেরূপ স্নেহ করিতেন, তাহাতে অন্য কেহ হইলে তাহার উপর অভিমান করিত—সে তাহাকে পর মনে করিয়াছে। কিন্তু মৃণালিনী অভিমানকে মনে স্থান দিতেন না। তিনি জানিতেন, স্ত্রীলোকের অভিমান এক জনের কাছেই সাজে; আর সেই এক জনই সে অভিমানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন। তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন, স্বামীর চিতায় তাঁহার অভিমান করিবার অধিকার ভস্মীভূত হইয়াছে। স্নেহও সেই ভস্মকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিতে পারে না। বিশেষ অভিমান কোথায় সম্ভব? যে স্থানে পাইবার কথা—তথায় না পাইলে অভিমান হয়। রেণুর কাছে, তাঁহার ত পাইবার কোন কথাই নাই—তিনি তাহাকে স্নেহ দিয়াই সুখী। তিনি যদি তাহার মাতা হইতেন, তবে তাহার কাছে ভালবাসা ও ভক্তি পাইবার অধিকার তাঁহার থাকিত। তিনি তাহার মাতার অধিক হইলেও মা নহেন; সে তাঁহার কন্যার অধিক হইলেও কন্যা নহে। কাযেই তাঁহার মনে অভিমান স্থান পাইল না। তিনি শঙ্কিতা হইলেন—কেন এমন হইল?

সুধীর কিন্তু বিরক্ত হইল। রেণু তাহার একমাত্র সন্তান—তাহার সমস্ত স্নেহ দিয়া সে কন্যাকে ভালবাসিত। সেই কন্যাকে আপনি আনিতে পারিবে না বলিয়া সে বিষম ব্যথা পাইয়াছিল। তাহার পর এ কি? সে কি তাহাদিগকে এমনই পর মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে?

পিসীমা সংবাদটি পাইয়াই সুধীরের বিরক্তির অনলে ইন্ধন যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে সুধীরকে কিছু বলিতেন না বটে, কিন্তু তাহাকে শুনাইয়া নানা কথাই বলিতেন। সে বিষয়ে কুমুদা তাঁহার "উত্তর-সাধক" হইত। সে-ই পিসীমা কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া পূর্ণিমার কাছে সব শুনিয়া আসিয়াছিল। যে দিন রেণুর মাসীর বাড়ী যাইবার কথা ছিল, সেই দিন পিসীমা সুধীরকে বলিলেন, "আমি কাল বৌমা'র বোনের বাড়ী যা'ব।"

সুধীর তাঁহার কথায় বিস্মিত হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"মেয়েটা এসেছে দেখে আসব। এখানে আনলেই হ'ত। তা—" বলিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সুধীর বলিল, "সে ত যায় নি।"

পিসীমা অতিমাত্র বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন, "কেন?"

"যেতে চাইলে না।"

"ও মা! সে কি? বলে, মাসী ঐ বোনঝি-অন্ত প্রাণ! এ সময় মেয়েদের কি মা মাসীর কাছে নইলে, যত্ন হয়? যেতে চাইলে না!"

সুধীর কোন কথা বলিল না।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যেতে চাইলে না?"

সুধীর কোন উত্তর দিল না। অর্দ্ধেক খাবার অভুক্ত রাখিয়া সে উঠিয়া গেল।

তাহার পর পিসীমা কুমুদাকে উপলক্ষ করিয়া নানা কথা বলিতেন এবং সুধীর সে সব শুনিতে পাইত।

এক দিন তিনি বলিলেন, "এ কথা বল্লে কেমন ক'রে? বাঘের মত বাপ—বাপ ব'লে এল, মাসী নিতে গেল, বল্লে, যা'ব না—শাশুড়ীর যত্নই যথেষ্ট!"

আর এক দিন তিনি বলিলেন, "কি জানিস, কুমুদা—

'খাই দাই ভুলি নে
তত্ত্বকথা ছাড়ি নে।'

বাপ বল মাসী বল—কেউ কিছু নয়। আমার কথা ত ছেড়েই দে; শাশুড়ী হ'ল বড়!"

আর এক দিন তিনি কুমুদাকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, "কি ব্যাপার বল, দেখি! সতীন-পো আর সতীন-ঝি হ'ল বাপের চাইতে বড়! আমার যখন কপাল পুড়ল, তখন বাবা সে ব্যথা ভুলে কিসে আমায় ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে না হয়, সেই জন্য দাঁড়ালেন। তিনি দাঁড়ালেন বলেই ত ভাশুর যেচে এসে মিটিয়ে ফেল্‌লেন। নইলে, টাকা কেউ সহজে দেয় না। জানিস, কুমুদা, টাকা বড় জিনিষ—টাকা দিয়ে বাপ ছেলেকে বিশ্বাস করতে পারে না; শাস্ত্রে বলে—অর্থ-ই অনর্থ। কিন্তু ঐ অনর্থ না হ'লে এক দিনও চলবার উপায় নেই; কুমুদা, এক দিনও না।"

পিসীমা সুধীরের প্রকৃতি বিশেষরূপ জানিতেন। সে যাহাকে ভালবাসে, কেহ তাহার নিন্দা করিলে সে ভালবাসার পাত্রের উপরই অভিমান করে। তাহা জানিতেন বলিয়াই তিনি যখন তখন এই ভাবের কথা তুলিয়া তাহার মনে বিরক্তির বিষ ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া তিনি চেষ্টা শিথিল করিলেন না। আর এ দিকে তিনি সুধীরের "সুমতি" করিবার জন্য যেমন মা কালী হইতে বাবা বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত বহু দেবী ও দেবতার কাছে "মানত" করিতে লাগিলেন, তেমনই প্রজাপতির বাহন ঘটক-ঘটকীদিগকে পূর্ব্বেই পূজা বাবদ দুই চারি আনা দিতে লাগিলেন।

পিসীমা'র মুখে কেবলই রেণুর নিন্দা শুনিয়া সুধীর যেমন ব্যথিত হইল, রেণুর প্রতি তেমনই অভিমান করিল। পিসীমা লক্ষ্য করিলেন, সে কয় দিন যেমন প্রত্যহ রেণুকে দেখিতে যাইত, আর তেমন যাইতে বিরত হইল। তিনি ভাবিলেন, তিনি জমী প্রস্তুত করিয়াছেন, এই বার বীজ বপন করিলে ফললাভ করিবেন। তিনি আবার সেই কথা আরম্ভ করিলেন—সুধীর বিবাহ না করিলে, সংসার আর চলিবে না; তিনি আর সংসারভার বহন করিতে পারেন না; পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলেন, তাই এ জন্মে কপাল পুড়িয়াছে—আবার কি স্নেহবশে—মায়ায় জড়াইয়া মানবজন্ম ব্যর্থ করিয়া পরজন্মে দুঃখ ভোগ করিবেন? দুই দণ্ড স্থির হইয়া ভগবানের নাম করিতেও পারেন না—সংসারের এতই কায।

পিসীমা যে তাহার জন্য অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, মনে করিতেছেন, ইহা মনে করিয়া সুধীর আপনার উপর বিরক্ত হইতে লাগিল। সে স্বভাবতঃ কেন্দ্রস্থ। তাহার পর সে মনে করিয়াছে, যাঁহার নিকট সেবা-যত্ন পাইবার অধিকার তাহার ছিল, তিনি যখন অকালে চলিয়া গিয়াছেন, আর তাহার পর যে কন্যা তাহার স্নেহের অবলম্বন, সেই কন্যাও তাহাকে এমন পর ভাবিল, তখন সে সেবা-যত্ন লাভের আশা করিবে না। তবে সে কেন পিসীমা'কে কষ্ট দিবে; কেন তাঁহার এই সব কথা সহ্য করিবে? তিনি যদি সত্য সত্যই তাহাকে স্নেহ করিতেন, তবে কখনই তাহার সংসার ভার বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেন না। রোগশয্যায় পড়িয়াও কাত্যায়নী কিরূপে সংসারের সব দিকে দৃষ্টি রাখিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা কেবলই তাহার মনে পড়িত।

এ দিকে রেণু তীব্র অভিমানবশে যাহা করিল—সুধীরের ও মৃণালিনীর মনে যে ব্যথা দিল, তাহার জন্য সে যে ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল, তাহা কে বুঝিবে? কে তাহার বেদনার গভীরতা পরিমাপ করিতে পারে? সে জানিত, মৃণালিনী তাহাকে কত ভালবাসেন—পিতার স্নেহ কিরূপ, তাহাও সে জানিত; জানিয়াও সে তাঁহাদিগের উপর অভিমান করিয়াছিল—তাঁহারা বিবাহ সম্বন্ধে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু সে অভিমানে সে তাঁহাদিগকে বেদনা দেয় নাই। যে অভিমান তাহাকে সেই কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছিল, সে অভিমান কাহার উপর?

স্বামীর উপর? না—না—না! যে স্বামী বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার পুত্রকন্যার পালনজন্য তাহাকে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বিবাহ করিয়াছেন, আর কোন কারণে নহে, তাঁহার উপর সে অভিমান করিতে পারে না। কেন না, অভিমানের মূলে অধিকার থাকে; এ ক্ষেত্রে তাহা নাই।

এক বার তাহার মনে হইয়াছিল, স্বামীর উপর তাহার যদি কোন অধিকার না থাকে, তবে তাহার উপর স্বামীর অধিকার কিসে উদ্ভূত হয়? সে তখনই হিন্দু রমণীর চিরাগত সংস্কারের প্রবাহে সে প্রশ্ন ভাসাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল—সে শুনিয়া আসিয়াছে, স্বামীই নারীর সর্ব্বস্ব, তিনি দেবতার প্রতীক। তবুও মনে সন্দেহ সমুদিত হইত—তাহাই কি? তখন সে বুঝিত, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বিবাহের পর সেই বিশ্বাসকে আঁকড়িয়া না ধরিলে, সংস্কারের আশ্রয় না লইলে উপায় নাই—ধিক্কৃত জীবন আর বহন করা যায় না। নারী কি অসহায়! তাহাকে অসহায় করিয়া সৃষ্টি করাই কি স্রষ্টার উদ্দেশ্য? না—সমাজই তাহার ব্যবস্থায় তাহার এই অসহায় অবস্থার উদ্ভব করিয়াছে? কে সে সন্দেহের অবসান করাইতে পারে? সে সামাজের ব্যবস্থাই মানিয়া লইয়াছিল। স্বামী তাহাকে যাহা বলিয়াছেন, সে তাহাই করিবে। সে সমাজের শাসনানুসারে নারীত্ব মানিয়া লইবে। হয়ত তাহা কেবল জীবনব্যাপী ধিক্কারের দংশন হইতে আপনি অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য। যদি তাহাই হয়, তবুও সে মন্দের ভাল; কেন না, বক্ষে অহরহঃ বৃশ্চিকদংশনযাতনা লইয়া মানুষ তাহার জীবন সহ্য করিতে পারে না।

কাযেই রেণুর যে অভিমান, সে স্বামীর উপরও নহে—তাহা নারীজন্মের উপর, আর সে অভিমান তাহার আপনার অদৃষ্টের উপর।

সেই অভিমান লইয়া সে মনকে দৃঢ় করিল—অদৃষ্ট তাহার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছে, সে তাহাই গ্রহণ করিবে—যদি স্নেহ, ভক্তি কিম্বা আর কোন বিবেচনা প্রতিকূল হয়, সে অবাধে সে সকলকে উপেক্ষা করিয়া যাইবে।

১৩

পিসীমা যখন দেখিলেন, সুধীর কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইতেছে না, তখন কুমুদার পরামর্শমত তিনি এক দিন পাশার শেষ দানের মত বলিলেন, "সুধীর, আমি একটি ভাল মেয়ের সন্ধান পেয়েছি; কাল আমি মেয়ে দেখব। তা'র পর—"

সুধীর তাঁহার কথা শেষ করিতে দিল না; বলিল, "আমি যখন বিয়ে করব না, তখন মেয়ে দেখা কেবল একটা কেলেঙ্কারী হ'বে।"

"আমি যে একরকম কথা দিয়েছি!"

"কথা দেবার কোন কারণই ত আমি দিই নি।"

"সংসার কি ভেসে যা'বে?"

"যদি ভেসেই যায়, তবে কি তা'কে ধরে রাখা যা'বে?"

"তা' কেন যা'বে না?"

"সংসার করবে বলেই ত রেণুর মা'কে এনেছিলে—সংসার করবার সাধও তা'র কম ছিল না। কিন্তু কি হ'ল?"

"তা'ই ব'লে কি তুই সন্ন্যাসী হ'বি?"

সুধীর বলিল, "এই দশব্যঞ্জন ভাত যদি সন্ন্যাসের লক্ষণ হয়, তবে সন্ন্যাসী হ'তে আপত্তি কি? অবশ্য আমি আজকালকার 'বাবা' সন্ন্যাসীদের কথা বলছি না; তাঁ'দের সন্ন্যাস ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্য।"

"সে আমি শুনব না।"

"তুমি আমার আর যে কথাই কেন শুনতে অস্বীকার কর না, এ কথাটা তোমায় শুনতেই হ'বে।"

যে ঘোড়ার "জমা" দোষ থাকে, তাহাকে চাবুক মারিয়া তাহার "জমা" কাটান যায় না—তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়—ভাল চালক তাহা জানে। তেমনই পিসীমা বুঝিলেন, ইহার পর আর এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া সুবিধা হইবে না। তিনি মনে মনে বলিলেন, "এই বুড়ী বাসুকির মত সংসার মাথায় ক'রে আছে বলেই কিছু বুঝতে পারছ না। যদি এক বার মাথা নাড়ি, তবেই বুঝবে, কত ধানে কত চা'ল। ভালমানুষের কাল নাই। আচ্ছা।"

যে কথা, সেই কায। সপ্তাহ কাটিবার পূর্ব্বেই এক দিন পিসীমা বলিলেন, "সুধীর, সারা জীবন ত সংসারের পাঁক ঘেঁটেই কাটালুম; এখন এক বার তীর্থে যা'ব। বৌমা'র—নীরুর মা'র বাপের বাড়ীর ক'জন যাচ্ছেন; এমন সুবিধা ত্যাগ করব না। আমার ত লোকবল নাই! তুই অমত করিস না।"

পিসীমা'র প্রস্তাবের স্বরূপ বুঝিতে সুধীরের বিলম্ব হইল না। সে বলিল, "আমি এতে অমত করব কেন, পিসীমা? তোমার তীর্থদর্শনের ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া আমারই কর্ত্তব্য; সে কর্ত্তব্যের বোঝা

যদি আর কেউ নেয়, সে ত ভালই। আমার কি করতে হ'বে ব'লে দিও।"

পিসীমা মনে করিয়াছিলেন, সুধীর হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে, সংসারের কি ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন। যখন তাহা হইল না, তখন তিনি মনে করিলেন, পেঁচটা আর একটু কসিয়া দিবেন। তিনি বলিলেন, "যা'বার কথা হ'তে না হ'তে কুমুদা ত আমার পায় মাথা খুঁড়ছে; বলে, 'পিসীমা তোমার পায়ে পড়ে আছি, আমায় ফেলে যেও না—এজন্মে ত এই হ'ল, পরকালের কায করি।' কষ্ট ক'রে টাকা জমিয়েছিল—কাযেই তা'রও অভাব হ'বে না।"

"সে ত ভালই হ'বে। সে সঙ্গে থাকলে তোমার কষ্ট হ'বে না। তা'র খরচ আর তা'কে করতে হ'বে না; আমিই দেব।"

পিসীমা'র কাছে সেই কথা শুনিয়া কুমুদা বলিল, "দাদা বাবুর দয়ার শরীর; ভগবান্ তাঁ'র ভালই করবেন।"

পিসীমা বলিলেন, "হাঁ ভালই হ'বে। তুইও গেলে—তখন বুঝবে, সংসার কেমন ক'রে চলে।"

"সেই শিক্ষা হ'লেই তখন বিয়েতে মত করতে হ'বে।"

"দেখি।"

"দেখবে, তা'-ই হ'বে। কথায় বলে, 'সোজা আঙ্গুলে ঘী উঠে না।' চল, আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

"সে ত যা'বই। তুই যা, বৌমাকে ব'লে আসবি—আমাদের যাওয়া ঠিক, তিনি বাপের বাড়ীতে খবর দেন; আর—"—পিসীমা কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু করিয়া বলিলেন, "আর দেখে আসবি, ব্যাপারখানা কি; মাসী কেন হার মান্‌লে।"

"আমি হাতের কাযটা চট ক'রে সেরে নিয়েই যাচ্ছি"—বলিয়া কুমুদা হৃষ্টচিত্তে কায সারিতে গেল।

পিসীমা মালার থলিটা কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, ফিরে এসে যেন দেখি, সুধীরের আমার সুমতি হয়েছে।"

কয় দিন পরেই পিসীমা পূর্ণিমার পিত্রালয়ের যাত্রীদিগের সঙ্গে তীর্থযাত্রা করিলেন। দলবদ্ধ হইয়া তীর্থযাত্রায় এখনও বাঙ্গালার সেকালের প্রথার অবশেষ আছে। সে কালে—পথ দুর্গম ছিল, জলপথে বা স্থলপথে দূরস্থানে যাইবার সময় লোক দলবদ্ধ হইয়া যাইত। এ কালেও কেহ তীর্থযাত্রা করিবেন, সংবাদ পাইলে পাঁচ জন সঙ্গী জুটিয়া যায়। পিসীমা যে দলে গমন করিলেন, সে দলেও লোকের সংখ্যা অল্প ছিল না; বিধবার সংখ্যাই অধিক। সুধীর প্রস্তাব করিয়াছিল, পিসীমা'র জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু ভাল দেখাইবেন না বলিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিল। সে পিসীমা'র ও কুমুদার আবশ্যক ব্যয়ের জন্য আবশ্যকাতিরিক্ত টাকা দিয়া দিয়াছিল এবং আপনি ষ্টেশনে যাইয়া পিসীমা'কে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিল।

পিসীমা চলিয়া যাইবার পর সংসারের বিশৃঙ্খলা অনুভব করিতে সুধীরের বিলম্ব হইল না। চাকর-পাচক কোম্পানী শীঘ্রই শোষণ-নীতি পরিচালিত করিয়া লাভবান্ হইবার উপায় স্থির করিয়া লইল এবং তাহাদিগের ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে পূর্ণ ভাণ্ডার দ্রুত শূন্য হইয়া সুধীরের ধনভাণ্ডার শূন্য করিবার সহজ পথ আবিষ্কার করিল।

পিসীমা ইচ্ছা করিয়া যে তাহাকে এই অসুবিধা ভোগ করাইতেছেন, তাহা সুধীর জানিত। সে বিবেচনা করিয়া দেখিল, সে দুই উপায়ে এই অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে—প্রথম বিবাহ করিয়া, দ্বিতীয় সংসার সঙ্কুচিত করিয়া। দিনের পর দিন সে পথের কথা ভাবিতে লাগিল।

সে বিবাহ করিতে পারে। যে সমাজে কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতার ধর্ম্ম, সে সমাজে তাহার বিবাহের পথ অনর্গলই আছে। কিন্তু বিবাহ করিলে সে কি তাহার ধর্ম্ম পালন করিতে পারিবে? যে স্থানে স্ত্রীকে ভালবাসা দেওয়া যায় না, সে স্থানে বিবাহ কি? কোন কোন লোক ভালবাসার প্রাচুর্য্য পোষণ করে—পাত্র পাইলেই ভালবাসা দিতে পারে; আর কাহারও কাহারও ভালবাসা পাত্রকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়—তাহা পাত্রান্তরে যাইতে পারে না। তাহার ভালবাসা কাত্যায়নীকে অবলম্বন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। দীর্ঘকাল রোগভোগ যখন কাত্যায়নীর দেহ হইতে রূপ হরণ করিয়া লইয়াছিল, তাহার মুখে যৌবন-লাবণ্যের স্থানে পাণ্ডুতা ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে শয্যাশায়ী করিয়া রাখিয়াছিল, তখনও—সেই দীর্ঘ-কালের মধ্যেও—সে ভালবাসা কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। তাহার পর সে ভালবাসা এখনও তাহার স্মৃতিকে জড়াইয়াই আছে। তাহা অন্যাশ্রয়ী হইতে পারে না। প্রথম-ফাল্গুনে যেমন এক দিনে বসন্তের আগমনে প্রকৃতি নূতন শোভায় পূর্ণ হয়, তেমনই তাহার গৃহে ও তাহার জীবনে কাত্যায়নীর আগমন নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। আজ কাত্যায়নী নাই—নারী-জীবনের আশার মুকুল দেখা দিতে না

দিতেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছিল—দীর্ঘকাল সেই বিনষ্ট আশার বেদনা সহ্য করিয়া কাত্যায়নীর সব বেদনার অবসান হইয়াছে। সেই সঙ্গে সুধীরের জীবনের যে অঙ্কের অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ত আর ফিরাইয়া আনা যাইবে না—সে অঙ্কে আর ত যবনিকা উঠিবে না! তবে? তবে—তাহা জানিয়াও সে যদি আবার বিবাহ করে, তাহা কি এক যুবতীর প্রতি ও তাহার আপনার প্রতি অবিচার করাই হইবে না? তাহা কি অধর্ম্ম হইবে না? সে তাহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া—ব্যর্থ নারীজন্মে কি কেবল তিক্ততাই পাইবে না? কোন্ অধিকারে সে তাহার সম্বন্ধে এমন অবিচার করিবে? সংসারে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যাঁহাকে আনিতে হয়, তিনি যদি গৃহে লক্ষ্মী হইবেন, আশা করা হয়—তবে তাঁহাকে গৃহের মত হৃদয়েও পূর্ণ অধিকার প্রদান করিতে হয়। হৃদয়ে অধিকার পাইলে নারী গৃহে অধিকার অধিগত করেন। নহিলে গৃহের অধিকারে তাঁহার কোন আকর্ষণ থাকে না—কেন না, সংসারে তাঁহার মমত্ববোধ জন্মে না। সংসারে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বিবাহ কি স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনই হইবে না? সংসারে শান্তির পরিবর্ত্তে যে অশান্তিই প্রতিষ্ঠিত হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? পিসীমা'র অধিকার-প্রিয়তার সহিত সঙ্ঘর্ষ ঘটিলে প্রস্তরের সহিত লৌহের সঙ্ঘর্ষে যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উদ্ভূত হইবে, তাহাতে সংসারের শান্তি ভস্মীভূত হইতেও পারে।

যে কাত্যায়নী তাহার জীবনে কল্যাণরূপিণী ছিল, সে নাই—যে তাহার স্থান লইবে বলিয়া আসিবে, সে যে তাহারই মত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যদি না হয়? আর সে তাহাকে তাহার আগ্রহপূর্ণ ভালবাসা দিতে না পারিয়া, তাহার কাছে কুণ্ঠিত—অপরাধী হইয়াই থাকিবে। সেই নারীর হতাশাসঞ্জাত বিরক্তিপ্রবণতায় সে কোন্ অধিকারে বাধা দিবে?

সুধীরের মনে হইল, তাহার আবার বিবাহের যে একটা হাস্যোদ্দীপক দিক্ থাকিবে, তাহাও অসাধারণ। সে এক দিন সন্ধ্যায় চোরেরই মত আপনার গৃহে আসিবে—সঙ্গে নববধূ। বিবাহের উৎসব থাকিবে না—সবই যেন গোপন রাখিতে হইবে। যে শুনিবে সে-ই বিস্মিত হইবে, কেহ কেহ হাসিবে।

তাহার পর সেই বধূ আসিয়া কি করিবে? যে কক্ষে কাত্যায়নী ফুলশয্যার দিন হইতে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তাহার স্মৃতির অনপনেয় প্রলেপ দিয়া গিয়াছে, সেই কক্ষে—ভাবিতে ভাবিতে সুধীরের মনে হইতে লাগিল,—অসম্ভব!—অসম্ভব! সে কি তাহার হৃদয় হইতে অতীত জীবনের স্মৃতির প্রলেপ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে? তাহার মনের মধ্য হইতে উত্তর উঠিল—না—না। সে তাহা পারিবে না।

যে কক্ষ রেণুর অধিকৃত ছিল, সে কক্ষ সুধীর তাহারই জন্য পূর্ব্ববৎ রাখিয়াছে। সে কক্ষের সঙ্গে তাহার মাতৃহীনা কন্যার শৈশবাবধি কত স্মৃতি বিজড়িত! নববধূ আসিয়া হয়ত সে কক্ষও অধিকার করিবে—রেণু যেমন ভাবে তাহা সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, আর তেমনভাবে সাজাইয়া রাখিবে না। যে দিন সে কাত্যায়নী নাই বলিয়া রেণুকে আপনার গৃহে আনিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া মৃণালিনীর গৃহে তাহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিল, সে দিনও সে সেই কক্ষে যাইয়া দীর্ঘশ্বাসে তাহার অভাবের অনুভূতি-যাতনা ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহার গৃহ যে তাহার নিকট গৃহমাত্র নহে—সে যে মন্দির; তাহার আশার শ্মশানে তাহা যে চিতাক্ষেত্রের উপর রচিত মঠেরই মত দণ্ডায়মান!

এক দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইতে পারিল না। বিনিদ্র অবস্থায় শয্যায় অবস্থান করা যেন কণ্টক-শয়নে অবস্থান বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে শয্যা ত্যাগ করিয়া—আলো জ্বালিয়া বসিল। তাহার পর কোন অজ্ঞাত কিন্তু অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ যেন তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে লইয়া গেল। কাত্যায়নীর মৃত্যুর পর সে কখন রাত্রিকালে সে কক্ষে প্রবেশ করে নাই। ভৃত্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে সে কক্ষের দ্বার ও বাতায়ন মুক্ত ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে বন্ধ করিত। ভৃত্যের প্রতি তাহার আদেশ ছিল—সে কক্ষের দ্রব্যগুলি ঝাড়িবে—মুছিবে, আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিবে। কাত্যায়নী শয্যা লইলে তাহার কাপড়ের আলমারীর দ্বারে চাবি লাগানই থাকিত—তাহার নির্দ্দেশানুসারে তাহাতে বস্ত্রাদি তুলা হইত, তাহা হইতে বস্ত্রাদি বাহির করা হইত। সুধীর চাবি বন্ধ করে নাই—তাহা যেমন ছিল, তেমনই রাখিয়াছিল। শয্যাও তেমনই ছিল—মধ্যে মধ্যে চাদর ও বালিশের ওয়াড় বদলাইয়া রাখা হইত। কেবল কক্ষটি সর্ব্বদাই পরিচ্ছন্ন রাখা হইত। সুধীর সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার বুকের মধ্যে অভাবের অনুভূতি প্রবল হইয়া উঠিল—আজ আর কেহ তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া নাই—

তাহার পদশব্দে কেহ সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিবে না। আলো জ্বালিয়া সে চারিদিকে চাহিল। তাহার পর তাহার অভ্যস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। এমন সময়—এমন ভাবে সে কখন কাত্যায়নীর মৃত্যুর পর সে কক্ষে প্রবেশ করে নাই। যে শয্যা এত দিন তাহার স্পর্শ পায় নাই, আজ সে সেই শয্যায় পড়িয়া—কাত্যায়নীর ব্যবহৃত বালিসে মুখ গুঁজিয়া অধীর-ভাবে কান্দিতে লাগিল। আজ প্রথম সে আপনার দারুণ শোকে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সেই অশ্রু যেন নিদাঘদিনান্তের বর্ষণের মত তাহার তাপতপ্ত হৃদয়ের দুঃসহ দুঃখজ্বালা প্রশমিত করিল।

সে শয্যা ত্যাগ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না—যেন তাহাতে কাত্যায়নীর আলিঙ্গন জড়াইয়া ছিল।

সে ভাবিতে লাগিল।

প্রভাতের আলোক আকাশকে রঞ্জিত করিতে আরম্ভ করিলে সে যখন শয্যাত্যাগ করিল, তখন সে শান্ত হইয়াছে—আপনার কর্ত্তব্যও স্থির করিতে পারিয়াছে। সেই শয্যা হইতে কাত্যায়নীর ধৈর্য্য ও ভাব যেন তাহার মনে সংক্রমিত হইয়াছিল। তাই সংসারের সহিতও তাহার আর বিরোধ ছিল না। পিসীমা'র উপরও তাহার আর বিরক্তি ছিল না; তিনি যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহাই তাহাকে করিতে বলিয়াছেন। বিশেষ, তাহার জন্য তাঁহাকে পরের সংসারে বদ্ধ রাখিবার অধিকার সত্য সত্যই কাহারও নাই।

সংসার যাহার ছিল—সে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে; এখন সুধীরের যদি কাহারও প্রতি অপ্রসন্ন হইবার থাকে, তবে সে তাহার অদৃষ্টের প্রতি। তাহাকে নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বহন করিয়াই পথ অতিক্রম করিতে হইবে। পথ যদি দীর্ঘ হয়—তাহাকে স্বল্প করিবার উপায় কি? ভার যদি দুর্ব্বহ হয়, তবুও তাহাকে তাহা বহন করিতেই হইবে। আর কাহারও কাছে কোনরূপ সাহায্য পাইবার অধিকার বা আশা তাহার নাই।

এই ধারণার মধ্যে যে বেদনা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাকে গ্রহণ করিতে পারিলে ইহাই সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রদান করে।

সুধীর উঠিয়া তাহার দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

পিসীমা'র গমন-সংবাদ মৃণালিনী পূর্ব্বে পায়েন নাই। যে রাত্রিতে সুধীর নূতন সঙ্কল্পে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারই পূর্ব্বের সন্ধ্যায় রেণুকে দেখিতে যাইয়া তিনি সে সংবাদ পাইয়াছিলেন। পাইয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর যে স্নেহ থাকে, সুধীরের প্রতি তাঁহার সেই স্নেহ ছিল; তাহার ব্যবহারে সে স্নেহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পিসীমা তাহার সংসারের কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, জানিতে না পারিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাই পরদিন সকালেই তাহাকে সংবাদ দিলেন, সে যেন আদালতে যাইবার বা আদালত হইতে ফিরিবার পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে।

সুধীরের নিকট মৃণালিনী যখন শুনিলেন, পিসীমা কোন ব্যবস্থা করিয়া যায়েন নাই, তখন তিনি বিস্মিতা ও চিন্তিতা হইলেন; বলিলেন, "তা হ'লে কি হ'বে?"

সুধীর একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "সে জন্য ভাবছেন কেন? পিসীমা মনে করেছেন, আমি জব্দ হ'ব। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন, মানুষের জব্দ হ'বার একটা সীমা আছে—তা'র বেশী জব্দ তা'কে কেউ করতে পারে না। তাঁ'র অদৃষ্ট নারী-জীবনের সর্ব্বস্ব থেকে বঞ্চিত ক'রে তাঁ'কে যে জব্দ করেছে, তা'র চেয়ে বেশী জব্দ তাঁ'কে আর কেউ করতে পারে না; তেমনই আমারও জব্দ হবার সীমায় আমি পৌঁছে গেছি—এখন তিনি আর আমাকে জব্দ করতে পারেন না—সমুদ্রে যা'র শয়ন, শিশিরে তা'র কিছু হয় না; যে সাপের বিষে জ্বলে, পিপড়ের কামড়ে তা'কে জব্দ করতে পারে না।"

সুধীরের কথায় মৃণালিনীর বুকের মধ্যে বেদনা উথলিয়া উঠিল। তিনি তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা—তাহাকে সান্ত্বনার কথা বলা ধৃষ্টতা মনে করিয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন।

সুধীর তাহার পর বলিল, "পিসীমা মনে করে-ছেন, আমি তাঁ'র কথা সুবোধ বালকের মত শুনি নি, এ বার জব্দ হয়ে বিয়ে করতে সম্মত হ'ব।"

পিসীমা যে তাহাকে বিবাহ করিতে বলিতেছেন, তাহা মৃণালিনী শুনিয়াছিলেন; কিন্তু সুধীর কোন দিন সে কথা তাঁহার কাছে উত্থাপিত করে নাই, তাই আজ এ কথায় তাঁহার একটু সন্দেহ হইল, সুধীর কি তাঁহার মত জানিবার জন্য কথাটা উত্থা-পিত করিল? মত জানিবার চেষ্টা যে ইচ্ছা ব্যতীত সম্ভব হয় না, তাহা তিনি বুঝিতেন। ভগিনীর কথা মনে করিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে বেদনার জ্বালা বিদ্যুতের মত চমকিয়া গেল। কিন্তু তিনি আপনার উচ্ছ্বসিত রোদনোচ্ছ্বাস সংযত করিয়া বলিলেন, "সংসার যদি অচলই হয়; তবে—"

তাঁহাকে উক্তি শেষ করিতে না দিয়া সুধীর বলিল, "আপনিও তাই বলছেন; এর পর, বোধ হয়, রেণুও তাই বলবে।" বলিয়াই সে হাসিল। সে হাসি মৃদু ও ম্লান হাসি নহে—তাহা যেন অশ্রুকে গোপন করিবার জন্য উচ্চ হাসি, আপনার অদৃষ্টকে বিদ্রূপ করিয়া অট্টহাসি।

১৪

পিসীমা যে দলে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, সে দলের যাত্রীরা অনেক বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের যাত্রার "প্রোগ্রাম" রচনা করিয়াছিলেন। যখন-তখন যাওয়া ঘটে না—অথচ তীর্থস্থান অনেকগুলি; কাযেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতগুলি তীর্থ দর্শন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করা যায়, তাহা করিতেই হইবে। তাঁহারা প্রথমে গিয়াছিলেন দ্বারকায়। কৃষ্ণলীলা, চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়—চারি লীলা চারি স্থানে; ভক্তির পঞ্চরসের শেষ রসদ্বয় বৃন্দাবন-লীলায় প্রকট—বাৎসল্য ও মাধুর্য্য; তাহার পর মথুরায় ঐশ্বর্য্যলীলা; কুরুক্ষেত্রে চক্রিলীলা; শেষ লীলা দ্বারকায়। দ্বারকায় কৃষ্ণ "রণছোড়জী"—যিনি মথুরায় কংসধ্বংসকারী, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি চক্রধর—চক্রী, তিনিই যুদ্ধত্যাগ করিয়া দ্বারকায় সিন্ধুকূলে শেষ আশ্রয় লইয়াছিলেন। দূরত্বহেতু দ্বারকা দর্শন করিয়া যাত্রীরা বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। তাহার পর প্রভাস দেখিয়া তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন-পথে আজমীরে আসিয়াছিলেন—পুষ্কর সাবিত্রী দেখিবেন। পুষ্কর হ্রদ, সাবিত্রী পর্ব্বত; হ্রদের সান্নিধ্যে পর্ব্বতের এবং পর্ব্বতের সান্নিধ্যে হ্রদের শোভা বিবর্দ্ধিতই হইয়াছে। পর্ব্বতের উপর সাবিত্রী দেবীর মন্দির। তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁহাকে বৈধব্যভোগ করিতে হয় না। যাত্রীর দলে বিধবার সংখ্যা অধিক, তাই জন্মান্তরে বৈধব্যমুক্তির আশায় সকলেই সাবিত্রী পাহাড়ে উঠিলেন। শ্রান্ত হইয়া সকলে যখন নামিয়া আসিলেন, তখন পুষ্কর হ্রদের কূলে—সোপানশ্রেণীর উপর চাতালে বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া সকলে শ্রান্তি দূর করিলেন। তাহার পর পুষ্করকৃত্য শেষ করিয়া সকলে আজমীরে ফিরিয়া আসিলেন।

আজমীরে ফিরিয়া দলের এক জন যুবক পত্রের সন্ধানে ডাকঘরে গেল এবং কয়খানি পত্র লইয়া ফিরিয়া আসিল। পত্রগুলির একখানি পিসীমা'র।

তাঁহার পত্র আসিয়াছে জানিয়া পিসী'মা ডাকিলেন, "কুমুদা!" কুমুদা একাধারে তাঁহার মন্ত্রী, পরিচারিকা, দেহরক্ষী ইত্যাদি; কেবল টাকার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। পিসীমা নোটের তাড়া গেঁজেয় পুরিয়া কোমরে জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখেন। কুমুদা আসিলে তিনি বলিলেন, "ব্যাগটা আন—চশমাখানা নেব। দেখিস উঠবার সময় যেন আমার মালার থলিটা মাথায় ঠেকে না!" তিনি যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই হইল; ব্যাগটা লইয়া কুমুদা ফিরিলেই দেওয়ালে পেরেকে ঝুলান থলিটা তাহার মাথায় ঠেকিল। পিসীমা বলিলেন, "মা গো! যা' বারণ করব, তা'ই আগে করবে। ছোট লোক—বিচার আসবে কোথা থেকে? মনে বিচার না থাকলে তা' কি শিখান যায়!"

কুমুদা এইরূপ তিরস্কারে অভ্যস্তা ছিল; উত্তর করিল না—ব্যাগটি আনিয়া দিল। পিসীমাও পত্র পড়িবার জন্য ব্যাকুলতায় আর তিরস্কার করিবার অবসর পাইলেন না। ব্যাগ হইতে চশমা বাহির করিয়া পিসীমা তাহা পরিলেন এবং খাম খুলিয়া পত্র পড়িতে লাগিলেন। তিনি যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে লাগিলেন। পত্রে লিখিত বিষয় তিনি যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। বুঝি তাঁহার হাতও একটু কাঁপিতেছিল। তিনি যখন দ্বিতীয় বার পত্রখানি পাঠ করিতেছিলেন, তখন আর সকলে যে যাহার সংক্ষিপ্ত পত্র পাঠ শেষ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া এক জন বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর ভাল ত?"

পিসীমা আপনাকে সামলাইয়া লইলেন; বলিলেন, "সব ভাল। মা-মরা মেয়ে, কোলে ক'রে 'মানুষ' করেছি—প্রথম ছেলেপুলে হ'বে, তা'র খবর না পেলে অস্থির হয়ে উঠি। মায়া! মায়া! ওতেই ত মানুষের যত কষ্ট! দেখ না—মৃগশিশুর উপর মায়ায় ভরতমুনির তপস্যা নষ্ট হয়েছিল।"

যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি ভরত ও তাঁহার মৃগশিশুর বিষয় অবগত ছিলেন না; কিন্তু অজ্ঞতা স্বীকার করিতে অসম্মত ছিলেন। তাই তিনি বলিলেন, "সে আর বলতে।"

পত্রে সুধীর লিখিয়াছিল—

পিসীমা,

আপনি যাইবার পর হইতে আমি কয় দিন ভাবিয়া স্থির করিয়াছি, আমার স্নেহের অত্যাচার সত্য সত্যই মাত্রা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আমার জন্য আপনি যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন,

তাহার পর আপনাকে আর ত্যাগ স্বীকার করিতে বলা অন্যায় হইবে। আপনি অনেক সময় বলিয়াছেন, সংসারের পঙ্কে থাকিয়া আপনি পরকালের কায করিতে পারিতেছেন না। যাহাতে আপনি পরকালের কায করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য।

সেই সব বিবেচনা করিয়া আমি স্থির করিয়াছি, আমার জন্য আপনাকে আর সংসারে বদ্ধ রাখিব না। আপনি কোন তীর্থস্থানে জীবনের শেষ কয় বৎসর যাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই জন্য এই পত্রে লিখিতেছি, আপনি কাশী বা বৃন্দাবন বা অন্য যে কোন তীর্থক্ষেত্রে বাসের ইচ্ছা করেন, তথায় বাসের ব্যবস্থা করিবেন—অথবা আমাকে লিখিলে আমি যাইয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিব।

আপনার যাহা অভিপ্রায় হয়, আমাকে জানাইবেন।

আশা করি, এ পর্য্যন্ত দ্বারকাদি তীর্থদর্শন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে এবং আপনি ভাল আছেন।

এখানে সব কুশল।—ইতি

প্রণত

সুধীর।

বিলাতে বিখ্যাত রঙ্গপত্রে একখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। চাণক্যাবতার বিসমার্ক জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য রচনা করিয়া স্বয়ং মন্ত্রী হইয়াছিলেন। সম্রাট্ প্রথম উইলিয়মের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার পৌত্র দ্বিতীয় উইলিয়ম কৈশর হয়েন, তখন তিনি বিসমার্কের সহিত যে ব্যবহার করেন, তাহাতে মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। চিত্রে ছিল—জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য-জাহাজ উত্তুঙ্গতরঙ্গসঙ্কুল সাগর পার হইয়া বন্দরে উপনীত হইতেছে। যিনি পথ দেখাইয়া জাহাজ পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে; তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছেন—তাঁহার হাত যেন কম্পিত হইতেছে। জাহাজের উপর দাঁড়াইয়া তরুণ-বয়স্ক সম্রাট্ আনন্দে হাসিতেছেন। বিসমার্কের যে অবস্থা চিত্রে চিত্রিত হইয়াছিল, সুধীরের পত্র পাইয়া পিসীমা'র সেই অবস্থা হইল। তাই পত্রপাঠকালে তাঁহার হস্ত কম্পিত হইয়াছিল।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সুধীর যে তাঁহাকে লিখিতে পারে, তাঁহাকে আর তাহার প্রয়োজন নাই—ইহা পিসীমা'র কল্পনাতীতই ছিল। তিনি কেবল ভাবিতে লাগিলেন—কি কারণে—কি সাহসে সুধীর এই পত্র লিখিল? সে যদি বিবাহ করিত এবং স্ত্রীর সহিত তাঁহার সদ্ভাবের অভাব-সম্ভাবনা মনে করিত, তবে হয়ত ইহা সম্ভব হইত। কিন্তু সে বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ ছিল। কারণ, কাত্যায়নী যত দিন জীবিতা ছিলেন, তত দিন কোন কারণে তাঁহার প্রভুত্ব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

তবে? তবে কি মৃণালিনীই তাহাকে পরামর্শ দিয়াছেন? তাহারই বা কি কারণ হইতে পারে? এক যদি হা-ভাতের ঘরে রেণুর বিবাহ হইত, তবে না হয় মৃণালিনী পরামর্শ দিতে পারিতেন—মেয়ে-জামাই বাড়ীতে আনিয়া রাখা হউক। কিন্তু তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে সে কারণের উদ্ভব হইতে পারে না। রেণুর সহিত যাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার অভাব নাই; বিশেষ সে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে এমন "নেটিপেটি" হইয়াছে যে, প্রসবের জন্যও পিতৃগৃহে আসিতে সম্মত হয় নাই। পিসীমা অবশ্য তাহার সেই ব্যবহার একালের মেয়েদের বেহায়াপনাই মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন আর সে কথা তাঁহার মনে হইল না।

তবে কেন এমন হইল?

পিসীমা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার আরও অসুবিধা হইল, তিনি কাহারও সহিত এ বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিলেন না। কুমুদার সঙ্গেও না। কারণ, বিদেশে তীর্থের সঙ্গীদিগের মধ্যে তিনি কুমুদার সঙ্গেও কোন গোপনীয় কথা বলিতে পারিতেন না; অথচ বলিবার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা কেবলই বৃদ্ধি পাইতেছিল—ছোট ষ্টীমারের বয়লার যেমন উষ্ণ বাষ্পে পূর্ণ হইয়া থাকে, তাঁহার মন তেমনই সেই ব্যাকুলতায় পূর্ণ হইয়া রহিল—তাহা হ্রাস করিবার কোন উপায় তিনি করিতে পারিলেন না।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আর এক ভাবনা হইল—বৃন্দাবনে বা কাশীতে তিনি যে বাসের ব্যবস্থা করিবেন, সঙ্গীরা তাহাতে কি বলিবেন—কি ভাবিবেন? সেই কথা মনে করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর দেবতার স্থানে এলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, ঠাকুরের চরণেই পড়ে থাকি।"

তাঁহার কথা শুনিয়া এক দিন এক বৃদ্ধা বলিলেন, "তা' ত বটেই, দিদি! কিন্তু এমন কপাল কি ক'রে এসেছি যে, সংসারের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে আসব?"

পিসীমা বলিলেন, "সেই ত' কথা। কিন্তু ঐ যে বলে—

'কুল কুল ক'রে রইলে কূলে;
কূলে কি গোবিন্দ মেলে?'

বাঁধন ছিঁড়তে না পারলে ত মুক্তি হয় না। এই ত আমার কথা, ভগবান্ ত সব বাঁধনই ছিঁড়ে দিয়েছিলেন; তবু ঐ ভাইপোর স্নেহের বাঁধন আপনি প'রে আজও ভুগছি।"

"সে আর কি করবে, বল?"

"আমি মনে করছি, কাশীতে বা বৃন্দাবনে থাকবার ব্যবস্থা করি। সুধীরকে লিখে দেব—আর যেন আমায় বেঁধে রাখে না।"

"তা' কি পারবে?"

"যখন ইচ্ছা হ'বে, গিয়ে তা'কে দেখে আসব। বাছা আমার সন্ন্যাসী হয়ে রইল। আমি ত কত চেষ্টাই করেছি, বিয়ে দেব—বৌমা এসে সংসারের ভার নেবে—আমার নিষ্কৃতি।"

"বড় ভাল ছেলে।"

"এ বার মনে করছি, সত্যিই আর ফিরব না।"

কুমুদা চক্ষু দুইটা কপালে তুলিবার মত করিয়া চাহিয়া বলিল, "নেও কথা! তা' কি কখন হয়? এই যে এত দিন এসেছ, এর মধ্যে দাদাবাবুর কত অসুবিধা হচ্ছে, তা' কি মনে ভেবেছ?"

পিসীমা বলিলেন, "ঐ ভাবনা ভেবেই ত এত দিন বেরুতে পারিনি। কিন্তু এখনও কি ঐ ভাবনাই ভাবব?"

"তা' ভাববে না? বলে, মা'র বাড়া ক'রে 'মানুষ' করেছ!"

"না। আর নয়।"

কুমুদা পিসীমা'র কথায় অতিমাত্র বিস্মিতা হইল। যিনি হাঁড়ি, বেড়ি প্রভৃতি লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত, তিনি সহসা সংসারে এমন অনাসক্ত হইলেন কিরূপে? ইহা কি তীর্থের ফল?

বৃন্দাবনে আসিবার পর পিসীমা'র কুমুদার কাছে আসল কথা বলিবার অবসর হইল। বৃন্দাবনে আসিবার পরদিন যখন সঙ্গীরা পূর্ব্বদিনেরই মত গোবিন্দজী প্রভৃতির মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখিতে গমন করিলেন, তখন পিসীমা বলিলেন, "আমার শরীরটা ভাল নাই; তোমরা দর্শন ক'রে এস, আমি কুঞ্জে থাকি।"

কুমুদা জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যা'ব?"

পিসীমা বলিলেন, "কাল ত দেখেছিস; আজ তুই থাক একটু সরষের তেল গরম ক'রে, পায়ের তলাটা মালিস ক'রে দে।"

"পায় ব্যথা হয়েছে?"

পিসীমা কিছু বলিলেন না; কুমুদা মৌনই সম্মতি লক্ষণ মনে করিল।

সঙ্গীরা চলিয়া যাইলে পিসীমা বলিলেন, "তেল গরম করতে হ'বে না! এখানে ব'সে শোন।"

কুমুদার বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল।

পিসীমা বলিলেন, "জানিস, কুমুদা, যা'র পেটের ছেলে নাই, তা'র কেউ নাই।"

কুমুদা বলিল, "সে আর বলতে? এই দেখ না, আমার যে ছেলেটা আঁতুড়ে পেঁচোয় পেয়ে মরেছিল, সে থাকলে আজ সমত্ত ছেলে হ'ত। তা' হ'লে আমার কি আর ভাবনা থাকত?"—কুমুদা চক্ষুতে জল আনিবার ব্যর্থ চেষ্টায় মুখখানাকে সঙ্কুচিত করিয়া বিকৃত করিল।

পিসীমা বলিলেন, "এই দেখ না, সুধীরকে ত পেটের ছেলের বেশী ক'রে 'মানুষ' করেছি, তা'র ব্যবহার—"

"কি ব্যবহার? দাদাবাবু ত তেমন ছেলে নয়!"

"ওরে বলে—

'যার হাতে খাইনি, সে-ই বড় রাঁধুনী,
যা'র সঙ্গে ঘর করিনি, সে-ই বড় ঘরণী।'

এখন ডানা হয়েছে, পিসীমা'কে আর দরকার নাই।"

"বল কি, পিসীমা?"

"হাঁ রে হাঁ। আমায় চিঠি লিখেছে, যে তীর্থস্থান তোমার ভাল লাগে, সেখানে বাস কর; আর আসবার দরকার নাই।"

"সত্যি?"

"সত্যি নয় ত কি তোর সঙ্গে মিথ্যে কথা বলছি?"

"কিন্তু, বাপু, এ যে বিশ্বাস হয় না! ডানা হয়েছে, বলছ। তা' ত নয়। তুমি ত কত বললে—বিয়ে ত করলে না।"

পিসীমা চুপ করিয়া রহিলেন।

কুমুদা বলিল, "আমার তখনি মনে হয়েছিল, অমন ক'রে একা দাদাবাবুকে ফেলে রেখে আসা ভাল হয় নি।"

পিসীমা যেন জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ভাল হয় নি? তখন ত তুইও বলেছিলি, তা' হলেই দাদাবাবুর শিক্ষা হ'বে।"

"নেও কথা! বলে, তুমি আসবেই বললে, আমি ভাবলাম, গরিবের ভাগ্যে যদি তীর্থদর্শন হয়।"

অন্য সময় হইলে পিসীমা এই ছোটলোকের মেয়েকে সমুচিত তিরস্কার করিতেন। এখন আর তাহা করিলেন না; কারণ, তিনি আপনিই বড়ই বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন বল, আমি যদি তীর্থে থাকি, তবে তুই কি করবি?"

"তুমি কি সত্যই ফিরবে না?"

"না গো না! বলে, যে সংসারে আমার দরকার নাই, আমি সেধে সেই সংসারে যা'ব? পোড়া কপাল আমার! আমি তেমন ঘরের মেয়ে নই। বাবা সর্ব্বেশ্বরী ক'রে রেখেছিলেন, তা'ই ছিলাম; নইলে আমি কি কাঙ্গাল?"

"তা'ত জানি। কিন্তু—"

"কিন্তু কি? আমি ফিরে যা'ব না। তুই কি করবি তা'-ই বল।"

যে সেনাপতি অভিযানের সময় সেতু অতিক্রম করিয়া তাহা অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করেন, তিনি যেমন আর প্রয়োজন হইলেও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন না, পিসীমা তেমনই ক্রোধবশে যাহা বলিয়া ফেলিলেন, তাহার পর তাঁহার আর ফিরিবার পথ রহিল না। কথাটা বলিয়াই তিনি মনে করিলেন, ভাল করিলেন না—কি সাহসে সুধীর পত্র লিখিয়াছে, তাহা জানিতে হইলেও কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আর ফিরাইয়া লইতে পারেন না।

কুমুদা বলিল, "এখনও বাড়ীতে ঘরখানা আছে, তাই ভাবছি, একটা ব্যবস্থা না ক'রে আসব?"

পিসীমা বলিলেন, "ব্যবস্থা কিসের? ঘর—আছে; যা'রা ঘর দখল করেছে, সেই ভাশুরপোরা কি এক বার খোঁজ নিয়ে থাকে?"

"তা' নেয় না বলেই ত' এসেছি। তবুও তা'রা—ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক ওষুধ ত পালবে—মুখে আগুন না দিলেও শ্রাদ্ধ ত করবে!"

"করবে কি না করবে, তুই দেখতে আসবি?"

"নেও কথা! তা' শ্রাদ্ধ করবে না? নইলে গতি হ'বে কেন; আর তা'রাই বা শুদ্ধ হ'বে কেমন ক'রে?"

"তোর সঙ্গে আর আমি বকতে পারি না। সে আমি তখনই মনে করেছি—ছোটলোকের কপালে কি তীর্থবাস সইবে?"

কুমুদার আর সহ্য হইল না; সে বলিল, "তোমারও ত, পিসীমা, দায়ে পড়ে সইছে—দাদাবাবু ঐ পত্র লিখেছে বলেই সইছে, নইলে তুমি ত ফিরে যা'বে বলেই দ্বারকায় শাঁখের মালা, সাবিত্রীতে নোয়া—জয়পুরে, দিল্লীতে, আগরায় হুদো হুদো জিনিষ কিনেছ!"

পিসীমা'র মুখে আসিতেছিল, "যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!" কিন্তু তিনি মুখের কথা মুখেই রাখিলেন; কারণ, তিনি বুঝিলেন, বকাবকি করিলে কুমুদাও সহজে ছাড়িবে না—কান্নাকাটি আরম্ভ করিবে; তাহা হইলেই তাঁহার তীর্থসঙ্গীরা সব কথা জানিতে পারিবেন। তাহাতে তাঁহারই সম্ভ্রমহানি হইবে। কাযেই আহত হইয়া আঘাতকারীকে দংশন করিতে না পারিলে সাপ যেমন তাহার গর্ত্তে গজরাইতে থাকে, পিসীমা'র ক্রোধ তেমনই তাঁহার মনের মধ্যে গজরাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "তা' হ'লে এঁদের সঙ্গেই তোর ফিরে যা'বার ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

সহসা পিসীমা'র ভাবপরিবর্ত্তনে কুমুদা বিস্মিতা হইল। সে নরম হইয়া বলিল, "সে যখনকার কথা, তখন হ'বে। তুমিও দেখ, দাদাবাবু আর কিছু লেখে কি না! মাসীমা কিছু বলে কি না। যা'বে না—এমন কথা এখনই ব'ল না।"

১৫

বিবাহের কথায় সুধীর যে হাসি হাসিয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহা মৃণালিনীর বুকে যেন ছুরিকার মত বিদ্ধ হইয়াছিল। মৃণালিনী, সে চলিয়া যাইবার পর, বহুক্ষণ বজ্রাহতার মত বসিয়া রহিলেন, তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। এ যে অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম—ইহাতে কি কেহ জয়ের আশা করিতে পারে? সে দিন সন্ধ্যারতির পর মৃণালিনী বহুক্ষণ ঠাকুরঘরে বসিয়া রহিলেন। বুঝি তাঁহার মনে হইতেছিল, যে শান্তি মানুষ তাঁহাকে দিতে পারে না, তাহা তিনি দেবতার কাছে লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কিছু দিন দেবসেবা পুরোহিতের ভার ছিল। মৃণালিনী যখন সে ভার গ্রহণ করিতে চাহিলেন, তখন তাঁহার স্বামী তাহাতে উৎসাহ দিলেন। বন্ধ্যা নারীর যে স্নেহ প্রকাশ পাইবার পথ পায় নাই, তাহা যদি ঠাকুরকে অবলম্বন করিতে পায়, তবে সে-ও ভাল, তাই তিনি সে বিষয়ে মৃণালিনীকে উৎসাহিত করিলেন এবং তিনি সেবার

ভার লইবার দিন হইতে দেবসেবার ব্যবস্থা বাড়িয়া গেল। ঠাকুরের সাজসজ্জা হইতে ভোগ পর্য্যন্ত সবই এমন ভাবে হইতে লাগিল যে, তাহা লইয়া মৃণালিনীর অনেকটা সময় কাটিত। মৃণালিনী স্বামীকে হারাইবার পর দেবতার সেবায় আরও অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। আজ তিনি সেই দেবতার কাছে সুধীরের কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া যেন কল্যাণ-পথ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে একখানি মুখ ভাসিয়া উঠিল—সে রেণুর।

তিনি ভাবিলেন, পিসীমা'কে যাইতে দিয়া সুধীর ভাল করে নাই; তিনি না থাকায় রেণুকে আর তাহার পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করা যায় না। কে তাহাকে দেখিবে?

রেণুর জন্য সুধীর যে বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাও মৃণালিনী বুঝিয়াছিলেন। আজ তিনি মনে করিলেন, আর এক বার রেণুকে তাহার কাছে আনিয়া রাখিবার প্রস্তাব করিবেন, তাঁহাকে আনিবার চেষ্টা করিবেন। তাহার পর—ঠাকুরের যাহা অভিপ্রেত তাহাই হইবে।

পরদিন তিনি রেণুর গৃহে গমন করিলেন এবং পূর্ণিমার কাছে আবার তাহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন; পূর্ণিমা বলিলেন, "আপনি ত জানেন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু রেণু যে যেতে চায় না।"

কথাটা কত সত্য, মৃণালিনী তাহা জানিতেন। তিনি বলিলেন, "সে আপনার গুণে। কিন্তু লোক বলবে—আপনি পাঠালেন না, ওর মা নাই, তাই পাঠা'তে আপনার আপত্তি হ'ল।"

"আমি কি জানি না, আপনি মা'র বেশী ক'রে ওকে স্নেহ করেন?"

"লোক আমাকেও নিন্দা করছে; বলছে, সত্যিই কি আমি নিয়ে যেতে চাইলে আপনি পাঠাতেন না—কি রেণু যেতে অস্বীকার করত?"

পূর্ণিমা চিন্তিতা হইলেন; বলিলেন, "রেণুকে বুঝিয়ে বলুন।"

মৃণালিনী বলিলেন, "আপনি বলুন।"

শেষে তাহাই হইল। পূর্ণিমা বধূকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন। শুনিয়া রেণু বলিল, "আমাকে তাড়াবার জন্য আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন, কেন, মা? আমি কি এমনই ভার হয়েছি?"

পূর্ণিমা তাহার গণ্ডে করতল ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "ছিঃ বৌমা, অমন কথা কি বলতে আছে? আমার ঘরের লক্ষ্মী—আমি কি তোমাকে ভার মনে করতে পারি, মা? কিন্তু তোমার মাসীমা'র তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুলতা দেখলেও মনে দুঃখ হয়।" রেণু কিছুক্ষণ কোন উত্তর দিল না—ভাবিতে লাগিল; তাহার পর বলিল, "ভাল আমি যা'ব; কিন্তু ছেলে-মেয়ে রেখে যা'ব না। কণা ও অশোক যদি আমার সঙ্গে যায়, তবে আমি যা'ব।"

এ বার পূর্ণিমাকে ভাবিত হইতে হইল। কণা ও অশোক হয়ত রেণুর কাছে থাকিতে পারিবে; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন কি? আর—নীরেন্দ্র কি তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে? এ যে তাঁহার ও তাহার পক্ষে বিষম শাস্তি হইবে! তিনি কি বলিবেন? অনেক ভাবিয়া তিনি মৃণালিনীর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দুই দিনও ছেলেরা তাঁহাকে ও নীরেন্দ্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। তখন—তাহারা চলিয়া আসিলে রেণুও যদি আসিতে চাহে, তবে কেহ তাঁহার দোষ দিতে পারিবে না।

মৃণালিনী মনে করিলেন, পিসীমা ফিরিয়া আসিলে তিনি রেণুকে তাহার পিতৃগৃহে পাঠাইবেন—আর তিনি আপনি, ভগিনীর দীর্ঘকালব্যাপী রোগে যেমন প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন, তেমনই তাহাকে দেখিতে যাইবেন। সুধীর পিসীমা'কে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার বিষয় তিনি জানিতেন না।

তিনি রেণুকে আনিবার দিন স্থির করিয়া যখন সুধীরের কাছে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তখন সুধীর বলিল, "পিসীমা ত আর আসবেন না!"

মৃণালিনী এই অপ্রত্যাশিত কথায় বলিলেন, "আসবেন না! সে কি?"

"কেন?"

"সংসার চলবে কি করে?"

সুধীর হাসিল—এ হাসি যেন বেদনার বিকাশ। সে বলিল, "পিসীমা যদি ম'রে যান?"

"যা'র উপর মানুষের হাত নাই—তা'র কথা আলাদা।"

"সংসার চলে। আপনার সংসারও চলছে—আমারও চলছে; তবে চলা—আর চলা।"

কথাটা কত সত্য, মৃণালিনীর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সংসারে তাঁহার কোন অবলম্বনই নাই; তবুও তাঁহার সংসার চলিতেছে। কিন্তু তিনি স্ত্রীলোক; বাল্যাবধি সংসার-ভার বহনের শিক্ষায় শিক্ষিতা। সুধীর কি করিবে? তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন, "পিসীমা হঠাৎ কেন স্থির করলেন, তিনি আর ফিরবেন না?"

"তিনি স্থির করেন নাই; স্থির আমিই করেছি।"

"সে কি রকম?"

"আমিই তাঁ'কে লিখে দিয়েছি, তাঁ'র আর ফিরে আসবার দরকার নাই।"

"কেন?"

"তিনি যে আমার জন্য তাঁ'র পরকালের চিন্তাও ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, এই কথাটা বার বার —যখন তখন শুনতে শুনতে আমি এমনই বিরক্ত হয়েছিলুম যে, তিনি চলে গেলে সংসার বিশৃঙ্খল হ'বে, সে ভয় কেটে গিয়েছিল। তা'র পর তিনি মনে করেছিলেন, তিনি চলে গিয়ে আমাকে এমন জব্দ করবেন যে, আমি বাধ্য হয়ে বিয়ে করব।"

বলিয়া সুধীর হাসিল।

মৃণালিনী বলিলেন, "সে কি কখন হয়? মনে কষ্ট করবেন। তুমি তাঁ'কে আসতে লিখে দাও।"

"সেটা সত্যই আমার পক্ষে অন্যায় হ'বে। তিনি তীর্থক্ষেত্রে বাস করুন—যথেষ্ট অবসর পেয়ে ঠাকুর-দেবতার সেবা করুন। সেই ত ভাল।"

"না। সে হ'বে না।"

"কেন হ'বে না?"

"তুমি যদি না লিখতে চাও, আমিই তাঁ'কে আসতে লিখব। আমি ঠিক জানি, আসতে লিখলেই তিনি আসবেন।"

দৃঢ় স্বরে সুধীর বলিল, "আমার অনুরোধ—আপনি সে কায করবেন না। কিছুতেই করবেন না।"

"তুমি এমন জিদ করছ কেন?"

"আমার জন্য কাউকে কোন ত্যাগস্বীকার করতে হ'বে না; কাউকে আমি তা' করতে দেব না। কা'রও সেবা নেবার অধিকার আমার নাই।"

এই কথার মধ্যে পতিগত-প্রাণা পত্নীর শোক, বেদনা ও স্নেহের অবলম্বন কন্যার উপর অভিমান কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তাহা বুঝিতে মৃণালিনীর বিলম্ব হইল না। কিন্তু যে দুঃখে সুধীর এই পথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাকে সে দুঃখে সান্ত্বনা দিবার কোন উপায় তিনি সন্ধান করিয়া পাইলেন না। আর তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিসীমা'কে আসিতে বলিয়া তাহাকে আরও কষ্ট দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তাই তিনি আর সে কথা উত্থাপিত করিলেন না।

কিন্তু মৃণালিনী যে উদ্দেশ্যে রেণুকে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাঁহার সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—এখন তিনি কি করিবেন?

কিন্তু মৃণালিনী বুঝিলেন, রেণুকে আনিতেই হইবে। সুতরাং তিনি তাহার উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পক্ষে সে উদ্যোগ আয়োজনও বড় সামান্য নহে; কেন না, তিনি তাহাতে অনভ্যস্ত—তাঁহার ভাগ্যে কখন তাহা করিবার সুযোগ ঘটে নাই। সেজন্য যে কত আয়োজন করিতে হয়, তাহা কেবল তিনি দেখিয়াছিলেন—রেণুর জন্মের জন্য। সে-ও কত দিন হইয়া গেল! সেদিন সূতিকাগৃহে যাহার আগমনে তিনি আনন্দোৎফুল্লা হইয়াছিলেন—আজ সে জননী হইবে। কিন্তু সে দিন তিনি যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, আজ তাহা লাভ করিতে পারিতেছেন না। আজ যাহার আনন্দ আর সকলের আনন্দকে ছাপাইয়া উঠিবার কথা, সে নাই। মাতৃহীনা রেণুকে তিনি আনিতেছেন—কিন্তু তাহার মা'র অভাব কে পূর্ণ করিতে পারে? তাহার পর সুধীরের জন্য তাঁহার কত দুঃখ!

মৃণালিনী স্বভাবতঃ স্বাবলম্বী ছিলেন—অবস্থায় তাঁহার সেই ভাবের অনুশীলনই হইয়াছিল। তাই তিনি যতক্ষণ পারিতেন, কোন কাযে কাহারও পরামর্শ বা সাহায্য লইতেন না; পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইলে কেবল সুধীরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু এ বিষয়ে সুধীর তাঁহাকে কোনরূপ পরামর্শ দিতে পারে না। অগত্যা তিনি পূর্ণিমার সহিতই পরামর্শ করিয়া সব ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ব্যবস্থায় কোনরূপ ত্রুটি থাকা ত পরের কথা—বাহুল্যই দেখা যাইতে লাগিল। সব ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ হইল, প্রায় সেই সময়েই রেণুকে আনিবার দিন উপস্থিত হইল।

রেণু স্বামীর পুত্র-কন্যাকে লইয়া মাসীমা'র বাড়ীতে আসিল।

যে দিন রেণু স্বামীর কথায় সঙ্কল্প করিয়াছিল, সে তাঁহার পুত্র-কন্যার জননীর অভাবই পূর্ণ করিবে —আর কিছু চাহিবে না—সেই দিন হইতে সে তাহাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া বাড়ী যাইতে চাহিল না। কাযেই পূর্ণিমা প্রতিদিন মধ্যাহ্নে মৃণালিনীর গৃহে আসিতেন। অপরাহ্নে নীরেন্দ্র আসিয়া পুত্র-কন্যাকে বেড়াইতে লইয়া

যাইত এবং ফিরিবার পথে তাহাদিগকে নামাইয়া দিয়া মা'কে লইয়া যাইত। ছেলে-মেয়ে দুইটি তাহাদিগের নবলব্ধ দিদিমা মৃণালিনীকে এমনই "পাইয়া বসিয়াছিল" যে, তাহাদিগকে লইয়া মৃণালিনী যেন তাঁহার জীবনের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের সন্ধান পাইতেছিলেন। যে গৃহ কখন শিশুর কলরবে মুখরিত হয় নাই, সে গৃহ যেন রুদ্ধদ্বার। সহসা তাহার দ্বার, বাতায়ন সব মুক্ত হইলে যেমন হয়, তাঁহার গৃহ যেন তেমনই মনে হইতে লাগিল।

সুধীরও প্রতিদিন আদালত হইতে ফিরিবার পথে এবং ছুটীর দিনও সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য শোকে ও চিন্তায় গভীরতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সে-ও কণার ও অশোকের মিষ্ট দৌরাত্ম্যে তৃপ্ত না হইয়া পারিত না। শিশুর দৌরাত্ম্য সে কখন ভোগ করে নাই। রেণু তাহার একমাত্র সন্তান—তাহার জন্মের পর হইতেই তাহার মাতা অসুস্থ; সে রোগীর ঘরে লালিত-পালিত হইয়াছিল। যে শিশু সেই আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হয়, সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে প্রভাবিত না হইয়া পারে না —শঙ্কা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সে-ও গাম্ভীর্য্য লাভ করে। রেণুর তাহাই হইয়াছিল। রেণুর আদর ও আবদার কোন দিন তাহাকে এতটুকু বিব্রত করে নাই। যে খেলানা মৃণালিনী আনিতেন বা সে আনিত, তাহার অতিরিক্ত কোন খেলানা রেণু কোন দিন চাহে নাই; কোন দিন সে কোন জিনিষের জন্য "বাহানা" ধরে নাই। কিন্তু কণা ও অশোক পিতার ও পিতামহীর কাছে আদর পাইতে ও আবদার করিতেই অভ্যস্ত ছিল। তাহারা সুধীরের সঙ্গেই সেইরূপ ব্যবহার করিত। সুধীর তাহাদিগের সব আবদার পূর্ণ করিত আর মনে মনে হাসিত—এ-ও অদৃষ্টের উপহাস; যাহারা কেহ নহে, তাহারাই তাহার আপনার! কিন্তু সে আদর আবদার এমনই মিষ্ট যে, সে-ও তাহাতে আকৃষ্ট না হইয়া পারিত না। এক এক দিন তাহারা পিতার সঙ্গে বেড়াইতে না যাইয়া সুধীরের সঙ্গে যাইত।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল—আনন্দের ও আশার মধ্যেই কাটিতে লাগিল বলিতে হয়। দিনের পর দিন ও মাস কাটিল।

কিন্তু মেঘহীন নীলাম্বরেও অতর্কিতভাবে মেঘোদয় হয় এবং যে মেঘ প্রথমে শিশুর হস্তেরই মত ক্ষুদ্র দেখায়, তাহাই দেখিতে দেখিতে বর্দ্ধিত হইয়া বৃষ্টি ও বজ্র বর্ষণ করে। এক দিন সন্ধ্যার পর ঠাকুর-ঘর হইতে ফিরিয়া পূর্ণিমাকে বিদায় দিয়া আসিয়া মৃণালিনী দেখিলেন, রেণু শুইয়া পড়িয়াছে। "অসময়ে শুলি কেন, মা?" জিজ্ঞাসায় রেণু বলিল, "মাসীমা, আমার শরীরটা ভাল ঠেকছে না।"

"অমন হয়"—বলিয়া মৃণালিনী আসিয়া তাহার কপালে করতলার্পণ করিলেন। কপাল তপ্ত বলিয়া মনে হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া থার্ম্মোমিটার আনিলেন—দেখিলেন, রেণুর একটু জ্বর হইয়াছে।

তিনি ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে যাইতেছেন দেখিয়া রেণু জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছেন, মাসীমা?"

তিনি বলিলেন, "সুধীরকে খবর দিতে যাচ্ছি।"

"এই ত আধ ঘণ্টাও হয় নি, বাবা গেছেন।"

"তা' হ'ক।"

"তাঁকে আজ আর বিরক্ত করবেন না। কোন ত দরকার নেই।"

"না, বাপু, জানিয়ে দেই।"

"না।"

"তবে ডাক্তার আনাই।"

"হয়ত কিছুই না। কেন ব্যস্ত হচ্ছেন?"

মৃণালিনী কিন্তু এ কথা শুনিলেন না; ডাক্তারকে আনাইলেন। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এখনও ত সামান্য জ্বর। হয়ত ইনফ্লুয়েঞ্জাই হ'বে; আজকাল কলিকাতায় খুব হচ্ছে। আজ আর কোন ওষুধ দেব না। বোধ হয়, তিন দিনেই সেরে যা'বে।"

মৃণালিনী চিন্তিতা হইলেন। তিনি সংসারে একা—রোগে তিনি অনভ্যস্তা। তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া রেণু হাসিল।

দ্বিতীয় দিন জ্বর কমিল না—বাড়িল। মৃণালিনীর উৎকণ্ঠাও বাড়িল। সুধীর চিন্তিত হইল। পূর্ণিমা বলিলেন, "তাই ত, মা, কি হ'বে!"

তৃতীয় দিনে জ্বর যখন আরও বাড়িল, তখন মৃণালিনী আর অপেক্ষা না করিয়া পরামর্শের জন্য অন্যান্য ডাক্তারও আনাইলেন। ডাক্তাররা পরামর্শ করিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না; মনে করিলেন, জ্বর হয় ম্যালেরিয়া, নহে ত ইনফ্লুয়েঞ্জা, নহেত টাইফয়েড হইতেও পারে। রক্ত-পরীক্ষা হইল—ম্যালেরিয়া নহে।

চতুর্থ দিনে বুঝিতে পারা গেল, জ্বর বক্রগতি লইতেছে—মাথার যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল। তখন ডাক্তাররা টাইফয়েডেরই চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন —গর্ভস্থ শিশুর জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষা মৃণালিনী ও সুধীর অধিক

চিন্তিত হইলেন। সুধীর মুখে কিছু বলিল না। মৃণালিনী কেবল দেবতার কাছে মাথা "কুটিতে" লাগিলেন—"আমি রেণুকে আনিয়া এ কি করিলাম! ঠাকুর, আমার মুখ রক্ষা করিও। তুমি সবই পার। তোমার চরণে আমি শরণ লইয়াছি—আমাকে কৃপা কর।"

ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন, কণাকে ও অশোককে আর টাইফয়েড রোগীর কাছে রাখা সঙ্গত নহে। মৃণালিনীর বাড়ী বড় হইলেও তিনি নিজে সর্ব্বদা রোগীর সেবায় ব্যস্ত; কাযেই রেণুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্ণিমা তাহাদিগকে গৃহে লইয়া যাইলেন। রেণু আপত্তি করিতে পারিল না, কিন্তু তাহাকে যে বাধ্য হইয়া স্বামীর ছেলে-মেয়েকে ছাড়িতে হইল, ইহাতে সে অদৃষ্টের উপর আরও অপ্রসন্ন হইল। সেই অপ্রসন্নতার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জ্বর ও মাথার যন্ত্রণা বর্দ্ধিত হইল।

ডাক্তাররা চিন্তিত হইলেন।

পূর্ণিমা যতক্ষণ সম্ভব রোগীর কাছে থাকিতেন, সুধীর আদালতে যাওয়া বন্ধ করিল, মৃণালিনী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন—কেবল ঠাকুরসেবার জন্য কয় বার রোগীর শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিতেন।

১৬

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, জ্বর-ত্যাগ হইল না। মৃণালিনী দিন-রাত্রি বাড়ীতে ডাক্তার রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ডাক্তাররা যখন শুশ্রূষা-কারিণী নিয়োগের কথা বলিলেন, তখন তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন—তিনি আর কাহাকেও রেণুর শুশ্রূষাভার দিয়া অল্পক্ষণের জন্যও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। ডাক্তাররা বলিলেন, "আপনার শরীরে কত সহিবে? আহার নাই—নিদ্রা নাই, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে।" তিনি উত্তর করিলেন, "যতক্ষণ সহে, ততক্ষণ আমি আর কাহাকেও এ ভার দিব না।"

শুশ্রূষাকার্য্যে প্রায় সমস্ত দিনই পূর্ণিমা আর সমস্ত দিন-রাত্রিই সুধীর তাঁহার সঙ্গে লিপ্ত থাকিত। ডাক্তাররা কোন আশাই দিতে পারিলেন না; কেবল বলিলেন—আশার মধ্যে এই যে, রোগ কোন নূতন উপসর্গে জটিল হইয়া দাঁড়ায় নাই, আর আশঙ্কা—রোগীর অবস্থাহেতু—হয়ত গর্ভস্থ শিশুর জীবন বিপন্ন হইবে, হয়ত উভয়েরই জীবন বিপন্ন হইবে।

আরও কয় দিন কাটিল। ডাক্তাররা পরামর্শ করিয়া বলিলেন, কৃত্রিম উপায়ে অকালে প্রসব করাইলে শিশু রক্ষা পাইবে না বটে, কিন্তু রেণুর আরোগ্য-সম্ভাবনা অধিক হইবে। ডাক্তাররা বুঝাইলে নীরেন্দ্র সে ব্যবস্থায় সম্মতি দিল—পুত্রের মতেই পূর্ণিমা মত দিলেন। কিন্তু মৃণালিনীর মন তাহাতে সম্মতি দিতে চাহিল না। তিনি সুধীরের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। সুধীর বলিল, "আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না: নীরেন ও তাহার মা যদি মত দেন, ডাক্তাররা যাহা ভাল বুঝেন করুন।" তাহার মুখভাব দেখিয়া মৃণালিনী বুঝিলেন, সে-ও তাঁহারই মত এ ব্যবস্থায় সম্মতি দিতে ইচ্ছুক নহে—তবে ডাক্তারদিগের উপর নির্ভর করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

কিন্তু রেণু সে প্রস্তাব শুনিয়া এমনই বিচলিত হইল যে, তাহার জ্বর বাড়িয়া গেল, বিবমিষা উগ্রভাবে দেখা দিল এবং তাহার অবস্থা ডাক্তাদিগের এমনই চিন্তার কারণ হইয়া উঠিল যে, তাঁহারা আর পূর্ব্বপ্রস্তাবানুসারে কায করা নিরাপদ মনে করিলেন না।

মাথায় বরফ দিয়া, গা মুছাইয়া রেণুর জ্বর কমিল বটে, কিন্তু বিবমিষা কমিল না। ডাক্তাররা এ উহার দিকে চাহিলেন—তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা।

সমস্ত দিন কাটিল—রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই রেণু বেদনা অনুভব করিতে লাগিল, সেই বেদনাই প্রসববেদনায় পরিণত হইল এবং মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। সপ্তম মাসের শেষভাগে শিশু জন্মগ্রহণ করিল—তাহার দেহ সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইলেও পূর্ণরূপে পুষ্ট হয় নাই। ডাক্তাররা তাহার জীবনের আশা করিলেন না বটে, কিন্তু মৃণালিনী তাহাকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কৃত্রিম উপায়ে প্রসব করাইবার প্রস্তাবে রেণুর বিচলিতভাব তিনি ভুলিতে পারেন নাই; প্রসবান্তে রেণু কিরূপ উৎসুক দৃষ্টিতে শিশুর দিকে চাহিয়াছিল, তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিলেন, শিশু জীবিত থাকিলে রেণুর রোগমুক্তি যেমন দ্রুত হইবে, সে জীবিত না থাকিলে সে সম্বন্ধে তেমনই সন্দেহ থাকিয়া যাইবে।

কিন্তু সাত মাসের শিশু, সে কি বাঁচিবে? তাহাকে "মানুষ করা" কি সম্ভব হইবে? তিনি মনে মনে দেবতাকে ডাকিলেন—"তোমার কৃপায় সবই সম্ভব হয়; কৃপা কর।" তাহার পর তিনি শিশুকে পালন করিবার জন্য কি করিতে হইবে, তাহা ডাক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তাররা যাহা বলিলেন, তাহাতে আর কেহ হইলে সব আশা ত্যাগ

করিত, মৃণালিনী কিন্তু আশা ছড়িলেন না। তিনি ডাক্তারদিগকে তাঁহাদিগের উপদেশ লিখিয়া দিতে বলিলেন—স্থির করিলেন, সে উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবেন; তাহার পর দেবতার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে।

সেই দিন হইতে মৃণালিনীর কায আরও বাড়িয়া গেল—প্রসূতি ও প্রসূত উভয়কেই শুশ্রূষা করিতে হইতে লাগিল। শিশুর—সেই অপুষ্ট শিশুর শুশ্রূষা—সে কিরূপ মনোযোগ ও ধৈর্য্যসাধ্য! তাহাকে তুলা জড়াইয়া কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত তাপে রাখিতে হয়—ঘড়ী ধরিয়া তাহার আহার দিতে হয়, অথচ মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ নাই।

প্রসবের পর রেণুর জ্বর ছাড়িয়া গেল। সে রাখিয়া গেল—রেণুর দেহে দারুণ দৌর্ব্বল্য আর এই অকাল-প্রসূত শিশু। রেণুও শিশুরই মত অসহায় হইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই, সর্ব্ববিষয়ে অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়। এক দিকে রোগী আর এক দিকে অপুষ্ট শিশু, মৃণালিনী উভয়ের পরিচর্য্যাভার লইয়া কায করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথানুসারে সুধীর আবার আদালতে বাহির হইতে লাগিল। গৃহে পৌত্র-পৌত্রীর শরীর অসুস্থ হইলে পূর্ণিমাও সময় সময় আসিয়া অধিক সময় থাকিতে পারিতেন না। কেবল মৃণালিনী অক্লান্ত ভাবে দুইটি জীবনরক্ষার গুরু ভার বহন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পক্ষকাল কাটিল; রেণুর দুর্ব্বল দেহে বলসঞ্চার হইতে লাগিল—যেন বর্ষারম্ভে শীর্ণকায়া নদীতে জল বাড়িতে লাগিল। ডাক্তাররা বলিতে লাগিলেন, শিশু বাঁচিতে পারে। তাঁহারা তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতায় এরূপ যত্নে শিশুপালন দেখেন নাই; বলিলেন, এ শিশুকে বাঁচান অসাধ্যসাধন এবং মৃণালিনী তাহাই করিতেছেন।

আরও পক্ষকাল পরে রেণুর সম্বন্ধে শঙ্কার অবসান হইল। ডাক্তাররাও মতপ্রকাশ করিলেন, শিশু বাঁচিয়া গেল; তবে আরও দুই মাস তাহাকে তুলায় জড়াইয়া রাখিতে হইবে—যাহাতে তাহার শয্যার তাপ নির্দ্দেশানুসারে রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে—তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করাইতে হইবে—ইত্যাদি।

আরও এক মাস পরে রেণু পুত্রের শুশ্রূষায় মাসীমা'কে সাহায্য করিতে পারিল; তখন মৃণালিনীর উৎকণ্ঠার ও পরিশ্রমের কারণ কতকটা দূর হইল।

তিন মাসের উৎকণ্ঠা ও শ্রম তাঁহার দেহে তাহাদিগের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল—যেন তাঁহার বয়স বহুদিন বাড়িয়া গিয়াছিল। আর তাঁহার মন? তাহাতে তিনি নূতন অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। সন্তানপালনের সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই—শিশুর মধ্যে রেণুকেই তিনি একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বার রেণু প্রসবমাত্র করিয়াছে, প্রসবান্তে শিশুকে মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিয়া রক্ষা করা, তাহাকে বড় করিয়া তুলা—এ সবই মৃণালিনী করিয়াছেন এবং সাধারণ শিশুর প্রতি যেরূপ মনোযোগ দিতে হয়, ইহার প্রতি তাঁহাকে তদপেক্ষা অনেক অধিক মনোযোগ দিতে হইয়াছে। তিনি আপনিই বলিতেন, "আমার এ যেন না বিইয়ে কানাইয়ের মা হয়েছে।"

আরও এক মাস পরে অর্থাৎ শিশু যত দিন গর্ভে থাকিবার কথা, তত দিন কাটিলে সে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রসূত শিশুরই মত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ণিমা ডাক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে তিনি তখনও রেণুকে ও তাহার পুত্রকে নিজগৃহে লইয়া যাইবার কথা বলিতে পারিলেন না। ডাক্তাররা বলিলেন, শিশুর বৈশিষ্ট্য মৃণালিনীই বুঝিয়াছেন, এখন তাহাকে তাঁহার কাছে রাখাই নিরাপদ।

এ দিকে মৃণালিনীর স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে যে মাতৃত্বের ভাব এতদিন স্ফুরিত হইবার অবকাশ পায় নাই, এখন তাহা যেন স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিল—রেণুর শিশুকে অবলম্বন করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিল। সে এক নূতন অনুভূতি। সময় সময় তাঁহার মনে হইত, হয়ত রেণুও শিশুকে আবশ্যক যত্ন করিতে পারিবে না। সে কথা মনে হইলে তিনি মনে মনে হাসিতেন—আপনার দৌর্ব্বল্যকে উপহাস করিতেন; কিন্তু সে দৌর্ব্বল্য জয় করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

আরও দুই মাস পরে যখন পূর্ণিমা রেণুকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন, তখন মৃণালিনী আপনার দৌর্ব্বল্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিলেন; মনে করিলেন, এ বার তাহা জয় করিতেই হইবে। তিনি শিশুর পালন সম্বন্ধে রেণুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিতে লাগিলেন—যেন তাহাতে কোন ত্রুটি না হয়।

রেণু মাসীমা'র কথা মনোযোগসহকারে শুনিত—আর ভাবিত। কিন্তু তাহার ভাবনার স্বরূপ মৃণালিনী উপলব্ধি করিতে পারিতেন না; না পারিবার কারণ—তাহার চিন্তা অন্তঃসলিলা

ফল্গুর বারিধারার মত কোন্ দিকে যাইতেছিল, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিতেন, দুর্ব্বল শিশুকে পালনের যে দায়িত্ব, তাহা গ্রহণ করিয়া সে তাহাকে "মানুষ করিতে" পারিবে কি না, রেণু তাহাই ভাবিতেছে। রেণুর ভাবনার ভাব দেখিয়া তাঁহারও দুশ্চিন্তা হইত—সত্যই যদি শিশুর পালনে কোন ত্রুটি হয়! তাহা হইলে কি আর তাহাকে বাঁচান সম্ভব হইবে? তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তিনি কি আরও দুই এক মাস রেণুকে তাঁহার কাছে রাখিবার প্রস্তাব পূর্ণিমার কাছে করিবেন? তাহাতে কি পূর্ণিমা সম্মত হইবেন? তাঁহারও একটা সংসার, বিশেষ নাতি ও নাতিনীর সব কায তাঁহাকে দেখিতে হয়; সে অবস্থায় তাঁহার পক্ষেও প্রতিদিন আসিয়া বধূকে ও তাহার পুত্রকে দেখা কষ্টকর। তিনি এত দিন হাসিমুখেই তাহা করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু আবারও তাহাই করিতে বলা কি সঙ্গত হইবে? তিনি মনে করিলেন, সে বিষয়ে সুধীরের সহিত পরামর্শ করিবেন।

এই সময় রেণু এক দিন বলিল, "মাসীমা, খোকাকে তুমি রেখে দাও।"

মৃণালিনী মনে মনে আনন্দানুভব করিলেও তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "সে কি হয়, মা?"

"কেন হয় না?"

"তোর শ্বশুরবাড়ী সবাই তা' শুনবেন কেন? জামাইও তা'তে সম্মত হ'বেন না।"

"সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হ'বে না।"

"আর তুই? তুই কি একে ছেড়ে থাকতে পারবি?"

"নিশ্চয় পারব। ওকে 'মানুষ করাই' ত সব চেয়ে বড় কথা। সে'টাই আগে দেখতে হ'বে।"

মৃণালিনী ভাবিতে লাগিলেন। তিনি কেবল আপনার কথাটাই ভাবিলেন না—নিজে এই বয়সে কিরূপ "জড়াইয়া পড়িবেন," স্নেহের আতিশয্যে সেই ভাবনাই ভাবিলেন না। তিনি কেবল ভাবিতে লাগিলেন—রেণু থাকিতে পারিবে কি? আর তাহার শ্বশুরবাড়ীর সকলে কি সম্মত হইবেন? কিন্তু রেণু যে বলিয়াছে—তাঁহাকে সে ভাবনা ভাবিতে হইবে না! তিনি তাহার কথার—তাঁহার ইচ্ছার অনুকূল ব্যাখ্যাই করিয়া লইলেন; মনে করিলেন—সে নিশ্চয়ই পূর্ণিমার ও নীরেন্দ্রের মত ব্যতীত সে কথা বলিতে পারে নাই। শেষে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা—এখন আমার কাছেই থাকুক, আর একটু বড় হ'লে নিয়ে যা'বি।"

রেণু বলিল, "সে হ'বে না, মাসীমা—ওকে আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম; ওকে তুমিই বাঁচিয়ে রেখেছ, আমি কেবল ও'কে পেটে ধরেছি।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "তাও দশ মাস নয়।"

"সে ত সত্য কথা।"

"না, বাছা, তোর ধন তুই নিবি—দেখেই আমার আনন্দ। না হয়, আমি তোর মেসমশাইয়ের এই সম্পত্তি ওকে লিখে দিয়ে যা'ব।"

মৃণালিনী ইহাই বলিলেন বটে, কিন্তু রেণুর কথায় তাঁহার মনে এক নূতন চিন্তার উদ্ভব হইল। তাঁহার স্বামীর এই যে সম্পত্তি—ইহা সমান্য নহে। এ সবই তাঁহার—স্বামী এ সব তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন এবং সেই জন্য স্বামীর যে সব স্বজনের তাহা পাইবার অধিকার লুপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন নহেন—তাঁহার সহিত সম্বন্ধ একরূপ লুপ্ত করিয়াছেন। যাহারা অর্থকেই আত্মীয়তার কারণ মনে করে, তাহাদিগের জন্যই কি তিনি এই সম্পত্তি "যক্ষের ধনের মত" রক্ষা করিতেছেন? সে বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল না। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, দেবসেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তিনি অবশিষ্ট সম্পত্তি কোন সৎকার্য্যের জন্য দান করিবেন। তাঁহার দিদিমা তীর্থক্ষেত্রে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা করিয়া ঠাকুরসেবার অধিকার দৌহিত্রীদিগকেও দিয়া গিয়াছেন—তিনি ঠাকুর লইয়া তথায়ও যাইতে পারেন। কিন্তু রেণুর এই পুত্র—এ যদি বাঁচিয়া থাকে এবং এই সম্পত্তি সম্ভোগ করে, তাহাতে কি তাঁহার তৃপ্তি হইবে না?

তাঁহার আপনার তৃপ্তি ব্যতীত আরও এক জনের তৃপ্তির কথা মৃণালিনীর মনে আসিল। তিনি আজ লোকান্তরে; কিন্তু মৃণালিনীর হৃদয়ে তিনি পূর্ব্ববৎ—বুঝি পূর্ব্বাপেক্ষাও নিকটস্থরূপে বিরাজিত। পূর্ব্বে কখন কখন মান-অভিমানে যে ভালবাসা শরতের লঘু মেঘে আবৃত চন্দ্রের মত মনে হইত, এখন তাহা ভক্তিতে পরিণতি লাভ করিয়া মেঘলেশশূন্য নীলাম্বরে পূর্ণিমার শশধরের মত হইয়াছে। দেবতার সহিত তিনি অভিন্ন হইয়াছেন। তিনি এই গৃহ কত যত্নে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন—সম্পত্তি কত চেষ্টায় বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন—এই গৃহের ও এই সম্পত্তির সহিত তাঁহার স্মৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত। তিনি কি কেবল আপনার সম্ভোগের জন্যই এ সব করিয়াছিলেন, আপনার পরবর্ত্তীদিগের কথা মনে না থাকিলে কি মানুষ তত যত্ন—তত চেষ্টা করিতে পারে? বোধ হয় না। কিন্তু তিনি তাঁহার অপরিমেয় স্নেহ দিবার পাত্র লাভ

করেন নাই। তিনি গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুস্তকাধারে তাঁহার পঠিত পুস্তকগুলি, তাঁহার বসিবার কক্ষে তাঁহার আসন প্রতি দিন স্বহস্তে ঝাড়িয়া মুছিয়া মৃণালিনী যেন অগাধ তৃপ্তি অনুভব করেন। রেণুকে তিনিও নিজ সন্তানের মত ভালবাসিতেন। রেণুর এই পুত্র—যে দেবদত্তরূপে তাহার মাসীমা'র অঙ্কে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে যদি এই সকলের উত্তরাধিকারী হয়—তিনি যদি তাহাকে এই গৃহ মন্দির মনে করিতে শিখাইয়া তাহাকে সেবাভার দিয়া যাইতে পারেন, তবে তাহা কি তাঁহার স্বামীর তৃপ্তিসাধক কার্য্যই হইবে না?

বিধবা হইয়া মৃণালিনী কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কেবল বিলাসের একটি উপকরণ ত্যাগ করেন নাই—সে শয্যা। যে শয্যা তিনি বধূকাল হইতে স্বামীর সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, সেই শয্যা তিনি ত্যাগ করেন নাই—ত্যাগ করিতে পারেন নাই, ত্যাগ করিতে চাহেন নাই। সে যেন তাঁহার কাছে—বৈষ্ণবের নিকট ব্রজ-রজের মতই পবিত্র—প্রিয়—প্রার্থনীয়। রাত্রিকালে রেণু ঘুমাইলে মৃণালিনী উঠিয়া যাইয়া সেই শয্যায় লুটাইয়া স্বামীর উদ্দেশে বলিলেন—আজ আমি কি করিব? আমি অসহায়—তুমি ব্যতীত আর কে আমাকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিবে? বাহিরের নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কোন উত্তর আসিল না। কিন্তু মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল—মনই নারায়ণ, তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত পথকে কর্ত্তব্যপথ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। সে উত্তর কে দিল? সে কি বন্ধ্যানারীর অতৃপ্ত মাতৃস্নেহ নহে? যদি তাহা না হয়, তবে তিনি কেন স্থির করিলেন, রেণুর প্রস্তাব সম্বন্ধে সুধীরকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না? পাছে সুধীর তাঁহাকে সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে নিবারণ করেন সেই আশঙ্কাই তাঁহাকে তাহা স্থির করিতে প্ররোচিত করিল।

সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি রেণু যে কক্ষে ছিল, সেই কক্ষে আসিলেন; রেণু ঘুমাইয়া আছে—তাহারই নিকটে শিশু নিদ্রিত। উচ্ছ্বসিত স্নেহে তিনি তাহার মুখচুম্বন করিলেন। শিশু জাগিয়া উঠিল। রেণুর নিদ্রাভঙ্গ হইল না—শিশুর জন্মাবধি সে কোন দিন তাহার জন্য রাত্রি জাগে নাই। মৃণালিনী শিশুকে অঙ্কে তুলিয়া লইলেন—শিশু হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া খেলা করিতে লাগিল। তাহার দিকে চাহিয়া মৃণালিনীর হৃদয় মাতৃস্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল। বৃন্দাবনে কংস-কারাগারে বদ্ধা দেবকীর পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া মাতৃভাবের অভিব্যক্তি যশোমতী এমনই ভাবে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অনাবিল মাতৃস্নেহকেই যশোমতী কল্পনা করিয়া দাশরথি বলিয়াছিলেন:—

"হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি,
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা সতী,
মুক্তি-কামনা আমারি হ'বে বৃন্দা গোপ-নারী,
দেহ হ'বে নন্দের পুরী, স্নেহ হ'বে মা যশোমতী।"

শিশুকে অঙ্কে লইয়া মৃণালিনীর হৃদয়ে সব দ্বিধা দূর হইয়া গেল। দেবতা তাহাকে তাঁহার কাছে আনিয়া দিয়াছেন—সেই দেবদত্তকে তিনিই দেবতার দানরূপে গ্রহণ করিবেন!

১৭

রেণুর শ্বশুরবাড়ী যাইবার দিন আসিয়া পড়িল। তাহাকে যাইতে দিতে হইবে মনে করিয়া মৃণালিনীর বুকের মধ্যে বেদনা অনুভূত হইতেছিল। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আগমনীর আনন্দ ও বিজয়ার বিষাদব্যাপ্তি দেখা যায়। মা না হইয়াও মৃণালিনী মাতৃহৃদয়ের অনুভূতি অনুভব করিতেছিলেন—স্নেহ যখন বিকশিত হয়, তখন সে পরকে আপনার করিয়া লয়।

রেণুকে লইতে গাড়ী আসিল। সে দিন আর পূর্ণিমা আসিলেন না, তিনি গৃহে পুত্রবধূর ও পৌত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—নবাগত পৌত্রের জন্য সব আয়োজন করিতেছিলেন। কণা ও অশোক গাড়ীতে আসিল। রেণু যখন তাহাদিগের সঙ্গে যাইয়া গাড়ীতে বসিল—মৃণালিনী তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন কণা ও অশোক প্রায় এক সঙ্গেই রেণুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"খোকা?"

রেণু একটু দৃঢ়তা সঞ্চয় করিয়া বলিল, "খোকা দিদিমা'র কাছে থাকবে।"

অশোক রেণুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাতরভাবে বলিল, "ওকে নিয়ে চল, মা! আমি মোটে দুষ্টুমি করব না—যা' বলবে তা'ই করব, মা।"

রেণুর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তাহার বুকের মধ্যে যে চাঞ্চল্য, তাহা কি সহজে লুকান যায়? সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "দিদিমা ছাড়া আর কেউ কি ওকে 'মানুষ' করতে পারবেন?"

কণা বলিল, "এখন নিয়ে চল, না হয় আবার আসবে।"

কষ্টে হাসিয়া রেণু জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"ওর জন্য যে বাড়ীতে সব গোছান হয়েছে, মা!"

মৃণালিনী তখনও তথায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেহানকে কি বলিস নি, ও থাকবে?"

রেণু ভয় পাইল—পা'ছে মৃণালিনী জানিতে পারেন, সে ছেলেকে রাখিয়া যাইবার কথা কাহাকেও বলে নাই। সে বলিল, "ওদের কথা শুন কেন, মাসীমা! কণা যে পাকা গিন্নী—ও-ই হয়ত সব আয়োজন ক'রে রেখেছে।"

কণা বলিল, "না মা।"

রেণু তাড়াতাড়ি বলিল, "চল—মা হয়ত ভাবছেন, এত দেরী কেন হচ্ছে। তাঁ'র 'বারবেলার' যে ভয়!"

সে চালককে গাড়ী চালাইতে বলিল।

গাড়ী চলিয়া যাইলে মৃণালিনী ফিরিয়া যাইবার সময় ভাবিতে লাগিলেন—ব্যাপারটা কি? কিন্তু তিনি কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না, রেণু শাশুড়ীর ও স্বামীর বিনাভিপ্রায়েই ছেলেকে রাখিয়া গিয়াছে। তিনি উপরে যাইয়া ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইলেন—আজ সে একা তাঁহার!

পঞ্জিকাকারের নির্দ্দেশানুসারে রেণুর যাইবার যে সময় স্থির হইয়াছিল, সে সময় সুধীর আদালতে ছিল; বিশেষ সে দিন তাহার একটা জটিল মোকর্দ্দমা থাকায় সে সে সময়ে আসিতে পারিবে না বলিয়া আদালতে যাইবার সময় রেণুকে দেখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রেণু মৃণালিনীর গৃহে আসিবার দিন হইতে সে প্রতিদিন ফিরিবার পথে তথায় আসিত বলিয়া তাহার মোটরচালক অভ্যাসবশে ফিরিবার সময় তথায় আসিল। গাড়ী যখন গৃহদ্বারে দাঁড়াইল, তখন সুধীরের মনে হইল—সে চালককে কিছু বলে নাই। কিন্তু আজ রেণু তথায় নাই বলিয়া গৃহদ্বার হইতে ফিরিয়া যাওয়াও শিষ্টাচারসঙ্গত হইবে না মনে করিয়া সে নামিল। তাহার গাড়ীর শব্দ পাইয়া মৃণালিনী সোপানের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহার বক্ষে রেণুর শিশু। তাহাকে সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "রেণু এখনও যায় নি?"

মৃণালিনী বলিলেন, "সে গেছে।"

সুধীর বিস্মিতভাবে মৃণালিনীর দিকে চাহিল—তাহার দৃষ্টিতে যে মৌন জিজ্ঞাসা ছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া মৃণালিনী বলিলেন, "ছেলেকে রেখে গেল—ব'লে গেল, তা'র মাসীকেই একে 'মানুষ' ক'রে দিতে হ'বে।"

সুধীর বলিল, "মাসীমা'র কর্ম্মভোগ মন্দ নয়।"—বলিয়া সে একটু হাসিল।

মৃণালিনী বলিলেন, "কিছু বুঝতে পারছি না—সব বুঝতে পারি, এ অভিমানও রাখি না। হয়ত দেবতাই দয়া ক'রে বালগোপালরূপে দেখা দিয়ে আমাকে ধন্য করলেন।"

সত্যই তিনি কত কথা ভাবিতেছিলেন—তাঁহার জীবনে এ কি পরিবর্ত্তন হইল! তিনি কখন শঙ্কিতা, কখন বা উৎফুল্লা হইতেছিলেন।

মৃণালিনীর কথা সুধীরকেও চিন্তিত করিল। সত্যই এ কি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটিল? সে "কায আছে, যাই"—বলিয়া চলিয়া গেল; ভাবিতে ভাবিতে গেল। মৃণালিনী রেণুর কথায় মনে করিয়াছিলেন, রেণু শাশুড়ীর ও স্বামীর সম্মতি লইয়াই পুত্রকে তাঁহার কাছে রাখিয়া গিয়াছে। সুধীর মনে করিল, তাঁহারা কেমন করিয়া বন্ধ্যানারীর স্কন্ধে এই গুরুভার দিলেন? আর রেণুই বা কেমন করিয়া পুত্রকে রাখিয়া গেল? কাত্যায়নী রোগ-শয্যায় থাকিয়াও কিরূপে কন্যার সব কাযের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা তাহার মনে পড়িল। মাতৃস্নেহের যে রূপ সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহার সহিত রেণুর ব্যবহারের সামঞ্জস্যসাধন তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। রেণুর পক্ষে শিশু পুত্রকে রাখিয়া যাওয়া এবং তাহার শাশুড়ীর ও স্বামীর পক্ষে তাহাতে সম্মত হওয়া তাহার নিকট দুর্ভেদ্য রহস্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

সুধীর বাড়ীতে আসিয়া পিসীমা'র পত্র পাইল—তিনি সেই দিনই আসিবেন। তিনি লিখিয়াছেন, তিনি কাশীতেই বাস করিবেন, স্থির করিয়াছেন, কেবল রেণুর পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে ও জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিতেছেন—থাকিতে নহে। ট্রেণ আসিতে অধিক বিলম্ব নাই দেখিয়া সুধীর তাড়াতাড়ি পুরাতন ভৃত্যকে মোটর লইয়া ষ্টেশনে যাইতে ও অন্য ভৃত্যকে পিসীমা'র জন্য এক ঘড়া গঙ্গাজল আনিবার ব্যবস্থা করিতে বলিল।

সন্ধ্যা হয়-হয় সময়ে পিসীমা আসিলেন—সঙ্গে কুমুদা। তাঁহার মুখ দেখিয়া সুধীর বুঝিল—আষাঢ়ের আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছে, যখন-তখন বর্ষণ আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু সে জানিত, শীতল বাতাসের স্পর্শ না পাইলে মেঘের বক্ষে সঞ্চিত বাষ্প বারিবিন্দুতে পরিণত হয় না—যাহাতে তাহার ব্যবহারে সেই সুযোগ না ঘটে, সে সে বিষয়ে সতর্ক হইল।

সুধীর পিসীমা'কে প্রণাম করিয়া কেবল বলিল, "আমি আদালত থেকে ফিরে চিঠি পেয়েই গঙ্গাজল আন্‌তে পাঠায়েছি—এখনই এসে পড়বে।"

সে পিসীমা'র জিনিষপত্র লইয়া যাইতে ভৃত্যকে আদেশ করিল।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেণু ভাল আছে?"

সুধীর উত্তর দিল "হাঁ।"

"মাসীর বাড়ীতেই আছে?"

"না—আজ শ্বশুরবাড়ী গেছে।"

"ছেলে একটু মানুষের মত হয়েছে?"

"হাঁ।"

"কাল সকালে আমি এক বার নীরুর বাড়ী যা'ব—রেণুকে আর খোকাকে দেখে আসব।

"কিন্তু খোকা ত সেখানে নাই।"

পিসীমা যে ভাবে সুধীরের দিকে চাহিলেন, তাহাতে মনে হইল, তিনি চক্ষু দুইটি কপালে তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "তবে, কোথায়?"

"রেণুর মাসীর বাড়ী।"

"একা?"

"তা'র মাসীর কাছে।"

"সেখানে থাকবে?"

"তাই ত দেখছি।"

পিসীমা কুমুদাকে বলিলেন, "এ কি হেঁয়ালী।"

কুমুদা বলিল, "তাই ত!"

পিসীমা আপনার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন, সুধীর নিষ্কৃতি পাইয়া আপনার বসিবার ঘরে গেল।

রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়া হর্ম্ম্যতলে শয়ান কুমুদাকে উদ্দেশ করিয়া পিসীমা বলিলেন, "দেখলি, কুমুদা, ছেলের কি আকার হয়েছে?"

কুমুদা বলিল, "নেও কথা—তা' আর দেখিনি?"

পিসীমা আর কিছু বলিলেন না দেখিয়া কুমুদা বলিল, "তা' হ'বে নি, পিসীমা? জন্মে অবধি তুমি সব দেখেছ—গায় আঁচ লাগ্‌তে দাও নি।"

পিসীমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে সব কি সকলেই মনে রাখে? এ যে কলিকাল।"

"তা'র পর মা-মরা মেয়েটার উপর দিয়ে কি ঝড়ই বহে গেল।"

"তা'ও ত শুনলি—ছেলেটা তা'র মাসীর কাছে রয়েছে; এমন কথা ত কখন শুনি নি।"

"তা'ই ত গা। বুঝতাম, যদি বৌদিদি বেঁচে থাকত—তা'র কাছে ছেলে রেখে দু'দিন যেত, সে এক রকম হ'ত। তা' না—মাসীর কাছে ছেলে রেখে কোন্ প্রাণে গেল?"

"আর মাসী ত কখন ছেলে নাড়ে নি।"

"সেই ত। তা' তোমার বৌমাই বা কেন মত দিলে?"

"সে ত আমি কিছুই জানিনে—যাই এক বার—গেলেই পেটের কথা পা'ব।"

"তা' কি পা'বে?"

"পা'ব—বৌমা মানুষটা বড় সরল। পা'ব না ঐ মেয়ের কথা। ও যে কি ভেবে কি করেছে, তা' সহজে কেউ জানতে পারবে না।"

"আচ্ছা, পিসীমা—মাসীর সম্পত্তি ত শুনি অনেক—সে সব গুছিয়ে আনবার ফিকির নয় ত?"

"হ'তেও পারে।"—এ কথাটা এতক্ষণও যে তাঁহার মনে হয় নাই ইহাতে পিসীমা বিস্মিতা হইলেন। এখন তাঁহার চিন্তার গতি সেই দিকে হইল। তিনি ভাবিলেন, তবে কি সুধীরও এই ব্যবস্থার মধ্যে আছে? কে বলিবে? তিনি কুমুদাকে বলিলেন, "আমরা সেকেলে লোক—অত ফন্দি-ফিকির বুঝি নে। এ কালের চাল-চলন সবই ভিন্ন হয়ে গে'ছে। তা'ই ত সংসারে আমাদের আর স্থান নাই।"

কুমুদা ভয় পাইল। পিসীমা'র সঙ্গে তীর্থবাসে তাহার কোনরূপ আগ্রহ ছিল না। সে মনে করিয়াছিল, পিসীমা যখন ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন সে কথা আর উঠিবে না। কিন্তু এ ত ভাল সুর নহে! সে বলিল, "নেও কথা—বুড়ো হ'লে কি বাপ মা'কে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়?"

পিসীমা বলিলেন, "তাই ত দেখছি। শুনিস নি গোরারা ঘোড়া বুড়ো হ'লে, তা'কে গুলী ক'রে মেরে ফেলে। এখন তাই চল হয়েছে।"

"গোরারা কি বাঙ্গালী?"

"এখন বাঙ্গালী যে গোরার চা'ল শিখছে।"

"তুমি যা'ই কেন মনে কর না, পিসীমা, দাদাবাবু তেমন ছেলে নয়।"

"আমিও ত তাই ভাবতাম। এখন দেখছি সবই সমান।"

"দেখছ না, কি আকার হয়েছে! তুমি কি ফেলে যেতে পার? কথায় বলে—

'কুপুত্র যদিও হয়,
কুমাতা কখন নয়।'

তুমি ত দাদাবাবুর মা'র বাড়া।"

"মা মরে বেঁচেছে—থাকলে তা'রও হয়ত এমনি খোয়ার হ'ত।"

পিসীমা চুপ করিলেন। কুমুদা কি বলিবে ভাবিতে লাগিল। এমন সময় পিসীমা'র নাসিকানির্গত শব্দ তাঁহার সুপ্তির আগমন ঘোষিত করিল।

পথের শ্রমে কুমুদাও শ্রান্ত হইয়াছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সে'ও ঘুমাইয়া পড়িল। তবে সে মনে করিল, পিসীমা আর যাইবেন না। সে বহু তীর্থ দেখিয়াছে বটে, কিন্তু তীর্থ তীর্থই ভাল—বাস করিবার জন্য নহে—যে স্থানে লোকের ভাষা বুঝিতে পারা যায় না, সে স্থানে কি কখন বাস করা যায়? বিশেষ কলিকাতাও ত বড় তীর্থ—গঙ্গার কূলে।

সে রাত্রিতে সুধীর ঘুমাইতে পারিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন কেবল রহস্যভেদে অক্ষম হইতেছে। রেণু তাহার পুত্রকে মাসীমা'র কাছে রাখিয়া গেল—কিন্তু সে বিষয়ে তাহার সহিত কোনরূপ পরামর্শও করিল না! নীরেন্দ্রও তাহাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলে নাই! অথচ রেণুই এই দগ্ধ জীবনে তাহার স্নেহের একমাত্র অবলম্বন—রেণুর জন্য সে কোন ত্যাগই দুষ্কর বলিয়া মনে করে না। রেণুর মাতার মৃত্যুর পর হইতেই সে লক্ষ্য করিতেছিল, পিতা-পুত্রীতে সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন হইতেছিল। রেণু আর তাহার সব আব্দার তাহার কাছে করিতে আসিত না—সে যেন একটু স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে সুধীর হৃদয়ে বেদনানুভব করিয়াছিল, কিন্তু মনে করিয়াছিল, তাহা রেণুর বয়সের ফল—সে যত দিন বালিকা ছিল, তত দিন যেমন ভাবে পিতার কাছে আদর পাইতে ও আব্দার করিতে আসিত, বাল্যকাল কৈশোরে পরিণত হইলে আর তাহা পারে নাই বলিয়া তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

তাহার পর রেণুর বিবাহ। রেণুর বিবাহে সে তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে ধারণা মনে মনে গঠিত করিয়াছিল, সে সেই ধারণানুসারে কায করিতে পারিল না। মৃণালিনী যাহা বলিলেন, তাহাতে সে আপনার উপর আপনি অসন্তুষ্ট হইল—মৃণালিনী তাহার যে মনোভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সে তাহা পারে নাই। কিন্তু তখন সে আপনাকে বুঝাইয়াছিল, রেণু স্বাভাবিক লজ্জাহেতু তাহাকে তাহার মনোভাব বুঝিতে দেয় নাই। কন্যার সুখই তাহার কাম্য। সে বিবাহে আর কোন আপত্তি করে নাই।

কিন্তু এ বিবাহে রেণু কি সত্যই সুখী হইয়াছে? সে বিষয়ে সে কখন নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, রুগ্না জননীর অপরিসীম স্নেহে বৰ্দ্ধিতা—এক সংসারের সমগ্র স্নেহের অধিকারিণী রেণু যে সপত্নীর কন্যাপুত্রকে পালন করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, ইহা সুধীর বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিত না। সে কেবল মনে করিত, সে বিষয় ভাবিয়া আর ফল কি?

তাহার পর রেণু সন্তান লাভ করিল। যদি বিবাহিত জীবনে তাহার সুখে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা থাকিয়া থাকে, তবে সন্তানের প্রতি স্নেহে সে তাহা অবজ্ঞা করিতে পারিবে মনে করিয়া সুধীর অগাধ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু এ কি! রেণুর যে পুত্র দীর্ঘকাল জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে থাকিয়া চিকিৎসকদিগের সর্ব্ববিধ চেষ্টায় ও মৃণালিনীর অপরিসীম শুশ্রূষায় মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, রেণু তাহাকে রাখিয়া স্বামীর গৃহে ফিরিয়া গেল—সপত্নীর কন্যাপুত্রকে মাতৃস্নেহ দিয়া আপনার পুত্রকে তাহাতে বঞ্চিত করিল! সুধীর ইহা কিছুতেই স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতে পারিতেছিল না। রেণু যে তাহাকে এ কথা পূর্ব্বে ঘুণাক্ষরেও জানিতে দেয় নাই, তাহাতে রহস্য যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

আজ তাহার মনের মধ্যে কাত্যায়নীর অভাব যেন নূতন ও প্রবল ভাবেই অনুভূত হইতে লাগিল। পুরুষ দম্ভবশে মনে করে, সে যখন সংসারের ব্যয়ভার বহন করে, তখন সংসার তাহার। কিন্তু এমনই এক একটা ঘটনা তাহার দম্ভ চূর্ণ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেয়—সংসারের কেন্দ্র স্বামী নহে—স্ত্রী। কাত্যায়নী জীবিতা থাকিলে—তিনি রোগশয্যায় থাকিলেও কখন এমন হইতে পারিত না। আজ সুধীর একান্ত অসহায়। সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, কিছুরই প্রতীকার করা সম্ভব বলিয়া মনে করিতেছে না। আজ তাহার মনে হইল, কাত্যায়নীর তিরোভাব কেবল যে তাহাকে অসহায় করিয়াছে, তাহার সংসার শ্রীহীন করিয়াছে, তাহা নহে—পরন্তু তাহাকে তাহার কন্যার ভালবাসাতেও বঞ্চিত করিয়াছে। সে মনে করিয়াছিল, পিসীমা'র ব্যবহারেই রেণু বিরক্ত হইয়াছে—তাই সে পিসীমা'কেই সংসার হইতে সরাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্টের এ কি উপহাস—যে দিন রেণু পুত্রকে রাখিয়া স্বামীর গৃহে গেল, সেই দিনই পিসীমাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন!

১৮

রেণুকে আনিবার জন্ম কণা ও অশোককে পাঠাইয়া পূর্ণিমা কেবল ঘর আর বারান্দা করিতেছিলেন—তিনি উৎকর্ণ হইয়া ছিলেন, কখন মোটরের হর্ণ বাজিবে। তাঁহার ব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া পুরাতন দাসী হাসিয়া বলিল, "মা, মেয়েরা বাড়ীতে বিয়ের বর আসবার পিত্তিখ্যেয় যেমন ব্যস্ত হয়, তুমি যে তেমনি হ'লে!" পূর্ণিমা হাসিয়া বলিলেন, "আজ যে বরই আসবে রে।" দাসী বলিল, "তাই বুঝি? তা' কা'র বর আসবে, মা?" পূর্ণিমা হাসিয়া বলিলেন, "বোধ হয়, আমারই।"

রেণুর এই পুত্রটির প্রতি তিনি স্বভাবতঃ স্নেহশীল। পূর্ণিমার স্নেহ অত্যধিক হইবারও কারণ ছিল। নীরেন্দ্র তাঁহার একমাত্র সন্তান—বিধবার অন্ধের যষ্টি। বিপত্নীক হইয়া সে যখন আর বিবাহ করিতে চাহে নাই, তখন তাঁহার ভাবনার ও আশঙ্কার অন্ত ছিল না। ভাবনা—কে নীরেন্দ্রকে দেখিবে? নীরেন্দ্র বাল্যকালাবধি তাঁহার স্নেহাধিক্যে পরনির্ভরশীল হইয়াছিল। আর কণা ও অশোককেই বা কে দেখিবে? আশঙ্কা—যদিও নীরেন্দ্র নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র, তবুও মানুষের মন—পিচ্ছিল পথে কখন কি বিপদ ঘটে, কে বলিতে পারে? রেণুকে আনিয়া তাঁহার সব ভাবনা ও সব আশঙ্কা তিরোহিত হইয়াছিল। বিশেষ রেণু যে মাতৃহীন শিশুদ্বয়ের মা-ই হইয়াছিল, তাহাতে তিনি অপরিসীম আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। রেণুর পীড়ার সময় তাঁহার হৃদয়ে নূতন আশঙ্কার উদ্ভব হইয়াছিল, বুঝি তাঁহার অদৃষ্টে তত সুখ সহিল না! সে আশঙ্কা যখন দূর হইল, তখন নূতন আশঙ্কা - রেণুর অকাল-প্রসূত পুত্রকে লইয়া। সে কি বাঁচিবে? মৃণালিনীর অসীম ও অসাধারণ চেষ্টায় সে আশঙ্কার কারণও দূর হইয়াছে। তাই পূর্ণিমা পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

আজ রেণুর পুত্র বাড়ীতে আসিবে, এ যে তাঁহার আশাতীত সৌভাগ্যের পরিচায়ক!

মৃণালিনীর গৃহ হইতে নীরেন্দ্রের গৃহে আসিতে হইলে যে স্থানে দুইটি রাস্তা মিশিয়াছে, সেই স্থানে আসিয়া সফার মোটরের হর্ণে আওয়াজ করিল। সেই পরিচিত শব্দ শুনিয়া পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি বারান্দায় যাইয়া দেখিলেন, গাড়ী আসিতেছে। তিনি ব্যস্ত হইয়া নামিয়া দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। ততক্ষণে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

গাড়ী হইতে কণা ও অশোক নামিল, তাহার পর রেণু নামিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। "থাক্! থাক্!" বলিয়া পূর্ণিমা তাহাকে তুলিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "এস, আমার মা-লক্ষ্মী, এস। বাড়ী যেন অন্ধকার ছিল - আজ আবার আলো হ'ল।"

দাসী নামিয়া আসিয়া তথায় দাঁড়াইয়াছিল। পূর্ণিমার দৃষ্টি কাহার সন্ধান করিতেছিল। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি বলিলেন, "খোকা বাবু কই?"

রেণু বলিল, "সে মাসীমা'র কাছে আছে।" বলিবার সময় বুঝি তাহার কণ্ঠস্বর একটু কম্পিত হইয়াছিল।

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রেণু কি বলিতে যাইয়া আপনাকে সামলাইয়া লইল—চুপ করিয়া রহিল।

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীর ভাল আছে ত?"

রেণু বলিল "হাঁ।"

পূর্ণিমার মনে হইল, তিনি রেণুর চক্ষুতে একটা অসাধারণ দৃষ্টি লক্ষ্য করিলেন—আষাঢ়ের সজল জলদপূর্ণ আকাশে যদি বিদ্যুদ্দীপ্তি দেখা যায়, তবে যেন এমনই মনে হয়। অজানা আশঙ্কায় পূর্ণিমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী, বলিলেন,—"তা' থাক, আরও দিন কয়েক সেখানে থাকুক। সত্যি, বাপু, বেহান যেমন ক'রে ওকে 'মানুষ' করেছেন, তেমন করতে আমরা পারতুম না—যত্ন বটে! যেন একটা সাধনা!"

যাহার প্রতীকারোপায় থাকে না, তাহা মানুষ যেমন অনিবার্য্য বলিয়া গ্রহণ করে, রেণুর এই ব্যবস্থা তিনি তেমনই ভাবে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে মনে শান্তি বা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিলেন না এবং তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—তিনি যে মনে করিয়াছিলেন, তিনি বিরূপ অদৃষ্টকে প্রসন্ন করিতে পারিয়াছেন, তাহা হয়ত সত্য নহে। নহিলে এমন অঘটন ঘটিল কেন? প্রথমতঃ, মা যে তাহার শিশুপুত্রকে ছাড়িয়া স্বেচ্ছায় থাকিতে চাহে, ইহাই আমাদিগের দেশের মহিলাদিগের কল্পনাতীত। দ্বিতীয়তঃ, রেণুর প্রকৃতি তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। সেই প্রকৃতিগুণেই সে তাঁহার স্নেহ আকৃষ্ট করিয়াছিল। যে সপত্নীর পুত্রকন্যাকে আপনার সন্তানের মত স্নেহ দান করে, সে কেমন করিয়া আপনার পেটের ছেলেকে রাখিয়া

আসিল ? সে কণার ও অশোকের জন্যই মৃণালিনীর সঙ্গে যাইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিল এবং তিনি তাহাকে পাঠাইতে জিদ করিলে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। এই মাতৃহীনদিগের প্রতি তাহার স্নেহ তাহারাও মাতৃস্নেহ বলিয়াই মনে করিয়াছে। সত্য বটে, মৃণালিনী যে যত্নে শিশুকে পালন করিয়াছেন, সে যত্ন সুলভ নহে ; কিন্তু তবুও মা'র মনে কেমন করিয়া সন্তানকে রাখিয়া আসিবার মত দৃঢ়তা লাভ করিল, তাহা পূর্ণিমা বুঝিতে পারিলেন না। তাই তিনি এই ব্যাপারে কেমন যেন আশঙ্কার আবির্ভাব মনে করিতে লাগিলেন।

কিন্তু পূর্ণিমা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—তিনি তাঁহার আশঙ্কার ও অশান্তির কথা প্রকাশ করিলেন না ; রেণুর পুত্রকে রাখিয়া আসা অনিবার্য্য বলিয়া যথাসম্ভব শান্তভাবেই গ্রহণ করিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে করিলেন—তিনি পৌত্রকে লইয়া আসিবেন। রেণু যে তাহাকে আনিবে না, স্থির করিয়াছে, তাহা তিনি মনে করিতে পারিলেন না। কেনই বা রেণু তাহা স্থির করিবে ?

এ-দিকে যে খোকাকে আনা হয় নাই, তাহাতে কণার ও অশোকের দুঃখের সীমা ছিল না। সে কথা তাহারা মা'কে বলিয়াছিল—বাড়ীতে আসিয়াই বাবাকে জানাইতে গিয়াছিল। অশোক বলিয়াছিল, "বোধ হয়, আমি দুষ্ট ব'লেই মা ভাইটিকে আনে নি। কিন্তু, বাবা, আমি সত্যি বলছি, আমি ভাইটিকে মারব না। তুমি মা'কে ব'লে খোকাকে আন।"

কণা অশোককে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল, "তুই মারবি ব'লে যে মা তা'কে রেখে এসেছেন, তা' ত নয়। মা ত বল্‌লেন, দিদিমা ছাড়া আর কেউ ওকে 'মানুষ' করতে পারবেন না।"

অশোক কিন্তু পরাভব স্বীকার করিল না। সে বলিল, "কেন, এখানে সকলে কি পারে না ?"

নীরেন্দ্র নির্ব্বাক্ হইয়া কন্যার ও পুত্রের কথা শুনিতেছিল। সে বড় অন্যমনস্ক। এ কি হইল—কেন এমন হইল ? তাহার মনেও অজানা আশঙ্কার মেঘ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। সে মনে করিতেছিল—অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া কি কেহ জয়ী হইতে পারে ?

পিতার কাছে অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া কণা ও অশোক রেণুর কাছে ফিরিয়া গিয়াছিল।

ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সফার জিজ্ঞাসা করছে, বেড়াতে যা'বেন কি ?"

সে কথা নীরেন্দ্রের মনেই ছিল না। ভৃত্যের কথা শুনিয়া সে বলিল, "ছেলেদের জিজ্ঞাসা ক'রে আয়।"—বলিয়াই সে বলিল, "আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা ক'রে আস্‌ছি।"

নীরেন্দ্র যখন পুত্রকন্যার কাছে গেল, তখন পূর্ণিমা কার্য্যান্তরে গিয়াছেন, অশোক রেণুর ক্রোড়ে বসিয়া খোকাকে আনিবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইতেছে—কণা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। নীরেন্দ্রকে দেখিয়া রেণু মাথার উপর কাপড় টানিয়া দিল।

নীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "খোকাকে রেখে এসেছ ?"

রেণু মৃদুস্বরে উত্তর দিল—"হাঁ।"

"কেন ?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে রেণুর একটু বিলম্ব হইল। কারণ, তাহার বুকের মধ্যে যে বিক্ষোভ অনুভূত হইতেছিল, তাহা বৈশাখদিনান্তবাত্যায় সমুদ্রসলিলের বিক্ষোভের সহিতই তুলনীয়। সে প্রবল চেষ্টায় সেই বিক্ষোভের মধ্যে বলিল—"তাই ভাল মনে করেছি ব'লে।"

"মাসীমা ছাড়া কেউ তাকে 'মানুষ করতে' পারবে না বলে ?"

রেণু মৃদুভাবে বলিল, "না।"

"তবে ?"

"আমার নিজের মন দুর্ব্বল, তাই।"

"সে কি ?"

"যা'দের মা না হয়েও মা'র কর্ত্তব্য করবার জন্য, আমি এ বাড়ীতে এসেছি—পাছে নিজের ছেলে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তা'দের অযত্ন হয়—আমার কর্ত্তব্যে ত্রুটি ঘটে, সেই ভয়ে তা'কে আনিনি।"

কেহ অতর্কিত আক্রমণে বক্ষে ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলে মানুষের যেমন হয়, নীরেন্দ্রের তেমনই হইল। সে বুঝিল—এ ছুরিকা তাহারই ; তাহারই কার্য্যফলে তাহা তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইয়াছে। তাহার মুখ রক্তশূন্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, তাহার পদতল হইতে হর্ম্ম্যতল সরিয়া যাইতেছে—সে সীমাতীত গভীর গহ্বরে পতিত হইতেছে।

কোনরূপে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া সে বলিল, "কিন্তু তা'র সম্বন্ধে কি আমাদের কোন কর্ত্তব্যই নাই ?"

"বোধ হয়, না।"—একটু থামিয়া, রেণু বলিল, "বোধ হয়, তা'র সম্বন্ধে তা'র মা'রও কোন কর্ত্তব্য আছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল ব'লেই ভগবান্

তা'কে জীবনধারণের সব সম্বল দিতে দেন নি। সেখানে তিনিও—"

রেণুর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া তাহার পর আর বাহির হইল না।

নীরেন্দ্র আর শুনিতে পারিল না। তাহার চক্ষুর সম্মুখে দিনের আলো যেন পীতবর্ণ হইয়া ক্রমে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। এক দিন সে অসতর্ক হইয়া যে কথা বলিয়াছিল, তাহাই আজ অজস্র ধিক্কাররূপে তাহার কর্ণ যেন বধির করিয়া দিতে লাগিল।

রেণু এতক্ষণ পাষাণপ্রতিমার মত ছিল—কেবল যন্ত্র হইতে যেমন শব্দ বাহির হয়, তাহার মুখ হইতে তেমনই কথা বাহির হইতেছিল। নীরেন্দ্র চলিয়া যাইবার পর—যে উত্তেজনায় সে তাহার কথার উত্তর দিয়াছিল—বক্ষে দারুণ আঘাতে যেমন মানুষের মুখ দিয়া রক্ত বাহির হয়, তেমনই তাহার কথা বাহির হইয়াছিল—সে উত্তেজনার কারণ যখন আর রহিল না, তখন সে ভাবিল —সে এ কি করিল? সে যে সব ব্যথা নীরবে সহ্য করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল! আজ সে যাহা করিল, তাহা নীরেন্দ্র যদি অভিমানের অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করে? অভিমান! কাহার উপর অভিমান?

সে আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না—তাহার পুত্র আসিবে বলিয়া পূর্ণিমা যে শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার উপর পড়িয়া—মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কণা ও অশোক তাহার ভাব দেখিয়া প্রথমে একটু স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তাহার পর তাহারাও কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে ডাকিতে লাগিল—"মা! মা!" এ বার আশঙ্কায় রেণু উঠিয়া বসিল—ছিঃ, সে তাহার দৌর্ব্বল্য এমনভাবে প্রকাশ করিল। সে আপনাকে আপনি ধিক্কার দিল; অতি কষ্টে রোদনোচ্ছ্বাস দমিত করিয়া বলিল, "কি বল্‌ছ?"

"তুমি কাঁদ্‌ছ কেন, মা? খোকার জন্যে?"—বলিয়া অশোক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রেণু বলিল, "না, বাবা!"

তাহার মনে হইল, যদি কেহ আসিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ দেখিতে পায়? "আমি আসছি"—বলিয়া সে মুখ প্রক্ষালিত করিবার জন্য দ্রুতপদে স্নানের ঘরের দিকে গেল।

এ দিকে কণা অশোককে বলিল, "ভাই, তুই এখানে থাক। আমি যাই—দিদিকে ব'লে আসি, মা বড্ড কাঁদছে।"

রেণু স্নানের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বসিতে না বসিতে কণার কথায় শঙ্কিতা পূর্ণিমা তাহাকে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পূর্ণিমার মনে হইয়াছিল, রেণু পুত্রকে রাখিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জন্য তাহার মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে—মা'র মন! তিনি আসিয়াই রেণুকে বলিলেন, "মা, তুমি ভুল করেছ। তা'কে কি রেখে আস্‌তে আছে? আমি যাচ্ছি, তা'কে নিয়ে আসি; আপনার বাড়ী আসবে, দিন ক্ষণ অত না-ই বা দেখা হ'ল!"

কণা বলিল, "আমিও যা'ব।"

পূর্ণিমা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তুমি ত গেছলে, দিদি, আন্‌তে পার নি। দেখবে, আমি গিয়েই নিয়ে আসব।"

রেণু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, মা—সে কিছুতেই হ'বে না।"

পূর্ণিমা মনে করিলেন, মাতৃহৃদয়ে স্নেহে ও শঙ্কায় দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। তিনি সস্নেহে তাহার স্কন্ধে আপনার দক্ষিণ করতল স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "ভয় কি, মা, তুমি থাকতে কি তা'র অযত্ন হ'বে? আমরা দু'জনে তা'কে 'মানুষ ক'রে' তুল্‌তে পারব।"

"না। তা'র জন্যে আমার কোন ভাবনা নাই।"

"সে হ'বে না। তুমি কেঁদে কেঁদে দেহপাত করবে, সে আমি হ'তে দেব না। তা' হ'লে, তোমাকে আবার বেহানের বাড়ী পাঠা'তে হ'বে।"

"আমি বল্‌ছি, আমি তা'র জন্যে এতটুকু ভাবি নি। যদি দেখেন, আমি ভাবছি, তখন যা' বলবেন, আমি তা'ই করব। দয়া ক'রে, আজ তাকে আনবেন না।"

পূর্ণিমা তাহার উক্তির কাতরতায় ব্যথিতা হইলেন; বলিলেন, "আচ্ছা, আজ আমি না হয় না-ই আনলাম; কিন্তু তোমার এ কথা আমি শুনব না।"

এক দিনের জন্য অব্যাহতি লাভ করিয়াও রেণু যেন কতকটা স্বস্তি পাইল—আসন্ন বিপদ কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনের চাঞ্চল্য দূর হইল না। সে কেবলই আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। কেন সে নীরেন্দ্রকে আপনার মনের গোপন কথা বলিল—কেন সে আপনার উচ্ছ্বসিত রোদনোচ্ছ্বাস সংযত ও গোপন করিতে পারিল না?

সে পূর্ণিমাকে গৃহকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে গেল—কাযে অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার আশায়।

সমস্ত দিন ও সন্ধ্যা সে কারণে অকারণে কাযে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিল। মাসীমা'র বাড়ী হইতে আসিবার সময় সে যে আহার করিয়া আসিয়াছিল, তাহার পর সে যে আর রাত্রিতে আহার করিবে না, তাহা সে পূর্ব্বেই পূর্ণিমাকে জানাইয়া দিয়াছিল। কণা ও অশোকের আহার শেষ করাইয়া সে তাহাদিগকে শয্যায় লইয়া শয়ন করিল—অশোককে তাহার বুকের কাছে টানিয়া লইল। পূর্ণিমা যখন আসিয়া তাহাকে তাহার ঘরে শুইতে বলিলেন, তখন সে বলিল—অশোক তাহার কাছে থাকুক। পূর্ণিমা বুঝিতে পারিলেন না, সে আপনার ও স্বামীর মধ্যে তাহার স্নেহ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের এই ধারণাকে ব্যবধান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি ভাবিলেন, আপনার পুত্রকে রাখিয়া আসিয়া রেণু যে শূন্যভাব অনুভব করিতেছে, তাহাই পূর্ণ করিবার চেষ্টায় সে আশোককে বুকে টানিয়া লইতেছে। তিনি তাহাতে বাধা দিলেন না। কিন্তু তাঁহার মনে হইল, শিশুকে না আনিলে চলিবে না।

কিন্তু সে কথা নীরেন্দ্রকে জানাইতে যাইয়া তিনি তাহার নিকট সহানুভূতির আগ্রহ পাইলেন না! নীরেন্দ্র রেণুর কাযের ও ব্যবহারের কারণ তাহার কথায় বুঝিতে পারিয়াছিল। সেই উক্তিতে সে তাহার ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়াছিল; বুঝিয়াছিল, আপনার কর্ম্মফলে তাহাকে সমস্ত জীবন বেদনা পাইতে হইবে—সে কখনই আপনার সৃষ্ট অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে না! সে বলিল, "মা, রেণুর যদি তা'কে সেখানে রাখতেই ইচ্ছা হয় তবে তা'তে বাধা দিয়ে কায নাই।"

পূর্ণিমা বিস্মিতভাবে পুত্রের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, পুত্রবধূর ও পুত্রের ব্যবহারে কোন রহস্য আছে—তিনি তাঁহার সরল বুদ্ধি লইয়া কিছুতেই সে রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছেন না।

১৯

তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনী যখন দিবসের শ্রমশ্রান্ত জীবের জন্য সুপ্তি বিতরণ করে, তখন যে কেবল নিশাচর পক্ষী ও পতঙ্গ প্রভৃতি জাগিয়া থাকে, তাহা নহে। তখন অনেক মানুষের নেত্রও সুপ্তিতে মুদিত হয় না—তাহাদিগের হৃদয়ের দুশ্চিন্তাই তাহাদিগকে জাগাইয়া রাখে।

যে দিন অপরাহ্নে রেণু তাহার পুত্রকে মৃণালিনীর স্নেহ-শীতল অঙ্কে রাখিয়া—প্রবল রোদনোচ্ছ্বাস প্রবলতর দৃঢ়তায় রুদ্ধ করিয়া স্বামীর গৃহে ফিরিয়া আসিল, সে দিন রাত্রিকালে এই উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পাঠকের পরিচিত অনেক গৃহেই সুপ্তিহীনের চিত্ত আশঙ্কায় ও বেদনায় চঞ্চল হইয়াছিল।

সে রাত্রিতে সুধীর ঘুমাইতে পারিল না। কিছুদিন হইতেই রেণুর ব্যবহারে তাহার মনে হইতেছিল, তাহাতে কোন রহস্য আছে—সে তাহা ভেদ করিতে পারিতেছে না। রেণুর শ্বশুরালয় হইতে আসিতে অসম্মতি তাহাকে যেমন ব্যথিত করিয়াছিল, তেমনই চিন্তিত করিয়াছিল। তাহার পর আজিকার এই ঘটনা—সে অনায়াসে পুত্রকে তাহার মাসীমা'র কাছে দিয়া চলিয়া গেল; সে পূর্ব্বে তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই, মৃণালিনীর কথায় মনে হইল, তিনিও বিশেষ কিছু জানিতেন না—এ কি রহস্য? সে যে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া এক দিনও পিতৃগৃহে থাকিতে চাহে না, সেই শ্বশুরালয়ে কি তবে তাহার পুত্রের অযত্নের—অনাদরের কোন সম্ভাবনা আছে? ভাবিয়া সুধীর যেন বক্ষে বিষম বেদনানুভব করিল। তাহার মনে পড়িল, সে যে রেণুকে পিসীমা'র সঙ্গে নীরেন্দ্রের গৃহে যাইতে দিয়াছিল, সে জন্য সে আপনাকে ধিক্কার দিয়াছিল। সে ভুল করিয়াছিল। কিন্তু রেণুর মনোভাব বুঝিতে কি মৃণালিনীরও ভুল হইয়াছিল? সুধীর স্বয়ং পুরুষ বা নারীর একাধিকবার বিবাহ সুখের হয় বলিয়া বিশ্বাস করিত না। তবুও সে যে নীরেন্দ্রের সহিত রেণুর বিবাহে সম্মতি দিয়াছিল, সে-ও কি ভুল বুঝিয়া? মাতৃহারা কন্যার মনের কথা কে বুঝিতে পারে? যিনি তাহাকে জননীর স্নেহই দিয়াছেন, তিনি কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই? সুধীর তাহার বিপত্নীক জীবনে আপনাকে অভ্যস্ত করিয়াছিল। কিন্তু এমনই এক একটা ঘটনা তাহাকে তাহার অবস্থার বেদনা যখন বুঝাইয়া দিত, তখন তাহার মনে হইত—সেকালে হিন্দু স্ত্রী কেন স্বামীর চিতায় সহমৃতা হইতে চাহিতেন, তাহা সে অনুমান করিতে পারে। সে অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিবার চেষ্টা কখন করে নাই; পরন্তু অদৃষ্ট সুখ ও দুঃখ যাহা দিয়াছেন, নতমস্তকে তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। সুখ ও দুঃখ কিছুই তাহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু রেণুর সম্বন্ধে সে কি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছে? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে রেণুর জননীর দেহমুক্ত আত্মা কি সে জন্য তাহাকে ক্ষমা করিবে? সে তাহার পরলোকগতা পত্নীর উদ্দেশে মনে মনে বলিল—"জীবনে কখন তোমার কাছে কোন কথা গোপন করি নাই,

তুমিও কোন দিন আমাকে ভুল বুঝ নাই। আজ কি তুমি বিশ্বাস করিবে না—আমি যদি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া থাকি, তবে সে ইচ্ছা করিয়া নহে, ভুল বুঝিয়া? তুমি কি সে জন্য আমাকে ক্ষমা করিবে না?"

বুঝি বেদনার নির্ঝরমুখ চেষ্টার প্রস্তরাবৃত ছিল—সে আবরণ সহসা সরিয়া গেল। আজ সুধীর শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া কান্দিতে লাগিল। সে এখনও ব্যবহারাজীবের কায করিতেছে, সমাজে মিশিতেছে, লোকের সঙ্গে হাসিয়া কথা কহিতেছে, প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে লোকের সহিত আলাপ করিতেছে—কিন্তু সে কিসের জন্য? তাহার জীবনে কি আকর্ষণ আছে? কিসে তাহার হৃদয়ের বিরাট শূন্য পূর্ণ হইতে পারে? মৃণালিনীর কথা তাহার মনে পড়িল—তিনি স্বামীর স্মৃতি দেবতার স্বরূপের সহিত এক করিয়া শোকে সান্ত্বনা পাইয়াছেন। তিনি ধর্ম্মাচরণে শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন। সে তাহা লাভ করিবার আশাও করিতে পারে না। আজ যে রেণু তাঁহাকে তাহার পুত্রের পালন ভার দিয়াছে, সে-ও বুঝি দেবতার দান। তিনি নিষ্ফল বক্ষে শিশুকে লাভ করেন নাই—মাতৃত্বের অতৃপ্ত কামনা বক্ষে বহন করিয়াছিলেন, তাই দেবতা বালগোপালের রূপে তাঁহার সে কামনা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। নহিলে এমন অঘটন সংঘটিত হইবে কেন?

সুধীর এইরূপ চিন্তায় বিচলিত হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, সে মেঘান্ধকার অমাবস্যার রাত্রিতে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তরণী ভাসাইয়া একা যাত্রী ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। তাহার রক্ষা পাইবার উপায় নাই—বুঝি আগ্রহও নাই। জলে জলবিম্বের মত তাহার লক্ষ্যহীন জীবন মৃত্যুর ফুৎকারে বিলীন হইয়া যাইলে ক্ষতি কি?

সমস্ত রাত্রি সে যেন দুশ্চিন্তার কণ্টকশয়নে কাটাইয়া প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিল। তখন তাহার মস্তকে যেন ভারানুভব হইতেছে, দেহে অবসন্নতা, চক্ষুতে রক্তাভা। সে উঠিয়া যাইয়া স্নান করিয়া অভ্যাসানুসারে কায করিতে বসিল; কিন্তু কায ভাল লাগিল না। তবে সে যখন মামলার নথীপত্র লইয়া পাঠ করিতে লাগিল, তখন সে তাহাতেই যেন মগ্ন হইয়া গেল—সে-ও অভ্যাসবশে।

সে রাত্রিতে পূর্ণিমাও ঘুমাইতে পারিলেন না। তাঁহারও মনে হইতে লাগিল—তিনি রহস্যলোকে উপনীত হইয়াছেন। রেণুর ব্যবহার তাঁহার মনে ধারণা জন্মাইয়া দিতে লাগিল—একটা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা তাহার করাল ছায়া বিস্তার করিতেছে; নিদাঘদিনান্তে যখন আকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘ সঞ্চিত হয়, তখন ঝড়ের আঘাত অনুভূত হইবার পূর্ব্বে যেমন তাহার গর্জ্জন—দূরাগত বৃহৎ পক্ষীর পক্ষতাড়িত পবনের শব্দের মত শ্রুত হয়, তিনি তেমনই প্রলয়বাত্যার দূরাগত গর্জ্জন শুনিতে পাইতেছেন। তিনি আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। তিনি মৃদুস্বভাবহেতু অল্পে আতঙ্কানুভব করেন। তাহার পর তিনি জীবনে শোক পাইয়াছেন, তাই অজানা বিপদের আশঙ্কা তাঁহাকে বিচলিত ও ব্যথিত করিতে লাগিল। নীরেন্দ্রই তাঁহার স্নেহের অবলম্বন—যখন তাহার সংসারের কেন্দ্র হইতে তাহার স্ত্রী অন্তর্হিত হইয়াছিল, তখন তিনি যেন সংসার বিবর্ণ দেখিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি বড় আশা করিয়া রেণুকে আনিয়া সেই স্থানে বসাইয়াছেন—তাহার ব্যবহারে তাঁহার মনে আবার কত আশা উদ্ভূত হইয়াছিল—যেন শুষ্ক শাখা আবার কুসুমে পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু রেণুর আজিকার এই ব্যবহার কি সে আশা নির্ম্মূল করিয়া দিল?

কিন্তু রেণুর কি হইয়াছে, তাহা পূর্ণিমা ঠিক করিতে পারিলেন না; সে যদি ব্যথা পাইয়া থাকে, তবে সে ব্যথার উৎস কোথায়, তাহা তিনি সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন না। সে কেন তাহার পুত্রকে রাখিয়া আসিল—কেমন করিয়া মা হইয়া পুত্রকে রাখিয়া আসিতে পারিল? সে কান্দিতেছে শুনিয়া তিনি যেন আশ্বস্তা হইয়াছিলেন—মনে করিয়াছিলেন, রেণুর মাতৃহৃদয়ে যে ব্যথা, তাহার সন্ধান তিনি পাইয়াছেন—সে ব্যথা তিনি দূর করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার কথায় তিনি আরও বিস্মিতা হইয়াছিলেন। সে কি জন্য দৃঢ়ভাবে বলিয়াছে, "তা'র জন্য আমার কোন ভাবনা নাই"—কেন সে ভাব দৃঢ়তাসহকারে ব্যক্ত করিয়াছে? সে কি কোন কারণে মনে করিয়াছে, তাহার গৃহে তাহার পুত্রের উপযুক্ত স্নেহ ও যত্ন মিলিবে না? তবে কি সপত্নীসন্তানদিগের আদরের প্রাচুর্য্য তাহার হৃদয়ে কোনরূপ বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছে? কিন্তু কণা ও অশোকের প্রতি তাহার ব্যবহারে ত তাহা মনে হয় না। সে যে অশোককে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া শয়ন করিয়াছে—সে কি কখন ছলমাত্র হইতে পারে? তাহা মনে করিবার কোন কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি কেবলই ভাবিতে লাগিলেন।

রেণুর সুপ্ত শিশুকে শয্যায় লইয়া শয়ন করিয়া মৃণালিনীও ঘুমাইতে পারিলেন না। রেণু পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে যাহাই কেন বলিয়া থাকুক না, সে যে সত্য-

সত্যই পুত্রকে তাঁহার কাছে রাখিয়া যাইতে পারিল, ইহাতে তিনি বিশেষ বিস্ময়ানুভবই করিলেন। সে তাঁহার কাছে আসিবার সময় স্বামীর পুত্র-কন্যাকে লইয়া আসিয়াছিল, আর যাইবার সময় আপনার পুত্রকে তাঁহার কাছে রাখিয়া গেল—তাহার এই দুই ব্যবহারে কিরূপে সমঞ্জস্যসাধন করা সম্ভব? মাতৃস্নেহ কি কখন এমন রূপ ধারণ করিতে পারে?

তাঁহার এক বার মনে হইল, হয়ত তিনি শিশুকে রাখিতে সম্মতা না হইলেই ভাল করিতেন। কিন্তু তখনই তাঁহার মনে হইল—রেণু তাহার মা—সে তাহার শুভাশুভ বিচার না করিয়া কখন তাহাকে রাখিয়া যায় নাই। রেণু যে সে বিষয়ে স্বামীর সহিত পরামর্শ করে নাই, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাহারা নিশ্চয়ই মনে করিয়াছে, তিনি শিশুর জন্মাবধি—রেণুর পীড়িতাবস্থায়ও—শিশুকে পালন করিয়াছেন, তাঁহার কাছে থাকিলে তাহার পালনে কোনরূপ ত্রুটি ঘটিবে না। তাহা মনে করিয়া তিনি কতকটা শান্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু তবুও তাঁহার মনে হইতে লাগিল, রেণু কেমন ক'রিয়া শিশুকে ছাড়িয়া থাকিবে—মা কি বুকের ছেলেকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে?

রেণু তাহার বক্ষে যেন বৃশ্চিকদংশনযাতনা অনুভব করিতে লাগিল। যে দিন নীরেন্দ্রের অসতর্ক উক্তি তাহাকে অতর্কিত আঘাত দিয়াছিল, সে দিনও সে এমন যাতনা অনুভব করে নাই। কেন না, সে দিন সে আপনাকে ধিক্কার দেয় নাই—ধিক্কার দিয়াছিল নারীজন্মে। সে দিন তাহার মনে হইয়াছিল, নারীজন্মে ধিক্। সে পদে পদে মনে করিয়া আসিয়াছে, নারীজন্মের সার্থকতা ত্যাগে—আপনার স্বতন্ত্র সত্তা ত্যাগ করিতে হয়। বুঝি নারীকে তাহার বিবেকবুদ্ধিও বিসর্জ্জন দিতে হয়। সে পিসীমা'র ব্যবহারে তাহাই বুঝিয়াছিল; পিতাকে ভুল বুঝিয়াও—তাহাই মনে করিয়াছিল; আর সে দিন স্বামীর কথায় সেই বিশ্বাসই তাহার মনে প্রবল হইয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল স্বামীর উপর তাহার কোন অধিকার নাই, ভালবাসার অধিকারও নাই। সে কেবল স্বামীর ও স্বামীর স্বজনের সেবা করিবার অধিকারী। ইহাই ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বিবাহের স্বরূপ! বোধ হয়, তাহাই। যদি তাহাই হয়, তবে সে কেন সে নিয়মের ব্যতিক্রমের আশা করিবে?

কিন্তু সে দিন সে ধৈর্য্যচ্যুত হয় নাই—কোন কথা বলে নাই। আর আজ—আজ কেন সে হাসিয়া স্বামীর প্রশ্ন উড়াইয়া দিতে পারে নাই, কেন মনের গোপন কোণে রক্ষিত কথা ব্যক্ত করিয়াছিল? সে ত প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে নাই। তবে তাহার ব্যবহার যদি নীরেন্দ্রের মনে এমন বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া থাকে যে, সে অভিমান বর্জ্জন করিতে পারে নাই? সে লজ্জা যে রাখিবার স্থান নাই; সে কথা সে কেন গোপন রাখিতেই পারিল না?

তাহার পর সে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে নাই। এ কি দৌর্ব্বল্য! সে দৌর্ব্বল্য পূর্ণিমা লক্ষ্য করিয়াছেন—মনে করিয়াছেন, সে তাহার শিশুপুত্রের জন্য মাতৃহৃদয়ের অনাবিল স্নেহ আপনার সঙ্কল্পের কঠিন করে দলিত করিয়া হত্যা করিতে পারে নাই। সে যে সেই স্নেহ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই, তাহা সে আপনি যেমন জানিত, আর কেহ তেমন জানিতে পারেন না; কিন্তু সে যে সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা কাহাকেও জানিতে দিবে না! তাহার সে সঙ্কল্প সে কি রক্ষা করিতে পারিত না?

সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভয় হইল, পূর্ণিমা যাহা বলিয়াছেন, হয়ত তাহাই করিবেন—তাহার শিশুপুত্রকে লইয়া আসিবেন। তিনি তাহাকে আনিতে চাহিলে মৃণালিনী যে আপত্তি করিবেন না, তাহা সে জানিত। আর তাহাকে লইয়া আসিলে সে যে কিছুতেই তাহার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহবেগ দমন করিতে পারিবে না, তাহাও সে জানিত। সে তাহা জানিত বলিয়াই অধিক শঙ্কানুভব করিতেছিল। যদি পূর্ণিমা তাহার শিশুপুত্রকে লইয়া আইসেন—তাহাকেই তাহার লালনপালন-ভার লইতে হয়—মাতার কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়? তাহা হইলে সে কি করিবে? তাহা হইলে তাহাকেই পরাভব মানিতে হইবে। আজ সে নীরেন্দ্রকে যাহা বলিয়াছে, তাহা ত তবে একান্তই নিষ্ফল হইবে!

তাই আজ সে আপনার দৌর্ব্বল্যকে ধিক্কার দিতে লাগিল। আর সে যে মাতার কর্ত্তব্য পালন করিতেছে না, ইহাও যে তাহার দুঃখের কারণ ছিল না, এমন নহে।

সেই ধিক্কার ও সেই বেদনা সম্মিলিত হইয়া তাহাকে দারুণ পীড়া দিতে লাগিল। সে ঘুমাইতে পারিল না—কেবল যাতনায় বিচলিত হইতে লাগিল। সে এখন কি করিবে? সে কি করিবে, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তাহার যে ভাবনা, তাহার কি কূল আছে—কূল থাকিতে পারে? তবুও সে কেবল ভাবিতে লাগিল।

সে রাত্রিতে যদি কেহ রেণুর অপেক্ষাও অধিক যাতনা ভোগ করিয়া থাকে—আপনাকে অধিক দুর্ভাগ্য মনে করিয়া থাকে, তবে সে—নীরেন্দ্র। মেঘান্ধকার রাত্রিকালে পথ হারাইয়া বাত্যাবিক্ষুব্ধ সিন্ধুতরঙ্গে পতিত হইয়া নাবিক যেমন উদ্ধার পাইবার সব আশা ত্যাগ করিয়া তরণীকেও ত্যাগ করে, সে তেমনই জীবনে সুখ ও শান্তিলাভের সব আশা ত্যাগ করিল। সে মনে করিল, সে আপনার ভুলে আপনি আপনার সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। তাহার প্রথম ভুল—সে কেন আত্মনির্ভরশীলতার অনুশীলন করে নাই? তাহার দ্বিতীয় ভুল—প্রথমা পত্নীকে হারাইয়া সে কেন বুঝিতে পারে নাই, অদৃষ্টের সহিত সংগ্রামে মানুষ কখন জয়লাভ করিতে পারে না? সে কেন আবার বিবাহ করিয়াছিল? তাহার তৃতীয় ভুল—সে সে দিন কেন রেণুকে সে কথা বলিয়াছিল; যদি বলিয়াছিল, তবে আপনার অন্যায় বুঝিতে পারিয়াই কেন সে জন্য ত্রুটি স্বীকার করে নাই—ক্ষমা ভিক্ষা করে নাই? সে ত্রুটিস্বীকার করিলে কি হইত, ক্ষমা চাহিলে ক্ষমা পাইত কি না, বলা যায় না; কারণ, যে কথা একবার উক্ত হয়, তাহা যে বাণ ত্যক্ত হয় তাহারই মত আর ফিরান যায় না, কিন্তু তবুও সে যখন তাহার অপরাধ বুঝিতে পারিয়াছিল, তখন অপরাধ স্বীকার করাই তাহার কর্ত্তব্য ছিল। সে তাহা করে নাই। সে রেণুকে যে ব্যথা দিয়াছিল, আজ রেণু তাহার প্রতিশোধ লইয়াছে। তাহাতেই সে সেই ব্যথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিল। কিন্তু সে বিশ্বাস করিতে পারিল না, রেণু ইচ্ছা করিয়া—প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্পে—প্রতিশোধ লইয়াছে। সে মনে করিল, রেণু তাহার মনের ভাব আর গোপন করিতে পারে নাই।

সে আজ আপনার অবস্থা উপলব্ধি করিল—পথ এখনও দীর্ঘ, এই দীর্ঘপথ তাহাকে বক্ষে নিজ কর্ম্মফলে সৃষ্ট দারুণ ক্ষত লইয়া অতিবাহিত করিতে হইবে। মৃত্যু তাহাকে যে বেদনা দিতে পারে নাই, সে আপনার কর্ম্মফলে সেই বেদনা অর্জ্জন করিয়াছে। সে জন্য সে আর কাহাকেও দায়ী করিতে পারে না—কাহারও দোষ দিতে পারে না। সে আপনার কর্ম্মে আপনি বদ্ধ।

সে দিন সে রেণুকে যে কথা বলিয়া আপনার জীবনে সুখের সব আশা ভস্মাবশেষ করিয়াছে, আজ সে সেই কথা বিশ্লেষণ করিল। সে কি সত্য সত্যই কেবল কণা ও অশোককে জননীর অভাব হইতে অব্যাহতি দিবার জন্যই আবার বিবাহ করিয়াছিল? আপনার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিবার যে আশা আজ দুরাশায় পরিণত হইয়াছে, সে আশা কি তাহাকে তাহার জননীর অনুরোধপালনে প্ররোচিত করে নাই? আর যদি সত্য সত্যই সে কেবল তাহার সন্তানদিগের জন্যই বিবাহ করিত—তবে তাহার সে কায কি একান্তই অন্যায় হইত না? সে ত কেবল স্ত্রীর নাম করিয়া দাসী আহরণ। সে অপমান কি সে রেণুকে করিতে পারে? রেণু কেন সে অপমান সহ্য করিবে? সে যতই ভাবিতে লাগিল, ততই আপনাকে অপরাধী মনে করিতে লাগিল।

তাহাকে সে অপরাধের জন্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে—নহিলে তাহার অব্যাহতি নাই। সে রেণুর প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহার জন্য তাহাকে যাতনার তুষানলে দগ্ধ হইতে হইবে। তদ্ভিন্ন তাহার আর কোন উপায় নাই।

জীবনব্যাপী যাতনা সহ্য করিবার সঙ্কল্পেই মানুষ শিহরিয়া উঠে; তাহার নিশ্চয়তা কিরূপ ভয়াবহ, তাহা সহজেই অনুমেয়। আজ নীরেন্দ্র তাহারই নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল।

তাহার বেদনার গভীরতাই তাহার চাঞ্চল্যের বিরোধী হইল। সে স্থিরভাবে আপনার অদৃষ্টের নিকট মস্তক নত করিল—যেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি সেই দণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য বধমঞ্চের সোপানে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সে তাহার বুকভরা আশা নিরাশায় পরিণত হইতে দেখিল। সে কেবল ভাবিল, যাহার এমন দুর্ভাগ্য হয়, তাহাকেও দীর্ঘ জীবনপথ অতিক্রম করিতে হয় কেন?

২০

সুধীর আদালতে চলিয়া যাইবার পর অহারান্তে পিসীমা কুমুদাকে বলিলেন, "কুমুদা, আমি রেণুর ছেলেকে দেখ্‌তে যা'ব। তুই যাবি?"

কুমুদা বলিল, "নেও কথা! কোলে করে 'মানুষ' করলাম—তা'র ছেলেটি হয়েছে দেখ্‌তে যা'ব না?"

"কই, এক বারও ত বলিস নি যে, দেখ্‌তে যা'বি।"

কুমুদা মনে মনে বলিল, "তুমিই বা ক'বার বলেছ? আর তোমার কাযের জালায় কি বল্‌বার সময় পেয়েছি?" সে মুখে বলিল, "জানি, পিসীমা, তুমি যা'বেই। তা'কে দেখবে বলেই ত এলে। তাই আর বলি নি।"

পিসীমা সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তা' আর বলতে? আমাকে কেউ চায় না—তবুও ভাবলাম, রেণুর ছেলে, না এলে লোক কি বল্‌বে? ওর মা ত' ওকে পেটেই ধরেছিল; এত বড় কর্‌লে কে?"

"তা'ত বটেই।"

"আচ্ছা বল্ দেখি, কি দিয়ে দেখি?"

কুমুদা বিপদে পড়িল। পিসীমা'র মনের ভাব কখন কেমন হয়, কেহ বলিতে পারে না। তাহা সে জানিত। যাহা দিতে বলিবে, তাহা যদি অধিক মূল্যের হয়, পিসীমা রাগ করিবেন; যদি অল্পমূল্যের হয় তিনি বিরক্ত হইবেন। সে বলিল, "আমরা ত'র কি জানি? তুমি যা' ভাল বুঝবে তা'ই করবে।"

পিসীমা তাঁহার লোহার সিন্দুক খুলিলেন—তাহার মধ্যে হইতে গহনার বাক্স বাহির করিয়া আনিলেন। তাঁহার অলঙ্কার যথেষ্টই ছিল—কিন্তু সে সব অধিক দিন ব্যবহার করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই—গহনার রং নষ্ট হয় নাই। সে সব যে আমলের গহনা, তখন বাউটী তাবিজ বাতিল হইয়াছে বটে, কিন্তু লংচেন ও জড়োয়া গহনার আমল আইসে নাই; গহনার ভার কমিয়াছে, কারুকার্য্য বাড়িয়াছে। পিসীমা কয়খানা গহনা নাড়াচাড়া করিয়া একটা বাক্স খুলিলেন—তাহাতে একছড়া মুক্তার মালা সিন্দূরে রঞ্জিত ছিল। সেই ছড়া বাহির করিয়া তিনি তাহা মুছিলেন—তাহার পর মালা ছড়াটি কুমুদাকে দেখাইয়া বলিলেন—"কেমন দেখছিস?"

কুমুদা জিজ্ঞাসা করিল, "কত দাম?"

"হাজার টাকায় কেনা ছিল।"

"অত টাকার জিনিষ দেবে?"

"কা'র জন্যে রেখে দেব?"—এ বার পিসীমা'র কথায় যে দুঃখের অভিব্যক্তি ছিল, তাহা আন্তরিক। এই দীর্ঘ কাল এই সব অলঙ্কার তিনি "যক্ষের ধনের" মত রাখিয়াছেন। রেণুর বিবাহে তিনি হীরার কণ্ঠী দিয়াছিলেন, আর আজ তাহার পুত্রকে দিবার সময় তিনি মুক্তার মালাই বাহির করিলেন। সুধীরের প্রতি তাঁহার যে স্নেহ তাহা আন্তরিক—সে-ই তাঁহার স্নেহের অবলম্বন। তাই সেই সুধীরেরও আর তাঁহাকে প্রয়োজন নাই শুনিয়া তিনি বিষম ব্যথা পাইয়াছেন। এ দেশে গৃহিণীরা মনে করেন, বিবাহ দিলে ছেলে পর হইয়া যায়। সুধীরের বিবাহে কিন্তু পিসীমা'র প্রভুত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বিবাহের পর প্রথম সন্তান প্রসব করিয়াই বধূ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছিলেন। স্বভাবতঃ মৃদুস্বভাব বধূ কোন দিনই পিসীমা'র কোন অধিকার হস্তগত করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি সমস্তভাবেই সংসার পরিচালন করিয়াছেন বলিয়া আজ সে সংসার পরিচালনভার ত্যাগ করিতে তাঁহার এত অনিচ্ছা।

মালার জন্য আর একটি বাক্স লইয়া তিনি গহনার বাক্স বন্ধ করিয়া সিন্দুকে তুলিলেন এবং সিন্দুকে চাবি দিয়া কুমুদাকে বলিলেন, "গাড়ী আন্‌তে বল; আর চাকরদের এক জনকে বল—আমি রেণুর বাড়ী যা'ব, সঙ্গে যেতে হ'বে।"

কুমুদা উঠিল এবং বলিল, "ছেলে ত মাসীর বাড়ী!"

"হাঁ রে হাঁ। মেয়েটাকে দেখে যা'ব না? তা'র ছেলেকে কি দিচ্ছি, তা' সে দেখবে না?"

এতক্ষণে কুমুদা পিসীমা'র প্রথমে রেণুর গৃহে যাইবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল—তিনি যাহা দিবেন, তাহা কি লোককে না জানাইয়া দেওয়া চলে? লোক তাহার প্রশংসা করিবে—তাহাই তিনি চাহেন।

পিসীমা হারের বাক্সটা অঞ্চলে বাঁধিয়া গাড়ীতে উঠিলেন এবং নীরেন্দ্রের গৃহে উপনীত হইয়া রেণুকে দেখিয়া বলিলেন, "তোকে যে দেখতে পা'ব, সে ভরসা আর করতে পারিনি।" বলিয়াই রেণুর চিবুকে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলী চুম্বন করিলেন।

কিছুক্ষণ কুশল-প্রশ্নাদির পর পিসীমা অঞ্চলে বদ্ধ বাক্সটি বাহির করিয়া পূর্ণিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"খোকা কই?" যেন সে কোথায়, তাহা তিনি জানেন না।

পূর্ণিমা বলিলেন, "সে বেহাইনের কাছে আছে।"

বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া নিপুণ অভিনেতার মত পিসীমা বাম করের অঙ্গুলী বাম গণ্ডে স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "সে কি?"

বলিতে বলিতে তিনি বাক্সটি খুলিয়া মুক্তার মালা বাহির করিয়া বলিলেন, "আমি ছুটতে ছুটতে আসছি—আমার সাত রাজার ধন এক মাণিককে দেখব ব'লে! সে আসে নি?'

"যে ক'রে তা'কে বাঁচান হয়েছে, তা'ত শুনেছেন?"

"তা' আর শুনি নি?"

"রেণু আসবার দিন কিছুতেই সাহস ক'রে তা'কে আন্‌তে পারলে না; মনে করলে, যিনি তা'কে ছোট্টটি থেকে বড় করেছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ তা'কে 'মানুষ' করতে পারবে না।"

"সে ভয় নেই। তুমি আছ, রেণু আছে—যত্ন কিছু কম হ'ত না। তবুও ভয় করে বই কি। আর—" একটু থামিয়া পিসীমা বলিলেন, "আর তিনি যদি ওকে রাখতে চা'ন, ভালই। তোমার কোন অভাব নেই সত্যি, কিন্তু তবুও তাঁ'র বিষয়সম্পত্তি ত কম নয়—খাবার লোক নেই। সে সম্পত্তিও যদি আসে, সোণায় সোহাগা হ'বে।"

পূর্ণিমা কোন কথা বলিলেন না।

রেণুর মনে হইল, বিষধর সর্প কাহাকেও দংশন করিবার পর যেমন ক্ষতস্থানে বিষ ঢালিয়া দেয়, পিসীমা তেমনই তাহার ক্ষতস্থানে দারুণ হলাহল ঢালিয়া দিলেন। সেই বিষের ক্রিয়ায় তাহার সর্ব্ব-শরীর যেন জ্বলিতে লাগিল। সে কেন পুত্রকে রাখিয়া আসিয়াছিল, তাহা সে-ই জানে—আর তাহার জন্য সে যে ব্যথা অনুভব করিতেছিল, তাহাও কেহ জানে না। কিন্তু তাহার কাযের যে এমন ব্যাখ্যা হইতে পারে—কেহ যে মনে করিতে পারে, সে অর্থলোভে পুত্রকে তাহার মাসীমা'র কাছে রাখিয়া আসিয়াছে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। সে শুনিয়াছে বটে, লোক অর্থ লইয়া এবং পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাল হইবে মনে করিয়া পুত্রকে পোষ্যপুত্র হইতে দেয়, কিন্তু তাহা তাহার নিকট একান্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইয়াছে।

তাহার পর পিসীমা পূর্ণিমার সহিত কি বলিলেন, তাহা সে শুনিয়াও শুনিল না।

পিসীমা বলিলেন, "আমি তা'র চাঁদ মুখ দেখব বলেই বিশ্বনাথের ধাম হ'তে এসেছি। আমি রেণুর মাসীর বাড়ীতেই যা'ব। বৌমা, তুমি যা'বে?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "যা'ব।"

"তবে এক খানা গাড়ী আনতে বল।"

"ঘরের গাড়ীই আনাই"—বলিয়া তিনি দাসীকে বলিলেন, "গাড়ী আনতে বল।"

পিসীমা রেণুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও চল।"

শরীরে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইলে মানুষের যে অবস্থা হয়, মনে বিষের ক্রিয়াহেতু রেণুর সেই অবস্থা হইয়াছিল—সে কোন উত্তর করিল না।

পূর্ণিমা বলিলেন, "বৌমা, তুমিও চল।"

"না।"—বলিয়া রেণু কাযের ছল করিয়া উঠিয়া গেল।

পূর্ণিমা বলিলেন, "মা'র প্রাণ—ছেড়ে থাকতেও পারছে না, আবার আনতেও সাহস হচ্ছে না।"

পিসীমা বলিলেন, "তা' ত বটেই। কিন্তু খুব শক্ত—আর খুব বুদ্ধিমতী। মাসীর অত বড় সম্পত্তি পাঁচ ভূতে খাবে, তা'র চেয়ে তিনি যা'কে মেয়ের মত ক'রে 'মানুষ' করেছেন, তা'র ছেলে পা'বে, এ ত সকল পক্ষেরই সুখের কথা।"

রেণুর কাযের এই ব্যাখ্যা পূর্ণিমারও ভাল লাগিল না। তাই তিনি বলিলেন, "কাকীমা' রেণু কি আর অত ভেবে কায করেছে?"

পিসীমা আশ্চর্য্যজনকভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "তুমি জান না, মা, জান না—ওর মত বুদ্ধি প্রায়ই দেখা যায় না। আমি তা'র অনেক পরিচয় পেয়েছি।"

পূর্ণিমা খোকাকে দেখিতে যাইবেন শুনিয়া কণা ও অশোকও যাইতে চাহিল। পূর্ণিমা তাহাদিগকে বলিলেন, "চল।"

কণা বলিল, "চল, আজ আমরা খোকাকে নিয়ে আসি।"

পূর্ণিমা বলিলেন, "মা যে সাহস করেন না! আর একটু বড় হ'ক, তখন আনব।"

"তখন মা বারণ করলেও আমি শুনব না।"

পিসীমা প্রভৃতি চলিয়া যাইলেন।

রেণু ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিল, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, তখন সে যেন তাহার বুকের ব্যথা ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইল। সে হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কান্দিতে লাগিল। সে যে বেদনা ভোগ করিতেছিল, তাহার কি অবসান হইবে না? তাহার মনের মধ্য হইতে যেন কে উত্তর দিল—না। রেণু বুঝিল, তাহাই বটে, যত দিন এই দুর্ব্বহ জীবনভার তাহাকে বহন করিতে হইবে, তত দিন এই বেদনাও সহ্য করিতে হইবে। তাহার জীবনব্যাপী ভুল আর জীবনব্যাপী যন্ত্রণা। পিতা তাহাকে ভুল বুঝিয়াছেন, মাসীমা তাহাকে ভুল বুঝিয়াছেন, স্বামী তাহাকে ভুল বুঝিয়াছেন—পিসীমা যে তাহাকে ভুল বুঝিবেন—তিনি যে তাহার কাযের কদর্থ করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? সে সব সহ্য করিয়াছে—পাষাণে বুক বাঁধিয়া পুত্রকে রাখিয়া আসিয়াছে, তবে সে পিসীমা'র কথায় অধীর হইল কেন? সে বুঝিতে পারিল না, বন্যার জল যখন নদী পূর্ণ করে, তাহার পর সামান্য বর্ষণে জলরাশি কূল ছাপাইয়া যায়।

নীরেন্দ্র বারান্দা হইতে পিসীমা'র সঙ্গে পূর্ণিমাকে এবং কণাকে ও অশোককে মোটরে উঠিতে দেখিয়া-ছিল। রেণু গেল না কেন? ভাবিতে ভাবিতে সে

মাতার কক্ষের দিকে গেল; দেখিল, ভূমিতে পড়িয়া রেণু কান্দিতেছে। তাহাকে তুলিয়া—তাহার অশ্রু মুছাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিতেই তাহার আগ্রহ হইল। কিন্তু সে সেই আগ্রহ দমিত করিল; কারণ, সে মনে করিল, সে-ই রেণুর দুঃখের কারণ। সে অপরাধীর মত তথা হইতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া অশ্রু মুছিল এবং পাছে ভৃত্যরা দেখিতে পায় বলিয়া দ্রুতপদে আপনার বসিবার ঘরে যাইয়া পঠিত সংবাদপত্রখানি লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, কে অধিক দুঃখী—সে না রেণু? কিন্তু যে-ই অধিক দুঃখী হউক না কেন, তাহার অপরাধ সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ রহিল না। সে অকারণে রেণুকে যে বেদনা দিয়াছে, তাহা যে রেণুর বুক বিদীর্ণ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ আজ সে নূতন করিয়া পাইল। স্বভাবতঃ কোমল-প্রকৃতি, স্নেহশীল নীরেন্দ্র আপনাকে কেবলই ধিক্কার দিতে লাগিল। সে যে জীবনে কত বড় ভুল করিয়াছে, তাহা সে কেবলই অনুভব করিতেছিল; অনুভব করিতেছিল আর যাতনাভোগ করিতেছিল।

আজ রেণু কান্দিবার যে সুযোগ পাইয়াছিল, সে সুযোগ সে পূর্ব্বে পায় নাই। তাই আজ সে কান্দিয়া মনের ভার লঘু করিল এবং তাহার পর উঠিয়া বসিয়া ভাবিল—তাহার বুকের মধ্যে যে উৎসমুখে ক্রন্দন উদ্গত হইতেছে, তাহা কখন রুদ্ধ হইবে না। তাহাই তাহার নিয়তি।

এ দিকে পিসীমা মৃণালিনীর গৃহে উপনীত হইলে মৃণালিনী তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, "ছুটতে ছুটতে এসেছি যাঁ'র চাঁদমুখ দেখতে, তিনি কোথায়?"

মৃণালিনী তাঁহাদিগকে যে কক্ষে লইয়া যাইলেন, সেই কক্ষে শয্যায় শয়ন করিয়া দেবদত্ত তখন খেলা করিতেছিল। পিসীমা দেখিয়া বলিলেন, "এ যে পুতুলটির মতই হয়েছে। আহা বেঁচে থাক, সুখে থাক।"

মৃণালিনী বলিলেন, "সেই আশীর্ব্বাদই করুন।"

পূর্ণিমা বলিলেন, "উনি যে অমন ক'রে খেলা করবেন, সে আশা করতে পারি নি। বেহান কি অসাধ্যসাধনই করেছেন।"

পিসীমা মৃণালিনীর হস্তে মুক্তার মালা দিয়া বলিলেন, "পরিয়ে দিও, মা।"

মৃণালিনী বলিলেন, "একটু বড় হ'ক—আপনিই পরিয়ে দেবেন।"

"আমি ত থাকব না।"

"কেন?"

"আমি কাশীতেই বাস করব। কেবল রেণুর ছেলেকে দেখব বলেই এসেছি।"

কুমুদা ভাবিল, যে কথা চাপা পড়িয়াছিল, তাহা আবার উত্তোলিত করা কেন?

মৃণালিনী বলিলেন, "সুধীরকে দেখবার ত কেউ নাই—তাই—"

পিসীমা বলিলেন, "বাছা আমার জীবনটাকে ব্যর্থ করেই দিল।" তিনি অঞ্চলে শুষ্ক চক্ষু মুছিবার ভাণ করিলেন।

"এখন নাতিটি হয়েছে—তবুও একটা নতুন অবলম্বন হ'ল।"

"তা' আর বলতে। বেঁচে থাক। এই বৌমা'কে বলছিলাম, অভাব ত কিছুরই নাই; তা'র উপর তোমার এই সম্পত্তি বার ভূতে না খেয়ে ও পেলে তোমারও তৃপ্তি।"

মৃণালিনী কিছু বলিলেন না।

রেণুর ছেলেকে কোলে লইয়া পিসীমা বলিলেন —"যেন ফুলের মত সুন্দর আর নরম।"

তাঁহারা বিদায় লইবার সময় কণা ও অশোক আবার বলিল, "খোকাকে নিয়ে যা'ব।"

পূর্ণিমা বলিলেন, "তোদের দিদিমা যেমন ক'রে ওকে 'মানুষ' করছেন, তেমন ক'রে 'মানুষ' করতে পারবি?"

কণা বলিল, "পারব—তুমি নিয়ে চল।"

পূর্ণিমা হাসিলেন।

তাহার পর পিসীমা'কে ও কুমুদাকে সুধীরের বাড়ীতে নামাইয়া দিয়া পূর্ণিমা কণা ও অশোককে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি নীরেন্দ্রকে বলিলেন—গাড়ী আসিয়াছে, সে বেড়াইতে যাইতে পারে।

নীরেন্দ্র বলিল, "আজ আর যা'ব না।" সে ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল, "গাড়ী তুলে দিতে বল্।"

পূর্ণিমা পুত্রের মুখ দেখিয়া বুঝিলেন—সে কোন চিন্তায় পীড়িত। কিন্তু এ কিসের চিন্তা?

পিসীমা'র কথা পূর্ণিমার বার বার মনে হইতে লাগিল। দেবদত্ত যদি মৃণালিনীর সম্পত্তি পায়, তবে সোণায় সোহাগা হয় বটে; কিন্তু কি দুঃখে তিনি নীরেন্দ্রের পুত্রকে পর করিয়া দিবেন? পিসীমা যাহাই কেন বলুন না, রেণু যে সেরূপ কোন চিন্তা মনে স্থান দিয়াছে, তাহা তিনি মনে করিতে পারিলেন না।

পিসীমা গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, সুধীর ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি তাহাকে বলিলেন, "আমি রেণুকে আর রেণুর ছেলেকে দেখে এলাম।"

সুধীর বলিল, "গাড়ী নাও নি কেন?"

"তুই যা'বার সময় মনে ছিল না। তখন খোকার মুখ কি দিয়ে দেখব, তা'ই ভাবছিলাম। মুক্তার মালা দিয়েই দেখে এলাম।"

সুধীর কোন কথা বলিল না।

পিসীমা বলিলেন, "যে জন্য এসেছি, তা' ত হয়ে গেল। এই বার কাশীতে যা'ব।"

"কাশীতেই বাস করবে?"

"হাঁ।"

সুধীর কোন কথা বলিল না।

রাত্রিকালে পিসীমা বলিলেন, "কুমুদা, এখন মন ঠিক কর, কাশীবাস করবি কি না?"

কাশীবাসে কুমুদার তেমন আগ্রহ ছিল না। সে বলিল, "দাদাবাবু ত যেতে বলে নি; তুমি কেন আপনি ও কথা তুলছ?"

পিসীমা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "ছোটলোক কি না—তা'ই তোর অমন কথা। আমাকে কি এক বার থাকতে বলেছে? আমি কিসের জন্যে যেচে থাকব?"

"নেও কথা। তোমার বাড়ী—তুমি সর্ব্বেসর্ব্বা; তোমাকে আবার কে থাকতে বলবে?"

"আমার বাড়ী কিসে রে? সবই জানিস, তবে আবার ও কথা বলছিস কি কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিতে?"

কুমুদা বুঝিল, পিসীমা'র সহিত এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করা নিরাপদ নহে। কারণ, তিনি সেচ্ছায় কাশীবাস করিতে যাইতেছেন না—একান্ত অনিচ্ছায় যাইতে চাহিতেছেন। সে চুপ করিল।

পিসীমা বলিলেন, "তুই কি যা'বি?"

"যদি বল, যা'ব।"

"যদি বলি কি? তোর ইচ্ছে হয় যা'বি, নয় ত যা'বি নে।"

কুমুদা চুপ করিয়া রহিল।

২১

কুমুদার বাঙ্গালা ছাড়িয়া "খোট্টার" দেশে যাইতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সে জানিত, পিসীমা'রও সে বিষয়ে কোন আগ্রহ নাই। কথায় বলে, "সাপের হাই বেদে চিনে।" এই অতি দীর্ঘকাল পিসীমা'র সঙ্গে থাকিয়া—এই বাড়ীর এক জন হইয়া, সে পিসীমা'র মনের কথাও অনেক সময় তাঁহার মুখেই ব্যক্ত হইতে শুনিয়াছে। পিসীমা পিতা-মাতার স্নেহে সুখে—বিলাসে পালিতা; তাঁহার শ্বশুরবাড়ীও ধনীর গৃহ; বিধবা হইয়া তিনি যেন পিতৃগৃহে আরও অধিক আদর লাভ করিয়াছিলেন—পাছে কাহারও কোন ব্যবহারে তিনি বেদনানুভব করেন; তিনিই গৃহের কর্ত্রী ছিলেন; সেই কর্ত্তৃত্ব সুধীরের বা সুধীরের পত্নীর ব্যবহারে কখন ক্ষুণ্ণ হয় নাই; তিনি কোন মন্দ জিনিষ ব্যবহার করিতে পারিতেন না—কোন অসুবিধা সহ্য করিতে পারিতেন না। পুরীধামে যাইয়া তিনি পক্ষকালও থাকিতে পারেন নাই—কি গন্ধ! তিনি বলিয়াছিলেন, "সাধে কি আমার ভাশুর বলতেন—'কিষ্কিন্ধ্যার বেটা ভূত,—ভূতের বেটা বিদিকিচ্ছি,—বিদিকিচ্ছির তিন পুত্তুর—বাঙ্গাল, উড়ে, ধাঙ্গড়'?" বৃন্দাবনে বানর এক দিন তাঁহার গামছা লইয়া পলাইলে তিনি বলিয়াছিলেন,—"এ দেশে কি মানুষ থাকতে পারে? এ দেশ হনুমানের আর দ্বারবানের। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন মাথায় থাকুন।" কাশীতেও তাঁহার মন তিষ্ঠিতে চাহে নাই—"ছাতুখোরের দেশ।" সে ভাবিতেছিল, দাদাবাবু তাঁহাকে থাকিতে না বলায় পিসীমা'র যে অভিমান হইয়াছে, কিসে তাহার উপশম করিতে পারে।

এক দিন রাত্রিতে পিসীমা শয়ন করিলে সে বলিল, "আমি একটা কথা বলি, পিসীমা।"

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

"তুমি এক বার রেণুর মাসীমা'কে বল—তিনি দাদাবাবুকে বিয়ে করতে বলুন।"

পিসীমা যেন জ্বলিয়া উঠিলেন, "ছোট লোকের বুদ্ধি কি না! আমি যা'ব তা'র তোষামোদ করতে! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।"

পিসীমা'র এইরূপ কথার জন্য কুমুদা প্রস্তুত ছিল—এইরূপ ব্যবহারে সে অভ্যস্তাও হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "কথায় বলে 'তোর পায় পড়ি নে—তোর বাবের পায় পড়ি'। দেখ্‌তেই ত পাচ্ছ।"

"কি দেখ্‌তে পাচ্ছি?"

"আজকালকার ছেলে—হয় ত লজ্জা করছে, কে কি মনে করবে। কিন্তু তাই ব'লে কি তোমার রাগ করা সাজে?"

"কেন রে?"

"দাদাবাবুর যদি সংসার না হয়, তোমারই বাপের সংসার ভেসে যা'বে—যদি একটি ছেলে হয়, তোমারই বাপের বংশ থাকবে। ঐ ভাগুরপোটি ছিল বলেই ত আজ শ্বশুরের ভিটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।"

পিসীমা কোন উত্তর দিলেন না। কুমুদা বুঝিল—ঔষধ ধরিয়াছে। সে বলিল, "আমার মা যখন মারা গেলেন, তখন আমরা সাত বোন, ভাই একটি ছিল—তা'র শোকেই মা মা'রা গেলেন। আমার তখন কপাল পুড়েছে। আমি বোনেদের সব এক-সঙ্গে ক'রে বাবাকে আবার বিয়ে করতে বল্লাম। আমার কপাল—আমাকে চ'লে আসতে হয়েছে; তা' হ'ক—বাবার ভিটেয় ত সন্ধ্যায় দীপ জ্বলছে।"

পিসীমা কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার নাসিকাগর্জ্জন শুনিতে না পাইয়া কুমুদা বুঝিল, তিনি ঘুমান নাই। সে বুঝিল, আর ভয় নাই। সে বলিল, "তুমি ভেবে দেখ। আমরা মুখ্যু মানুষ। কিন্তু মাসীর কথা যে ফেল্না নয়, তা'ত তুমি জান। মিথ্যা কথা বল্ব না—বোনের যা করেছে, তা'ও বড় দেখা যায় না। তা'র পর বোনঝি ত ছিল গলার হার; আর অত বড় বাড়ী—অত টাকা সব দেবে ব'লেই ত বোনঝির ছেলেটিকে নিয়েছে। এ যে মা'র চেয়েও বেশী।"

এই বার পিসীমা'র কথা শুনা গেল—"সবই অদৃষ্ট। কত আশা ক'রে বৌ এনেছিলাম; তা' যত দিন বাঁচলে নিজেও ভুগে গেল—আমাদেরও ভুগিয়ে গেল; তা'র পর তা'র যদি জুড়াল—আমাদের জ্বালা জুড়াল না।"

কুমুদা আর কিছু বলিল না।

অল্পক্ষণ পরেই পিসীমা'র নাসিকাগর্জ্জনে কুমুদা বুঝিল, তিনি ঘুমাইয়াছেন। সে পিসীমা'কে ভাল করিয়াই অধ্যয়ন করিয়াছিল—মনে করিল, লক্ষণ ভাল।

পরদিন সে আর সে কথার উত্থাপন করিল না—এ বার পিসীমা'র পালা।

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, পিসীমা কিছুই বলিলেন না। কুমুদা একটু বিস্মিতা হইল, বুঝি শঙ্কিতাও হইল। কারণ, এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকা পিসীমা'র পক্ষে অস্বাভাবিক। রাত্রিতে পিসীমা বলিলেন, "কুমুদা, তুই কি কাল এক বার রেণুর মাসীর বাড়ী যাবি?"

কুমুদা বলিল, "যেতে বল যা'ব। আমরা কি বুঝি?"

"কিন্তু—"

"আমি ত তাই বলি, আমি গেলে কি হ'বে? আমাদের কথার কি কোন দাম আছে, পিসীমা? হয় ত হেসেই উড়িয়ে দেবে—নয় ত বা বকে উঠ্‌বে। বিষ থাক আর না থাক, চক্রটা যে কুলোপানা।"

"কিন্তু আমি গেলে যদি—"

পিসীমা'কে কথা শেষ করিতে না দিয়া কুমুদা বলিল, "অপমান করবে? কা'র ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে, তোমাকে অসম্মানের কথা বলতে পারে? তা' ছাড়া সত্যি কথা বলব, পিসীমা, কোন দিন তোমার অসম্মান করেনি। আস্‌তে যেতে প্রণাম করতে কখন ভুল হয় নি।"

"সে কথা সত্যি। তবে কি জানিস, তা'র ছিল বোন।"

"বোন যদি থাক্‌ত, তবে কি আর কেউ এ কথা বল্‌ত? বোন গেছে—বোনঝিরও—তোমার কৃপায়—ঘর বর যা' হয়েছে, তা' তপিস্যা ক'রে লোক পায় না। এখন, তা'রই বা বল্‌তে দুঃখ কি হ'বে?"

"আচ্ছা, দেখি ভেবে।"

"সে-ই ভাল—তুমি ভেবে যা' ভাল মনে করবে, কর।"

পিসীমা আর কিছু বলিলেন না।

পরদিন প্রাতে পিসীমা যখন পূজা সারিয়া উঠিলেন, তখন কুমুদাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এক বার পাঁজিখানা আন্‌ত।" স্বর মৃদু।

তাহার পরই তিনি বলিলেন, "থাক্, তো'কে যেতে হ'বে না, কি ছুঁয়ে ফেল্‌বি। আমি যাচ্ছি।"

সে দিন বৃহস্পতিবার; "বারবেলায়" যাইবেন না বলিয়া পিসীমা পঞ্জিকা দেখিলেন এবং তাহার পর কুমুদাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সকাল সকাল কায সেরে নিস; বেলা দু'টার সময় যা'ব।"

যাইবার স্থানের উল্লেখ করা প্রয়োজন হইল না।

সুধীর আহার করিতে বসিলে পিসীমা তাহাকে বলিলেন, "ক'দিন দেখিনি—আজ এক বার রেণুকে আর রেণুর ছেলেকে দেখ্‌তে যা'ব। আমি ভাবছি, রেণুকে আর খোকাকে এনে ক'দিন থাকতে বলব।"

সুধীর বলিল, "খোকা ত রেণুর কাছে থাকে না।"

"কিন্তু এমন আর কত দিন চল্‌বে?"

"রেণু বলে, ঐ ব্যবস্থাই চল্‌বে।"

"সে হ'বে না।"

"ছেলের জন্য যে বিরাট ব্যবস্থা রেণুর মাসীকে করতে হয়েছে, তা'কে আনাও সহজ নয়। রেণুর শাশুড়ীই বলেন, হনুমানকে বিশল্যকরণী আন্‌তে

যেমন গোটা পাহাড় আন্‌তে হয়েছিল, তা'কে আন্‌তে তেমনই রেণুর মাসীমা'কে অবধি আন্‌তে হয়।"

"সে কথা সত্যি। আহা—ছেলের স্বাদ ত কখন পায় নি, ছেলেটিকে বুক থেকে নামায় না।"

সুধীরের হাসি পাইল—যেন পিসীমাই সে স্বাদ পাইয়াছেন! কিন্তু সে কোন কথা বলিল না। সে বুঝিল, তিনি যে মৃণালিনীর প্রশংসা করিতেছেন, তাহার কোন উদ্দেশ্য আছে এবং তাহা মনে করিয়াই সে শঙ্কিত হইল। পিসীমা'র রেণুকে নীরেন্দ্রের গৃহে লইয়া যাইতে সম্মতি দিয়া সে যে ভুল করিয়াছিল, তাহা সে কখন ভুলিতে এবং সে জন্য কখন আপনাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিল, এ ক্ষেত্রে পিসীমা'র উদ্দেশ্য কি হইতে পারে? আহার্য্য সে একরূপ নাড়াচাড়া করিয়াই উঠিয়া পড়িল।

পিসীমা বলিলেন, "কিছুই যে খেলি না!"

সুধীর কোন কথা বলিল না।

সুধীর ভাবিয়া দেখিল, পিসীমা যাইতে চাহিলে, তাঁহাকে নিবারণ করাও যায় না। বাহির হইবার সময় সে পিসীমা'কে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কখন গাড়ী চাহি?"

পিসীমা বলিলেন, "বেলা দু'টায় যা'ব আর তিনটার মধ্যেই ফিরব, মনে করছি। আজ আবার লক্ষ্মীপূজা।"

সুধীর ভৃত্যকে নির্দ্দেশ দিয়া গেল, গাড়ী দুইটায় উপস্থিত হইবে এবং পিসীমা ফিরিয়া আসিলে আদালতে তাহাকে আনিতে যাইবে। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু তাহার যে জটিল মামলাটি ছিল, তাহার চিন্তাই তাহার উদ্বেগশঙ্কা তাহাকে ভুলাইয়া দিল।

পিসীমা যথাকালে কুমুদাকে লইয়া মৃণালিনীর গৃহে উপনীত হইলেন। দ্বারবান দাসীকে ডাকিয়া দিল।

দ্বিতলে উঠিয়াই পিসীমা গৃহে আরও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন। যে গৃহ যেন অন্ধকার ছিল, তাহাতে সহসা আলোকপাত হইয়াছে। মানুষের মনে যেমন, তাহার গৃহেও এমনই হয়। যে বাতায়ন বন্ধ থাকে—মনে হয়, কোন দিন বুঝি তাহা মুক্ত করা হইবে না, সময় সময় তাহা অতর্কিত কারণে মুক্ত করিতে হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বাতায়নপথে সূর্য্যালোক কক্ষমধ্যে পতিত হয়—তাহার সকল অংশ আলোকিত করে, আর বাহিরের বাতাস তরুপত্রের মর্ম্মর-রব ও বিহগের কলকূজন বহিয়া আনে। মৃণালিনীর গৃহে ও জীবনে তাহাই হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবন রুদ্ধদ্বার কক্ষেরই মত হইয়াছিল—আজ এই শিশুর কুসুমকোমল স্পর্শে তাহার রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইয়াছে। ইহা তিনি সত্যই দেবতার দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নহিলে ভগিনীর মৃত্যু, রেণুর তাঁহারই গৃহে আসিয়া অসুস্থ অবস্থায় অকালে পুত্র প্রসব এবং শেষে তাহার—তাঁহারই নিকট পুত্রকে রাখিয়া গমন, এ সব অঘটন ঘটিল কেন?

শিশুর জন্য কত আয়োজন যে করিতে হয়, তাহা যত দিন যাইতেছিল, তিনি ততই বুঝিতেছিলেন। তিনি রেণু প্রসূত হওয়া হইতে তাহার লালনপালনে অনেক কাযই করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রেণুর মা বাঁচিয়া ছিলেন এবং রেণু অকালে প্রসূতও হয় নাই। সে মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হয় নাই। যে সতর্কতায়, যে যত্নে অকাল-প্রসূত শিশুকে পালন করিতে হয়, তাহা যাঁহাদিগের সে অভিজ্ঞতালাভ হয় নাই—তাঁহারা অনুমান করিতেও পারেন না। সে জন্য মৃণালিনীকে বিপুল আয়োজন করিতে হইয়াছে, তাই গৃহেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

পিসীমা'কে দেখিয়া মৃণালিনী আসিয়া প্রণাম করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "দেবুকে এক বার খাওয়াতে হ'বে; তা'র আয়োজন করি।"

পিসীমা ও কুমুদা সেই আয়োজন দেখিলেন—দেখিয়া পিসীমা'রও মনে হইল, অসাধ্যসাধনই বটে।

পিসীমা কৃতনিশ্চয় হইয়া আসিয়াছিলেন—মৃণালিনীকে তাঁহার কথা বলিবেন। সুতরাং যখন শিশুকে দুগ্ধ পান করাইয়া পাত্রাদি গরম জলে ফুটাইতে আড়াইটা বাজিল, তখন তাঁহাকে তৎপর হইতে হইল, অধিক ভূমিকা করিবার সময় আর হইল না। তিনি মৃণালিনীকে বলিলেন, "মা, তোমাকে মেয়ের মত মনে করি, তাই বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি।"

মৃণালিনীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না—পিসীমা'র বিপদ! কি বিপদে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন? তিনি বলিলেন, "কি বলুন! আমার যা' সাধ্য, তা' আমি অবশ্যই করব।"

"দেখ, মা, আমি তীর্থবাসে যা'ব। কিন্তু—"

"আপনি তীর্থবাসে থাকবেন শুনে আমি সুধীরকে বলেছিলাম, সে কেমন ক'রে হ'বে?"

"সেই কথাই তোমাকে বল্‌তে এসেছি। পুরুষ মানুষ কি কখন সংসার দেখ্‌তে পারে? বৌমা ছিল—পড়ে ছিল, তবুও সংসার তা'র ছিল। তা'র পরে—" পিসীমা অঞ্চলে অশ্রুশূন্য চক্ষুতে অশ্রু মুছিবার ভাণ করিয়া বলিলেন, "কুচোটুকু রেখে গিয়েছিল—সে-ও ত স্বামীর ঘরে গেছে। এখন সংসার কে দেখ্‌বে?"

"আপনি থাক্‌তে সে ভাবনা নাই।"

"আমার, মা, দেহ আর বইছে না। এখনও যদি সুধীর বিয়ে করে, এখন ত ডাগর মেয়ে পাওয়া যায়, তা'কে মাস কতক সব বুঝিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। আমার বাপের নাম বজায় থাক্‌বে—"

পিসীমা'কে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া মৃণালিনী বলিলেন, "আপনি তা'কে বলুন।"—তাঁহার মনে হইতেছিল, তাঁহার যেন বাক্‌রোধ হইয়া আসিতেছিল।

পিসীমা বলিলেন, "আমি বলেছি—তা'তে কাণ দেয় না। তা'ই আমি এসেছি—" পিসীমা মৃণালিনীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি এক বার বল।"

মৃণালিনীর মুখ হইতে কথা বাহির হইল না—তিনি মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইলেন।

পিসীমা বলিলেন, "আমি জানি, তুমি আমার কথা রাখবে—তুমি আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবে—আমার পিতৃকুল রক্ষা করবে।"

মৃণালিনী কিছু বলিতে পারিলেন না।

ঘড়ীর দিকে চাহিয়া "গাড়ী আবার সুধীরকে আন্‌তে যা'বে"—বলিয়া পিসীমা যখন উঠিলেন, তখন অভ্যাসবশে মৃণালিনী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু কিছু বলিতে পারিলেন না। শিশু তখন ঘুমাইতেছিল; পিসীমা'র আর তাহাকে আদর করা হইল না।

সহসা প্রবল ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যাইলে উদ্যানের যে অবস্থা ঘটে, তখন মৃণালিনীর মনের সেই অবস্থা। তাঁহাকে বলিতে হইবে—"সুধীর, তুমি আবার বিবাহ কর?"

তিনি আর পারিলেন না—সেই স্থানেই পড়িয়া অশ্রুর উৎস মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি কতক্ষণ কান্দিলেন, তাহা তিনিও জানিতে পারিলেন না। শিশুর কণ্ঠের স্বরে তিনি চমকিয়া উঠিয়া আপনাকে সংযত করিয়া তাহার নিকট গমন করিলেন। তাহার আবরণ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া তিনি তাহাকে অঙ্কে লইয়া বসিলেন; সে খেলা করিতে করিতে হাত বাড়াইয়া তাঁহার—বন্ধ্যার নিষ্ফল বক্ষে বুঝি মাতার সঞ্চিত অমৃতের সন্ধান করিতে লাগিল।

তখনও মৃণালিনীর দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া তাহার অঙ্গে পতিত হইতেছিল। তাহার স্পর্শ কিন্তু তাঁহার মনোযোগ অন্য দিকে প্রবাহিত করিল—তাঁহার চঞ্চল চিত্তে সংযমের ধৈর্য্য আনিয়া দিল। তিনি স্থির হইয়া চিন্তা করিবার সুযোগ লাভ করিলেন।

ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার মনে হইল, সুধীরের মনোভাবে কোনরূপ ইঙ্গিত পাইয়াই পিসীমা তাঁহাকে এই কথা—এই নিষ্ঠুর কথা বলিতে সাহস করেন নাই ত? তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন। এ কথা প্রথমে তাঁহার মনে উদিত না হইবার বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহার স্বামী পুরুষের ও স্ত্রীলোকের—কাহারও একাধিক বার বিবাহের বিরোধী ছিলেন—তিনি তাহা ভালবাসার শুচিতাক্ষুণ্ণকারী বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তিনি যে উন্নত আদর্শের অনুসরণ করিতেন, তাহা অনেকে রক্ষা করিতে পারে না। রেণুর বিবাহের কথাও তাঁহার মনে পড়িল এবং তাঁহাকে যেন আবার বিচলিত করিল। সুধীরের ব্যবহার তাঁহাকে তাহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল রুগ্না পত্নীর সেবা করিয়া—সেই পত্নীর মৃত্যুর পর, কন্যারও বিবাহ দিয়া আজ যদি সুধীর তাহার সেই আদর্শভ্রষ্ট হয়, তবে তিনি তাহাতে দুঃখিত হইলেও তাহাকে ঘৃণা করিবেন না—তাহাকে অপরাধী মনে করিবেন না। পিসীমা তাহার কল্যাণকামী—তাহার ইষ্টানিষ্ট বুঝেন। তিনি তাঁহাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন—সে অনুরোধ পালন তাঁহার পক্ষে যত বেদনাদায়কই কেন হউক না, তিনি তাহা পালন করিবেন।

তিনি দৃঢ়চিত্ত-যাহা কর্ত্তব্য বা করণীয় মনে করেন, তাহা—যত অপ্রিয় বা যত কঠোরই হউক না—পালন করিতে দ্বিধানুভব করেন না।

২২

যে দিন পিসীমা যাইয়া মৃণালিনীকে অনুরোধ করিয়া আসিলেন, তাঁহাকেই সুধীরকে বিবাহ করিতে বলিতে হইবে—সে দিন সুধীর আদালত হইতে ফিরিবার পথে মৃণালিনীর গৃহে গেল না।

এ দিকে মৃণালিনীও যেমন চাঞ্চল্যে কাল কাটাইতে লাগিলেন, পিসীমাও তেমনই ভাবে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। তবে উভয়ের চাঞ্চল্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল। মৃণালিনীর চাঞ্চল্যের কারণ

—অপ্রিয় কার্য্য যদি করিতেই—হয়, তবে তাহা যত শীঘ্র শেষ করা যায়, ততই ভাল। যে কায বেদনাদায়ক—যাহা করিতে ইচ্ছা হয় না, সেই কায যদি করিতেই হয়, তবে যেমন করিয়াই হউক তাহা করিয়া ফেলিলেই নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। যতক্ষণ তাহা সম্পন্ন করা না যায়, ততক্ষণই উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য। তিনি কত কথাই ভাবিতেছিলেন। যদি সুধীর আবার বিবাহ করে, তবে কি হইবে? তাঁহার যত ভাবনা—রেণুর জন্য। তিনি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন, রেণুর যেন কেমন ভাবান্তর হইয়াছে; সে আর পিতৃগৃহে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে না—এমন কি পুত্রকেও দেখিতে আসিতে চাহে না; তাহার শাশুড়ীই মধ্যে মধ্যে আসিবার সময় তাহাকে সঙ্গে লইয়া আইসেন। তাহার মুখের ভাবে বয়সের পক্ষে অসঙ্গত গাম্ভীর্য্য ক্রমেই নিবিড় হইতেছে; তাহা তাহার যৌবনলাবণ্য নষ্ট করিতেছিল। সে যেন হাসি ভুলিয়া যাইতেছে—যাহা করিতে হইবে তাহা কর্ত্তব্যবোধে সুসম্পন্ন করে। ইহা তাঁহার শঙ্কার কারণ হইয়াছিল। কিন্তু সুধীর তাহার কন্যাকে—একমাত্র সন্তানকে কত ভালবাসে, তাহা তিনি তাহার ব্যবহারে সর্ব্বদাই বুঝিতে পারিতেন। রেণুর যে ভাবান্তর তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা সুধীরকে কত পীড়িত করে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেন; স্বভাব-গম্ভীর সুধীরের গাম্ভীর্য্য ঘটনাফলে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি সময় সময় তাহার কথায় সেই পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইত। তাহার সেই বেদনাই বুঝি দেবদত্তের প্রতি তাহার স্বাভাবিক স্নেহ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল। প্রায়ই আদালত হইতে গৃহে—তাহার আকর্ষণহীন গৃহে ফিরিবার পথে সে দেবদত্তকে দেখিতে আসিত, সেই শিশুকে লইয়া যেন শিশুরই মত আনন্দানুভব করিত।

সুধীর যদি আবার বিবাহ করে, তবে কি তাহার এই ভাব থাকিবে?

মৃণালিনী আপনাকে আপনি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন—না থাকে, না থাকিবে, দেবদত্তের কিসের অভাব? তাহার পিতা, পিতামহী সকলেই তাহার জন্য ব্যাকুল—সে তাঁহার শূন্য জীবন পূর্ণ করিয়াছে; যদি সুধীর বিবাহ করিয়া আবার সংসার পাতিয়া বসে—তাহাকে দেখিবার তাহার সংসার রাখিবার লোক হয়, তবে তাহাতে কি আপত্তি থাকিতে পারে?

কিন্তু তিনি আপনাকে এইরূপ বুঝাইবার যত চেষ্টাই কেন করুন না, ভগিনীর কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন তিনি মনকে প্রবোধ দিবার একমাত্র উপায় অবলম্বন করিলেন—হয় ত সুধীরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াই পিসীমা ঐ কথার উত্থাপন করিয়াছেন।

এ দিকে পিসীমা'র চাঞ্চল্য কুমুদার কথায় আরও বাড়িতে লাগিল। কুমুদা তাঁহাকে আশ্বাস দিল—"তুমি দেখে নিও, পিসীমা, এ বার যে ওষুধ দিয়েছ, তাতেই রোগ সারবে। দাদাবাবুকে এ বার বল্‌লেই বুঝতে পারবে।"

পিসীমা বলিলেন, "তোর যেমন বুদ্ধি! আগে মাসীকে জিজ্ঞাসা করি—তা'র পর সুধীরকে বল্‌ব। নইলে হয় ত হিতে বিপরীত হ'বে।"

অগত্যা কুমুদা বলিল, "ভাল—তাই হ'বে। তা কবে মাসীর বাড়ী আবার যা'বে?"

"দেখি—কি হয়।"

পিসীমা সেই দিনই সুধীরকে বলিলেন, "খোকাকে দেখ্‌তে কি গেছলে?"

সুধীর "না" বলিলে তিনি বলিলেন, "কি চালাক হয়েছে! আর রেণুর মাসীর ঋণ আমরা কখন শোধ করতে পারব না—কি যত্নেই ছেলেকে 'মানুষ' করছে। সত্যিই, বাপু, আর কেউ অমন ভাবে ঐ ছেলে মানুষ করতে পারত না।"

সুধীর কোন কথা বলিল না। কিন্তু যে মৃণালিনীকে পিসীমা দেখিতে পারিতেন না, তাঁহারই এত প্রশংসায় তাহার মনে সন্দেহের উদয় হইল। পিসীমা'র নিশ্চয়ই কোন অভিসন্ধি আছে। সে অভিসন্ধি কি, সে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

পরদিনও তাহার দেবদত্তকে দেখিতে যাওয়া হইল না—একটি মোকর্দ্দমায় পরামর্শ ছিল। অপর পক্ষ বড় ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিলেও তাহার মক্কেল বলিয়াছিলেন, তিনি তাহার উপরেই ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন—তাঁহার তাহার উপরেই বিশ্বাস।

কিন্তু সে দিনও যখন পিসীমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি দেবদত্তকে দেখিতে গিয়াছিল?—তখন তাহার সন্দেহ ঘনীভূত হইল।

তাহার পরদিন সে আদালত হইতে ফিরিবার পথে মৃণালিনীর গৃহে গেল।

মৃণালিনী যে কথা তাহাকে বলিবেন বলিয়া পিসীমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সে কথা—সেই অপ্রিয় কথা, যথাসম্ভব শীঘ্র বলিবার আয়োজন করিলেন। আপনার মন দৃঢ় করিয়া তিনি বলিলেন, "পিসীমা এসেছিলেন, তোমাকে একটা কথা বলতে ব'লে গিয়েছেন।"

সুধীর অনেক সময়েই যেমন ব্যঙ্গের বাতাসে বিষয়ের গুরুত্ব উড়াইয়া দিত, তেমনই ভাবে বলিল, "পিসীমা নিজেই ত অনেক কথা অনর্গল বলেন—তবে আবার আপনাকে কোন কথা বলবার জন্য অনুরোধ কেন? সংপ্রতি ত 'মৌনী একাদশী'ও নাই!"

"তিনি, বোধ হয়, সে কথা তোমাকে ব'লে তা'র যে উত্তর পেয়েছেন, তা'তেই আমাকে বল্‌তে অনুরোধ করেছেন।"

"ইংরেজীতে একটা কথা আছে—যদি প্রয়োজন হয়, তাই এক ধনুতে দুই ছিলা দেওয়া; পিসীমা কি তা'ই করতে চান? অতিসাবধানীরা তাই করে বটে।"

"কথাটা হেসে উড়াবার নয়।"

"যা'র এতটা গুরুত্ব, তা' আমি বোধ হয়, জ্যোতিষী না হ'লেও বলতে পারি।"

"কি বল ত।"

"পিসীমা চান—আমি এই মাথায় আবার টোপর দিয়ে বিয়ে করতে যাই।"

মৃণালিনী শুনিয়া স্তম্ভিতা হইলেন। কিন্তু সুধীরের কথা—সম্মতির লক্ষণ কি বিরক্তির বিকাশ তাহা তিনি স্থির বুঝিতে পারিলেন না। কারণ, কথাটায় অকারণ গাম্ভীর্য্য ছিল।

তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সুধীর আপনাকে সংযত করিয়া আবার ব্যঙ্গের আশ্রয় লইয়া বলিল—"তাঁ'কে বল্‌বেন, আমি যে আশায় অপেক্ষা করছিলাম, সে আশাও নির্ম্মূল হয়েছে। জানেন ত—

'হাভাতে যদ্যপি যায় সাগর শুকায়ে যায়,
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া।'

সুতরাং আর উপায় নাই।"

মৃণালিনী কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করিলেন—সুধীরের মুখ যেন সহসা রক্তশূন্য হইয়া গেল। তিনি শঙ্কিতা হইলেন। তিনি তাহার কথা বুঝিতে পারিলেন না বুঝিয়া সুধীর বলিল—"রেণুর যে মেয়ে হ'ল না।"

বলিয়া সে হাসিল—সে যে চেষ্টা করিয়া হাসিল, তাহা মৃণালিনী বুঝিতে পারিলেন।

ততক্ষণে সুধীর আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে বলিল, "আমার জন্মের সময়ের ঘটনা বুঝি আপনি জানেন না? ঠাকুরদাদা মশায়ের ইচ্ছা ছিল না—মা প্রসবের জন্য বাপের বাড়ী যা'ন। কিন্তু দাদামশায়ের আর দিদিমা'র বিশেষ অনুরোধ তাঁ'কে সেই ব্যবস্থায় সম্মতি দিতে হয়েছিল। মা'র প্রসব-বেদনা হয়েছে শুনেই তিনি আমার মামার বাড়ীতে গিয়ে বসে ছিলেন। আমি প্রসূত হ'বার পর তিনি সূতিকাঘরে গিয়ে আমাকে দেখে যখন গঙ্গাস্নান ক'রে বাড়ী ফিরবেন ব'লে বাহির হলেন, তখন দিদিমা ব'লে পাঠালেন—'সন্দেশ কই?' উত্তরে ঠাকুরদা বল্‌লেন, 'যদি মেয়ে হ'ত তবে সন্দেশ পাঠাতাম—যখন তখন গিন্নীকে ভয় দেখাতে পারতাম, তাঁ'র তোয়াক্কা রাখি না। কিন্তু এ যে তিনিই ভয় দেখা'বেন!' আমিও তেমনই বল্‌ছি, রেণুর যদি মেয়ে হ'ত, তবে পিসীমা'র ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব হ'ত। কিন্তু সে সুযোগ ত হ'ল না।"

মৃণালিনীর মন সুধীরের প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইল। কিন্তু তবুও তিনি বলিলেন, "ব্যঙ্গ ছাড়! বিষয়টা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়।"

"উড়িয়ে দেবার না হ'তে পারে, কিন্তু রেণুর মা'র চিতায় পুড়িয়েই এসেছি।"

যে উত্তেজনার ভাব সুধীরের কথায় কখন আত্মপ্রকাশ করিত না, তাহার উক্তিতে তাহার বিকাশে মৃণালিনী বুঝিতে পারিলেন, সে চেষ্টা করিয়া আপনার শোকোচ্ছ্বাস দমিত করিতেছে। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু তিনি মনে যে তৃপ্তি পাইলেন, তাহা অসাধারণ।

কিছুক্ষণ দেবদত্তকে লইয়া খেলা করিয়া সুধীর চলিয়া গেল। পিসীমা তাহার মনোভাব জানিয়াও যে ভাবে তাহাকে বিব্রত করিতেছেন, তাহা তাহার অপ্রীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে দিন রাত্রিকালে সে আহারে বসিলে পিসীমা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি খোকাকে দেখ্‌তে গেছলে?"—তখন সে কেবল "হাঁ" বলিয়াই কথা শেষ করিতে পারিল না বা শেষ করিল না; সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "রেণুর মাসীমাকে তুমি যা' ব'লে এসেছিলে, তিনি আমাকে তা' জানিয়ে দিয়েছেন আর তা'তে আমার যা' বলবার তা'ও আমি তাঁ'কে ব'লে এসে'ছি।"

কুমুদা দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল—সে মনে মনে আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করিল; সে-ই ত পিসীমা'কে মৃণালিনীর কাছে যাইয়া তাঁহাকে বলিতে বলিয়াছিল—তিনি দাদাবাবুকে বলুন, তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। তাহার পিতা যখন প্রৌঢ় হইয়াও আবার বিবাহ করিতে পারিয়াছিল, তখন দাদাবাবু ত কোন্ ছার—কেবল, ভদ্রসমাজে একটা অকারণ চক্ষুলজ্জায় যত বিপদ্ ঘটে।

সুধীর আহার শেষ করিয়া উঠিয়া যাইতে না যাইতে কুমুদা পিসীমা'কে বলিল, "দেখ্‌লে, পিসীমা, 'গরিবের কথা বাসী হ'লে খাটে'। তুমি ত হাল ছেড়েই দিয়েছিলে—তীর্থবাসী হ'তে যাচ্ছিলে। বলে, 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ'। এখন হ'ল ত?"

যে উপায় তিনি উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই, তাহা যে কুমুদা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়াছে, তাহার জন্য কুমুদার নিকট পরাভব স্বীকার করিবেন—সে মনোবৃত্তি পিসীমা'র ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি মনে বুঝিয়াছিলেন, তিনিই হারিয়াছেন। তবুও তাহা স্বীকার না করিয়া তিনি বলিলেন, "বলে, 'গাছে না উঠতেই এক কাঁধি'! আগে দেখ্‌, সুধীর কি ব'লে এসেছে।"

কুমুদা বলিল, "সে কথা আর ভাব্‌তে হ'বে না।"

সেই রাত্রিতে পিসীমা কল্পনায় আকাশে সুরম্য সৌধ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। কুমুদার সঙ্গে তাঁহার অনেক কথা হইল। "ডাগর মেয়ে" আনিতে হইবে, কিন্তু "ধেড়ে বৌ"—মা গো! সে তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি তাহাকে শিক্ষা দিবেন—ইত্যাদি।

অনেক কথার মধ্যে কুমুদার একটা কথা কিন্তু কেমন বেসুরা বাজিল। সে বলিল, "এখন বৌ এসে তোমাকে রেণুর মা'র মত মান্য করে—তবে ত! আজকাল যা' দেখি, তা'তে ভয়ও কিন্তু হয়।"

কে যেন তাঁহার মনে সহসা তপ্তশলাকার স্পর্শ দিল। কুমুদা যাহা বলিল, তাহা যে সম্ভব হইতেও পারে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু আশঙ্কার কারণ যদি থাকে, তবে আশার অবকাশও ত আছে। পিসীমা বলিলেন, "তা'র ঘর-সংসার সে বুঝে নিলেই ত আমি মুক্তি পাই। আমি ত পা বাড়িয়েই আছি, কেবল সুধীরের জন্যই ত সংসারের পাঁক ঘাঁটছি। দেখ্‌লি ত কত লোক তীর্থে বাস করে—পরকালের ভাবনা ভাবে। আমি ত যেতেই চাই।" কুমুদা সে কথার উত্তর দিল না; কিন্তু মনে মনে হাসিল—পিসীমা'র তীর্থস্থানে যাইয়া বাস করিবার বাসনা কত বলবতী, তাহা—আর যাহারই হউক—তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

পিসীমাও আর কিছু বলিলেন না।

পরদিন আহার করিতে বসিয়াই সুধীর পিসীমা'কে বলিল, "তোমার ত আজ গাড়ী চাই?"

পিসীমা বলিলেন, "কেন, সুধীর?"

"রেণুর মাসীমা'র বাড়ী যা'বে না?"

তিনি "হাঁ" বলিলেই সে বলিল, "আমার ফি'রে আসতে পাঁচটা বাজবে; তুমি সাড়ে চারটায় ফিরে এসে গাড়ী পাঠিয়ে দিও।"

পিসীমা'কে একা পাইয়া কুমুদা বলিল, "দেখ্‌লে ত, পিসীমা? বলে 'সেধো, ভাত খাবি?—না হাত ধুয়েই ব'সে আছি।' কি ভুলই হয়েছে, এত দিন রেণুর মাসীকে না ব'লে! হয় ত এত দিন দাদাবাবুর ছেলে কোলে করতে পেতে। নিজে তাগাদা ক'রে তোমাকে পাঠাচ্ছে। বল ত চট্ ক'রে পুরুত ঠাকুরকে আসতে ব'লে আসি। ঘটক-ঘটকী ত বাড়ী মাড়ান ছেড়েছে।"

পিসীমা বলিলেন, "তোর যে আর দেরী সয় না!"

"না, পিসীমা, মন না মতি—যখন দাদাবাবুর মত হয়েছে, তখন আর দেরী করা হ'বে না।"

"আরে বাপু, পাঁচটা মেয়ে দেখ্‌তে হ'বে ত! সকালে উঠে যা'র মুখ দেখব, তা'কেই বৌ ক'রে আনব—তা ত আর হয় না।"

শেষে স্থির হইল, মৃণালিনীর গৃহ হইতে ফিরিবার পথে পিসীমা পুরোহিত ঠাকুরকে ক'নের সন্ধান লইতে বলিয়া আসিবেন।

একটু তাড়াতাড়ি কায সারিয়া পিসীমা গাড়ী আনাইয়া—কুমুদাকে সঙ্গে লইয়া মৃণালিনীর গৃহে গমন করিলেন। তথায় মৃণালিনীর মুখ দেখিয়াই তাঁহার উৎসাহ যেন অকালজলদোদয়ে প্রভাত-পদ্মের দশা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি বিলম্ব না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সুধীর কি এসেছিল?"

মৃণালিনী বলিলেন, "হাঁ।"

কুমুদা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবুর মত হয়েছে?"

মৃণালিনী বলিলেন, "না।"

কুমুদা চক্ষুর্দ্বয় অকারণ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "না! কেন গা? দাদাবাবু কি বল্‌লে?"

পিসীমা'র মুখে কোন কথা বাহির হইল না—কিন্তু তিনি কুমুদার প্রশ্নের উত্তর-প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

পিসীমা'র দিকে চাহিয়া মৃণালিনী বলিলেন, "সুধীর যেমন ভাবে গুরু বিষয় লঘু করে, তেমনই ভাবে বল্‌লে—যদি রেণুর মেয়ে হ'ত তবে না হয় নাতনীর সঙ্গে বিয়ে হ'ত; কিন্তু তা' ত হয় নি।"

পিসীমা যেন জ্বলিয়া উঠিলেন! কেবল "ওঃ" বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন; যাইবার সময় রেণুর পুত্রকে দেখিয়া যাইতেও ভুলিয়া যাইলেন।

গাড়ীতে পিসীমা কোন কথা বলিলেন না। আসন্ন কাল-বৈশাখীর ঝড়ের আশঙ্কায় কুমুদাও আর কিছু বলিল না।

বাড়ীতে ফিরিয়া ঝড় উঠিল এবং পিসীমা'র রাগ কুমুদার উপরেই পড়িল—তাহার কথা শুনিয়াই ত তিনি মৃণালিনীকে অনুরোধ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন—"তোর মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল ত? বলে, ছোট লোক কি না—নইলে এমন বুদ্ধি হ'বে কেন? কি অপমানটাই না করালি!"

কুমুদা জানিত, পিসীমা'র কাছে যে যত সহ্য করে, তাহাকে তত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সে বলিল, "অপমান কি?"

পিসীমা বলিলেন, "তা' তুই কি বুঝবি? ছোট লোকের কি অপমানবোধ আছে? যে অপমান সুধীর নিজে আমাকে করতে ভরষা পায় না, সেই অপমান শালীকে দিয়ে করালে।"

কুমুদা বলিল, "অবাক্ করলে, মা! অপমান কিসে হ'ল?"

"তুই তা'র কি বুঝবি—সে বোধ কি তোদের আছে?"

"না থাকাই ভাল"—বলিয়া কুমুদা চলিয়া গেল।

সেই দিন রাত্রিকালে পিসীমা যখন তাহাকে বলিলেন, "আমি কাশীবাস করতে যা'ব; তুই ঠিক ক'রে বল, যা'বি কি না"—তখন কুমুদা বলিল, "আমি আপন জনদের জিজ্ঞাসা না ক'রে বলতে পারব না।"

"আপন জন! কখন ত খোঁজ নিতে দেখি না।"

"তা নি'ক বা না নিক—আপন জন বটে ত।"

পিসীমা আর কিছু বলিলেন না।

২৩

পিসীমা ইহার পর সত্য সত্যই কাশীবাসিনী হইবার সঙ্কল্প করিলেন এবং সে কথা শুনিয়া সুধীর যখন তাহাতে কোন আপত্তি না করিয়া বলিল, "তবে চল, আমি গিয়ে তোমার বাড়ী ঠিক ক'রে দিয়ে আসি"—তখন আর তাঁহার যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। কুমুদা কিন্তু যাইতে অস্বীকার করিল। পিসীমা বলিলেন, "ছোট লোক কি না! ও আর কত হ'বে! এঁটো পাত কি কখন স্বর্গে যায়?" কুমুদা কিছু বলিল না বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিল, "আমরা এঁটো পাত—আস্তাকুড়েই আমাদের স্থান বটে; কিন্তু যদি কোন দিন বিশ্বনাথ ডাকেন, তবেই যা'ব—কারও উপর অভিমান ক'রে যা'ব না; অভিমান করবারও কেউ নাই।"

সুধীর স্বয়ং যাইয়া পিসীমা'র বাড়ী ঠিক করিয়া দিয়া আসিল। তাহার এক বন্ধুর মা কাশীতে বাস করিতেন—তাঁহার সঙ্গেই পিসীমা'র বাসের ব্যবস্থা সে করিয়া দিয়া আসিল। বাড়ী এক—কিন্তু সব ব্যবস্থা স্বতন্ত্র; কারণ, সে জানিত, সমস্ত জীবন সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিয়া পিসীমা এখন আর কাহারও কোন কথা—সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া চলিতে পারিবেন না।

সে ফিরিয়া আসিবার দিন পিসীমা'কে প্রণাম করিলে—পিসীমা'র একবার মনে হইল, তিনি বলেন, তিনি ফিরিয়া যাইবেন—এই সুধীরই তাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁহার স্নেহের অবলম্বন—সুধীর তাহার শূন্য গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে—তথায় সে একা! পিসীমা'র বুকের মধ্যে স্নেহসঞ্জাত বেদনা অনুভূত হইল। কিন্তু তিনি আর মনের কথা মুখে বলিতে পারিলেন না; কেবল দীর্ঘশ্বাস রুদ্ধ করিতে পারিলেন না। শেষে তিনি বলিলেন, "কুমুদা যে এল না, সে ভালই হ'ল; সে সংসারের সব জানে।"

সেই কথায় সুধীর পিসীমা'র স্নেহের আন্তরিকতা আবার নূতন করিয়া অনুভব করিল। তাহারও বক্ষে বেদনা অনুভূত হইল।

দিন গত হইতে লাগিল।

সুধীর দিন দিন তাহার কাযেই আপনাকে অধিক ব্যাপৃত রাখিতে লাগিল—স্বাস্থ্যের দিকে চাহিবার অবসর তাহার ছিল না, আর সে চাহিবেই বা কেন? তাহার জীবনে কি আকর্ষণ আছে? এক আছে—কন্যা। সেই কন্যার প্রতি পিতার স্নেহ কত আধারণ, তাহা সে-ই জানিত। কিন্তু তাহাও যে বিকাশের কোন সুযোগ পাইল না! সে-ও তাহার ভাগ্য—দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। কন্যাকে সে যে দিন আসিতে বলিত, সে দিন সে আসিত—সপত্নীর পুত্র-কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আসিত, কিন্তু পুত্রকে আনিত না; তাহার আগমন-সংবাদ পাইয়া যদি মৃণালিনী দেবদত্তকে লইয়া আসিতেন, তবে সে যেন তাহাতে বিচলিত হইত—দেবদত্তকে এড়াইয়া চলিতেই চাহিত। তাহার মুখে অকাল-বার্দ্ধক্যের ছায়া নিবিড় হইয়া আসিয়াছিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া মৃণালিনীর সর্ব্বাগ্রে সন্দেহ হইল—কোন বিশেষ ও গোপনীয় কারণ ব্যতীত এমন হয় নাই। তিনি সেই কারণ আবিষ্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি অসাধারণ

বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং যাহা আবিষ্কার করিবেন স্থির করিতেন, তাহা প্রায়ই আবিষ্কার করিতে পারিতেন। সে বিষয়ে সুধীরের পরামর্শ লাভ করিলে তিনি আরও শীঘ্র সফলকাম হইতেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি সুধীরকে কিছু বলিতে চাহিলেন না। তাহাকে দেখিয়াই তিনি তাহার মনের বেদনা কল্পনা করিতে পারিতেন।

তাই মৃণালিনী কারণ সন্ধানের জন্য রেণুর শাশুড়ীর নিকট সংবাদ লইতে প্রবৃত্তা হইলেন। সংবাদ লইয়া তিনি যাহা জানিলেন, তাহাতে তাঁহার বেদনার আর অন্ত রহিল না। পূর্ণিমা যাহা বলিলেন, তাহাতে মৃণালিনী স্তম্ভিতা হইলেন; বুঝিলেন, কি ভুলই হইয়াছে!

পূর্ণিমা যে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারেন নাই, সেই কথা মৃণালিনীর নিকট প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া আর কোন কথা গোপন করিতে পারিলেন না। স্বামীর সহিত রেণুর স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধে আর কেহই কোন ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারিত না বটে, কিন্তু সে ত্রুটি পূর্ণিমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই—অতিক্রম করা সম্ভব নহে। যে সম্বন্ধ কর্ত্তব্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে ত্রুটি না থাকিলেও "প্রাণের" যে অভাব থাকে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। নীরেন্দ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধে তাহাই পূর্ণিমা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি অনেক আশা করিয়া পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন; তাঁহার এক আশা পূর্ণ হইয়াছে, পুত্রের মাতৃহীন পুত্র-কন্যা মা পাইয়াছে, বুঝি তাহাদিগের মা-ও তাহাদিগকে এত যত্ন করিতেন না—এত স্নেহ দেখাইতে পারিতেন না। রেণু যে স্নেহ দেখাইত তাহাও মৌখিক কি না, তিনি বুঝিতে পারিতেন না, কিন্তু তাহাতে কৃত্রিমতাও লক্ষ্য করিতে পারিতেন না। হয়ত তাহা সত্য সত্যই মাতৃস্নেহে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাই কি সব? স্বামি-স্ত্রীর যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক, তিনি পুত্রবধূর সম্বন্ধে তাহাই লক্ষ্য করিতে পারিতেন না এবং তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হইতেন।

তিনি লক্ষ্য করিতেন, এই ভাব পুত্রের পক্ষেও বেদনার কারণ হইয়াছে। তিনি দুই চারি বার কারণ-সন্ধান-চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সে বিষয়ে রেণুর নিকট হইতে তিনি কোনরূপ সাহায্য লাভ করেন নাই। তিনি মৃণালিনীকে বলিলেন—"যা'র অদৃষ্টে ভগবান্ সুখ লিখেন নাই, সে কি অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয় লাভ করতে পারে?" তিনি অশ্রু বর্ষণ করিলেন—তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, স্নেহের অবলম্বন—ঐ পুত্র। তাহার বিবাহ দিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, সংসারের ভগ্ন অংশ আবার সংস্কার করিতে পারিবেন। সে আশা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু তবুও তিনি আশা করিয়াছিলেন, তিনি পুত্রকে সংসারে সুখী দেখিয়া অন্তিমে নয়ন মুদ্রিত করিবেন। রেণুকে পুত্রবধূরূপে পাইয়া তাঁহার সেই আশা আবার বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু অকালজলদোদয়ে যেমন প্রভাতপ্রস্ফুটিত পদ্ম সঙ্কুচিত হইয়া যায়—এ তেমনই হইয়াছে। রেণুকে যে দিন তিনি প্রথম বিচলিত দেখিয়াছিলেন, সেই দিন তিনি শঙ্কিতা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মনে করিয়াছিলেন, স্বামি-স্ত্রীতে যদি বুঝিবার কোন ভুল হইয়া থাকে, তবে ভালবাসাই উভয়কে তাহা ভুলাইয়া দিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। তিনি তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন, মাতৃহীনা কন্যা পিতার আদরে হৃদয়ে অভিমান অধিক পুষ্ট করিয়াছে, কিন্তু তবুও এই ভাব থাকিবে না। তিনি বিশেষ ভাবে মনে করিয়াছিলেন, সন্তান লাভের পর স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক স্নেহে অসন্তোষের সব কারণ দূর হইয়া যাইবে—সন্তানই স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে নূতন বন্ধনের সৃষ্টি করিবে। সাধারণতঃ তাহাই হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা হইল, তাহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। রেণু পুত্রকে তাহার মাসীমা'র কাছেই রাখিয়া আসিল—যেন বলপূর্ব্বক তাহাকে দূরে রাখিল। যে যাহাই কেন বলুক না, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রেণু সে জন্য আপনি কি বেদনা বরণ করিয়া লইয়াছে। তাহার মুখভাবেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন। সে যেন দশ বৎসর অধিক বয়স্কা হইয়াছিল!

সব বলিতে বলিতে পূর্ণিমা কান্দিতে লাগিলেন—মৃণালিনীও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

পূর্ণিমা বলিলেন, "জানি, আপনার কষ্ট হ'বে—কিন্তু তবুও এক এক বার মনে হয়, আমি দেবদত্তকে নিয়ে যাই; রেণু কি তা'তেও তা'র অভিমান-কঠোরতা ত্যাগ করবে না?"

মৃণালিনী বলিলেন, "আমার কষ্টের জন্য ভাবি না। অদৃষ্টে যদি কষ্টই না থাকবে, তবে এমন হ'বে কেন?" তিনি আপন বৈধব্যের কথাই বলিলেন।

তাহার পর তিনি বলিলেন, "এই পুরী আর এই দেবতা—এই দিয়ে তিনি চলে গেছেন। কিন্তু

আমি রেণুকে জানি; যদি ওর অনভিপ্রায়ে দেবদত্তকে আপনি নিয়ে যা'ন, ও আরও দৃঢ় ও কঠোর হ'বে। এখন আমি বুঝতে পারছি, কেন ও কণা অশোকের সঙ্গে দেবদত্তকে মিশতে দিতে চায় না —যেন দেবদত্ত ওর কেউ নয়।"

কিন্তু মৃণালিনী যাহা জানিতে পারিলেন, তাহাতে তাঁহার বেদনা ও ভাবনা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। কি উপায়ে তিনি রেণুর বেদনা দূর করিতে পারেন, সেই চিন্তাই তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এ বিষয়ে প্রথম কর্ত্তব্য স্থির করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি জীবনে কখন কোন বিষয়ে বক্র পথ গ্রহণ করেন নাই এবং সুধীর তাঁহাকে সর্ব্বদাই বলিয়াছে —পুরুষের কুটিল বুদ্ধি যে স্থানে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, সে স্থানে স্ত্রীলোকের সরল বুদ্ধি জয়ী হয়। তিনি টেলিফোন করিয়া রেণুকে তাঁহার নিকট আসিতে বলিয়া তাহাকে আনাইতে গাড়ী পাঠাইলেন।

রেণু আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন—"রেণু, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক' বছর কেটে গেল, দেবদত্তের লিখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।"

রেণু বলিল, "তা' ত আপনি করেছেন।"

"করেছি, কিন্তু আমার বিদ্যা ত তুই জানিস। নিজে যেখানে অসিদ্ধ, সেখানে অন্যের সাধনার কি ব্যবস্থা করব?"

রেণু বলিল, "আমিই কি খুব পণ্ডিত, মাসীমা?"

"না হ'লেও আমার চাইতে তুই বেশী জানিস। তোর মেসমশাই এক বার তোরই লিখাপড়ার কথায়— সুধীরকে বলেছিলেন, মেয়েদের লিখাপড়া শিখবার প্রয়োজন আছে। তাতে সুধীর যখন হেসে বলেছিল, 'জানেন ত মাড়বারীরা মাষ্টারকে বলে, ছেলকে তার পড়নে লায়েক করলেই হ'বে—অর্থাৎ সে ব্যবসা সম্বন্ধে টেলিগ্রাম প'ড়ে তা'র মানে বুঝতে পারলেই, হ'ল তেমনই আমাদের মেয়েদের লিখাপড়া শিক্ষা—গোয়ালার আর ধোপার হিসাব দেখে নেওয়া, আর চিঠি লিখা।' তখন তিনি বলেছিলেন, 'তা' নয়, —একটা বড় কায মেয়েরা করতে পারে। ভগবান তা'দের সন্তান পালন করবার ভার দিয়েছেন, যদি তা'রা ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারে, তবে যে কত উপকার হয়—কত সুশিক্ষা দেওয়া যায়, তা' কি আর বল্‌তে হ'বে?' সুধীরও তা স্বীকার করেছিল।"

রেণু বলিল, "যেটুকু বিদ্যা আমার আছে তা'ই ভাঙ্গিয়ে ত কণাকে আর অশোককে গাধা করছি।"

"সে কথা নয়, মা। দেবদত্তের বাবা ত বিদ্বান —সে কেন ছেলের শিক্ষার ভার নেবে না?"

সহসা রেণুর মুখ যেন রক্তলেশহীন—পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

সে একটু সামলাইয়া লইলে মৃণালিনী বলিলেন, "দেখ, তোর মেসমশাই বল্‌তেন, ছেলেদের পুতু-পুতু ক'রে 'মানুষ করলে' তা'রা জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত হয় না; সেই জন্য তিনি ছেলেদের বাড়ীতে না পড়িয়ে স্কুলে দিবার পক্ষপাতী ছিলেন—দশ জনের সঙ্গে মিশলে তা'দের অনেক ত্রুটি ঘুচে যায়।"

রেণু কিছু বলিল না।

মৃণালিনী বলিলেন, "এ বার ত দেবদত্তকে স্কুলে দিতে হ'বে?"

রেণু বলিল, "ও আপনার—আপনি যা' ভাল বুঝবেন, তা-ই করবেন।"

"অশোককে তুই কোন্ স্কুলে দিয়েছিস?"

সহসা সর্পাহত হইলে মানুষ যেমন ভীত ও চমকিত হয়, রেণু তেমনই ভীত ও চমকিত হইল— অত্যন্ত কাতরভাবে মৃণালিনীকে বলিল, "মাসীমা, আপনি আমার মা'র চাইতেও বুঝি আমাকে বেশী ভালবেসেছেন। আমার একটা অনুরোধ—একটা আব্দার—একটা প্রার্থনা—আপনি দেবদত্তকে অশোকের সঙ্গে এক স্কুলে পড়তে দেবেন না; দেবদত্ত আপনার—ও যেন তাই-ই জানে।"

বলিতে বলিতে রেণুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। কিন্তু তাহার চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল না - আকাশ যখন নিদারুণ রবিকরে জ্বলিতে থাকে, তখন কি তাহাতে স্নিগ্ধ মেঘের সঞ্চার সম্ভব হয়?

কিন্তু মৃণালিনী আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অভ্যস্ত সংযমের বন্ধন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি রেণুকে বুকে লইয়া বলিলেন, "কেন এমন করছিস, মা? তোর বাবার আর তোর মাসীর কি তুই ছাড়া আর কেউ আছে?"

তখন রেণুর অভিমান যেন আরও প্রবল হইল— যে অভিমান সে এত দিন প্রকাশ করিতে পারে নাই, আজ সে তাহা আর অপ্রকাশ রাখিতে পারিল না— সে দৃঢ় স্বরে বলিল, "আমি কি কোন অন্যায় কায করেছি?"

মৃণালিনী তাহাকে বলিলেন, "তুই কোন অন্যায় কায করতে পারিস, এ আমাদের ধারণার অতীত; আর যদি কখন সে ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তবে তা'র আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।"

দ্বিগুণ অভিমানে রেণুর হৃদয় পূর্ণ হইল। সে বলিল, "আমাকে কর্ত্তব্য ব'লে যা করতে পাঠিয়েছেন, তা'তে কি আমার কোন ত্রুটি হয়েছে?"

"তোকে ত আমরা কোন কর্ত্তব্য করতে পাঠাই নি, মা। আমরা—"

বাধা দিয়া রেণু বলিল, "যিনি আমার স্বামী—তাঁ'র ছেলেমেয়ের মা'র অভাব পূর্ণ করতে কি আমি পারি নি?"

এ বার মৃণালিনীকে চমকিয়া উঠিতে হইল - তিনি বুঝিলেন, কোথায় যে ভুল হইয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার আর উপায় নাই। তিনি বলিলেন,—"সে কি কথা, রেণু?"

রেণু যেন অস্বাভাবিক দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া বলিল—"আমাকে ত তাই শুন্‌তে হয়েছে।"

"এ কথা তো'কে কা'র কাছে শুন্‌তে হয়েছে?"

রেণু আর কোন উত্তর দিল না—কিন্তু তাহার যে তীব্র দৃষ্টিতে সে মাসীমা'র দিকে চাহিয়া এতক্ষণ কথা বলিতেছিল, সে দৃষ্টি নত হইল। তাহা কোমল হইল না।

মৃণালিনী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন -তিনি বুঝিলেন, যে ভুল হইয়াছে, তাহা সংশোধিত হইবার নহে। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না—নীরেন্দ্র কেন এমন কথা বলিয়াছে। তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারও তাঁহার নাই। কেবল রেণুর বেদনা বক্ষে অনুভব করিবার অধিকারই তাঁহার আছে।

তিনি কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "মা, যদি কোন ভুল ক'রে থাকি, তবে সে জন্য আমিই দায়ী। তোর বাবার কোন দোষ নাই—আমিই তোর ব্যবহারে ভুল বুঝেছিলাম—তাকে ভুল বুঝিয়েছিলাম। মা, যদি পারিস, আমাকে ক্ষমা করিস।"

এই বার রেণুর দৃঢ়তা গলিয়া গেল। তাহার জ্ঞানোন্মেষ অবধি মা পীড়িতা—রুগ্না। এই মাসীমাই তাহাকে অবারিত স্নেহে "মানুষ করিয়াছেন"—তাহার জন্য তিনি কত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন, তাহাও সে জানে। সেই মাসীমা'র এই কথা তাহার দৃঢ়তা ভাসাইয়া লইয়া গেল। এতক্ষণে সে আপনি মাসীমা'র বুকে মুখ লুকাইল। সে যে মাসীমা'কে এত কষ্ট দিয়াছে, তাহাতে সে মর্ম্মাহতা হইল। সে বলিল—"মাসীমা! মা!"—সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

সে-ও কান্দিতে লাগিল—মৃণালিনীও কান্দিতে লাগিলেন।

সেই সময় দেবদত্ত ডাকিল, "মা!"

সে তাহার শিক্ষকের নিকট পড়িয়া আসিয়াছিল। অভ্যাসবশে মৃণালিনীই বলিলেন, "কি বাবা?"

রেণু যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল; বলিল, "মাসীমা, আপনিই ত বলেন, মন নারায়ণ—আপনার মন থেকেই ঐ উত্তর বেরিয়েছে। ও আপনার।"

সাধারণতঃ দেবদত্ত পড়িয়া আসিয়া কাপড় না ছাড়িয়া মৃণালিনীকে স্পর্শ করে না।

আজও সে সেই জন্যই একটু দূরেই দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু আজ মৃণালিনী আর তাহাকে বুকে না লইয়া থাকিতে পারিলেন না।

রেণু বলিল, "মাসীমা, মেয়ের একটা কথা রাখবেন—ওর ঐ ভুল ভুল নয়—ও ভুল ভাঙ্গতে দেবেন না।"

২৪

রেণু চলিয়া গেল - হয়ত যে কথা এই দীর্ঘকাল প্রকাশ করিতে পারে নাই, এবং যাহা তাহার মনের মধ্যে থাকিয়া কেবলই তাহাকে দুর্ব্বহ বেদনায় পীড়িত করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বেদনার ভার কিছু লঘু বোধ করিল। তাহার পিতা ও মাসীমা যে ভুল বুঝিয়াছিলেন—তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ কর্ত্তব্যচ্যুত হয়েন নাই, ইহাও সে জানিয়া গেল। তাহা জানায় যদি কোনরূপ সান্ত্বনালাভের সম্ভাবনা থাকে, তবে সে সেই সান্ত্বনাও লাভ করিল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে—যাহা গঠিত হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া গড়িবার উপায় নাই। সে পত্নীর কর্ত্তব্য পালন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল—সে কর্ত্তব্য সে পালন করিয়া আসিয়াছে, করিবে। যে স্থানে ভালবাসা আঘাত পাইয়া অঙ্কুরেই নষ্ট হয়, সে স্থানেও সেই কর্ত্তব্যপালন—কর্ত্তব্যের আবরণে মনের অগ্নি লুকাইয়া রাখা—কিরূপ কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ সহজে অনুমান করিতেও পারে না। রেণু প্রতিদিন আপনার কার্য্যের বিশ্লেষণ করিয়াছে—কোথাও কর্ত্তব্যত্রুটি দেখিতে পায় নাই।

কিন্তু জলের স্রোতঃ যখন একই ভাবে প্রবাহিত হয়, তখন তাহাকে যেমন অন্যান্য দিকে ফিরান যায় না, তেমনই সে তাহার চিন্তাকে অন্য দিকে লইতে পারে নাই। আজ তাহার সে কথা মনে হইল। তখন সে যাহা দেখিতে পাইল, তাহাতে সে আপনি শঙ্কিতা হইল—আপনাকে ধিক্কার

দিল—নারীজন্মকে ধিক্কার প্রদান করিল। চিরাচরিত বিশ্বাসবশে আমরা নারীর নারীত্বের প্রতিই অধিক মনোযোগ দিয়া থাকি; অনেক সময় নারীও ভুলিয়া যায়েন. তাঁহার আরও কর্ত্তব্য আছে। সন্তানের কর্ত্তব্য, মাতার কর্ত্তব্য, ভগিনীর কর্ত্তব্য—এ সবও উপেক্ষণীয় নহে। আজ রেণুর মনে হইল, সে সে সব কর্ত্তব্য অবজ্ঞা করিয়াছে—সেই অপরাধে সে অপরাধী।

সন্তানের কর্ত্তব্য পিতা-মাতার প্রতি। সে তাহার পিতা-মাতার নিকট কেবল স্নেহ ও আদরই লইয়াছে—প্রতিদানে কিছুই দেয় নাই। মা তাহার নিকট সেবা গ্রহণের পূর্ব্বেই সেবার অতীত লোকে গমন করিয়াছেন। কিন্তু যে মাসীমা তাহাকে তাহার মাতার অভাব অনুভব করিতে দেন নাই—পাছে সে সেই অভাব অনুভব করে সেই আশঙ্কায় তাহাকে মাতৃস্নেহেরও অধিক স্নেহ অকাতরে প্রদান করিয়াছেন—সেই মাসীমা? সেই মাসীমা'র প্রতি কি তাহার কোন কর্ত্তব্যই নাই? সে তাহার স্নেহশীল পিতার সম্বন্ধে যেমন, তাহার স্নেহশীলা মাসীমা'র সম্বন্ধেও তেমনই—অভিমানবশে কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছে। সে অভিমানকেই বড় মনে করিয়াছে, তাহা স্বার্থেরই প্রতি আগ্রহ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? তাহার পিতা—তাহাকে কত স্নেহ করেন, তাহাও সে ভুলিয়া গিয়াছে? সে তাহার পিতার কথা যতই মনে করিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, তাঁহার মত আদর্শচরিত্র মানুষ সে কি কল্পনাও করিতে পারে? পত্নীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও পত্নীর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি আদর্শই নহে? সেই পিতার প্রতি অভিমানবশে সে কত দিন তাঁহাকে দেখিতেও যায় নাই। কিন্তু তাঁহার স্নেহের এতটুকু হ্রাস হয় নাই। পিসীমা চলিয়া গিয়াছেন—কে তাঁহাকে দেখিতেছে? অথচ সে—তাঁহার কন্যা বর্ত্তমান। তাহার মনে হইয়াছে—সে মনে করিয়াছে, সে থাকিয়াও নাই; তাহার কর্ত্তব্য—স্বামীর পুত্র-কন্যার জননীর কায করা। কিন্তু তাহা যে অভিমানের ফল, তাহা যে ভিত্তিহীন, আজ যখন মৃণালিনীর কথায় সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, তখন সে কি করিবে?

তাহার জীবনের ব্যর্থতা আজ রেণুকে যে ভাবে পীড়িত করিতে লাগিল, তাহাতে সে যেন সমুদ্রের তরঙ্গ-তাড়নে কাতর ও আপনাকে অসহায় বিবেচনা করিতে লাগিল। যেন সে দুর্ব্বুদ্ধিবশে তরণী হইতে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে—তরঙ্গমালা তাহাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে। সে অসহায়। সকল দিকেই যেন বিপদ। আর সে বিপদ তাহার আপনার সৃষ্ট।

তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—সে যেন সকল অনর্থের হেতু।

সমস্ত রাত্রি সে জাগিয়া কাটাইল—যেন শত বৃশ্চিকের দংশন-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। দিবালোকবিকাশের পূর্ব্বেই সে শয্যাত্যাগ করিল—সংসারের নিয়মিত কাযে কোনরূপে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিবে। বনমধ্যে পথিক একাকী যদি দেখে এক দল ক্ষুধিত নেকড়ে বাঘ তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তবে তাহার যে অবস্থা হয়, দুশ্চিন্তাতাড়িত হইয়া তাহার সেই অবস্থা হইয়াছিল।

তাহার মনে পড়িল—সে যখন রোগশয্যায়—যখন তাহাকে লইয়া সত্যসত্যই যমে-মানুষে টানাটানি, তখন যে উৎকণ্ঠা সুধীরের মনে প্রবল হইয়াছিল তাহাতে তাহার দেহে অকাল-জরার লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে সব লক্ষণ দিন দিন স্পষ্ট হইতেছে। মৃণালিনী একাধিক বার তাহার উল্লেখ করিয়া রেণুকে বলিয়াছেন—"দেখলে দুঃখ হয়।" বাস্তবিক তাহাকে দেখিবার, তাহার সেবাশুশ্রূষা করিবার, তাহাকে একটু যত্ন করিবার কেহ গৃহে নাই। কুমুদা প্রায়ই মৃণালিনীর কাছে বা তাহার কাছে দুঃখ করে—"দাদাবাবুর আহার ত পাখীর আহার হ'ল। অথচ খাটনী দিন দিন বাড়ছে—সকালে সন্ধ্যায় বাড়ীতে মক্কেলের ভীড়। আর দাদাবাবু ত বই নিয়েই আছেন। এমন ক'রে শরীর ক'দিন টিকবে?" সে সে কথা শুনিয়াছে, পিতাকে লক্ষ্য করিয়াছে; কিন্তু কন্যার কর্ত্তব্য স্মরণ করে নাই। পরন্তু মৃণালিনী যখন সময় সময় বলিয়াছেন, "রেণু, তুই মাঝে মাঝে গিয়ে বাপের কাছে থাক; দেবদত্তকেও নিয়ে যা"—তখন সে সেই কথায় বিরক্তই হইয়াছে। আজ সে বুঝিল, সে কেবল অভিমানবশে। সে স্থির করিয়াছিল, স্বামীর পুত্র-কন্যাকে পালন করাই তাহার কায—সে অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহাই করিবে। কিন্তু অভিমানের যে বর্ম্মে সে আপনার হৃদয় আবৃত করিয়াছিল, আজ মৃণালিনীর কথার আঘাতে তাহা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে—আঘাত বক্ষে যাইয়া লাগিয়াছে। তাই আজ সেই আঘাতের ক্ষতমুখে যেন বুকের রক্ত বাহির হইয়া যাইতেছে—সে কেবলই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু সে কি করিবে? আর কি ফিরিবার উপায় আছে? যাহা ত্যাগ করা হয়, তাহা কি আবার পাওয়া যায়?

তাহার মনের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইল—সে কি তাহার ত্যক্ত পথে ফিরিয়া যাইবে? তখনই মনে হইল—সব হয়ত হইতে পারে, কিন্তু এক বিষয় আর হইতে পারে না। সে আবার পিতার কাছে কন্যার আদর লাইতে পারে—পিতা তাহাকে তাহা দিবার জন্যই ব্যাকুল; সে আবার মাসীমা'র সেই স্নেহ পাইতে পারে—তিনি তাহা অকাতরেই দিতেছেন, কেবল সে-ই তাহা গ্রহণ করিতেছে না—প্রত্যাখ্যান করিতেছে; সে সবই হইতে পারে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে কি তাহার স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে? যৌবনের ভালবাসা-কুসুম যখন আপনারও অজ্ঞাতে স্বাভাবিক নিয়মে স্বামীর ব্যবহারে ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেই সময় নীরেন্দ্রের একটি অসতর্ক উক্তির আঘাতে তাহা ছিন্নদল হইয়া কর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইয়াছে। তদবধি সে এত দিন জীবনের যে নূতন আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া সে আজ আবার কেমন করিয়া স্বামীর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইবে? তাহার যে ব্যবহার স্বামীকে দূরে রাখিয়াছে, স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর রচনা করিয়াছে, লজ্জা ত্যাগ করিয়া সে কি সেই প্রাচীরের একখানির উপর একখানি করিয়া স্থাপিত ইষ্টক স্থানচ্যুত করিয়া সেই ব্যবধান দূর করিতে পারে? তাহার মনের মধ্য হইতে—তাহার নারীসুলভ লজ্জা বলিয়া উঠিল,—না! না! না! সে আবার ভাবিল নারীজন্মে ধিক্।

হয়ত ভুলই হইয়াছে, কিন্তু ভুল সংশোধন করিবার আর উপায় নাই—সে যদি কর্ত্তব্যের কঙ্কর-কণ্টকিত পথই বাছিয়া লইয়া থাকে, তবে তাহাকে অবশিষ্ট জীবন সেই পথই অতিক্রম করিতে হইবে। পদে পদে চরণ ক্ষতবিক্ষত হইবে। কিন্তু উপায় কি? তাহাই তাহার নিয়তি।

কিন্তু সে এক বারও বুঝিতে পারিল না—হয়ত সে-ই ভুল করিয়াছে এবং আবার ভুলই করিতেছে, তাহার বেদনার ঔষধ নাই। ভালবাসাই তাহার একমাত্র ভেষজ; সে তাহাই দূরে ফেলিয়া দিয়াছে।

পুত্রবধূর মুখ দেখিয়াই তীক্ষ্ণবুদ্ধি পূর্ণিমার মনে হইল—একটা কিছু ঘটিয়াছে। তিনি পুত্র পুত্রবধূর ব্যবহারে যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করিতেন—পুত্রের মুখে যে ঘন বিষাদের লেপ দেখিতে পাইতেন—তাহাতে তিনি সর্ব্বদাই ব্যথিতা হইতেন; যেন তাঁহার বক্ষে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে—কেবলই তাঁহাকে বেদনা দিতেছে—অথচ সে কণ্টক কোথায় তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না—কাযেই তাহা উৎপাটিত করিবার উপায়ও করিতে পারিতেছেন না। তিনিও দিন দিন নিরাশ হইয়া পড়িতেছিলেন।

আজ তিনি রেণুর মুখে যে ভাব লক্ষ্য করিলেন, তাহা কেবল কাল-বৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির পর কুসুম-কাননের অবস্থার সহিত তুলনীয়। অথচ তিনি তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। গৃহে নিত্য যেমন হয়, তেমনই হইয়াছে—কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই—কোন নূতন বা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় দৈনন্দির কার্য্যের স্রোতে আবর্ত্তের উদ্ভব হয় নাই; কেবল রেণু তাহার মাসীমা'র বাটীতে গিয়াছিল। তিনি যে মৃণালিনীকে কতকগুলি কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার পর মৃণালিনী রেণুকে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া তাঁহার মনে হইল, নিশ্চয়ই মৃণালিনীর কোন কথায় এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু মৃণালিনীকে তিনি ভালরূপই জানিতেন; তাঁহার মত স্থিরবুদ্ধি পুরুষ বা মহিলা তিনি আর দেখেন নাই; তিনি যে কোন কথায় রেণুকে বেদনা দিতে পারেন, ইহা পূর্ণিমার কল্পনাতীত। তবে কি হইল?

তিনি জানিতেন, রেণুকে সে কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা—জিজ্ঞাসা করিলে সে কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে—তাহার উত্তরে ত্রুটি ধরিবার কিছুই থাকিবে না বটে, কিন্তু কিছুই জানা যাইবে না। রাজহংসের গাত্রে জল পড়িলে তাহা যেমন তাহার পালক সিক্ত করিতে পারে না—গড়াইয়া পড়িয়া যায়, তেমনই কোনরূপ জিজ্ঞাসায় রেণুর উত্তর দিতে অনিচ্ছা বা আপত্তি থাকিলে জিজ্ঞাসা কখনই তাহাকে কোনরূপে আকৃষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু অবস্থায় কিছু প্রভেদ ঘটিয়াছে—মৃণালিনীকে তিনি যাহা বলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার পর এই অবস্থা। তাই কি হইয়াছে জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ তাঁহাকে মৃণালিনীর গৃহে যাইতে প্ররোচিত করিল।

তিনি আশায় ও আশঙ্কায়—আশা অপেক্ষাও আশঙ্কায় চঞ্চল চিত্তে অপরাহ্নে মৃণালিনীর গৃহে উপনীত হইলেন। তখন মৃণালিনী অন্য দিনেরই মত দেবদত্তের পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বসিয়া ছিলেন—দেবদত্ত শিক্ষকের নিকট পাঠ লইতেছিল। তাঁহার ব্যবস্থা ছিল, তিনি যতক্ষণ পারিতেন, পাঠরত

দেবদত্তের কাছে বসিয়া থাকিতেন। সুধীর তাঁহাকে বলিয়াছিল, মা'র ধৈর্য্য ব্যতীত শিশুকে পাঠ অভ্যাস করাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা এবং আমাদিগের দেশে যে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই শিক্ষায় আনন্দ পায় না—পাঠের সঙ্গে যে আতঙ্কের উদ্ভব হয়, তাহার কারণ তাহাদিগকে ঐ বিড়ম্বনাই ভোগ করিতে হয়। শিক্ষার সঙ্গে যদি ধৈর্য্যহারা শিক্ষকের তিরস্কার বা প্রহার সংযুক্ত হয়, তবে শিক্ষায় কিরূপে শিশুর আগ্রহ জন্মিতে পারে? তাই তিনি দেবদত্তের পাঠকালে তাহার কাছে থাকিবার চেষ্টাই করিতেন—অনেক সময় তাহাকে পাঠ বুঝাইতে শিক্ষক যখন অক্ষম হয়েন, তখন তিনি অতি সহজে তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন।

পূর্ণিমাকে দেখিয়া তিনি উঠিলেন, শিক্ষককে বলিলেন, "আজ পড়া থাকুক; আপনি ঐ গল্পের বই হ'তে একলব্যের গল্পটি দেবদত্তকে প'ড়ে শুনান।'

পূর্ণিমা দেখিলেন, স্বভাবতঃ স্থির মৃণালিনীর মুখেও চাঞ্চল্যের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। ইহা অসাধারণ ব্যাপার।

উভয়ে অন্য কক্ষে আসিলে পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ রেণুর মুখ দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, কি হয়েছে জান্‌তে আপনার কাছে এসেছি। কি হয়েছে, যে, আপনাকে দেখেও বুঝা যায়—ঝড় বহে গেছে?"

মৃণালিনী বলিলেন, "আমাকে দেখেও তাই মনে হয়? বোধ হয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সহ্য করবার—অচঞ্চল থাকবার শক্তিও হ্রাস পায়।"

"কি হয়েছে?"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃণালিনী বলিলেন, "আমরা রেণুকে ভুল বুঝেছি; সে-ও আমাকে ও তা'র বাবাকে ভুল বুঝেছে। কিন্তু তা'ও সহ্য করা যায়। যা' সহ্য করা যায় না—সে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে ভুল বুঝেছে।" বলিতে বলিতে মৃণালিনীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

পূর্ণিমা সাগ্রহে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এ সব ভুল ভাঙ্গিয়ে দিন। আপনি পারবেন।"

মৃণালিনী বলিলেন, "কালও আমার মনে হয়েছিল, আমি তা' পারব; কিন্তু সমস্ত রাত যত ভেবেছি আর কেঁদেছি—আর দেবদত্তকে বুকে চেপে ধরেছি, ততই আমার মনে আশার আলো যেন ক্ষীণ হয়ে এসেছে, আর অন্ধকার ততই ঘন হয়েছে।"

পূর্ণিমা ভীতা হইলেন।

মৃণালিনী বলিলেন, "আমি এক বার সুধীরের সঙ্গে পরামর্শ করব। কিন্তু তা'তেও যে কোন ফল হ'বে, সে বিশ্বাসও আমি হারাচ্ছি। বোধ হয়, ভেবে ভেবেই, রেণুর সম্বন্ধে সে যেন কেমন আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। তা'কে দেখলে দুঃখ হয়।" মৃণালিনীর গলাটা ধরিয়া আসিল। তিনি একটু থামিয়া বলিলেন, "আপনি ত সবই জানেন—অমন ধৈর্য্য, অমন সংযম আর কে দেখাতে পারবে? কিন্তু ধৈর্য্যেরও বুঝি সীমা আছে—সমুদ্রেরও কূল থাকে। বুঝি সেই সীমা লঙ্ঘিত হচ্ছে।"

পূর্ণিমা আর কি বলিবেন?

অল্পক্ষণ পরে—উভয়েই যখন নির্ব্বাক্, চিন্তায় মগ্ন, তখন দেবদত্ত আসিয়া ডাকিল,—"মা!"

দুই জনই তাহার জন্য বাহু প্রসারিত করিলেন। সে বোধ হয়, পূর্ণিমার বাহুপ্রসারণ লক্ষ্য করে নাই, মৃণালিনীর কোলেই আসিল।

পূর্ণিমার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। এই সংসার!

মৃণালিনী তাঁহাকে বলিলেন, "যাহা মানুষের সাধ্যাতীত, তা'-যিনি ইচ্ছামাত্র করতে পারেন, দেখি, যদি তাঁ'র দয়া হয়।"

তিনি দুই কর যুক্ত করিয়া উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবদত্তও তাহার কোমল করদ্বয় যুক্ত করিয়া প্রণাম করিল।

পূর্ণিমা তাহার মুখচুম্বন করিলেন। কে আশা ত্যাগ করিতে পারে? তিনি আশা করিলেন, এই পুণ্যবতী মহিলার প্রার্থনা দেবতা কখন অপূর্ণ রাখিবেন না—আর এই সরল বালকের—।

পূর্ণিমা বিদায় লইয়া যাইলে দেবদত্ত মৃণালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, উনি কাঁদলেন কেন?"

মৃণালিনী কি উত্তর দিবেন? তিনি বলিলেন, "মনে ব্যথা পেয়েছেন।"

আর পূর্ণিমা গৃহে ফিরিয়া যাইলেই অশোক ও কণা আসিয়া মুখ ভার করিল, "তুমি কোথায় গেছলে?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "কেন আমার কি কেউ নেই।"

কণা বলিল, "কে আছে?"

অশোক বলিল, "তুমি কি দেবুকে দেখ্‌তে গেছলে? আমাদের নিয়ে গেলে না কেন?"

পূর্ণিমা অন্য কথায় সে প্রশ্ন এড়াইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

২৫

রেণু ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল, সে এত দিন যে কর্ত্তব্য অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, তাহা পালন করিবে। সুধীর ইহার পর যে দিন তাহাকে দেখিতে আসিল, সেই দিনই সে বলিল, "বাবা, আমি শনিবারে তোমার কাছে যা'ব।" তাহার এই কথায় সুধীর বিস্মিত হইল—বিবাহের পর এত দিনের মধ্যে রেণু কখন যাচিয়া পিত্রালয়ে যাইতে চাহে নাই। সে দুঃখ তাহার অন্তরকে পীড়িত করিত; কিন্তু তাহা সে প্রকাশ করিবার সুযোগও কোন দিন পায় নাই। আজ যেন কে তাহার দুঃখের ক্ষতে স্নিগ্ধ ভেষজের প্রলেপ দিল।

কিন্তু অদৃষ্টের কি উপহাস! তখনই তাহার মনে পড়িল—শনিবারে হাইকোর্ট বন্ধ থাকিলেও তাহার ছুটি নাই—বাঁকুড়ায় একটা বড় মামলায় এক পক্ষ তাহাকে ব্যবহারাজীব নিযুক্ত করিয়াছেন। একটা বাঁধ লইয়া দুই জমিদারে মামলা—এক পক্ষে এক জন বড় ব্যারিষ্টার, অপর পক্ষে সে। মামলাটি জিদের এবং বহুদিন হইতে নানা আকারে চলিয়া আসিয়াছে। যেরূপ মোকর্দ্দমায় বহু দিনের বহু দলিল, রায়, মানচিত্র প্রভৃতি দেখিয়া কায করিতে হয়, সেইরূপ মোকর্দ্দমায় তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং সেই জন্যই এক পক্ষ তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাব-জজ উভয় পক্ষের ব্যবহারাজীবের অনুরোধে শনিবারে শনিবারে মোকর্দ্দমাটির শুনানী স্থির করিয়াছিলেন। সে বলিল, "মা, আমি ত শনিবারে কলিকাতায় থাকব না।"

রেণু কিছু বলিল না। সে মনে করিল, অদৃষ্টের সহিত সংগ্রামে এ-ও তাহার পরাভব। সে মনে করিয়াছিল, সে জয়ী হইবে—অদৃষ্ট এক আঘাতে তাহার চেষ্টা ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল—তাহার ভাগ্যে জয় নাই।

রেণু কোন কথা বলিল না—পিতার উপস্থিত না থাকিবার কারণও জিজ্ঞাসা করিল না; দেখিয়া সুধীর বলিল, "বাঁকুড়ার মোকর্দ্দমাটা এখনও শেষ হয়নি; এই শনিবারের পরের শনিবারও শেষ হ'বে না।"

সুধীরের মোকর্দ্দমায় বাঁকুড়ায় যাইবার কথা রেণু জানিত। কারণ, তাহার ও দেবদত্তের জন্য সে বাঁকুড়া হইতে যে পরিমাণ গোপীনাথপুরের বিছানার চাদর ও পাত্রসায়রের বড় বড় কাঁসার বাটি আনিয়াছে, তাহা দেখিয়া পূর্ণিমা রেণুকে বলিয়াছেন, "তোমার বাবা কি এ বার ওকালতী ছেড়ে চাদরের আর বাসনের ব্যবসা করবেন, রেণু?"

কন্যার ও দৌহিত্রের জন্য নানা জিনিষ কিনিয়া আনা—সুধীরের একটা বাতিকের মত হইয়াছিল। মানুষের স্নেহ যখন প্রকাশপথ পায় না, তখন সে কেবলই সেই পথের সন্ধান করে—পর্ব্বতের অঙ্গে উৎস হইতে উদ্গত জলধারা যেমনভাবে অবতরণ-পথ খুঁজিয়া নানা দিকে প্রবাহিত হয়, স্নেহও তেমনই নানা উপায়ে আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহে।

সুধীর বলিল, "রবিবার ভোরে আমি ফিরব—ষ্টেশন হ'তে এসে তোকে নিয়ে বাড়ী যা'ব। তুই গিয়ে খাবার সব ব্যবস্থা করবি। জানিস ত হোটেলে নিজের দরকারমত সব নিজে ঠিক ক'রে নিতে হয়।"

বলিয়া সুধীর ম্লান হাসি হাসিল।

যদিও সুধীরের কোন দোষ ছিল না, তথাপি প্রথমেই বাধা পাইয়া রেণু বলিতে যাইতেছিল, "তা' হ'লে মোকর্দ্দমাটা শেষ না হওয়া অবধি আর যা'ব না"—কিন্তু তাহার ঐ ম্লান হাসির অন্তরালে যে বেদনা ছিল, তাহা বুঝিয়া সে আর তাহা বলিল না, বলিল—"রবিবারে ত কণার আর অশোকের স্কুল নাই—ওরা মা'কে একটু বিশ্রাম করতেও দেবে না।"

যখন পিতা-পুত্রীতে এই কথা হইতেছিল, তখন পূর্ণিমা তথায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "খুব দেবে। তুমি সে জন্য ভেব না।"

রেণু কেন কণা ও অশোককে লইয়া যাইবে না স্থির করিয়াছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া পূর্ণিমার মনে প্রথম বিস্ময় দেখা দিল। তাহার পর তিনি ভাবিলেন, ব্যাখ্যা ত সুধীরের কথাতেই পাওয়া গিয়াছে—গৃহিণীহীন গৃহ হোটেল; সে গৃহে ছেলে-মেয়ের আহারাদির সুব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য বলিয়াই রেণু ঐরূপ কথা বলিয়াছে। রেণুর প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সে জানিত, সুধীর মৃণালিনীকেও বলিবেন, তিনি যেন দেবদত্তকে লইয়া আইসেন। দেবদত্ত যে তাহার প্রকৃত পরিচয় পায়, তাহা তাহার অভিপ্রেত ছিল না।

গৃহে ফিরিয়া সুধীর কন্যার আগমনের জন্য আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইল। মাত্র কয় ঘণ্টার জন্য সে তাহার পিতৃগৃহে আসিবে। কিন্তু তাহাতেই সুধীরের কি আনন্দ! গৌরী পিত্রালয়ে আসিবেন জানিয়া গিরিরাজের আনন্দ কি এমন ভাবেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল?

সুধীর গৃহে ফিরিয়া প্রথমেই কুমুদাকে বলিল, "কুমুদা, আমি শুক্রবার রাত্রিতে বাঁকুড়ায় যা'ব—

রবিবারে ফিরিবার পথে রেণুকে নিয়ে আসব। সে রাত্রিতে খেয়ে তবে ফিরে যাবে। সব ঠিক ক'রে রাখ্‌তে হ'বে।"

কুমুদা বিস্মিতা হইল—তখনও রবিবারের তিন দিন বাকি; আর বাড়ীর মেয়ে বাড়ীতে আসিবে, তাহার জন্য আবার কি ঠিক করিতে হইবে? সে সুধীরের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়াও বিস্মিতা হইল। কিন্তু সুধীরের মনের আনন্দ-চাঞ্চল্য সে অনুমান করিতেও পারিল না।

তাহার পরই সুধীর মৃণালিনীকে টেলিফোন করিল—রবিবারে রেণু আসিবে; তিনি যেন আইসেন। দেবদত্তকে আনিতে হইবে।

শুনিয়া মৃণালিনী বিশেষ আনন্দিতা হইলেন। তিনি মনে করিলেন, নানা ভুলে যে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল—যাহা প্রলয়-সূচনা বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, সে মেঘ বুঝি কাটিয়া গেল! বুঝি দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন।

সুধীর আপনি গৃহে অতি সামান্য স্থানই অধিকার করিয়া থাকিত। আর কতকাংশ তাহার আইন-পুস্তকগুলি অধিকার করিয়াছিল। তাহার মৃতা পত্নীর ব্যবহৃত কক্ষ সে তাঁহার সময় যেমন ছিল, সেই ভাবেই রক্ষা করিয়াছিল—এমন কি আলমারীটিতে কাত্যায়নী কবে চাবি লাগাইয়া চাবিটি আর বাহির করেন নাই—সে আলমারীতে চাবি তেমনই লাগান ছিল—সুধীরের আশা ছিল, রেণু সে সব ব্যবহার করিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। রেণুর ব্যবহৃত আসন হইতে তাহার স্নানের ঘরের তোয়ালে পর্য্যন্ত সে যেমন রহিয়াছিল, তেমনই ছিল। এ বার সে স্বয়ং সব দেখিয়া আবার যে জিনিষের প্রয়োজন হইতে পারে সেই জিনিষ আনাইয়া রাখিতে লাগিল—রেণুর যেন কোন দ্রব্যের অভাব না হয়। শুক্রবারে আদালতে যাইবার পূর্ব্বেই সে সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ দেখিয়া তবে গেল। তাহার মনে কত আনন্দ!

রবিবার প্রাতে বাঁকুড়া হইতে ফিরিয়া সুধীর ষ্টেশন হইতেই কন্যার গৃহে গেল। রেণু তখনও প্রস্তুত হয় নাই—কণাকে ও অশোককে খাবার দিতেছিল। সে বলিল, "বাবা, আমি স্নানটা সেরে পরে যা'ব। তুমি দু' রাত্তির ট্রেণে কাটিয়েছ—তুমি বাড়ী যাও, স্নান করগে।"

সুধীর বলিল, "তা' হ'বে না। আমি না হয় একটু অপেক্ষা করছি।"

শুনিয়া পূর্ণিমা রেণুকে বলিলেন, "সে কি, বৌমা, তোমার বাবা ষ্টেশন থেকে ছুটে এসেছেন; তুমি যাও; আমি ছেলেদের দেখছি।"

যে রেণু বিবাহের পর কোন দিন পিত্রালয়ে যাইবে—বলে নাই, যাহার ব্যবহার তাঁহাকে এমনই বিস্মিত ও ব্যথিত করিয়াছে যে, তাহা তাঁহার নিকট একান্তই অস্বাভাবিক মনে হইত, সে এত দিন পরে পিত্রালয়ে যাইতে চাহিয়াছে—ইহাতে তিনি যেন বিশেষ স্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন। বাস্তবিক সুধীরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বহু বার মনে হইয়াছে, তিনি রেণুকে বলেন, সে দিন কয়েক পিত্রালয়ে যাইয়া থাকুক—পিতার শুশ্রূষা করুক; তাঁহাকে শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিবেচনা করিয়া কথা বলিতেন—তাই রেণুর কাছে সে প্রস্তাব করিতে সাহস হয় নাই—পাছে রেণু ভুল বুঝে বা কোন নূতন জটিলতার সৃষ্টি হয়।

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া রেণু বলিল, "তবে আমি কি চট ক'রে স্নানটা সেরে নেব?"

সুধীর বলিল, "না! না! বাড়ীতে স্নানের সব আয়োজন করা আছে।"

সে আয়োজন কিরূপ, তাহা রেণু কল্পনাও করিতে পারে নাই। মূল্যবান্ বস্ত্র হইতে মূল্যবান প্রসাধনদ্রব্য পর্য্যন্ত সবই প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে সুধীর কন্যার জন্য আনিয়া রাখিয়া তবে বাঁকুড়ায় গিয়াছিল।

গৃহে আসিয়া তাহার জন্য সব আয়োজন দেখিয়া রেণু বিস্মিতা হইল এবং সেই আয়োজনে পিতার স্নেহবিকাশ উপলব্ধি করিয়া সে অন্তরে স্নিগ্ধ শান্তির অনুভূতি রোধ করিতে পারিল না। সে বলিল, "এ কি, বাবা? এ যে রাজারাজড়ার আয়োজন!"

সুধীর বলিল, "মা, তোর মা যখন তাঁ'র নিজের হাতে সাজান সংসার সম্ভোগ না ক'রে চলে গিয়েছিলেন, তখন এই আশাতেই মনে যথাসম্ভব শান্তি পেয়েছিলাম যে, এ সব তুই সম্ভোগ করবি—তোর ছেলে-মেয়েরা তাঁ'র সম্পত্তিতে তাঁ'র স্নেহের পরিচয় পাবে। কিন্তু—"

সুধীরের গলাটা "ধরিয়া" আসিল; সে যেন অন্যমনস্ক ভাবে এক জন প্রসিদ্ধ বিদেশীর কথার আবৃত্তি করিল—"আমরা কি ছায়ামাত্র, আর কি ছায়ারই অনুসরণ করি!"

বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিল। সে প্রবল চেষ্টায়—কোনরূপে—

আপনার ভাব সংযত করিয়া বলিল, "মা, স্নান করগে।"

বলিয়া সে চলিয়া গেল।

রেণু মনে করিল—এ কি? সে যে দৃঢ়তায় আপনার অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইবার আশা করিয়াছিল—মাতৃস্নেহ পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিবার চেষ্টায় হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিতেও দ্বিধানুভব করে নাই—সে দৃঢ়তা যে সে পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিল, তাহা সে জানিত। পিতাকে সে কখন বিচলিত হইতে দেখে নাই; তাঁহার অশ্রু কখন কাহারও সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে নাই। সেই পিতার অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্য আজ আর আত্মগোপন করিতে পারে নাই। সে ভয় পাইল, তবে কি এক দিন এই দৌর্ব্বল্য তাহাকেও অভিভূত করিবে? পিতার জন্য তাহার সন্তান-হৃদয় সে ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল—তাহা ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সুমধুর সম্মিলন; উৎসমুক্ত জলধারা যেমনভাবে উপল ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেই ভাব তেমনই তাহার হৃদয়ের দৃঢ়তা ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

স্নান করিবে বলিয়া রেণু একটি ছোট হাত-ব্যাগে কাপড় জামা প্রভৃতি সব আনিয়াছিল; তাহার বিশ্বাস ছিল, সেগুলির প্রয়োজন হইবে। সে সেই সব বাহির করিতেছে দেখিয়া কুমুদা বলিল, "ও সব কি হবে, মাসীমা?"

রেণু বলিল, "স্নান করব। ঘরটা পরিষ্কার আছে ত?"

কুমুদা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "এ কি পরের বাড়ীতে এসেছ? তুমি আসবে বলা অবধি কি দাদাবাবুর স্বস্তি আছে? ঝাড়া পোঁছা জিনিষ সব আবার ঝাড়িয়ে পুঁছিয়ে—ঘর ধুইয়ে—নিজে তোমার সব জিনিষ এনে গুছিয়ে—কি করতে হ'বে সব দশ বার ব'লে তবে ত বাহিরে গেছলেন।"

"চল্ ত, দেখি"—বলিয়া রেণু স্নানের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। কুমুদা সঙ্গে চলিল।

সে ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার জন্য ক্রীত বহুমূল্য বস্ত্রাদি দেখিয়া রেণু বিস্মিতা হইল। সে অভ্যাসলব্ধ গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া পিতার আদরের কন্যারই মত দ্রুত-পদে পিতার কাছে চলিল।

সুধীর তখন স্নান করিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। রেণু যাইয়া অভিমানের সুরে বলিল, "কি করেছ, বাবা? ঐ সব দামী কাপড় জামা এনে রেখেছ? আমি ত পরব না।"

কন্যাকে বক্ষের নিকট টানিয়া লইয়া সুধীর বলিল, "তুই যদি না পরিস, তবে আমি আজ খা'ব না। দেখি, তুই কেমন আমাকে পারিস।"

সুধীরের মনে হইল—তাহার বক্ষের বহ্নিদাহে কে যেন স্নিগ্ধ সলিল ঢালিয়া দিল।

"যাও, তুমি স্নান কর"—বলিয়া রেণু তাহার স্নানের ঘরে চলিয়া গেল।

সে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবে বলিয়া পিতার কাছে আসিয়াছিল—যে ভাব কর্ত্তব্য অপেক্ষা অনেক উচ্চ ও অনেক পবিত্র, সেই ভাব তাহার কর্ত্তব্যসম্পাদন-স্পৃহার স্থান অবাধে অধিকার করিল। এ যে পিতার স্নেহ! ইহা ত্যাগে পূত।

কত দিন পরে পিতৃ-পুত্রী এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিলেন। কন্যার আহারের স্বল্পতা লক্ষ্য করিয়া সুধীর বলিল, "তুই যে পাখীর আহার ধরেছিস! শরীর যে ভেঙ্গে যা'বে।"

রেণু বলিল, "কেন, বাবা, শরীর ত বেশ আছে।"

"দেখবি বয়স হ'লে।"

এইরূপ কথায় কথায় উভয়ের আহার শেষ হইল।

তাহার পর মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইলে দেবদত্তকে লইয়া মৃণালিনী আসিলেন। তিনি আসিলে রেণু প্রথমেই আপনার পরিধেয় বস্ত্র দেখাইয়া বলিল, "দেখেছ, মাসীমা, বাবা আমাকে এই কাপড় পরিয়ে তবে ছেড়েছেন; বল্লেন, নইলে উনি খাবেন না।"

মৃণালিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা' পরবি না। কেমন জব্দ! বাপের কাছেই মেয়ে জব্দ।"

সুধীর রেণুকে বলিল, "আমি একখানা ভাল কাপড় এনেছি, তাই ত দশ বার বল্‌ছিস। তোর মাসীমা তোকে কি দিলেন?"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "আবার আমার ঘাড়ে কেন?"

"দেখ রেণু, আমি দেবুকে সিকি পয়সা দিইনি—আমার যা' কিছু, সব আমার মেয়ের। আর উনি মাসীমা - তোর উপর যত স্নেহ মুখে; সর্ব্বস্ব দিলেন দেবুকে।"

পিতা তাঁহার সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা রেণু কোন দিন ভাবে নাই। আর মাসীমা তাঁহার সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও সে জানিত না। সে জানিত না—মৃণালিনী বলিয়াছিলেন, "রেণুর ছেলে রেণুরই থাকবে—আমি ওকে পোষ্যপুত্র নিতে পারব না"—তাই তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দেবদত্তকেই তাহার সেবাইত করিয়াছিলেন—দলিল হইয়া গিয়াছিল।

তিনি দেবদত্তের নাবালক অবস্থায় তাহার সম্পত্তি তাহার নামে পরিচালন করিতেছিলেন। সুধীর ঠিক করিয়া দিয়াছিল ২৫ বৎসর বয়সে দেবদত্ত সে সম্পত্তিতে অধিকার লাভ করিবে—তাহার পূর্ব্বে নহে।

রেণু অতর্কিত ভাবে এই কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক্ রহিল; তাহার পর বলিল, "বাবা, তোমার সম্পত্তি কোন সৎকারে দিয়ে যেও।"

"সে—তোর যা' ইচ্ছা তুই করিস। আমি তো'কে দিয়েই তৃপ্ত হয়েছি।"

মৃণালিনী সুধীরের মুখে ক্লান্তির ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "দু' রাত্রি ত রেলে কেটেছে—তুমি যাও, একটু ঘুমাও।"

সুধীর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "দিনে কি আমার কখন ঘুম হয়? এখন ত রাত্রিতেও বড় হয় না।"—

বলিয়াই তাহার মনে হইল, এই সত্য গোপন রাখিলেই হয়ত সে ভাল করিত।

তাহার পর সে বলিল, "কখন দিনে ঘুমাই না—আর আজ রেণু আর দেবু এসেছে, আজ ঘুমাবার চেষ্টা করব!"

এই কথাটা বলিয়া সুধীরের মনে হইল—সে পদে পদে ভুল করিতেছে; হয়ত রেণু মনে করিবে, সে যে আইসে না এ কথায় তাহাই উপলক্ষ করিয়া পিতা তাঁহাকে পরোক্ষভাবে তিরস্কার করিলেন।

সে যাহাই হউক, সে দিন সকলেরই বিশেষ আনন্দে কাটিল। সুধীরের মনে হইল—সে যে এমন আনন্দ জীবনে আবার কখন পাইবে, তাহা তাহার আশাতীত ছিল—কল্পনাতীতও ছিল।

মৃণালিনীর মনে হইল—পিতাপুত্রীর মধ্যে যে ব্যবধান জন্মিয়াছিল, স্নেহের প্রবাহে তাহা ভাসিয়া গেল; এখন রেণু মধ্যে মধ্যে আসিবে এবং পিতার সেবাযত্নের ব্যবস্থা করিবে। রেণুর মনে হইল, সত্য সত্যই সে পিতাকে ভুল বুঝিয়াছিল—পিতার প্রতি যে স্বাভাবিক ভালবাসার উৎস সে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা মুক্ত হইয়া গেল; সে আর কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিল না—সে কেবল কর্ত্তব্য পালন করিতেছে।

অপরাহ্ণে মৃণালিনী দেবদত্তকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। দেবদত্ত যাইবার সময় তাহার জন্য ক্রীত অনেকগুলি পুস্তক লইয়া গেল।

রাত্রিতে কন্যার আহারান্তে সুধীর তাহাকে তাহার গৃহে রাখিয়া আসিল—বলিয়া দিল, সে যেন পরবর্ত্তী রবিবারে আবার আইসে।

২৬

পরবর্ত্তী রবিবারও আনন্দে অতিবাহিত হইল। পূর্ব্ব রবিবারেরই মত এ দিনও সুধীর হাওড়ায় নামিয়া রেণুর বাড়ীতে আসিল। সে দিন কিন্তু কণা ও অশোক প্রস্তুত হইয়া ছিল—তাহারা যাইবে। পূর্ব্ববার যে তাহাদিগের "মা" তাহাদিগকে লইয়া যায়েন নাই, তাহাদিগের সেই অভিমান সমস্ত সপ্তাহে শেষ হয় নাই এবং নানা কথায় নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহারা যখন রেণুকে বলিয়াছিল, "তুমি আমাদের মোটেই ভালবাস না" তখন রেণু তাহার অভ্যাসবশে মনে করিতে চাহিয়াছে—ভালবাসা তাহার কায নহে, তাহাদিগকে "মানুষ করাই" তাহার নারীজীবনের কর্ত্তব্য—কঠোর হইলেও সেই কর্ত্তব্য তাহাকে পালন করিতে হইবে। কিন্তু সে তাহার মনের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া আপনিই চমকিয়া উঠিয়াছে—সে তাহার নারী-হৃদয়ে স্বাভাবিক ভালবাসার প্রবেশ রুদ্ধ করিতে পারে নাই। বালুবিস্তারে জল পড়িলে তাহা যেমন অনায়াসে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত করে, তেমনই নারীর হৃদয়ে স্নেহের কারণ ঘটিলে তাহার গতিরোধ করা সম্ভব হয় না। স্বামীর একটি অসতর্ক কথায় রেণুর মনে অভিমান পুঞ্জীভূত ও দৃঢ় হইয়াছিল—সে অভিমান ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কিন্তু কণা ও অশোককে সে ভালবাসিয়াছে। তাহারা তাহাকে এমন ভাবে "জড়াইয়াছে" যে, সে তাহাদিগকে ছাড়াইতে পারে না। সে যে আপনার সন্তানকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে তাহার মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-দানের ক্ষুধা আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং কণাকে ও অশোককে স্নেহ দিয়া সে সেই ক্ষুধা প্রশমিত করিতে পারিয়াছে।

সে যতই ভাবিতে লাগিল, ততই বিস্মিত হইতে লাগিল; কিন্তু এ বার সে আর আপনার উপর বিরক্ত হইতে পারিল না।

পূর্ণিমা এ বারও কণা ও অশোককে গমনে নিরস্ত করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা বলিয়াছিল, তাহারা কিছুতেই শুনিবে না। পূর্ণিমা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, দাদুর বাড়ীতে ত মেয়েরা কেহ নাই—সব ব্যবস্থা করিতে অসুবিধা

হইবে। তাহাতে কণা বলিয়াছিল, "কেন, মা ত যা'বেন।" অশোক রেণুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা, আমরা তোমার সঙ্গে গেলে কি তোমার বড্ড অসুবিধা হ'বে?" রেণু বলিয়াছিল, "তা হ'বে না।" তখন সে বলিয়াছিল, "আচ্ছা, আমরা দাদুকে জিজ্ঞাসা করব। যদি তিনি বলেন, অসুবিধা হ'বে, তবে যা'ব না।"

সুধীর আসিলে তাহারা ছুটিয়া যাইয়া বলিল, "দাদু, আমরা মা'র সঙ্গে গেলে কি বড্ড অসুবিধা হ'বে?"

সুধীর হাসিয়া বলিল, "তোমরা যে বড্ড বেশী খাও—গরিব মানুষ আমি তা' দেব কেমন ক'রে?"

অশোক বলিল, "না, দাদু, আমারা বেশী খা'ব না।"

কণা বলিল, "দাদু ঠাট্টা করছেন। আমরা যা'ব।"

কাযেই পূর্ণিমা আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাহাদিগকে লইয়াই যাইতে হইল। কিন্তু রেণু তাহা চাহে নাই; কেন চাহে নাই, তাহা সে কেবল এক দিন মাসীমা'কে বলিয়াছিল। দেবদত্তকে সে তাহার সহিত কণার ও অশোকের সম্বন্ধ সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখিবার ইচ্ছাই করিয়াছিল। আজ সে মনে করিল, সে বিষয়েও তাহার পরাজয় হইবে। কিন্তু আজ আর সে যেন সেই পরাজয়ে আপনাকে ধিক্কার দিতে পারিল না—এরূপ অবস্থায় সে যেমন আপনার উপর আপনি রুষ্ট হইত, আজ আর তাহার মনে সে ভাব দেখা দিল না। যথাকালে স্বামীর পুত্র-কন্যাকে লইয়া সে আপনার পিতৃগৃহে গেল।

সে তথায় যাইবার অল্পক্ষণ পরেই মৃণালিনীর টেলিফোন আসিল। মৃণালিনী যখন জানিলেন, কণা ও অশোক রেণুর সঙ্গে আসিয়াছে, তখন রেণুর কথা স্মরণ করিয়া, তিনি বলিলেন, "আমি আজ না গেলে হয় না?" রেণু যেন অকূলে কূল পাইল, বলিল, "সে-ই ভাল, মাসীমা।"

রেণু যাইয়া পিতাকে বলিল, "মাসীমা আজ আর আসবেন না।"

সুধীর হাসিয়া বলিল, "তোর মাসীমা'রও পায়াভারী হ'ল! তবে তুই সব দেখে ব্যবস্থা কর।"

তাহাই হইল এবং রেণুই সব ব্যবস্থা করিয়া লইল।

সন্ধ্যার পর রেণুকে তাহার গৃহে রাখিতে যাইবার সময় পথে—মোটরে—সুধীর বলিল, "যেমন ক'রেই হ'ক আসছে শনিবারে মামলা শেষ ক'রে আসব। তা' হ'লে পরের শনিবারে আর রবিবারে তুই আসবি।"

রেণু বলিল, "হয়ত আবার একটা মামলায় বাহিরে যেতে হ'বে।"

"যদি মামলায় নিতে আসে, তা' হ'লেও আর যা'ব না।"

"কেন, বাবা?"

"তুই আসবি।"—রেণু বুঝিতে পারিল, পিতার গলাটা যেন ধরা-ধরা হইয়া আসিল।

রেণু বলিল, "আর সপ্তাহে দু'দিন বিশ্রাম—তা'-ও হয় না; দু'রাত্রি ত রেলেই কাটে।"

গাড়ী রেণুর গৃহদ্বারে আসিল। নামিবার সময়—রেণু পিতাকে প্রণাম করিলে কণা ও অশোকও তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং বলিল, "দাদু, আস্‌ছে রবিবারে আমরা ঠিক হয়ে থাকব।"

সেই রবিবারও আসিল। তাহার পূর্ব্বে রেণু এক দিন মৃণালিনীর নিকটে গিয়াছিল।

বেলা বাড়িতে লাগিল—ট্রেণের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সুধীর আসিল না!

পূর্ণিমা পুত্রকে বলিয়াছিলেন, রেণুর পিতৃগৃহে সব ব্যবস্থা করিবার কেহ নাই—ছেলেরা যাইলে তাহার বড় "ঝক্কি" হয়, নীরেন্দ্র যেন সকালে ছেলেমেয়েকে আলিপুর চিড়িয়াখানা দেখাইতে লইয়া যায়। তাহাই হইয়াছিল।

বিলম্ব হইতেছিল—রেণু দুই বার ঘড়ীতে সময় দেখিয়া মনে করিতেছিল, হয়ত কোন কারণে সুধীরের আসা হয় নাই। কিন্তু সে ভাবনা স্থায়ী হইতে পারিতেছিল না; কারণ, সুধীরের সম্বন্ধে সেরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই; যদি কোন কারণে আসা না ঘটিত, তবে সে নিশ্চয়ই তাহাকে "তার" করিয়া সে সংবাদ জানাইয়া দিত। রেণু জানিত না—সে কল্পনাও করিতে পারে নাই—সুধীর আসিয়াছিল, কিন্তু সে আর কন্যাকে লইতে আসিবে না।

বাড়ীর কাছে রাস্তার উপরে মোটরের হর্ণ শুনা গেল। তাহার পর ভৃত্য আসিয়া পূর্ণিমাকে ডাকিল—"মা, শুনুন।"

অজানা আশঙ্কার ছায়া রেণুর মনে পতিত হইল।

পূর্ণিমা অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মনে করিলেন, নীরেন্দ্রকে পাঠাইয়া দিয়া কি অন্যায় কাযই করিয়াছেন! এখন উপায় কি?

তাঁহার মুখ দেখিয়া রেণু ভয় পাইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, মা?

"কিছু নয়, মা"—এই মিথ্যা কথা বলিবার চেষ্টা করিলে, পূর্ণিমার যেন কণ্ঠরোধ হইল।

এই সময় ছেলেমেয়েকে লইয়া নীরেন্দ্র ফিরিয়া আসিল। পূর্ণিমা অতিক্রত যাইয়া পুত্রকে হাওড়া ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন—স্বয়ং মৃণালিনীর গৃহে গমন করিলেন।

রেণুর মনে হইতে লাগিল, একটা কি বিষম ব্যাপার ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহার নিকট সংবাদ গোপন করা হইতেছে।

তাহাই সত্য।

যথাসময়েই ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।—সুধীরও আসিয়াছিল, কিন্তু জীবিতাবস্থায় নহে।

ট্রেণ থামিলে যাত্রীরা বাহির হইতে লাগিল—অনেক যাত্রীর বাহির হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল; তাহারা বাহির হইবার সময় কি আলোচনা করিতে করিতে আসিতেছিল।

শেষে—কয় জনকে জিজ্ঞাসার পর—এক জন যাত্রীর নিকট হইতে সুধীরের মোটর-চালক সংবাদ পাইল, এক জন যাত্রীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

যাত্রীটি কে জিজ্ঞাসায় যাত্রীটি বিরক্তিব্যঞ্জক ভাবে বলিল—"আমি কি করে জানব?"

কিন্তু আর এক জন বলিল, "শুনছি কে এক জন বড় উকিল।"

তখন মোটরচালক গাড়ী রাখিয়া ছুটিয়া ষ্টেশনে গেল। তখন শব ট্রেণের কামরা হইতে নামাইয়া যে শয্যায় তাহা ছিল প্লাটফর্ম্মে তাহারই উপর রাখা হইয়াছে।

চালক দেখিল, তাহারই প্রভু।

যে ভৃত্য সঙ্গে গিয়াছিল, সে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বেই মৃত্যু ঘটিয়াছে। তিনি ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এবং উত্তরে ভৃত্য জানাইতেছিল কিছু দিন হইতে তাহার প্রভু শিরঃপীড়ায় কাতর হইতেন; পূর্ব্বদিন সমস্ত দিন আদালতে কায করিয়া তিনি অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ করেন এবং আহার্য্য প্রায় স্পর্শই করেন নাই। ট্রেণ আসিলে সে তাঁহার শয্যা রচনা করিয়া দিয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিয়া তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় গিয়াছিল—প্রভু তখন শয়ন করিয়াছেন।

শুনিয়া ডাক্তার মত প্রকাশ করিলেন—নিশ্চয় "হাই ব্লাড প্রেসার" ছিল—তাহার উপর অত্যধিক মানসিক শ্রমে "এপোপ্লেক্সি" হইয়াছিল।

ষ্টেশনের কর্ম্মচারী বলিলেন, শব শবব্যবচ্ছেদাগারে পাঠাইবেন।

শুনিয়া যান-চালক বলিল, আমি বাবুকে নিতে এসেছিলাম। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি বাবুর জামাইবাড়ী খবর দিতে যাচ্ছি; তাঁ'রা এসে যে ব্যবস্থা হয় করবেন।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাড়ীতে খবর দিবে না?"

"বাড়ীতে ত কেউ নাই।"

"ওঁর স্ত্রী?"

"তিনি অনেক দিন মারা গেছেন।"

"ছেলে?"

"নাই।"

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ওঃ—যত্ন করবার কেউ ছিল না!"

মোটর-চালক কাঁদিতে কাঁদিতে যথাসম্ভব দ্রুত যান চালাইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। যাইবার সময় সে ভৃত্যকে তথায় থাকিতে বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে গিয়াছিল—সে কোথায় যাইবে? ডাক্তারের শেষ কথা যে কত সত্য, তাহা সে জানিত—গৃহে সংবাদ দিবারও কেহ ছিল না। তাহার পর মাসীমা; তাঁহার গৃহে কর্ম্মচারী প্রভৃতি ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্ক কোন পুরুষ নাই। কাযেই সে রেণুর গৃহেই গিয়াছিল। কিন্তু সে বুঝিয়াছিল, সংবাদটি সহসা রেণুকে দেওয়া হয়ত সঙ্গত হইবে না; তাই সে তথায় যাইয়া যখন জানিতে পারে, নীরেন্দ্র গৃহে নাই; তখন পূর্ণিমাকেই সংবাদ দিয়াছিল। কারণ, বিলম্ব করিবার সময় ছিল না—প্রভুর শব তখনও হাওড়া রেল ষ্টেশনে এবং সে বলিয়া আসিয়াছিল, সে তাঁহার স্বজনগণকে আনিবার জন্যই যাইতেছে।

তবে পূর্ণিমা কি করিবেন স্থির করিবার পূর্ব্বেই নীরেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং মা'র কাছে সংবাদ পাইয়াই—প্রয়োজন হইতে পারে মনে করিয়া—কিছু টাকা লইয়া হাওড়া ষ্টেশনাভিমুখেই যাত্রা করিয়াছিল।

পথেই তাহার মনে পড়ে—সুধীরের এক বন্ধু-পুত্রই তখন হাওড়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট। সে প্রথমে তাঁহার গৃহে যাইয়া—তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যখন হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা বিলম্বে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। তখন একখানির পর একখানি ট্রেণ আসিবার সময়—প্লাটফর্ম্ম পরিষ্কার করিতে হইবে।

সেই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট ও নীরেন্দ্র তথায় উপনীত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, তিনি নিজ দায়িত্বে শব লইয়া যাইবেন—উহা শবব্যবচ্ছেদগৃহে পাঠাইতে হইবে না। কর্ম্মচারীরা ষ্টেশন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কথায় শব ছাড়িয়া দিলেন।

ভৃত্য, মোটর-চালক, নীরেন্দ্র ও ম্যাজিষ্ট্রেট চারি জনে ধরিয়া শব বাহিরে আনিলেন—যে যান তাহাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল, সেই যান সুধীরের শব লইয়া যাত্রা করিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট নীরেন্দ্রকে বলিলেন, "আমি বাবাকে ফোনে খবরটা জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি—তুমি যাও।"

শব লইয়া নীরেন্দ্র কোথায় যাইবে, তাহা সে এতক্ষণ ভাবিয়া দেখে নাই। এই বার তাহা স্থির করিতে হইবে। সে যেন কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁর বাড়ীতেই নিয়ে যাই?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ। খবর পেলে অনেকেই আসবেন।"

কয় বৎসর পূর্ব্বে দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষকাল রোগ ভোগ করিয়া কাত্যায়নীর প্রাণ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিলে যে পথে তাঁহার শবের অনুসরণ করিয়া সুধীর শ্মশানে গিয়াছিল, সেই পথে মোটর তাহার শব বহন করিয়া গৃহদ্বারে উপনীত হইল।

ভৃত্য দ্রব্যাদি নামাইয়া লইতে আসিয়া দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার শক্তিও সে যেন হারাইয়াছিল।

দাদাবাবু আসিয়াছেন, অথচ কেহ কোন কথা কহিতেছে না, ইহা কুমুদার নিকট একান্ত বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইল। তাই সে ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বারান্দা হইতে ব্যাপার কি দেখিবার চেষ্টা করিল। তথা হইতে সে কেবল দেখিল, ভৃত্য প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। তখন সে নামিয়া আসিল। তাহার পর তাহার আর্ত্তনাদ পল্লীবাসীদিগকে গৃহে কোন দুর্ঘটনার সংবাদ দিল।

পল্লীর লোকের সহিত সুধীরের বিশেষ সদ্ভাব ও হৃদ্যতা ছিল। সকলেরই আপদে বিপদে সে সহায় বলিয়া বিবেচিত হইত। বিশেষ পল্লীর যুবকরা তাহার বিশেষ অনুগত ছিল। পাড়ার ক্লাবে, পুস্তকাগারে, সাঁতারের প্রতিযোগিতায়, বারয়ারী পূজায় সে কখন অর্থ দিতে কার্পণ্য করে নাই। প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের ও অনুষ্ঠানের সে-ই সভাপতি নির্ব্বাচিত হইত—তাহার গৃহেই সভা হইত—সভায় জলযোগের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকিত। যুবকরা আসিয়া আর বিলম্ব না করিয়া শব নামাইবার আয়োজন করিল—কয় জন ফুল আনিবার জন্য দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

শব কোথায় রক্ষা করা হইবে, যুবকরা নীরেন্দ্রকে তাহা জিজ্ঞাসা করিল। নীরেন্দ্র কি বলিবে স্থির করিতে পারিল না। তখন যুবকদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "এখনই ত শ্মশানে নিয়ে যেতে হ'বে; এই উঠানেই রাখা যা'ক।"

অন্য সকলে বলিল, "সে-ই ভাল।"

কুমুদা তখন আর্ত্তনাদ ত্যাগ করিয়া যে ভৃত্য সুধীরের সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাকে দুর্ঘটনা কিরূপে ঘটিল—তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। যুবকরা তাহাকে বলিল, "চল—কোন্ খাট নিয়ে আস্‌ব দেখিয়ে দাও।"

খাট মূল্যবান্—সাধারণতঃ লোক ত খাটিয়াতেই শব লইয়া যায়। তাই খাট দেখাইয়া দিবে কি না কুমুদা তাহাই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল। যুবকরা ভৃত্যদিগের এক জনকে বলিল, "চল, খাট দেখিয়ে দিবে।"

যুবকরা ভৃত্যের সঙ্গে দ্বিতলে গেল এবং যে ছোট খাটে সুধীর শয়ন করিত, সেইখানি খুলিয়া নামাইয়া আনিয়া প্রাঙ্গণে আবার খাটাইয়া লইল। তাহার পর তাহারা শয্যাও বহন করিয়া আনিয়া খাটে পাতিয়া দিল।

নীরেন্দ্রকে তাহারা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। এ যেন তাহাদিগেরই গৃহের অবশ্য-করণীয় কায। বাস্তবিক সুধীর তাহাদিগের আত্মীয়েরও অধিক ছিল—সে পল্লীবাসীর বল ও ভরসার স্থল বলিয়াই বিবেচিত হইত; পল্লীতে তাহার কোন শত্রু ছিল না—সকলেই তাহাকে ভালবাসিত ও ভক্তি করিত।

শয্যা পাতিয়া যুবকরা যখন সযত্নে সুধীরের শব তাহার মোটরগাড়ী হইতে নামাইয়া সেই শয্যায় শায়িত করিতেছিল—সেই সময় দ্বারে একখানি যান আসিয়া দাঁড়াইল। সেই যানে মৃণালিনী ও পূর্ণিমা বেণুকে লইয়া আসিয়াছিলেন

২৭

মৃণালিনী তখন কেবল আহ্নিক শেষ করিয়াছেন। সহসা ঠাকুরঘরে পূর্ণিমার ক্রন্দনোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে

"বেহান্।" শুনিয়া তিনি দ্রুত বাহিরে আসিলেন। অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাহিরে আসিয়া তিনি দেখিলেন, পূর্ণিমা কান্দিতেছেন; তাঁহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এ কি সর্ব্বনাশ হইল!"

পূর্ব্বদিনও মৃণালিনী সংবাদ পাইয়াছিলেন, রেণু, নীরেন্দ্র সকলেই সুস্থ ছিল। তবে সহসা কি হইল? তখন পূর্ণিমাই বলিলেন, সুধীরকে আনিতে তাহার গাড়ী লইয়া চালক হাওড়া ষ্টেশনে গিয়াছিল, সে-ই আসিয়া দারুণ দুঃসংবাদ দিয়াছে এবং তাহা শুনিয়া নীরেন্দ্র ষ্টেশনে গিয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া মৃণালিনী পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতর্কিত আঘাতের প্রাবল্য যেন তাঁহাকে বেদনার স্বরূপ অনুভব করিতে দিতেছিল না।

পূর্ণিমা বলিলেন, "আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি; আপনিই রেণুর মা—মা'র বাড়া। তা'কে কেমন ক'রে এ কথা জানা'ব?"

তখন স্বভাবতঃ স্থির ও গম্ভীর মৃণালিনীর মনে তাঁহার স্নেহসঞ্জাত কর্ত্তব্যের আহ্বান ধ্বনিত হইল। রেণুর মা যে দিন তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, সে দিন তিনিই আপনার শোক চাপিয়া তাহাকে বক্ষে লইয়াছিলেন। আজও তাঁহাকেই সেই কায করিতে হইবে—পূর্ণিমা তাহারই আহ্বান লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার আপনার কথা ভাবিবার আর অবকাশ নাই। তাঁহার স্বামী যখন নিঃসন্তান পত্নীকে আপনার সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে—দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান করিয়া মহাযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন হইতে সুধীরই তাঁহার ভ্রাতা, বন্ধু ও পরামর্শদাতা হইয়াছিল। তিনি হিন্দু বিধবা—নিঃসহায়া; কিন্তু তাঁহার বল ও ভরসা যে কখন বিচলিত হয় নাই তাহার কারণ সুধীর। সুধীরই তাঁহার সম্পত্তি কি ভাবে দেবদত্তকে প্রদান করা হইবে তাহার সব ব্যবস্থা করিয়া সেই ব্যবস্থানুযায়ী কায করিয়া গিয়াছে। তাঁহার বৈষয়িক সব কাযে তিনি যেমন সুধীরের পরামর্শেই নির্ভর করিতেন, তাহার পারিবারিক সব কাযে সুধীর তেমনই তাঁহার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া আসিয়াছে—তাহার একমাত্র সন্তান রেণুর বিবাহেও সে তাঁহার কথায় আপনার মত ত্যাগ করিয়াছিল—সেই বিবাহে যদি কোন ভুল হইয়া থাকে, তবে সে জন্য সে কখন তাঁহাকে দোষ দেয় নাই। আজ তিনি অসহায়।

কিন্তু সে কথা ভাবিবার সময় তাঁহার নাই। তিনি রেণুকে তাহার এই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত দারুণ শোকে বক্ষে লইবেন। এক বার তাঁহার মনে হইল, হায়, মানুষ—তোমার আশা কি অসার! যখন তিনি মনে করিতেছিলেন, পিতা ও পুত্রীর সম্বন্ধে অস্বাভাবিক ভাব দূর হইয়া স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়া আসিতেছিল—দেবতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তখনই সব আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল!

তিনি পুরোহিত ঠাকুরকে বলিলেন, তিনি যেন তাঁহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া পূজাদি শেষ করেন এবং প্রধান দাসীকে অন্য সব বিষয়ে উপদেশ দিয়া পূর্ণিমার সঙ্গে যাত্রা করিলেন।

ভৃত্যের পূর্ণিমাকে গোপনে কোন সংবাদ প্রদান, তাঁহার—কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় গমন—এ সবই রেণুর এতই অস্বাভাবিক মনে হইয়াছিল যে, সে একটা বিষম বিপদের অপেক্ষাই করিতেছিল। যেন সে প্রলয়ের দূরাগত শব্দ শুনিতে পাইতেছিল, কোন্ দিক্ হইতে বজ্রাঘাত কখন আসিবে, স্থির করিতে পারিতেছিল না।

মৃণালিনী ও পূর্ণিমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ণিমা কান্দিতেছিলেন, মৃণালিনীর চক্ষুতে অশ্রু নাই—কিন্তু মুখ দেখিয়া রেণুর ভয় হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে, মাসীমা?"

মৃণালিনী বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে চল, মা?"

"কোথায়?"

"তোমার বাড়ী।"

"কেন? বাবা—"

"হাঁ—" বলিয়া মৃণালিনী তাহাকে বক্ষে চাপিয়া বলিলেন, "মা, অধীর হ'স না—নারীজীবন কেবল সহ্য করবার জন্য।"

"বাবা নাই?"

এই জিজ্ঞাসায় যে যাতনা আত্মপ্রকাশ করিল, তাহা যে শুনিতে পায় নাই, সে বুঝিতে পারিবে না। তাহা জিজ্ঞাসা নহে—আহত—রক্তাক্ত হৃদয় হইতে উত্থিত আর্ত্তনাদ।

মৃণালিনীর মনে হইল—তাঁহার বক্ষে শেল বিদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি প্রবল চেষ্টায় আপনার ধৈর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বলিলেন, "চল, মা।"

"বাবা কোথায়?"

"নীরেন সংবাদ পেয়ে আনতে গেছেন।"

রেণু মুখ তুলিল; অত্যন্ত কাতর যাচ্ঞার ভাবে বলিল, "মাসীমা, আমি বাবাকে দেখ্‌ব।"

"তুমি দেখবে বলেই ত তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। তুমি না দেখলে যে তা'র আত্মার তৃপ্তি হবে না, মা! তা'র তুমি ছাড়া—"

মৃণালিনীর কথা আর বাহির হইল না।

মাসীমা'র বক্ষ হইতে মুখ তুলিবার পূর্ব্বে রেণু কেবল বলিল, "মাসীমা! মা!"

গাড়ীতে সমস্ত পথ কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। মৃণালিনীই রেণুকে তাঁহার ও পূর্ণিমার মধ্যে বসাইয়াছিলেন। তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি কেবলই রেণুকে লক্ষ্য করিতেছিল।

মৃণালিনীই প্রথমে গাড়ী হইতে নামিলেন এবং রেণুকে নামাইলেন।

তাঁহারা উপনীত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সুধীরের বিশেষ বন্ধু—হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের পিতা আসিয়াছিলেন। তিনি সুধীরের বাল্যবন্ধু ছিলেন —উভয়ে একসঙ্গে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—একই ব্যবসা বাছিয়া লইয়াছিলেন। পুত্রের নিকট টেলিফোনে সংবাদ পাইয়াই তিনি আসিয়াছিলেন —এতটুকু বিলম্ব করেন নাই। তিনি জানিতেন, সুধীরের গৃহে কেহ নাই—এক জনকে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া সব ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুধীর অনেক বার তাঁহাকে বলিয়াছে, "প্রকাশ, তুমি যদি আগে মর, আমি করণীয় সব করিব; কিন্তু সর্ত্ত এই যে, আমি যদি আগে মরি, তবে তুমিই দাঁড়িয়ে সব করবে—তুমি জান, আমার করবার কেউ নাই।" সে কথায় তিনি কখন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই; কিন্তু আজ পুত্রের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াই সেই কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল—সুধীরের কথা কি তবে কোন অজ্ঞাতের প্রভাবে উক্ত হইত—সে কি সেই "Coming events cast their shadows before?" আজ তাঁহাকেই বন্ধুর অভিপ্রেত কায করিতে হইবে।

তিনি অগ্রসর হইয়া, "এস, মা!" বলিয়া রেণুকে ধরিলেন।

তখন যুবকরা সুধীরের শব প্রাঙ্গণে খাটের উপর স্থাপিত করিয়াছে।

বাহ্যসংজ্ঞাবিরহিতা সহসা আঘাতে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলে যেমন চমকিয়া উঠে, তেমনই চমকিয়া উঠিয়া দৃঢ় ও উচ্চকণ্ঠে রেণু বলিল, "এখানে নয়!" যেন শবের অসম্মান করা হইতেছে—শব অপবিত্র করা হইতেছে।

সকলে ত্রস্তে তাহার দিকে চাহিল। যাহারা শব বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহারা যেমন ছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রকাশচন্দ্র স্নেহস্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করব, মা?"

মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে পিতৃবন্ধুর দিকে চাহিয়া রেণু বলিল, "জ্যেঠামশাই, এখানে নয়—এক বার বাবাকে উপরে নিয়ে চলুন—মা'র যে ঘর তিনি দেবমন্দির ক'রে রেখেছিলেন, সেই ঘরে—সেই শয্যায় এক বার বাবাকে রাখুন।"

প্রকাশচন্দ্রের ধৈর্য্যের সংযম শোকের প্লাবনে ভাসিয়া গেল। তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে যাহাকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন, সেই কন্যার কথা তাঁহার মনে পড়িল। বন্ধুর পিতৃমাতৃহারা কন্যার বেদনা তিনি বুঝিলেন—এ যে কন্যা!

তিনি কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "তাই হ'বে, মা—তুমি যা' বলবে তা'ই হ'বে।"

তাঁহার ইঙ্গিতে যুবকগণ শব সোপানের দিকে লইয়া চলিল—রেণু দ্রুত চঞ্চলপদে তাহাদিগের অগ্রবর্ত্তী হইল। প্রকাশচন্দ্র তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিলেন। ভৃত্য পূর্ব্বেই আসিয়া সেই কক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া বাতায়ন মুক্ত করিতেছিল।

যুবকরা সেই কক্ষে শয্যার উপর শব শায়িত করিল। সেই কক্ষেই—সম্মুখে কাত্যায়নীর বৃহৎ চিত্র। সুধীর প্রতিদিন সেই চিত্রের নিম্নে ফুল দিত। সে কয় দিন অনুপস্থিত ছিল, তাই ফুল শুকাইয়া গিয়াছিল। তথায় সে আর কাহাকেও ফুল দিতে দিত না।

পিতার শব সেই শয্যায় শায়িত হইলে রেণু তাহার চরণপ্রান্তে যাইয়া পদচুম্বন করিল।

তাহার পরেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। মৃণালিনী তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি তাহার নিকটেই ছিলেন। তিনি তাহাকে ধরিয়া সেই শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন।

প্রকাশচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার ডাকিতে চলিলেন। যে সব যুবক আসিয়াছিল, তাহাদিগের এক জন বলিল, "পাড়ার ডাক্তার বাবুও উপস্থিত আছেন।" ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নাই—এখনই সেরে উঠ্‌বেন।" তিনি ঘরের বৈদ্যুতিক পাখা চালাইয়া দিলেন। মৃণালিনীর নির্দ্দেশে কুমুদা জল লইয়া আসিল; মৃণালিনী রেণুর মুদিত চক্ষুর উপর ও তপ্ত কপালে জল দিয়া অঞ্চলে তাহা মুছিয়া দিলেন।

সংসারে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত প্রকাশচন্দ্র তখনই শব শ্মশানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ও দিকে সংবাদ পাইয়া

যাহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংখ্যাও অল্প নহে। প্রকাশচন্দ্র তাঁহাদিগের সহিতও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন।

কে মুখাগ্নি দিবে, তাহাই কেবল প্রকাশচন্দ্র তখনও স্থির করিতে পারিলেন না।

সেই বিষয়ে কাহারও কাহারও সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তিনি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া সুধীরের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তথায় টেবলের উপর প্রথমেই যাহা তাঁহাদিগের দৃষ্টি আ.কৃষ্ট করিল, তাহা সুধীরের উইল। কাগজখানি খুলিয়া তাহার উপর সুধীরের স্ত্রীর নাম ক্ষোদিত কাগজচাপা ঢাকা দিয়া রাখা হইয়াছে। উইলে সাক্ষীর স্বাক্ষর আছে এবং উহা রেজেষ্টারী করা।

উইল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—

আমার ত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সর্ব্ববিধ সম্পত্তি আমার একমাত্র সন্তান—আমার—সর্ব্বস্ব—কন্যা রেণু পাইবেন এবং যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

প্রকাশচন্দ্রের মনে পড়িল, উইলের মামলায় বহু বার সুধীর তাঁহাকে বলিয়াছে, উইল যত বড় হয়, তত অস্পষ্ট ও ত্রুটিবহুল হয়—তাহাতে মামলার বীজ তত অধিক নিহিত থাকে; আর বড় বড় উকীলের উইলেই বড় বড় মামলার সূত্র পাওয়া যায়। সে সে সম্ভাবনার অবকাশ রাখে নাই।

উইলের সঙ্গে রেণুকে লিখিত একখানি দীর্ঘ পত্র। তাহার আরম্ভে সুধীর লিখিয়াছে :—

মা,

আমি আমার সর্ব্বস্ব আমার সর্ব্বস্বকে দিয়াই তৃপ্তিলাভ করিলাম। তুমি ইহা যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবে। কেবল কতকগুলি বিষয়ে আমার অভিপ্রায় তোমার অবগতির জন্য লিখিলাম। তুমি সেই অভিপ্রায় অনুসারে কায করিতে বাধ্য নহ; উহা কেবল আমার অভিপ্রায়রূপে তোমাকে জানাইতেছি।

পিসীমা হইতে কুমুদা পর্য্যন্ত সকলের সম্বন্ধে তাহার অভিপ্রায় সুধীর সেই পত্রে লিখিয়াছিল।

উইল ও পত্র দেখিয়া প্রকাশচন্দ্র বিস্মিতভাবে বলিলেন, "সুধীর কি মৃত্যুকে সম্মুখে দেখে এই সব ব্যবস্থা ক'রে গেছে?"

তাঁহার মনে হইল, সুধীর তাহার শরীরের অবস্থায় বুঝিয়াছিল—যে কোন সময় মৃত্যু আসিবে, সেই জন্য সে প্রস্তুত হইয়া ছিল; সে যেন সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া সংসারে ছিল। কখন্ মৃত্যু হইবে স্থির নাই বুঝিয়াই কি সে উইলখানি সর্ব্বদা টেবলের উপর এমনভাবে রাখিত যে, তাহা দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে না?

কে মুখাগ্নি দিবে, তাহা স্থির করিবার জন্য প্রকাশচন্দ্র পুনরায় যে ঘরে শব ছিল, সেই ঘরে গমন করিলেন। উইল ও উইলের সম্বন্ধীয় পত্র তিনি লইয়া যাইলেন।

তিনি যখন সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন রেণুর সংজ্ঞা ফিরিয়াছে, সে পিতার শবের পদপ্রান্তে বসিয়াছে; মৃণালিনী তাহার পার্শ্বে—পূর্ণিমাও তথায়।

নীরেন্দ্র নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। প্রকাশচন্দ্র তাহাকে ডাকিলেন, বলিলেন, "সুধীরের উইল সে টেবলের উপর রেখে গিয়েছিল। তুমি রাখ্‌বে?"

নীরেন্দ্র বলিল, "এখন আপনার কাছেই থাকুক।"

মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "উইল?"

প্রকাশচন্দ্র বিষয়ী লোক, তিনি উইলের সর্ত্ত সকলকে জানাইয়া দিতেই চাহিলেন—বলিলেন, "অত্যন্ত সরল ও সংক্ষিপ্ত।" বলিয়া তিনি উহা পাঠ করিলেন।

রেণু শুনিল; কিন্তু কিছুই বলিল না—দৃষ্টিও উত্তোলিত করিল না।

তাহার পর প্রকাশচন্দ্র নীরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "রেণুর মাসীমা'কে জিজ্ঞাসা কর—মুখাগ্নিদান কে করবে।"

নীরেন্দ্র তাহার মাতাকে সে কথা বলিল এবং তিনি সে কথা অতি মৃদুস্বরে মৃণালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিন্তু রেণু তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। মৃণালিনী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে প্রকাশচন্দ্রকে বলিল, "জ্যেঠামশায়, বাবা ত আমাকেই তাঁ'র সর্ব্বস্ব ব'লেছেন; আমিই সে কায করব। তা'তে কোন আপত্তি হ'বে না ত?"—তাহার স্বর দৃঢ়।

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "না, মা, আপত্তি হ'তে পারে না। আত্মার যদি অনুভূতি থাকে, তবে তুমি তা'র শেষ কায করলে সুধীরের আত্মার যত তৃপ্তি হ'বে, তত আর কিছুতেই হ'বে না। কিন্তু—"

রেণু তাঁহার দিকে চাহিল।

প্রকাশচন্দ্র মনের চাঞ্চল্য সংযত করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু—তুমি কি পারবে?"

"পারব। জীবনে বাবার কোন কায করি নি—করতে পারি নি; অথচ আমি তাঁ'র সর্ব্বস্ব। এই শেষ কায, তা'ও করতে পারব না ?"

শেষ কথাগুলি বলিবার সময় রেণুর কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল—বুঝি তাহার শুষ্ক চক্ষুতে অশ্রুর স্নিগ্ধতাও দেখা গেল। মৃণালিনীর মনে হইল, বুঝি এই বার কঠিন তুষার বিগলিত হইবে। রেণু যে এক বিন্দু অশ্রুপাতও করে নাই, তাহা তিনি শঙ্কার কারণ বলিয়া মনে করিতেছিলেন।

কিন্তু মৃণালিনীর সে আশাও পূর্ণ হইল না। রেণুর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল না। সে তাঁহাকেই বলিল, "মাসীমা, আমায় কি কি করতে হ'বে আপনি ব'লে দেবেন।"

মৃণালিনী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইহাই আজ তাঁহাকে করিতে হইবে! কিন্তু—তিনি ত দৃঢ়ই হইবেন—দৃঢ়ই হইয়াছেন। ইহাই আজ তাঁহার কর্ত্তব্য এবং তাঁহাকেই সে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।

তখন প্রকাশচন্দ্রের নির্দ্দেশে শব শ্মশানে লইয়া যাইবার আয়োজন হইল। পল্লীর বহু যুবক তথায় সমবেত হইয়াছিল। তাহারাই সব আয়োজন করিয়া লইল।

আবার কুমুদার আর্ত্তনাদে গৃহ পূর্ণ হইল। যুবকগণ কুসুমাস্তৃত করিয়া সুধীরের শব গৃহ হইতে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

তাহার মুখে স্বাভাবিক স্নিগ্ধ প্রশান্তির ভাব সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। সে জীবনে যেমন—মৃত্যুতেও তেমনই তাহার শান্তির ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অথচ তাহার জীবনে সে কত আঘাত পাইয়াছে—কি নিঃসঙ্গভাবেই জীবন কাটাইয়াছে! রুগ্না স্ত্রীকে সে কি যত্নে—কি নিষ্ঠাসহকারে সেবা করিয়াছে! সে দেখিয়াছে, তাহার কন্যাও হয়ত তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, কিন্তু কন্যার প্রতি স্নেহে সে আপনার হৃদয় হইতে অভিমান প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

আজ সে সকল দুঃখের অতীত।

যখন যুবকরা হরিধ্বনি করিয়া শব তুলিল, তখন রেণু বলিল,—"আমার অনুরোধ আমার প্রার্থনা—মা'কে যে পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, বাবাকে যেন সেই পথে নিয়ে যাওয়া হয়।"

যুবকরা বলিল, "তা'ই হ'বে।"

তখন রেণু প্রকাশচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনি আমাকে নিয়ে চলুন।"

২৮

শ্মশানে। পিতার শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য রেণু শ্মশানে আসিল। পূর্ব্বে সে কখন শ্মশান দেখে নাই—তাহার কথা শুনিয়াছে মাত্র। শ্মশান অতি পবিত্র স্থান; তাহার বক্ষে ধনী, নির্ধন, পুণ্যাত্মা, পাপী, সুখী, দুঃখী, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই সমান—তাহার বক্ষে কত আশার, ভালবাসার, কত বেদনার কত সুখের শেষ হয়। তাই শ্মশানে আসিলে মানুষের মনে বৈরাগ্য আপনি দেখা দেয়—সেই বৈরাগ্যভাবই তাহাকে তাহার শোক সহ্য করিবার শক্তি প্রদান করে।

রেণু সেই শ্মশানে তাহার পিতার সর্ব্বস্বরূপে তাঁহার শবের সঙ্গে আসিয়া তাহার সন্তানের কর্ত্তব্য পালন করিল। যখন সুধীরের শব ভস্মীভূত হইতেছিল, সেই সময়ের মধ্যে কত লোক আসিল—কত লোক চলিয়া গেল। তাহাদিগের মধ্যে এক জনের আর্ত্তনাদ তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিল,—পিতা পুত্রের মুখাগ্নির জন্য আসিয়াছেন, তিনি কান্দিয়া বলিতেছেন, তিনি পুত্রকে নিকটে রাখিয়াছিলেন—শেষ সময়ে তাহার হাতের আগুন পাইবেন—এই আশায়; আর তিনিই আজ তাহার চিতায় অগ্নি দিতে আসিয়াছেন!

শুনিয়া রেণু চমকিয়া উঠিল—কিন্তু সেই উক্তি যেন তাহার মনের মধ্যে যে চিতা জ্বলিতেছিল, তাহাতে সান্ত্বনা-সলিল প্রক্ষিপ্ত করিল—সে কন্যা পিতার শেষ কায করিতে আসিয়াছে, কিন্তু এমনও হয়! আর তাহার মনে হইল, হিন্দু শাস্ত্রকাররা মানব-চরিত্র কি নখদর্পণে দেখিতেন! যদি এই সব কার্য্য করিতে নির্দ্দেশ না থাকিত, তবে কি এই পুত্রশোককাতর পিতা আজ তাহার শোকশেল বক্ষে লইয়াও শ্মশানে আসিতে পারিত ?

সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, সুধীরের এই মৃত্যু কি মুক্তি ? জীবনে তাহার কি আকর্ষণ ছিল ? মানুষ সংসারী হইবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষায় বিবাহ করে—আশা করে, ভালবাসা, যত্ন ও সন্তান লাভ করিবে। সে বিবাহ করিয়া সবই পাইয়াছিল। কিন্তু সে কয় দিনের জন্য ? তাহার বিবাহিত জীবন কেবল রুগ্না পত্নীর সেবায় কাটিয়াছে। সেই সেবা যে তাহার অসাধারণ ভালবাসার উৎস হইতেই উদ্গত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। যত্ন সে পায় নাই। তাহার সন্তানই তাহার স্নেহের কেন্দ্র ছিল। সে সেই সন্তান। সে কি পিতার প্রতি কন্যার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে ?

তাহার বুকের মধ্যে—সন্দেহ দেখা দিল, তাহার পর নিদাঘে দিগন্তে পশ্চিম দিক্‌চক্রবালে মেঘ এক বার দেখা দিলে যেমন দেখিতে দেখিতে পুঞ্জীভূত হয়, তেমনই সেই সন্দেহ নিশ্চয়ে পরিণত হইয়া তাহার কর্ত্তব্যচ্যুতি দেখাইয়া দিল। সম্মুখে যেমন চিতা জ্বলিতেছিল, তাহার মনেও তেমনই চিতা জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু সেই চিতার অগ্নিতে তাহার মনে পিতার প্রতি সন্দেহের শব ভস্মসাৎ হইয়া গেল। সে বুঝিল, তাহার বিবাহ সম্বন্ধে পিতা কোনরূপ অন্যায় করেন নাই, তিনি যাহা তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর মনে করিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছিলেন। মাসীমা'র কথা শুনিবার পর তাহার মনের একটা সন্দেহ অপনীত হইতেছিল। সে জানিত, সুধীর পুরুষ বা স্ত্রীলোক কাহারও একাধিক বার বিবাহের বিরোধী ছিল; তাহার একাধিক বন্ধুর সম্বন্ধে তাহার অনুযোগ ছিল—তাঁহারা বিপত্নীক হইয়া আবার বিবাহ করিয়াছিলেন, সে এক দিন তাহাকে প্রকাশচন্দ্রের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিতে শুনিয়াছিল, প্রকৃত ভালবাসা সংযমের দৃঢ় ও অবিচিলিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা একনিষ্ঠ। সেই পিতা কেন যে তাহার বিবাহ-কালে তাঁহার সেই মত অনায়াসে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই এবং বুঝিতে না পারিয়া পিতার উপর অভিমানে পীড়িত হইয়াছিল। কিন্তু মৃণালিনীর কথায় তাহার মনে হইয়াছিল, পিতা হয়ত তাঁহার মত অনায়াসে বর্জ্জন করেন নাই, সে মত বর্জ্জন করিতে তাঁহাকে কষ্টই ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে মত যে তিনি বর্জ্জন করেন নাই, তাহা পিসীমা'র অজস্র চেষ্টায়ও সুধীরের পুনরায় বিবাহ করিতে অসম্মতিতেই বুঝিতে পারা যায়। বয়স ও বিবেচনা তাহার মনে অভিমানের দৃঢ়তা শিথিল করিয়া আনিয়াছিল;—আজ তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। সে মৃণালিনীর কথাই মনে করিতেছিল—পিতা হয়ত ভুল করিয়াছিলেন, কিন্তু সেজন্য তিনি অপরাধ করেন নাই।

পিতার প্রতি যে শ্রদ্ধাসম্বলিত ভালবাসার উৎসমুখ সে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এত দিন সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নাই; আজ তাহা মুক্ত হইয়া গেল। উৎসমুখোদ্গত ধারায় তাহার তাপতপ্ত হৃদয়ে স্নিগ্ধতার সঞ্চার হইল।

কিন্তু তবুও সে কান্দিতে পারিল না। আঘাত যখন অত্যন্ত অধিক থাকে, তখন তাহার বেদনা অনুভূত হয় না।

ক্রমে চিতা নির্ব্বাপিত হইল।

শববাহীরা গঙ্গা হইতে মৃৎপাত্রে জল আনিয়া চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে লাগিলেন। প্রকাশচন্দ্র একটি পাত্র জলে পূর্ণ করিয়া রেণুকে বলিলেন, "চল, মা, যখন সুধীরের ছেলের সব কায, তুমি তা'র ছেলে ও মেয়ে করেছ, তখন চিতায় জল দাও।" বলিতে বলিতে তিনি কান্দিয়া ফেলিলেন।

রেণু তাঁহার সঙ্গে গেল—তাঁহার নিকট হইতে পাত্রটি গ্রহণ করিয়া পিতার চিতায় গঙ্গোদক ঢালিয়া দিল। প্রকাশচন্দ্র মৃত বন্ধুর উদ্দেশে বলিলেন—"সুধীর, যদি জীবনে কোন জ্বালা পেয়ে থাক, তবে তোমার সর্ব্বস্বের দত্ত এই জলে সে জ্বালা জুড়াক।"

তাহার পর প্রকাশচন্দ্র রেণুকে বলিলেন, "চল, গঙ্গাজল স্পর্শ করবে।"

রেণু বলিল, "স্নান করব না, জ্যেঠামশায়?"

"যদি ইচ্ছা কর, চল।"

তিনি মৃণালিনী ও পূর্ণিমার দিকে চাহিলে মৃণালিনী রেণুর প্রস্তাবেই সম্মতি জানাইলেন। প্রকাশচন্দ্র তাঁহাদিগকে গঙ্গার কূলে লইয়া যাইলেন।

রেণু স্নান করিতে জলে নামিয়া শুনিল, তাহার নিকটে কোন স্নানার্থিনী গঙ্গার উদ্দেশে বলিতেছেন, "মা সর্ব্বসন্তাপহারিণী—কবে আমার সব সন্তাপ হরণ করবে?" রেণু চমকিয়া উঠিল—তাহার মনে হইল, তাহার মনের মধ্য হইতেও যেন ঐ প্রশ্ন উঠিতেছে।

মৃণালিনী বলিলেন, "ডুবটা দিয়ে ওঠ, মা।"

রেণু মাসীমা ও শাশুড়ীর সঙ্গে উঠিল।

তাহার পর প্রকাশচন্দ্র সকলকে সুধীরের শূন্য গৃহে লইয়া আসিলেন। গৃহদ্বারে অগ্নি ও ঘট—জানাইয়া দিতেছিল, গৃহে মৃত্যু তাহার করস্পর্শ দান করিয়াছে।

তিনি নীরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেণু এখন কোথায় যা'বে?

রেণু সে প্রশ্ন শুনিতে পাইল এবং সে-ই তাহার উত্তর দিল,—"আমি এখানেই থাকব।"

"আচ্ছা। আমি আবার সন্ধ্যার সময় আসব"—বলিয়া প্রকাশচন্দ্র ম্লানমুখে—অশ্রু মুছিয়া নিজ-গৃহাভিমুখগামী হইলেন।

রেণু পূর্ণিমাকে বলিল, "মা, আপনি বাড়ী যা'ন—কণা আর অশোক সারাদিন আপনাকে পায় নি।"

পূর্ণিমা বলিলেন, "আমি ফিরেই নীরেনকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তা'রা তোমার জন্যই বেশী ব্যগ্র হ'বে—যদি বল, তা'দের নিয়ে আসতে বলি।"

"এখানে তা'দের কষ্ট হ'বে। বরং আপনি বাড়ী যা'ন।"

পূর্ণিমা কি করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। এ সময় রেণুকে রাখিয়া যাওয়া তিনি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলেন না। কিন্তু—তিনি মৃণালিনীর সহিত পরামর্শ করিতে চাহিলেন।

সেই সময় রেণু তাহার মাসীমাকে বলিল, "মাসীমা, আপনি বাড়ীতে যা'ন। সারা দিন ত মুখে জল দেন নি। দেবদত্তও একা আছে।"

মৃণালিনী বলিলেন, "আমার জন্য ভাবিস না, মা! তুই কি এখানেই থাকবি?"

"হাঁ।"—রেণু দৃঢ়ভাবেই বলিল।

তিনি বুঝিলেন, রেণু আজ একা থাকিতে চাহিতেছে—সে লোকের সঙ্গ বিরক্তিকর মনে করিতেছে। তাঁহার মনে হইল, দেশে প্রচলিত কথা আছে, পুত্রশোক স্বামীর কাছ ব্যতীত নিবৃত্ত হয় না। এ-ও রেণুর পুত্রশোক। কিন্তু তিনি অবস্থা জানিয়া আর মনে করিতে পারেন না, নীরেন্দ্র এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবে। তাই তিনি স্থির করিলেন, তিনি রেণুর কথার প্রতিবাদ করিবেন না। কিন্তু তিনি রেণুকে একাকী রাখিয়া যাইতেও পারেন না। তিনি পূর্ণিমাকে বলিলেন, "বেহান, আপনি যা'ন—দু'টো মুখে দিয়ে আসবেন—তা'র পরে আমি যা'ব।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিও ত মুখে জল দেন নি।"

মৃণালিনী বলিলেন "আমাদের আর ওতে কি?"

তিনি পূর্ণিমাকে পাঠাইয়া দিলেন। যাইবার সময় পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কণা আর অশোককে নিয়ে আসব?"

মৃণালিনী বলিলেন, "না। আমি বুঝতে পারছি রেণু একা থাকতে চাইছে—অবস্থাটা ভাল ক'রে উপলব্ধি করতে চায়। ছেলেরা এলে, তা'রা ওর কাছে যেতে চাইবে।"

"কিন্তু আজ এই বাড়ীতে কি বৌমা একা থাকবেন?

"না। আমি থাকব। আমার কাছে ওর কোন সঙ্কোচ নাই—ও যদি ইচ্ছা করে, আমি পাশের ঘরে থাকব।"

পূর্ণিমা চলিয়া যাইলে রেণু মাসীমা'কে জিজ্ঞাসা করিল, "মাসীমা, আপনি গেলেন না?"

"আমি পরে যা'ব।"

"সারাদিন এই ভাবে—"

"রেণু, আমাদের জীবন কষ্ট সইবার জন্য। তোর শোকের সঙ্গে তুলনা করছি না, কিন্তু এক বার ভেবে দেখ—আমার শোকের তুলনায় এই একটু অসুবিধাই কি বড়? আমার ভাই নাই—সুধীর সে অভাব অনুভব করতে দেয় নাই। আজ আমি ভাবছি—আপদে-বিপদে কি করব? আমার অবস্থাটা তুই ত বুঝিস।"

রেণু আর কিছু বলিল না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রকাশচন্দ্র আসিলেন এবং মৃণালিনী তখনও রহিয়াছেন জানিয়া রেণুকে বলিলেন, "মা, তোমার মাসীমা'র কথা যা' সুধীরের কাছে শুনেছি, তাতে ওঁকে এখানে মুখে জল দিতে বলা বৃথা। উনি এক বার বাড়ী যান।"

রেণু বলিল, "আমি মাসীমাকে বলেছি; কিন্তু উনি যাচ্ছেন না।"

মৃণালিনী বলিলেন, "ও আমাকে যেতে বলছে—ও মেয়ে, মা'র জন্য মেয়ের যে ভাবনা তাই ও ভাবছে কিন্তু আমি যে ওকে ফেলে যেতে পারছি না।"

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "সেটা ত আপনার কর্ত্তব্য। আমি সবই জানি। আমি এখন আছি—এক বার দেখতে হ'বে কাল সুধীরের কোন মোকর্দ্দমা আছে কি না—সেগুলার ব্যবস্থা করতে হবে—মক্কেলদের সংবাদ দিতে হ'বে। আমি মুহুরীকে সকালেই সে কথা ব'লে গিয়েছিলাম। আপনি এই বেলা গিয়ে এক বার ঘুরে আসুন। আপনার বাড়ীতেও ত অনেক কায।

মৃণালিনী মনে করিলেন, তাঁহার পরামর্শ মন্দ নহে।

প্রকাশচন্দ্র সুধীরের বসিবার ঘরে যাইয়া তাহার মুহুরীর সঙ্গে মোকর্দ্দমার কাগজপত্র দেখিতে লাগিলেন এবং কোন্‌টির কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেই বিষয়ে পরামর্শ ও বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

মৃণালিনী গৃহে যাইয়া ঠাকুরের সব ব্যবস্থা করিয়া আসিবার পূর্ব্বে ভাবিতে লাগিলেন, দেবদত্তকে লইয়া যাইবেন কি? তাহাকে রাখিয়া যাইলে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়; কিন্তু তাহাকে লইয়া যাইলে রেণু কিছু মনে করিবে না ত? শেষে তিনি সঙ্কল্প স্থির করিলেন, তাহাকে লইয়া যাইবেন। রেণু যে পুত্রকে তাঁহার দিকট দিয়া গিয়াছে, সে স্বামীর উপর ও আপনার অদৃষ্টের উপর অভিমানহেতু।

কিন্তু অভিমান—অভিমান। তাহা কখন মাতৃস্নেহ নির্ম্মূল করিতে পারে না। রেণু কি কখন তাহার পুত্রের প্রতি তাহার স্নেহ মাতৃহৃদয় হইতে বিধৌত করিয়া ফেলিতে পারে? তাহা সম্ভব নহে। বিশেষ তিনি আজ রেণুকে একাকী থাকিতে দিতে পারেন না—আবার তিনি দেবদত্তকেও ফেলিয়া যাইতে পারেন না।

দেবদত্ত সমস্ত দিন তাঁহার প্রতীক্ষায় ছিল, তিনি আসিলেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রেণু কেমন আছে। সঙ্গে সঙ্গেই সে বলিয়াছিল, "মা, আমি এক বার তাঁ'কে দেখ্‌তে যা'ব না?"

তখন তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, "যা'বে। সে একটু শান্ত হ'ক।" তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত দেবদত্ত আর কোন কথা বলে নাই। কিন্তু এখন তিনি মতপরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর স্বয়ং কার্য্য শেষ করিয়া দেবদত্তকে আহার করাইয়া বলিলেন—"চল, রেণুকে দেখতে যা'বে।"

দেবদত্ত প্রস্তুত হইল।

তিনি যখন সুধীরের সেই পরিচিত গৃহে আসিলেন, তখন তিনিও যেন আর হৃদয়ের চাঞ্চল্য সংযত করিতে পারিতেছিলেন না। ভগিনীর মৃত্যুর পর তাঁহাকে এই গৃহে আসিতে হইয়াছিল; কিন্তু সে রেণুর আকর্ষণে—ভগিনী যে তাঁহাকেই কন্যার ভার দিয়া গিয়াছিলেন।

তাহার পরও তাঁহাকে এই গৃহে আসিতে হইয়াছে—রেণুর জন্যও বটে, আর সুধীরের জন্যও বটে—ভ্রাতার উপর ভগিনীর যে স্নেহ, সেই স্নেহ তিনি তাহাকে দিয়াছিলেন এবং তাহার নিকট হইতে কনিষ্ঠের ভক্তি ও ভালবাসা পাইয়াছেন।

মৃণালিনী যখন আসিলেন, তখনও প্রকাশচন্দ্র তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন—নীরেন্দ্র এক বার আসিয়া গিয়াছিল এবং পূর্ণিমা আসিয়াছিলেন। প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "আমি তবে আসি।"

মৃণালিনী সুধীরের মুহুরীকে ডাকাইয়া বলিতে বলিলেন, তিনি যেন সর্ব্বদা সুধীরের সব দেখেন।

মাসীমা'কে দেখিয়া রেণু বলিল, "মাসীমা, আবার এলেন কেন?"

মৃণালিনী বলিলেন, "মন বুঝলে না, মা, তোকে পেটেই ধরি নি, কিন্তু—"

রেণু বলিল, "আর কত কষ্ট আমার জন্য করবেন, মাসীমা?"

মৃণালিনী বলিলেন, "দেবুকে ত আমি একা রেখে আসতে পারি না, তাই একেও নিয়ে এলাম।"

"আপনি ওকে নিয়ে ফিরে যান, মাসীমা, ওর কষ্ট হ'বে।"

মৃণালিনী বলিলেন, "মা, আমি জানি—আজ লোকের সঙ্গই তোকে পীড়িত করছে। শোকের নিয়মই তাই। কিন্তু আমরা তোকে কোন রকমে বিরক্ত করব না। বেহান চলে যা'বেন। আমি আর দেবু তোর পাশের ঘরে থাকব।"

রেণু আর কিছু বলিল না।

মৃণালিনী ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া রেণুর আহারের ব্যবস্থা করিতে যাইলেন এবং দেবদত্তের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিতে বলিলেন।

দেবদত্ত জানিত না—এ তাহারই গৃহ।

রাত্রিতে রেণুকে তাহার শয্যায় শয়ন করাইয়া মৃণালিনী আসিয়া পার্শ্বের কক্ষে নিদ্রিত দেবদত্তের কাছে শয়ন করিলেন।

সে রাত্রিতে তাঁহার নয়নে যেমন রেণুর নেত্রেও তেমনই নিদ্রার স্পর্শ হইল না।

এক বার মৃণালিনী দেখিলেন, রেণু উঠিয়া আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। সে জানিত না যে, মৃণালিনী জাগিয়া আছেন। মৃণালিনীর মনে হইল—আজ এই শোক তাহার অভিমানের আবরণ ছিন্ন—বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার জননীর স্নেহের আকর্ষণে তাহাকে দেবদত্তের কাছে আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া—"আয়, মা!" বলিয়া তাহাকে আপনার বুকের উপর টানিয়া লইলেন।

পার্শ্বেই দেবদত্ত ঘুমাইতেছিল।

মৃণালিনী বুঝিলেন—রেণুর মনে প্রবল সংগ্রাম চলিতেছিল; তাহার ফল কি হইবে, কে বলিতে পারে?

রেণু ভাবিতেছিল—ঘটনার স্রোতঃ তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে—সেই স্রোতঃ তাহাকে কোথায়—কোন্ কূলে আনিয়া দিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

২৯

পরদিন প্রাতে মৃণালিনী যখন দেবদত্তকে লইয়া আপনাকে গৃহে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, তখন তিনি ভাবিলেন, রেণুকে রাখিয়া যাইবেন—না, সঙ্গে লইয়া যাইবেন, না—তাহাকে তাঁহার স্বামি-গৃহে দিয়া যাইবেন; কিন্তু তিনি যাহা জানিতেন, তাহাতে তিনি

তাঁহাকে কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সঙ্গে যাবি না?"

রেণু দৃঢ়তা সহকারেই বলিল, "না।"

মৃণালিনী তাহার দিকে চাহিলেন। সে বলিল, "আমি এখানেই থাকি।"

"ভাল। আমি যত শীঘ্র পারি, আসব। তোর সব ব্যবস্থা—"

রেণু বলিল, "পুরুত ঠাকুর মশাই ত এখনই আসবেন। তিনি যেমন বলবেন, কুমুদা তেমনই ব্যবস্থা ক'রে দিবে। আপনি যেন না খেয়ে ছুটে আসবেন না।"

মৃণালিনী বলিলেন, "তুই মুখে দু'টো না দিলে কি আমার খাবার রুচবে, মা?"

তিনি কুমুদাকে ডাকিয়া বলিলেন, সে যেন সব আয়োজন করিয়া রাখে—তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

তিনি যখন গাড়ীতে উঠিবেন, সেই সময় পূর্ণিমার গাড়ী গলিতে প্রবেশ করিল। তাহা দেখিয়া মৃণালিনী দ্বারেই দাঁড়াইলেন—তাঁহার গাড়ী অগ্রসর হইয়া পূর্ণিমার গাড়ীর জন্য স্থান করিয়া দিল।

নীরেন্দ্র, অশোক ও কণাকে সঙ্গে লইয়া পূর্ণিমা অবতরণ করিলেন। মৃণালিনীর শিক্ষানুসারে দেবদত্ত পূর্ণিমাকে ও নীরেন্দ্রকে প্রণাম করিল। পূর্ণিমা তাহার মুখচুম্বন করিলেন। নীরেন্দ্রের মনে কেমন যেন বেদনার সঞ্চার হইল। দেবদত্ত—কণা ও অশোকেরই মত তাহার সন্তান! কিন্তু সে যেন তাহার উপর সব অধিকার হারাইয়াছে, তাহাকে আপনার বলিবার অধিকারও তাহার নাই। সে তাহার কর্ম্মফল। কিন্তু ত্রুটি কি সংশোধিত নয় না? না। যে বাণ এক বার নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা যেমন আর ফিরান যায় না, তেমনই যে কথা একবার উচ্চারিত হয়, তাহাও আর ফিরান যায় না।

মৃণালিনী পূর্ণিমাকে বলিলেন, রেণু তাঁহাকে বলিয়াছে, সে এই গৃহেই থাকিবে। তিনি পূজার পরই ফিরিয়া আসিবেন—পূর্ণিমা কি ততক্ষণ থাকিবেন?

পূর্ণিমা বলিলেন, "হাঁ।"

তখন মৃণালিনী গমনোদ্যোগ করিলে কণা ও অশোক তাঁহাকে বলিল, "দিদিমা, দেবু আমাদের কাছে থাকুক না কেন।"

মৃণালিনী জানিতেন, তাহা রেণুর অভিপ্রেত নহে। তিনি বলিলেন, "ওর সকালে মুখ ধোয়াও হয়নি; এখন চলুক, না হয় আবার আসবে।"

গাড়ীতে বসিয়া তিনি ভাবিতে ভাবিতে যাইলেন—এখন অবস্থার না জানি কি পরিবর্ত্তন হইবে। এক জনের অভাবে মানুষের সংসারে ও জীবনে কত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা তিনি আপনার অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছেন—সুধীরের জীবনে ও সংসারেও দেখিয়াছেন। কিন্তু রেণুর সমস্যা সে সকল হইতেও স্বতন্ত্র। এই জটিল সমস্যার সমাধান কিরূপ হইবে, তাহা কে বলিবে? তিনি দেবতাকে উদ্দেশে বলিলেন,—মানুষ যাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না, তাহা ভাবিয়া কোন লাভ নাই—তুমি যাহা কল্যাণকর মনে করিবে, তাহাই করিও।

গৃহে আসিয়া মৃণালিনী দেবদত্তের সব ব্যবস্থা করিয়া স্নান করিতে গমন করিলেন—তাহার পর যথারীতি ঠাকুর-ঘরে যাইয়া কায করিতে লাগিলেন।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় টেলিফোন আসিল—প্রকাশ বাবু সুধীরের গৃহে আসিয়াছেন—তিনি এখন চলিয়া যাইতেছেন, আদালত হইতে বেলা চারিটার সময় আসিবেন; তখন মৃণালিনী সুধীরের গৃহে আসিতে পারিবেন কি?

মৃণালিনী জানাইয়া দিলেন, তিনি যাইবেন।

তাহার অল্পক্ষণ পরেই তিনি তথায় গমন করিলেন, অনেক ভাবিয়া দেবদত্তকে না লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। পাছে রেণু বিরক্ত হয়।

তিনি যাইয়া দেখিলেন, পুরোহিত ঠাকুর তখনও অপেক্ষা করিতেছেন—কুমুদা তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে সব দ্রব্য আনিয়াছে।

মৃণালিনী পূর্ণিমাকে বলিলেন, কণা ও অশোকের খাইতে বিলম্ব হইতেছে, তিনি তাহাদিগকে লইয়া গমন করুন।

কণা ও অশোক কিন্তু সহজে রেণুকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইল না; বলিল, তাহারা মা'র কাছে থাকিবে। শেষে পূর্ণিমা তাহাদিগকে লইয়া গমন করিলেন। মৃণালিনী নীরেন্দ্রকেও যাইতে বলিলেন।

তখন রেণু মৃণালিনীকে বলিল, "মাসীমা, দেখুন।" সে একখানা কাগজ তাঁহার হাতে দিল। তাহা সুধীরের লিখিত—এবং তাহারই জন্য উদ্দিষ্ট। তাহাতে সে লিখিয়াছে, অগ্রে তাহার মৃত্যু হইলে পিসীমা যদি সে সংবাদ জানিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে যেন তাহা জানান না হয়—প্রতি মাসে তাঁহাকে যে টাকা পাঠান হয় তাহা নিয়মিত ভাবে পাঠান হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার টাকা ও তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া সে টাকা—মিলাইয়া তাঁহার স্বামী সুরনাথের নামে

সুরেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য সে কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি বাগান ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ মন্দির নির্ম্মাণের ও দেবসেবার সব ব্যবস্থা পিসীমা'র টাকা হইতে হইতে পারিবে। তাহার বিস্তৃত ব্যবস্থাও সে লিখিয়া রাখিয়াছিল।

মৃণালিনী যখন সেই কাগজে লিখিত নির্দ্দেশ পাঠ করিতেছিলেন, তখন ভৃত্য একখানি পত্র লইয়া আসিল—ডাক-পিয়ন তাহা দিয়া গিয়াছে। পত্র সুধীরের নামে। রেণু খাম খুলিল—খামের উপর যে হস্তাক্ষর তাহা তাহার পরিচিত—পিসীমা'র!

পিসীমা লিখিয়াছেন—তিনি বিশ্বনাথের চরণে নিত্য তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছেন। কয় দিন তাহার পত্র না পাইয়া তিনি চিন্তিত হইয়াছেন। সে যেন পত্র পাইয়াই তাঁহাকে তাহার কুশল-সংবাদ দেয়।

পত্র পাঠ করিয়া মৃণালিনী রেণুর দিকে চাহিলেন, রেণু তাহার মাসীমা'র দিকে চাহিল। রেণু বলিল, "মাসীমা, কি হ'বে?"

মৃণালিনী ভাবিতে লাগিলেন। এ সংবাদ কে তাঁহাকে দিবে? অথচ সংবাদ গোপন রাখাও কি সম্ভব হইবে?

রেণুকে আহার করাইয়া মৃণালিনীর গৃহে যাইতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। তাহার পর তিনি বেলা তিনটা বাজিলেই ফিরিয়া আসিলেন—এ বার দেবদত্তকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

তিনি কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

যতক্ষণ তিনি আইসেন নাই, ততক্ষণ রেণু তাহার পিতার বসিবার ঘরেই কাটাইয়াছে। সে তাঁহার উপর অভিমান করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্নেহ সে পরিমাপ করিতেও পারে নাই। আজ তাহার সে ত্রুটি সংশোধনের কোন উপায় আর নাই।

মৃণালিনী আসিলে সে তাঁহাকে সেই কথা বলিল। শুনিয়া মৃণালিনী বলিলেন, "তোর যদি ত্রুটি হয়ে থাকে, তবে সে তা কোন দিন ত্রুটি ব'লে মনে করে নি। ছেলেমেয়ের অত্যাচারও বাপমা'র কাছে মিষ্ট মনে হয়। সুধীর যে কখন তোর উপর বিরক্ত হয় নি, তা' ত তুই তা'র সব ব্যবস্থা দেখেই বুঝতে পারছিস।"

"তা' পারছি, মাসীমা! আর তা' পারছি ব'লেই আমার আর দুঃখ রাখবার স্থান নাই।"

তাহার পর বেলা চারিটা বাজিতে না বাজিতে প্রকাশচন্দ্র আসিয়া ডাকিলেন, "মা—রেণু?"

ডাকিয়া তিনি দ্বিতলে আসিলেন।

মৃণালিনী পার্শ্বের ঘরে চলিয়া যাইলেন; রেণুর নির্দ্দেশে তিনি সুধীরের বসিবার ঘরেই বসিলেন। রেণু তাঁহাকে পিসীমার সম্বন্ধে সুধীরের নির্দ্দেশ এবং পিসীমা'র পত্র দেখাইল। পাঠ করিয়া প্রকাশচন্দ্র বলিলেন' "আমরা বুঝতে পারি না, এমন অনেক ঘটনা ঘটে। এক জন ইংরেজ কবি লিখেছেন, যে ঘটনা ঘটিবে—পূর্ব্বেই তাহার ছায়াপাত হয়। হয়ত পিসীমা'র মনে তেমনই এই ঘটনার ছায়াপাত হয়েছিল। তিনি সুধীরকে কত স্নেহ করতেন, তা' ত আমরা সকলেই জানি।"

তাহার পর তিনি বলিলেন,"মা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ত দু'দিন কেটে গেল। ছেলের চাইতেও মেয়ে বাপ্‌মা'কে বেশী ভালবাসে। তা'ই আমাদের নিয়ম —ছেলের আগে মেয়ে বাপমা'র উদ্দেশে জল দিবে। তোমাকে পরশু দিনই সুধীরের 'কায' করতে হ'বে।"

রেণু শুনিতে লাগিল।

রেণু বলিল, "জ্যাঠামহাশয়, আমার যা' যা' কর্ত্তব্য তা' করবার ব্যবস্থা আপনি ক'রে দিন। যেন কোন কাযে কোন ত্রুটি না থাকে।"

প্রকাশচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এ-ও আমাকে করতে হ'বে, মা?"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "এ বাড়ীতে কোন্ ব্যবস্থা আমি যে কবে করেছি, তা' যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ তোমার কথায় সব নূতন হয়ে উঠছে। লোককে খাওয়ান সুধীরের একটা ঝোঁকের মত ছিল। তোমার মা'রও সে ঝোঁক কম ছিল না—বিশেষ তিনি স্বামীর সত্তায় আপনার সত্তা এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছিলেন যে, স্বামীর যা' ভাল লাগত, তিনি তা'ই ভালবাসতেন। তিনি কখন গৃহিণীর অধিকার নিতে পারেন নি—পিসীমা'র তাঁবেই থাকতেন, তবু সুধীরের কাছে এ বিষয়ে তাঁ'র উৎসাহের কথা আমরা জান্‌তে পারতাম।"

তিনি বলিলেন, "তোমার মাসীমা তা' জানেন।"

মৃণালিনী তাহা বিশেষ জানিতেন—কারণ, এই সব নিমন্ত্রণেই তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর আগমন না ঘটিলে সুধীর ও কাত্যায়নীর অনুযোগের সীমা থাকিত না।

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "তা'র পর তোমার মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুধীর যেন আপনার সব সখ

বিসর্জ্জন করল—আদালতের কায,সে-ও যেন করতে হয় ব'লে করত—তা'র মন স্ত্রীর রোগ-শয্যায় থাকত; কোন সাধকও যে ভাবে সাধন করতে পারে না—সে সেই ভাবে স্ত্রীর সেবা করত। আমি সে কথা যতই ভাবি, ততই তা'র প্রতি ভক্তিতে আমার মন পূর্ণ হয়—ততই আপনাকে ভাগ্যবান্ ব'লে মনে করি—তা'র বন্ধু হ'বার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম।"

প্রকাশচন্দ্রের গলাটা "ধরিয়া" আসিল। মৃণালিনীর দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। রেণু কান্দিতেছিল।

প্রকাশচন্দ্র আপনাকে সামলাইয়া লইলেন, বলিলেন, "মা, কায কোথায় করবে?"

রেণু দৃঢ়ভাবে বলিল, "বাবার এই বাড়ীতে।"

"সেই ভাল, মা। এ বাড়ী তা'র কাছে স্ত্রীর স্মৃতিমন্দির ছিল। তোমার শাশুড়ীকে সে কথা বলেছ?

"তাঁ'র কোন আপত্তি হ'বে না। হ'বে কি, জ্যেঠামশাই?"

মৃণালিনী পার্শ্বের কক্ষে দ্বারের পার্শ্বেই ছিলেন, তিনি বলিলেন, "না।"

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "কায করবার লোকের ত বাহুল্য নাই—তুমি সংক্ষেপে সেরে নাও—দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ আর যাঁ'দের না বললে নয়—তা'রা; পাড়ার যে ছেলেরা ঘাটে গিয়েছিল, তা'রা—"

বাধা দিয়া রেণু বলিল, "সে হ'বে না, জ্যোঠামশায়। বাবা লোককে আদর-যত্ন করতে কত ভালবাসতেন, তা'র পরিচয় পাইনি বটে, কিন্তু আজ আপনার কাছেই তা শুনেছি। যেমন ভাবে কায করলে তাঁ'র মনের মত হ'ত—সেই ভাবে কায করতে হ'বে।"

"বেহানকে খুব পরিশ্রম করতে হ'বে। কায করবার লোক ত তিনি আর তোমার মাসীমা।"

"কেন জ্যেঠাইমা আসবেন না?"

"কেন আসবেন না, মা?"

"আমি কি গিয়ে তাঁ'কে ব'লে আসব?"

"তোমায় যেতে হ'বে না, মা। আমি ত তোমার ছেলে—আমিই তোমার হয়ে বলব। কলিকাতায় জীবন কাটালাম বটে, কিন্তু কলিকাতার হালের চা'ল কখন ভাল মনে করতে পারি না। বাড়ীর গৃহিণী নিমন্ত্রণ করতে না এলে বাড়ীর গৃহিণী যা'বেন না—এ সব একেলে চা'ল। সেকালে আমাদের সময় ছিল, বাড়ীর একটি ছেলে এসে মেয়েপুরুষ সব নিমন্ত্রণ করত, তা'তেই হ'ত।"

তিনি হাইকোর্টের এক জন বৃদ্ধ জজের গল্প বলিলেন। তাঁহার পৌত্রীর বিবাহ হইয়া গেল—কুটুম্বরা পশ্চিমে থাকেন, কলিকাতার হাল আমলের প্রথা জানেন না; বাড়ীর বড় মেয়ে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণের দিন জজের পুত্রবধূ—কন্যার মাতা আসিয়া শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, নতুন কুটুমবাড়ী নিমন্ত্রণ রাখতে কে যা'বে?" তীক্ষ্ণধী শ্বশুর ব্যাপারটা বুঝিলেন; তিনি বলিলেন, "দেখছি তুমি মহা সমস্যায় পড়েছ! তোমার বেহান যখন নিজে নিমন্ত্রণ করতে আসেন নি, তখন তুমি অবশ্যই যেতে পার না—তা'তে তোমার অপমান হ'বে। আমি বলি, তোমার শাশুড়ী ত একালের লোক ন'ন, তাঁর অপমান হ'বে না—তিনিই যা'ন।" পুত্রবধূর খুব শিক্ষা হইয়াছিল।

রেণু বলিল, "চলুন না, আমিই যাই।"

"না, মা—তোমাকে যেতে হ'বে না। আমি তাঁ'কে ঠিক সময় নিয়ে আসব। মেয়ের বাড়ীতে আসবেন—দুঃখের সময়; নিমন্ত্রণ কেন, মা?"

মৃণালিনী কয় দিন হইতেই একটি বিষয় লক্ষ্য করিতেছিলেন—রেণুর কোন কাযের মধ্যে তাহার স্বামীকে সে যেন স্থান দিতেছিল না—ইচ্ছা করিয়াই সে তাহা করিতেছিল, কি অন্য কারণে, তাহা তিনি বুঝিতে না পারিলেও ইহাতে তাঁহার মনে শঙ্কার উদ্ভব হইতেছিল। তিনি ভয় করিতেছিলেন—রেণুর জীবনে পাছে তাহার শ্বশুরালয়ের—বিশেষ স্বামীর প্রভাব আরও হ্রাস পায়। তাহা তিনি একান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে করিতেন। তিনি এই সুযোগে বলিলেন, "কেন, ওর মেয়ে নিমন্ত্রণ করতে যা'বে। ছেলে-মেয়ে একদিন মা'কে না পেয়ে একেবারে ম্লানমুখ হয়ে বেড়াচ্ছে।'

রেণু কোন কথা বলিল না—আপত্তিও করিল না। প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "তাই হ'বে। তবে রেণুর জ্যেঠাইমাকে নিমন্ত্রণ করতে যেতে হ'বে না। তিনি বাড়ীর সকলকে নিয়ে আসবেন—কায-কর্ম্ম করবেন। সে বিষয়ে কোন ভাবনা নাই।"

সেই ব্যবস্থাই হইল এবং প্রকাশচন্দ্র যাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে, তাঁহাদিগের এবং দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। মধ্যে মাত্র একটি দিন—কাযেই আর বিলম্ব করা চলে না।

তিনি তাঁহার গৃহে গাড়ী পাঠাইয়া তাঁহার স্ত্রীকে আনাইয়া লইলেন। তিনি আসিয়া মৃণালিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া সব আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং পূর্ণিমা তাঁহাদিগের কার্য্যে যোগ দিলেন।

কণা ও অশোক আবার মা'র কাছে আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কণাকে মৃণালিনী বলিলেন, "তুমি ত দিদি, এবার মস্ত বড় হ'য়ে গেল; মা'র হ'য়ে তুমি নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছ।"

অশোক বলিল, "কেন, দিদি, আমি যা'ব না?"

মৃণালিনী বলিলেন, "মা যাবেন না—তাই কণা তাঁ'র প্রতিনিধি হয়ে যা'বেন! তুমি এক কায কর—বাবার সঙ্গে যা'বে।"

অশোক বলিল, "আমি দিদির সঙ্গে যা'ব।"

"আচ্ছা তা'ই হ'বে।"

তাহাই হইল এবং উদ্যোগ আয়োজন এমন ভাবে হইতে লাগিল যে, রেণুর মনে হইতে লাগিল, সে তাহার যতটুকু সাধ্য পিতার প্রীতিকর অনুষ্ঠান করিতেছে। তাহার মনের কথা কেহই জানিতে পারিলেন না। সে কেবলই ভাবিতেছিল—সে পিতার প্রতি যে অবিচার করিয়াছে, তাহা তাহার অপরাধ—সে তাহা পাপ বলিয়া বিবেচনা করে; সে কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবে না? প্রকাশচন্দ্র তাহাকে কথায় কথায় পিতার সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা শুনাইয়াছেন—পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম—তাঁহার প্রীতিতে সর্ব্বদেবতার প্রীতি সম্পাদিত হয়। সেই পিতাকে সে ভুল বুঝিয়াছে; তাঁহার স্নেহের স্বরূপ সে বুঝিতে পারে নাই। তাহা বুঝিবার মত শক্তি তাহার ছিল না—অভিমান তাহাকে সেই স্নেহের সম্বন্ধে ভুল বুঝাইয়াছিল। তাহার ব্যবহারে তাহার পিতার মনে কত বেদনার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সে কল্পনা করিতে পারিতেছে; কিন্তু—সেই বেদনাই তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ হয় নাই ত? সে যত ভাবিতেছিল, ততই তাহার বক্ষ বেদনায় ও চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। তাই পিতা লোককে আদর করিতে ভালবাসিতেন—এই কথা প্রকাশচন্দ্রের নিকট শুনিয়াই সে সঙ্কল্প করিয়াছিল—সে "চতুর্থীতে" তাহাই করিবে। জলে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন সম্মুখে তৃণখণ্ড দেখিলে তাহাই অবলম্বন করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করে, সে-ও তেমনই মনে করিতেছিল—পিতার সম্বন্ধে এখনও তাহার যাহা করণীয় আছে, সে সেই সকল এমন ভাবে সম্পন্ন করিবে যে, তাহাতে তাহার ভুলের ফল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

তাহার আগ্রহাতিশয্য লক্ষ্য করিয়া মৃণালিনী যখন বলিলেন, সে অত্যন্ত ব্যাকুলতায় বিব্রত হইতেছে কেন—তখন সে যাহা বলিল, তাহাতে মৃণালিনী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার নিকট রেণুর মনের কথা আর গোপন থাকিল না। তিনি বলিলেন, "তুমি কি সুধীরের কোন ব্যবহারে কোন দিন মনে করিতে পেরেছ, সে তোমাকে অপরাধী মনে করেছে? স্নেহ নিম্নগামী। আমাদের দেশে চলিত কথা আছে—

'কুপুত্র যদিও হয়
কুমাতা কখন নয়'

—তুমি যেমন সুধীরের পুত্রেরও অধিক—সর্ব্বস্ব ছিলে, সে-ও তেমনই তোমার কেবল পিতাই ছিল না—একাধারে পিতা ও মাতা ছিল। দেবদত্তের জন্মকালে তুমি যখন জীবনের আর মরণের সন্ধিস্থলে—তখন কি কেহ সুধীরের অপেক্ষাও বেশী চিন্তিত হয়েছিল?"

সে সময় পিতার যে অবস্থা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহা রেণুর মনে পড়িল। সে আর চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিল, "মাসীমা, বাবার ব্যবহারে—তাঁ'র স্নেহে কখন কোন ত্রুটি কেহ লক্ষ্য করতে পারে নি বটে, কিন্তু আমার ত্রুটি ত আমার কাছে—আমি গোপন করতে পারি না। আমি যত তা' মনে করছি, ততই আমার মনে হচ্ছে, আমি যে অপরাধ করেছি, তা'র হয়ত প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

মৃণালিনীরও মনে হইয়াছে—যদি রেণুর ভুলের জন্য সুধীর বেদনা না পাইত, তবে হয়ত দীপ এত শীঘ্র নির্ব্বাপিত হইত না; তথাপি তিনি সে কথা আজ মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টাই করিলেন। তিনি রেণুকে বলিলেন, "তুমি ভুল করছ, মা। তোমার শোক তোমার ত্রুটি তোমার কাছে অতিরঞ্জিত ক'রে অপরাধে পরিণত করেছে। গঙ্গার জল যেমন যা'কে স্পর্শ করে, তা'কেই নির্দ্দোষ করে—তেমনই সুধীরের মত দেবচরিত্রের স্নেহ তোমার কোন ত্রুটি থাকলেও তাকে স্পর্শ ক'রে নির্দ্দোষ করেছে; তা'র সব মলিনত্ব বিধৌত ক'রে দিয়েছে।"

তাহাতেও যেন রেণুর মনের ভার দূর হইল না লক্ষ্য করিয়া মৃণালিনী বলিলেন, "তা'র মনে যদি সে ভাব থাকত, তবে কি সে তা'র স্নেহের একমাত্র অবলম্বন কন্যাকেই তা'র সর্ব্বস্ব দিয়ে, তা'র ইচ্ছামত সেই সর্ব্বস্বের ব্যবহার করতে নির্দ্দেশ দিয়ে যেত? তা'র সঙ্গে অর্থের সদ্ব্যবহার করা নিয়ে আমার অনেক বার অনেক আলোচনা হয়েছে। দেবদত্তকে তুমি আমার কোলে দিবার পূর্ব্বে সে তোমার মেস মহাশয়ের সম্পত্তির কি করা কর্ত্তব্য তা'

নিয়ে অনেক ভেবেছে। সে বিদেশে কোন এক জন মনীষীর কথা বল্‌ত—ধনী হয়ে মরা কলঙ্কের কথা; যে ধন উপার্জ্জন করে, সে তা'র সদ্ব্যবহার কর্‌তে না জান্‌লে—তা'র ধন গর্দ্দভের চিনির বস্তা বহিবার মতই হয়। সে নিজে তা'র বাপের আর মা'র নামে হাসপাতালে টাকা দিয়াছে—অনেক ছেলে তা'র সাহায্য পেয়ে লিখা-পড়া শিখে জীবনে সাফল্য লাভ করেছে; সে পিসীমা'র জন্য দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার নির্দ্দেশ দিয়ে গেছে। কিন্তু নিজের সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার তা'র মেয়ে-কেই দিয়ে গেছে। এতেও কি তুমি বুঝতে পারছ না—তুমি তা'র কি ছিলে—সে তোমাকে কত স্নেহ করত—তোমার উপর তা'র আস্থা কেমন ছিল?"

রেণু যেন অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইল, হয়ত সে তাহার ত্রুটি সত্য সত্যই অতিরঞ্জিত করিতেছে।

সে মনে একটু শান্তি পাইল।

তাহার পর "চতুর্থীর" উদ্যোগে ও আয়োজনে সে দুই দিন আর অধিক ভাবিবার সময় পাইল না।

একান্ত নিষ্ঠা সহকারে সে "চতুর্থীতে" কন্যার কর্ত্তব্য পালন করিল।

৩০

"চতুর্থীর" কায শেষ হইল—তাহার পরদিন মৃণালিনী লক্ষ্য করিলেন—রেণু যেন অন্য দিনের অপেক্ষাও বিষণ্ণ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীর কি ভাল নাই?"

রেণু বলিল, "কিছু ত অসুখ মনে হচ্ছে না।"

"ক'দিনের পরিশ্রমেই তোমাকে এমন দেখাচ্ছে।"

রেণু আর কিছু বলিল না—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল—তাহার পর বলিল, "সব কায শেষ হ'ল!" সে যেন অন্যমনস্কভাবেই এই কথা বলিল।

মৃণালিনী যেন চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন, এখনও রেণু তাহার পিতার চিন্তাতেই মগ্ন আছে এবং তাহাই তাহার ভাল লাগিতেছে। তিনি বলিলেন, "মা, কায ত এখনও শেষ হয় নি।"

"কেন?"

"শুন্‌লে ত প্রকাশ বাবুর কথা—কন্যাই অধিক স্নেহের, তাই পিতামাতা প্রথমে তা'র শ্রদ্ধার অর্ঘ্য গ্রহণ করেন।"

"তা'র পর?"

"তা'র পর—কে কি করবেন, সে কথা প্রকাশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে হ'বে।"

প্রকাশচন্দ্র অন্য দিনেরই মত আদালত হইতে ফিরিবার পথে আসিলেন এবং বলিলেন, "আমি সে কথা ভেবে রেখেছি। সুধীরের এক জ্ঞাতি-পুত্র আমাদের আদালতেই উকীল—তা'কে ব'লে রেখেছি। সে সব সংবাদ দিলে অধিকারী স্থির ক'রে ব্যবস্থা করব।"

তিনি রেণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ইচ্ছা, সে কায এই বাড়ীতেই হ'বে।"

রেণু বলিল, "হাঁ।"

সে যেন আরও কয় দিন এই বাড়ীতে থাকিবার সুযোগ পাইয়া আনন্দিতা হইল।

তাহার পর সে প্রকাশচন্দ্রকে বলিল, "জ্যাঠামশায়, আজ ক'দিনই আমি 'পিসীমার' কথা ভাবছি। তাঁ'র সম্বন্ধে কি করা য'বে?"

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "তুমি ত দেখেছ, তিনি যদি জান্‌তে না পারেন, তবে তাঁ'কে সংবাদটা জানান না হয়, এই সুধীরের অভিপ্রেত ছিল। সে যে কা'র জন্য ভাবেনি—তাই আমি ভাবি। কিন্তু এ সংবাদ কি গোপন থাকবে? জান ত, মা, যাঁ'রা তীর্থবাস করতে যান, তাঁ'রাও অনেকে এক একটি সংবাদপত্র। আমার এক জ্যেঠাইমা পুরীতে বাস করতেন, তিনি প্রথম প্রথম প্রতিদিন তিনবার মন্দিরে যেতেন—শেষে কেবল সন্ধ্যারতি দেখতে যেতেন; মা মধ্যে মধ্যে তাঁ'র কাছে যেতেন—তিনি কেবল সন্ধ্যারতি দেখতে যাওয়া আরম্ভ করবার পর মা যে বার গেলেন সে বার তা'র কারণ জিজ্ঞাসা করলে জ্যেঠাইমা বললেন, 'আর বলিস নে, ছোট বৌ, শুনেছিস ত—

'গয়ায় গেলাম ঘুচাতে পাপ—
সেখানে দেখি—সতীনের বাপ!'

এলাম দেবস্থানে—এখানেও দেখি যাঁ'রা তীর্থবাসিনী হয়েছেন, তাঁ'রা মন্দিরে গিয়েও কেবল পরের কথার আলোচনা—কুৎসার আলোচনা করেন। তাই বিরক্ত হয়ে এই ব্যবস্থা করেছি—আর সময় বাড়ীতে ব'সে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করি।' সুধীরের সংবাদ ত অনেক সংবাদপত্রেই বেরিয়েছে—হয়ত কে কোন দিন ব'লে ফেলবেন—সহানুভূতি দেখাতে যা'বেন।"

রেণু বলিল, "তা' হ'লে কি করা যায়, জ্যেঠামশাই?"

"কি আর করবে বল।"

"কিন্তু দেখুন আজও তাঁ'র এক পত্র এসেছে—তিনি বাবার চিঠি না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। হয়ত তিনিই কাউকে সংবাদ নিতে বলবেন।"

"তা' হ'লে কি সংবাদ দেবে?"

পিসীমা'র প্রতি রেণুর কখনই বিশেষ আকর্ষণ ছিল না—বরং তাহার বিপরীত ভাবই ছিল বলিলেও বলা যায়। কিন্তু তাহার মহাশোক তাহাকে অন্যের শোকে সহানুভূতি-সম্পন্ন করিয়াছিল। তাই সে কয় দিনই পিসীমা'র কথা ভাবিয়াছে।

প্রকাশচন্দ্র ভাবিয়া বলিলেন, "যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাঁ'কে সংবাদ দিতে যেতে হয়। পত্রে সংবাদ দেওয়া ভাল হ'বে না।"

"আমি যা'ব ?"

"যদি যেতে চাও তবে শ্রাদ্ধ উপলক্ষ ক'রেই যেতে হয়। কাশীতে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ক'রে যেতে হয়।"

"সে ব্যবস্থা কে করবে ?"

"কেন, মা, তোমার অভাব কি ? কাশীতে আমাদের ক'জন বন্ধুর বাড়ী আছে—যাঁ'কে বলব, তিনিই সানন্দে বাড়ী দেবেন। নীরেন্দ্র যা'বেন। তোমার মাসীমা যেতে পারবেন না—কিন্তু তোমার শাশুড়ী হয়ত যেতে পারবেন। তোমরা সবাই যেতে পার।"

"কিন্তু—জ্যেঠামশায়, 'পিসীমাকে' কি আমি সংবাদ দিতে পারব ?"

"না"—বলিয়া প্রকাশচন্দ্র একটু চিন্তা করিলেন; তাহার পর সুধীরের মুহুরীকে ডাকিয়া পঞ্জিকা আনিতে বলিলেন। পঞ্জিকা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "মঙ্গলবারে কায পড়বে। যদি বল—আমি শুক্রবারে তোমাদের নিয়ে যা'ব। যদি ব্যবস্থা করতে পারি বুধবার অবধি থেকে তোমাদের নিয়ে আসব—না হয়, রবিবারের মধ্যে সব ব্যবস্থা ক'রে তবে ফিরব।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "তোমার জ্যেঠাইমা'রও কি একটা পূজা মানত করা আছে—ক'বার যাবেন যাবেনও করেছেন, দেখি যদি তিনি যেতে চান।"

তিনি উঠিয়া যাইয়া টেলিফোন ধরিলেন—বাড়ীতে ফোন করিলেন এবং তাহার পর আসিয়া বলিলেন, "কাশী-যাত্রা-একবার শুন্‌লে হয়! তোমার জ্যেঠাইমাও যা'বেন।"

তখন সেই আয়োজন হইতে লাগিল।

পূর্ণিমাও যাইবেন—কণা ও অশোকও যাইবে।

প্রকাশচন্দ্র সব ব্যবস্থা করিলেন। ভৃত্যদিগকে পূর্ব্বে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

প্রকাশচন্দ্রের ব্যবস্থায় কলিকাতায় সব আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করা হইল এবং সুধীরের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট জ্ঞাতিকে সম্মত করাইয়া তাঁহাকেই লইয়া যাওয়া স্থির হইল।

মোগলসরাই ষ্টেশন হইতে দুইখানি বাসে সকলে কাশী-যাত্রা করিলেন।

বাস অগ্রসর হইলে যখন কাশীর দৃশ্য সকলের নয়ন-সমক্ষে প্রকট হইল, তখন প্রকাশচন্দ্রের পত্নী উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া পূর্ণিমাকে ও রেণুকে বলিলেন,—"কাশী দেখ।"

উভয়েই উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। কণা ও অশোক বিস্মিত ভাবে—যেন একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল—"কি চমৎকার!"

চমৎকারই বটে। নিম্নে উত্তরবাহিনী জাহ্নবী—তাহার কূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বারাণসী—সোপান-শ্রেণী নদীতে নামিয়া আসিয়াছে—সোপানে জনতা—তাহাদিগের বেশে বর্ণের কি বৈচিত্র্য!

যে বাসে মহিলারা ছিলেন, প্রকাশচন্দ্র তাহাতেই—সম্মুখে চালকের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। রেণু যখন তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—"জ্যেঠাইমা, ঐ যে চূড়া দেখা যাচ্ছে—ঐ কি বিশ্বনাথের মন্দির ?"—তখন তিনি বলিলেন, "না, মা। পরধর্ম্মদ্বেষী বাদশাহ ঔরঙ্গজেব বিশ্বনাথের মন্দির অপবিত্র ক'রে তা'র উপর যে মসজেদ প্রতিষ্ঠা ক'রে মনে করেছিলেন—বিরাট পুণ্য সঞ্চয় করলেন—ঐ সেই মসজেদের চূড়া; হিন্দুর বুকে বেদনা দিতে দণ্ডায়মান।"

রেণু যেন ব্যথিতা হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কোন ধর্ম্মের লোকের মনে অকারণে ব্যথা দিলে কি সত্যই পুণ্যসঞ্চয় হয় ?"

"কখনই হয় না। যদি বল—তা'র ফলও ভাল হয় না, তবে তা'রই প্রমাণে বলা যায়—ঔরঙ্গজেব তাঁ'র দীর্ঘ রাজত্বের ও জীবনের অর্দ্ধাংশ যুদ্ধে, অশান্তিতে, ছেলেমেয়েদের ভয়ে কাটিয়ে ছিলেন—তাঁ'র কাযের ফলেই মোগলরাজ্য শেষ হয়।"

অশোক ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিতেছিল—সে বলিল, "কেন, দাদা, তা'র পরেও ত মোগল-রাজ্য ছিল।"

প্রকাশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "খুব ঠকিয়েছিস। ছিল বটে, কিন্তু না থাকবার মত—ঐ যে তোর বুড়ী দিদিকে দেখ্‌ছিস, ওঁরই মত—যা'বার পথে থাকা। তখন থেকে মোগলরাজ্য ভেঙ্গে পড়তে লাগল—শেষে যিনি একেবারে সব শেষ করলেন—"

অশোক বলিল, "বাহাদুর শা ?"

"হাঁ। তিনি নামেমাত্র রাজা ছিলেন—কিন্তু কাযে কিছুই না। তুই যেমন বড় হ'লে বৌদিদির

কাছেই থাকবি—তিনি তেমনই তাঁ'র বেগমদের মহলেই থাকতেন।"

বাস গঙ্গার উপর সেতুতে উপস্থিত হইল।

যে বন্ধুর গৃহ লওয়া হইয়াছিল, তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে বাস চলিল—অল্প সময়ের মধ্যেই গৃহদ্বারে উপনীত হইল।

তাহার পর গৃহে সকলকে রাখিয়া প্রকাশচন্দ্র পিসীমা'র গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

তিনি যখন সেই গৃহে উপনীত হইলেন, তখন পিসীমা গঙ্গা-স্নান করিয়া ফিরিয়া আইসেন নাই। তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

তিনি ফিরিয়া আসিলেই সংবাদ পাইলেন এক জন লোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "কে ?"

প্রকাশচন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "পিসীমা, আমি প্রকাশ।"

পিসীমা ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, "প্রকাশ ! তুমি কি কাশীতে এসেছ, বাবা ?"

"হাঁ।"

"তোমাকে ব'সে থাকতে হয়েছে। এই গঙ্গা-স্নান ক'রে শিবের মাথায় জল দিয়ে সুধীরের, রেণুর, দেবুর মঙ্গল কামনা ক'রে ফিরি—একটু দেরী হয়। তা'রা সব ভাল আছে ত ?"

কথাটার সরল উত্তর না দিয়া প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "পিসীমা, রেণু কাশীতে এসেছে। তাই আপনাকে নিয়ে যেতে হ'বে।"

"রেণু এসেছে ! কেন ? কবে এল ? একা এসেছে ?"

প্রকাশচন্দ্র শেষ প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন, "একা নহে, পিসীমা, জামাই এসেছেন, ছেলেমেয়ে এসেছে। বেহানও এসেছেন।"

"বেড়া'তে এসেছে বুঝি ? তা' বেশ। দেবুকে আনে নি ?"

"না।"

"মাসী কি তা'কে আসতে দেবে !"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "বাবা, আমি পূজা সেরে নিয়ে যা'ব, তোমার ত দেরী হ'বে !"

"আমি ত বাড়ী চিনে গেলাম—আমিই বৈকালে এসে আপনাকে নিয়ে যা'ব। সে-ই ভাল হ'বে না কি, পিসীমা ?"

"তা'ই হ'বে, বাবা, যত শীঘ্র পার এস—পোড়া মন—মায়া কি কাটাতে পারা যায় ? রেণু এসেছে—কতক্ষণে তা'কে দেখব, তা'ই কেবল মনে হচ্ছে। আহা সুধীর যদি আসত—কত দিন তা'কে দেখি নি !"

"রেণু ত বল্ছে, আপনাকে কলিকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যা'বে।"

"না, বাবা, এ কথা আর যেন বলে না। সুধীর ত আর সংসারী হ'ল না।—হ'লে আমার পায় আবার বেড়ী পড়ত। এখন যে ক' দিন থাকব, যেন বাবা বিশ্বনাথের চরণে থেকে মণিকর্ণিকায় পুড়তে পারি।"

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা, পিসীমা' আমি বৈকালেই আসব।"

"ক' দিন সুধীরের পত্র পাই নি—বোধ হয়, তোমরা আসবে বলেই আর পত্র দেয় নি। তুমি কি কোন কাযে এসেছ ?"

"না, পিসীমা, আমার স্ত্রীর পূজা দিবার ছিল—তিনি এলেন, আমিও এলাম।"

* * * * *

অপরাহ্ণে প্রকাশচন্দ্র আসিয়া পিসীমা'কে লইয়া যাইলেন।

পিসীমা যাইয়া রেণুকে, নীরেন্দ্রকে, পূর্ণিমাকে ও ছেলে-মেয়েকে আদর করিলেন—প্রকাশচন্দ্রের স্ত্রীকে বলিলেন, "বৌমা, তোমাকে কত দিন পরে দেখলাম ! তাই ত কথায় বলে, বেঁচে থাক্‌লেই দেখা হয়।"

তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সুধীর কেমন আছে, রেণু ?"

রেণু এতক্ষণ স্থির ছিল—আর পারিল না ! কান্দিয়া ফেলিল।

পিসীমা চমকিয়া উঠিলেন—"রেণু, তবে কি সুধীর—"

তিনি অবশিষ্ট কথা বলিতে পারিলেন না।

প্রকাশচন্দ্রের পত্নী ও পূর্ণিমা আসিয়া তাঁহার কাছে বসিলেন।

পিসীমা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

বহুক্ষণ পরে শান্ত হইয়া পিসীমা বলিলেন,—"তাই আমার মনে কত আশঙ্কা হচ্ছিল কেন, তা'র পত্র পাচ্ছি না।"

তখন প্রকাশচন্দ্র তাঁহাদিগের কাশীতে আসিবার কারণ জানাইলেন।

পিসীমা কেবল কান্দিতে লাগিলেন।

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "আপনি সুধীরকে যেমন ভালবেসেছেন, সে-ও আপনাকে তেমনই ভক্তি করত। তা'র কাগজপত্রের মধ্যে দেখলাম, সে রেণুর জন্য লিখে গেছে—আপনাকে যেন সংবাদ

জানান না হয়—আপনি মনে কত ব্যথা পা'বেন তা' সে বুঝতে পেরেই ঐ কথা লিখে গিয়েছিল।"

তাহার পর তাঁহার সম্বন্ধে সুধীর আর যে সব ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিল, প্রকাশচন্দ্র তাহাও বলিলেন। তিনি সেই সুযোগ লইয়া বলিলেন, সুধীর যে মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য জমি কিনিয়া রাখিয়া গিয়াছে—তাহাতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, পিসীমা'কে যাইয়া তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

পিসীমা কান্দিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বাবা আমি আবার সেই বাড়ীতে যা'ব! একে একে সকলেই গেল—রইলাম কেবল আমি, আমার কপাল পোড়া তাই।"

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "পিসীমা, আজ সে কথা আর বলব না। কিন্তু আপনাকে রেণু যেতে বলছে, আপনি কি তা'র কথা ফেল্‌তে পারবেন?"

তাহার পর শ্রাদ্ধ শেষ হইল।

তখন প্রকাশচন্দ্র আবার পিসীমা'কে যাইবার কথা বলিলে, পিসীমা বলিলেন, "বাবা, আমি কি আর যেতে পারি?"

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "পিসীমা, সুধীর গেল—তা'ও যে সহ্য করতে হ'ল। এখন সব বিষয় আমাদের পরামর্শ ক'রে করতে হ'বে। এই দেখুন না বাড়ী। রেণুর ইচ্ছা নহে বাড়ী ভাড়া দেয়। কিন্তু কেউ না থাকলে কি বাড়ী থাক্‌বে? আপনি থাক্‌লে রেণুও মধ্যে মধ্যে আসবে; আমাকে বলেছে, আমি যেন যাই—আমার কাছে বাপের কথা শুনতে ভালবাসে। আর নীরেনের ছেলেমেয়ে তা'রাও ত আপনার পর নহে।"

প্রকাশচন্দ্র শেষে বলিলেন, "পিসীমা, আপনি কাশীতে বাস করবেন ব'লে তা'র কোন ব্যবস্থাতেই ত সুধীর কোন ত্রুটি রেখে যায় নি। আপনার যখন ইচ্ছা কাশীতে আসবেন। এখন—রেণু বড় আঘাত পেয়েছে; আপনি আর ওর মাসীমা বাপের বাড়ীর বলতে ত এই দু' জন। আপনাদের কর্ত্তব্য —ওকে শোকে সান্ত্বনা দেওয়া।"

মাসীমা'র কথায় পিসীমা'র ভাবান্তর হইল। মাসীমাই রেণুকে সান্ত্বনা দিবেন—আর তিনি দূরেই থাকিবেন? তখন তিনি মনে মনে অনুকূল যুক্তির অবতারণা করিতে লাগিলেন। মাসীমা ত কলিকাতাতেই আছেন—তবুও রেণু কাশীতে আসিয়াছে এবং তাঁহাকে যাইতেই বলিতেছে। এ সময় না যাওয়া কি ভাল হইবে?

ইহার পর তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল তিনি প্রকাশচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

প্রকাশচন্দ্রের আর থাকিবার সুবিধা হইল না। তিনি বুধবারেই তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া যাইলেন। তিনি যাইবার পূর্ব্বে নীরেন্দ্রকে ভার দিয়া যাইলেন—সে যেন তাহার মাতাকে ও রেণুকে কাশীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়া লইয়া যায়।

কাশীতে দ্রষ্টব্য স্থানের—মন্দিরের অন্ত নাই। কেহ কেহ বলেন, ছয় মাস দেখিলেও কাশীর সব মন্দির দেখা হয় না।

কিন্তু শীঘ্রই ফিরিতে হইবে। তাই নীরেন্দ্র প্রধান প্রধান মন্দিরাদি সকলকে দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হইল।

কাশীতে আসিয়া রেণু তাহার শোকতপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা লাভ করিল। যে ইহক'লের কার্য্যে আমরা এত ব্যস্ত থাকি, তাহা কিরূপ তুচ্ছ, তাহা কাশীতে আসিলেই বুঝিতে পারা যায়। যুগে যুগে—স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু ইহকাল তুচ্ছ করিয়া পরকালের জন্য সাধনা করিতে এই বারাণসীতে আসিয়াছে—তাঁহাদিগের সাধনার সিদ্ধিলাভ কি হয় নাই? ইহকাল ও পরকালের যে ব্যবধান, তাহা বুঝি এই মহাতীর্থে আসিলে দূর হইয়া যায়।

তাহার পর সকলে কলিকাতায় ফিরিলেন।

গৃহদ্বারে পিসীমা'র আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইলে গৃহমধ্যে কুমুদার ক্রন্দন তাহাতে যুক্ত হইল। পূর্ণিমার সঙ্গে রেণুই পিসীমা'কে নামাইয়া লইল। তাঁহাদিগের আসিবার সংবাদ পাইয়া মৃণালিনী আসিয়াছিলেন।

পিসীমা'র আগমনে রেণু আরও কয় দিন পিতৃগৃহে—তাহার গৃহে রহিয়া গেল।

তাহার পর প্রকাশচন্দ্রের ও মৃণালিনীর পরামর্শে সে আবার স্বামিগৃহে গেল। তবে সে মধ্যে মধ্যে পিসীমা'র কাছে আসিতে লাগিল।

ওদিকে প্রকাশচন্দ্র সুধীরের ত্যক্ত সম্পত্তিতে রেণুর অধিকার-প্রতিষ্ঠার যে সব ব্যবস্থা আইনে প্রয়োজন, সে সব করিলেন এবং রেণুর অভিপ্রায় অনুসারে পিসীমা'র জন্য কল্পিত মন্দিরনির্ম্মাণের কার্য্যেরও ব্যবস্থা করিলেন। সে কার্য্যে রেণু বিশেষ আগ্রহ দেখাইতে লাগিল।

গঙ্গার কূলে সুধীরের ক্রীত বাগানে শিবমন্দির নির্ম্মিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তথায় একটি গৃহও নির্ম্মিত হইল।

পিসীমা'র শরীর কিন্তু ক্রমেই অপটু হইয়া আসিতে লাগিল এবং সেই জন্য তিনি কাশীতে যাইতে চাহিলে রেণু যেমন তাহাতে আপত্তি করিত, তেমনই যাহাতে শীঘ্র মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয়, সে চেষ্টাও করিতে লাগিল। সে কার্য্যের ভার প্রকাশচন্দ্র বিশেষ বিবেচনা করিয়া নীরেন্দ্রকে দিলেন।

৩১

দশ বৎসর পরে। দশ বৎসর এক হিসাবে যেমন উপেক্ষণীয়—অন্য দিক্‌ হইতে তেমনই গুরুত্বপূর্ণ; জাতির বা দেশের ইতিহাসে যাহা সামান্য, ব্যক্তির বা পরিবারের পক্ষে তাহা তেমনই অসামান্য।

যাঁহাদিগকে লইয়া এই গল্প রচিত হইতেছে, তাঁহাদিগের পক্ষে এই দশ বৎসর সামান্য নহে।

এই দশ বৎসরের মধ্যে রেণু দুই জনকে হারাইয়াছে—আর এক জনকেও সে হারাইতে বসিয়াছে। যে পিতৃবন্ধু—প্রকাশচন্দ্র, সুধীরের মৃত্যুর পর, নানা বিষয়ে তাহার অবলম্বন ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। প্রকাশচন্দ্রের জীবনে ও চরিত্রে কতকগুলি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি যৌবনে যে সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে হিন্দুসমাজের সকল আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া হয়ত সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি সে শ্রদ্ধা হারান নাই। প্রথমে তিনি পিতার নির্দ্দেশ বলিয়াই সে সকলের প্রতি শ্রদ্ধার অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং পরে—বিচার-বুদ্ধির উপর সেই শ্রদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের যে উদারতা তাহার বৈশিষ্ট্য তিনি তাহারই বিশেষ অনুশীলন করিয়াছিলেন।

সুধীরের মৃত্যুর পর হইতে তিনি লাভজনক ব্যবহারাজীবের ব্যবসার সঙ্কোচ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "ট্রেণ ছাড়বার আগে দু' বার ঘণ্টা বাজে। প্রথম ঘণ্টা বাজা সুধীর জানিয়ে গেছে। যখন কেবল দ্বিতীয় ঘণ্টার অপেক্ষা, তখন মনে করা ভাল—জীবনে ওকালতী ছাড়া আরও কায আছে।" তিনি তাঁহার সম্পত্তির বিভাগেও কিছু নূতনত্ব দেখাইয়াছিলেন। প্রত্যেক পুত্রকে ও গৃহিণীকে সমান ভাবে সম্পত্তি দিয়া, কন্যাদিগকে পুত্রদিগকে দত্ত অংশের অর্দ্ধাংশ দিয়াছিলেন—গৃহিণীকে তাঁহার অংশ দিয়া—তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি জনহিতকর বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যয়ের জন্য তিনি নির্দ্দেশ দেন। তাঁহার শ্রাদ্ধের ব্যয়ের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তিনি করিয়া গিয়াছিলেন। শরীর যখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বুঝিতে পারিলেন, তখন চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার পরামর্শ দিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"মনকে যে এখনও দৃঢ় করতে পারি নি! এখনও নাতি-নাতিনীরা কাঁদলে অস্থির হয়ে পড়ি—ওদের মধ্যেই শেষ শ্বাস ফেলব।" সকলকে লইয়া যাইবার কথা উঠিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "এত বড় স্বার্থপর হ'তে পারব না। মেয়েদের সকলেরই সংসার আছে—তা'রা সংসারে তা'দের সব কর্ত্তব্য ছেড়ে—কবে আমি মরব তা'রই জন্য গিয়ে বসে থাকবে! তা'র পর বুড়া বয়সে একটি মেয়ে বেড়েছে—সে ত যেতে পারবে না।" তিনি রেণুর কথাই বলিয়াছিলেন। শুনিয়া রেণু যখন বলিয়াছিল, "কেন, জ্যেঠামশায়, আমিও যা'ব।" তখন তাহাতে প্রকাশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "না, মা, তুমি যেতে পার না। মানুষ যে যা'র কর্ম্মে বদ্ধ। তুমি যা'দের মা হয়ে নিজের ছেলেকেও বুকে রাখনি—নিজের মাতৃত্বকে যা'দের প্রতি কর্ত্তব্যের জন্যও দলিত ক'রে নারীত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছ, তা'দের ছেড়ে তুমি যেতে পার না। সে কর্ত্তব্য হ'তে তোমার ত ছুটী পাবার সময় হয় নি। তা'রা যদি তোমার সন্তান হ'ত, তা' হ'লে হয়ত তুমি তা'দের অন্যের কাছে রে'খে যেতে পারতে, মা। কিন্তু তা'রা তোমার নিজের সন্তান নয়—সন্তানের অধিক।"

শুনিয়া রেণু চমকাইয়া উঠিয়াছিল, "তবে কি আমার কর্ত্তব্য শেষ হ'বে না?"

"নিশ্চয়ই হ'বে। কণার বিয়ে দিয়ে তা'কে যখন 'পরঘরী' ক'রে দেবে—তা'র নিজের সংসার নিয়ে সে ব্যস্ত হ'বে—অশোকেরও সংসার ক'রে দেবে—তখন তোমার কর্ত্তব্য শেষ হ'বে। তখন কর্ত্তব্য থাকবে কেবল স্বামীর সম্বন্ধে। তোমার জ্যেঠাইমা'র কর্ত্তব্য আমি গেলে শেষ হ'বে। তোমার শাশুড়ীর শরীর ভাল নাই; বিশেষ হৃদ্‌রোগ কখন কি হয়, বলা যায় না। আমি কোথাও যা'ব না—যে দিন ডাক আসবে, সে দিন তোমাদের মধ্যে থেকেই উত্তর দেব—'যাই।' যখন ছেলে-মেয়েরা মুখে গঙ্গাজল দেবে, তখন তুমিও যেন তা' দিতে ভুল না।"

হইয়াছিলও তাহাই।

রেণুর মনে হইয়াছিল, পিতার মৃত্যুর শোক যেন সে নূতনভাবে পাইয়াছিল।

প্রকাশচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বেই পিসীমা জরাজীর্ণ ও শোকদুর্ব্বল দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রকাশচন্দ্রের ও নীরেন্দ্রের চেষ্টায় তাঁহার দেবমন্দির তাঁহার জীবদ্দশাতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল—তাহার প্রতিষ্ঠাও হইয়া গিয়াছিল। প্রতিষ্ঠার দিন পিসীমা'র ভাব যে দেখিয়াছিল, সে-ই অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিল। তিনি দেবমূর্ত্তির পদতলে লুটাইয়া কান্দিয়াছিলেন—তিনি যেন আর সুধীরের নিকট হইতে দূরে না থাকেন—ঠাকুর তাঁহাকে সেই সৌভাগ্য দান করুন—তাঁহার আর কিছুই চাহিবার নাই। তদবধি তিনি অধিকাংশ সময় ঠাকুরবাড়ীতেই কাটাইতেন—দুই এক দিনের ব্যবধানে কলিকাতায় আসিয়া এক বার রেণুর গৃহে, এক বার মৃণালিনীর গৃহে যাইতেন।

তাহার পর তিনি আর দীর্ঘদিন জীবিতা থাকেন নাই। নীরেন্দ্রই তাঁহার শেষ কায করিয়াছিল।

পূর্ণিমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন—যে কোন দিন রোগের আক্রমণে তিনি প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। শুনিয়া পূর্ণিমা বলিয়াছেন, "তা'র চেয়ে ভাগ্য আর কি হ'তে পারে? যদি নিজে না ভুগে আর কাউকে না ভুগিয়ে যেতে পারি, তবে সে ত পরম লাভ।" তিনি বলিয়াছেন, যদি তিনি রোগ ভোগ করেন, তবে যেন তাঁহাকে পিসীমা'র ঠাকুরবাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

রেণুর ইচ্ছা—পূর্ণিমার মৃত্যুর পূর্ব্বেই স্বামীর কন্যার বিবাহ হয়। প্রকাশচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন—কণার সংসার হইলে তাহার একটি বন্ধন ছিন্ন হইবে। আর কণার জন্য পাত্রনির্ব্বাচনের দায়িত্ব যদি পূর্ণিমা গ্রহণ করেন, তবেই ভাল হয়। নীরেন্দ্রের পরনির্ভরশীলতার বিষয় মনে করিয়া সে ভাবিত—সে হয়ত সে দায়িত্ব রেণুকেই দিবে। তাই সে প্রায়ই পূর্ণিমাকে কণার বিবাহ দিতে বলে। পূর্ণিমাও সে জন্য আবশ্যক উপদেশ দেন। কিন্তু ইচ্ছানুরূপ সম্বন্ধ সহজে পাওয়া যায় না। বিশেষ সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া পূর্ণিমার যেমন রেণুরও তেমনই মত ছিল—তাহার বিবাহ দূরে দেওয়া অভিপ্রেত হইবে না।

অশোক ও দেবদত্ত পড়িতেছে—কিন্তু দুই জন দুই বিদ্যালয়ে; রেণুর অভিপ্রায়ানুসারেই তাহা হইয়াছে। উভয়েই মেধাবী এবং উভয়েই ভবিষ্যৎ উন্নতির লক্ষণ-বিকাশ করিতেছে।

কুমুদা কোথায় থাকিবে, তাহা মৃণালিনীর ও রেণুর বিবেচনার বিষয় হইয়াছিল। পিসীমা'র মৃত্যুর পর তাঁহারা তাহাকে সুধীরের শূন্য গৃহেই আনিয়াছেন। সে তথায় থাকিয়া প্রতিদিন এক বার রেণুর গৃহে, আর এক বার মৃণালিনীর গৃহে যায়—তাহার আহার মৃণালিনীর গৃহেই হয়।

এই দশ বৎসরে কাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই? কিন্তু রেণুর পরিবর্ত্তন যেমন তাহার বয়সের হিসাবে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে—মৃণালিনীর পরিবর্ত্তন তেমনই তাঁহার বয়স বিবেচনা করিলে অত্যন্ত অল্প হইয়াছে।

রেণুর পরিবর্ত্তন তাহার দেহে অকাল প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমা আনিয়াছে। মানুষের দেহ তাহার মনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। রেণু তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়া পর্য্যন্ত তাহার মনের সহিত যে সংগ্রাম করিয়াছে, তাহার তীব্রতা সে ব্যতীত আর কেহই বুঝি সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। যদি কেহ তাহা অনুমান করিয়া থাকেন, তবে দুই জনের পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়াছিল—সুধীর আর মৃণালিনী। সুধীরের পক্ষে সেই অনুভূতি এতই বেদনাদায়ক হইয়াছিল যে, তাহাতেই যে তাহার অকালমৃত্যুর কারণ নিহিত ছিল, তাহা বলা যায়। তাহাকে যৌবনেই আপনাকে প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত করিতে হইয়াছিল। প্রথম সন্তান প্রসবের পরই তাহার পত্নী রুগ্না হইয়া পড়িলে সে যেরূপভাবে তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছে, তাহা যে দেখিয়াছে, সে-ই প্রশংসা না করিয়া পারে নাই। সে যেন বাহিরের সব আকর্ষণ হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াছিল—আনন্দ তাহার অজ্ঞাত ছিল। সে ব্যবহারাজীবের ব্যবসা করিত—সে-ও, বোধ হয়, আপনাকে কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য—সংযমের অনুশীলনে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য। সমগ্র অবসরকাল সে রোগীর কার্য্যে ব্যয় করিত। তাহাই যেন তাহার সাধনা ছিল। সেই সাধনায় সে কিরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহা তাহার পরিচিত সকলেই জানিতেন। যখন তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তখন তাহার মনে হইয়াছিল, বুঝি তাহার আর কোন বন্ধন নাই—জীবনে তাহার সব কায শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পর সে বুঝিয়াছিল—তাহার বন্ধন ছিল, সে বন্ধন তাহার স্ত্রীরই সৃষ্ট—তাহার একমাত্র সন্তান—কন্যা। সেই কন্যাই তাহার জীবনের আকর্ষণ ও স্নেহের কেন্দ্র হইয়াছিল। কন্যার বিবাহে যাহা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার হৃদয়ে নিরাশার অন্ধকার ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সে মনে করিয়াছিল, সুখ যাহার ভাগ্যে নাই, সে কি সুখের সন্ধান করিলে তাহা পাইতে

পারে? সে কন্যার অভিমান আপনার অপরাধ-প্রসূত বলিয়াই বিবেচনা করিত, আপনাকেই কন্যার ম্লান মুখের জন্য দায়ী বিবেচনা করিত। গৃহে যখন তাহার আর কোন আকর্ষণ ছিল না, তখন সে তাহার হৃদয়ের বেদনা ভুলিবার জন্যই—কেহ কেহ যেমন মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে তেমনই—ব্যবহারাজীবের কাযে অত্যন্ত অধিক মনোযোগদান করিয়াছিল। অতিরিক্ত মানসিক শ্রমে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল—তাহার অনিদ্রা-রোগ যত প্রবল হইতেছিল, সে ততই রাত্রিকালেও অধ্যয়ন করিত। অধ্যয়নফলে সে ব্যবহারশাস্ত্রে অনন্য-সাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিল এবং তাহার সেই খ্যাতি যত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহার ব্যবসার বিস্তারও তত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ব্যবসার বিস্তার-লাভের সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমও অধিক করিতে হইত. সেই গুরু শ্রমই তাহার অকালমৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ।

রেণুর বিবাহিত জীবন তাহার মনের সহিত সংগ্রামেই পূর্ণ ছিল। সে মনে করিয়াছিল—যে মাসীমা তাহাকে কন্যার অধিক স্নেহে পালন করিয়াছেন আর যে পিতার সে-ই সর্ব্বস্ব তাঁহারাও তাহার সম্বন্ধে ভুল করিলেন! তাঁহারাই যদি ভুল করিতে পারেন, তবে যে স্বামী ভুল কবিবেন—তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? সে যখন প্রথম যৌবনে আপনার হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাল-বাসার স্ফূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তখন তাহার অদৃষ্ট তাহার প্রতি বিমাতার মত ব্যবহার করিল। যে পিতার নিকট সে বহু বার শুনিয়াছে—স্ত্রীলোক বা পুরুষ কাহারও একাধিক বার বিবাহ ভালবাসার মর্য্যাদাহানিকর, সেই পিতাই বিপত্নীকের সহিত তাহার বিবাহ-প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাহার হৃদয় অভিমানে পূর্ণ হইয়াছিল। বসন্ত যেমন প্রকৃতির সকল দিকে পরিবর্ত্তন প্রস্ফুরিত করে—শীতের স্পর্শে রিক্তপত্র তরুলতায় কুসুম-সুষমা ফুটাইয়া তুলে, বিহগের কণ্ঠে সঙ্গীত ও তাহার দেহে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ফুটায়—তেমনই ভাল-বাসা নারীর হৃদয়ে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করে; বসন্তে যেমন চারিদিকে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়—যৌবনের ভালবাসায় তেমনই মানুষের কাছে চারি দিক্ সুন্দর হয়। সেই ভালবাসা যখন রেণুর হৃদয়ে বিকশিত হইতেছিল, সেই সময় স্বামীর এতটুকু অসাবধানতায়—একটি কথায়, তাহার পক্ষে জীবনে সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; অকালজলোদয় যেমন বিকাশোন্মুখ পদ্মের উপর নবরবিকরপাত নিবারিত করে, তেমনই সেই কথা তাহার বিকশোন্মুখ ভাল-বাসার বিকাশ রুদ্ধ করিয়াছিল। সে তাহার হৃদয়ের সহিত সংগ্রামজনিত বেদনায় ব্যথিত হইয়াছিল। সেই বেদনা লইয়াই তাহাকে ভাবীজননীর কর্ত্তব্য পালন করিতে হইয়াছে—সেই বেদনার দুর্ভাগ্য-পরিচয় গোপন রাখিয়া সংসারের সব কায সম্পন্ন করিতে হইয়াছে; যেন বুকে বৃশ্চিকের দংশন-যন্ত্রণা লইয়া স্বাভাবিক ভাবে কায করিতে হইয়াছে—স্বাভাবিকতার ছদ্মবেশে অস্বাভাবিক অবস্থা গোপন রাখিতে হইয়াছে। তাহাতে কেবল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অনুশীলনই হইয়াছে—কিন্তু সবই দুঃখ। সেই দুঃখের মধ্যে দেবদত্ত প্রসূত হইল—তখন সে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। জীবনের সহিত মৃত্যুর সংগ্রামে জীবন যখন জয়ী হইল, তখন আবার নূতন চিন্তা তাহাকে ব্যাকুল করিতে লাগিল—সে কি করিবে? সেই সময় সে যাহা স্থির করিল, তাহাও যে তাহাকে পীড়িত করে নাই, তাহা নহে। সে তাহার পুত্রকে তাহার মাসীমা'কে দিয়া আসিল। তখনও তাহার মনে অভিমান প্রবলই ছিল। সে নারীজন্মে ধিক্কার দিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিল—সে তাহার নারীত্বের জন্য তাহার মাতৃত্ব বলি দিবে; স্বামীর যে কন্যাপুত্রকে পালন করাই তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সে তাহাদিগকেই পালন করিবে। যে স্বামীর প্রতি তাহার ভালবাসার স্থানে সে অভিমানকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই স্বামীর সহিত তাহার সম্বন্ধ কিরূপ হইয়াছিল, তাহাও সহজে অনুমেয়। তাহার সবই যেন ছদ্মবেশ! এইরূপ অবস্থায় সে যদি একটিমাত্র আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া থাকে, তবে সে স্নেহের আকর্ষণ, সেই আকর্ষণ তাহাকে কণা ও অশোকের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম তাহার দেহে ও ব্যবহারে অসাধারণ পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

দীর্ঘকাল পরে সে যখন পিতার ব্যবহারে আপনার ভুল কেবল উপলব্ধি করিতেছিল—আবার এক বার পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই সময় অদৃষ্ট তাহার হস্ত হইতে, অমৃতপূর্ণ পাত্র, তাহার ওষ্ঠাধরস্পৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই, কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছে; পিতা অপ্রত্যাশিতভাবে লোকান্তরিত হইয়াছেন।

পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে রেণু তাহার প্রতি পিতার সীমাহীন স্নেহের যে পরিচয় পাইয়াছে তাহাতে পিতার প্রতি তাহার অভিমান মন হইতে প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে—সে

মনে করিয়াছে, পিতার সম্বন্ধে সে বিষম ভুল করিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে আর এক কারণে বিষম বেদনা অনুভূত হইতেছিল। সে ভুল বুঝিয়া সেই স্নেহশীল পিতার মনে কত বেদনাই দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইয়াছে, সে-ই কি সুধীরের অকালমৃত্যুর জন্য অন্ততঃ অংশতঃ দায়ী নহে? যদি তাহাই হয়? সে যেন কিছুতেই আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। সে তাহার জীবনের সব কথার আলোচনা করিত—আলোচনা করিত, আর বেদনানুভব করিত। সে জ্ঞানসঞ্চারাবধি মাতাকে রুগ্না দেখিয়াছে—তাহার পর মাতৃবিয়োগ, মাতৃবিয়োগের পর তাহার বিবাহ—তাহার বিবাহিত জীবনে কেবলই মনের সহিত সংগ্রাম; মা হইয়াও সে তাহার পুত্রকে পুত্ররূপে বক্ষে ধরিতে পারে নাই—ধরে নাই; তাহার পর পিতৃবিয়োগ।

এই পিতৃবিয়োগ তাহাকে তাহার আপনার নিকট অপরাধী করিয়াছে। যদি তাহার মাসীমা ও তাহার পিতৃবন্ধু প্রকাশচন্দ্র তাহাকে তাহার সেই অপরাধ-বিশ্বাস-বেদনা অপনোদনে সাহায্য না করিতেন, তবে সেই বিশ্বাস-বেদনা যে সে সহ্য করিতে পারিত না তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সংগ্রাম, এই ঘটনা-বিপর্য্যয়, এই বেদনা রেণুকে পিষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে। সে পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে চিত্তের দৃঢ়তা লাভ করিয়াছিল, তাহাই তাহাকে সব সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছে—সে বিষয়ে সে সুধীরের উপযুক্ত কন্যা।

কিন্তু মনের এই ভাব দেহেও তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এই ঘটনা-পরম্পরা যদি কাকাকেও পীড়িত করিতে না পারিয়া থাকে, সে কেবল মৃণালিনীকে। তাহার কারণ—তিনি আপনাকে সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই তিনি এই সংসারের সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনিত্য মনে করিয়া সংসারের কায কেবল কর্ত্তব্য বিশ্বাসে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। যখনই মন কোন কারনে চঞ্চল হইয়াছে, তখনই তিনি দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন—দেবতা কখন তাঁহার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন নাই। দুঃখ আসিয়াছে—কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর আর যে সব দুঃখ আসিয়াছে, সে সব সেই বিরাট দুঃখের তুলনায় উপেক্ষণীয়—যেন সমুদ্রের তুলনায় সরোবর। সে সব দুঃখ তিনি তাঁহার পরীক্ষা বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। যিনি সুখ ও দুঃখ অবিচলিতভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি যেমন প্রশংসার জন্য ব্যাকুল হয়েন না, তেমনই নিন্দা ও উপেক্ষা করেন। পূর্ণিমা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় রেণুকে বলিয়াছেন—"বৌমা, তোমার মাসীমা'র কাছে গেলে অস্থির মন স্থির হয়—তিনি যেন পুণ্যতীর্থ।" তিনি যে দেবদত্তকে পুত্রের মত পালন করিয়াছেন, তাহাও কর্ত্তব্যবোধে; যদি তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য না হইবে, তবে প্রসবকালে রেণু তাঁহার নিকটে আসিয়া পীড়িতা হইয়া পড়িবে কেন—আর কেনই বা সে তাহার পুত্রকে তাঁহার অঙ্কে দিয়া যাইবে?

কিন্তু যে নৌকা বন্দরে আসিয়া নোঙ্গর করে, সে যেমন তরঙ্গে সামান্য চাঞ্চল্য ভোগ করিলেও কখন স্থানভ্রষ্ট হয় না, মৃণালিনী তেমনই অন্য সকল কাযের মধ্যে কখন আপনার স্থিরসঙ্কল্পভ্রষ্ট হয়েন নাই—দেবসেবায় কোন দিন কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনায় হয়ত রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়াছে; হয়ত কোন কোন দিন দেবতার প্রসাদগ্রহণেরও অবসর হয় নাই; কিন্তু সকল অবস্থাতেই তাঁহার পূজার্চ্চনার নিয়ম তিনি কখন লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি তাঁহার জীবন দেবতার সেবাকার্য্যেই উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন—এবং সেই কার্য্যেই তিনি অনাবিল শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতে পারিতেন :—

"ফলিয়াছে বহু আশা, ফলে নাই
বহু আর ;
বহিয়াছি এ জীবন—আশার ও
নিরাশার ;
লভিয়াছি শোকে শান্তি—লভিয়াছি
দুঃখে সুখ :—
প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র,—প্রেমে
ভরিয়াছে বুক।"

—আজ তিনি দেবতার শেষ আহ্বানের জন্য এই "জীবন-প্রভাসতীরে" ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন—

"সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু—ভাসে কৃষ্ণ-
পদতরি—
এই কূলে সন্ধ্যা—ঊষা অন্য কূলে
মুগ্ধকরী।"

তিনি সুখ দুঃখ উভয়ই দেবতার দান বলিয়া বিবেচনা করিতেন বলিয়াই যেমন কখন সুখে

উল্লসিত হয়েন নাই, তেমনই দুঃখেও বিচলিত হয়েন নাই। শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্র যেমন নীলাচলের চরণে তাহার গর্জ্জনশব্দ স্তম্ভিত করে, তেমনই বুঝি কাল তাহার পরিবর্ত্তন মৃণালিনীর নিকটে আনিলে তাহা স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাই এই দশ বৎসরে তাঁহারই পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়াছে।

রেণু অনেক বার মনে করিয়াছে, সে তাহার সম্মুখে যে আদর্শ পাইয়াছে, সে কেন তাহারই অনুসরণ করে না? সে সে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যে প্রভেদ অনিবার্য্য হয়, তাহা অতিক্রম করা যদি অসম্ভব না হয়, তবে তাহা যে শক্তিতে সম্ভব করা যায় সে শক্তি সে সঞ্চয় করিতে পারে নাই। যে সাধনায় সে শক্তি সঞ্চয় করা যায়, হয়ত সে সেই সাধনা করিবার অবসর পায় নাই। সময় সময় সে মনে করিয়াছে, তাহার অভিমানই তাহার সেই সাধনার অন্তরায় হইয়াছে —কিন্তু সে কিছুই স্থির বুঝিতে পারে নাই। তবে সে বুঝিয়াছে, মাসীমা'র মত সাধনা যে করিতে পারে সে-ই জীবনে প্রকৃত শান্তিলাভ করিতে পারে— হয়ত তাহার সেই শান্তি জীবনের পরপারেও তাহাকে ত্যাগ করে না।

ঘটনাবহুল দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে—কালের রথ কখনও নিশ্চল হয় না—কেহ তাহার চক্রতলে পড়িয়া পিষ্ট হয়, কেহ পার্শ্বে থাকে। যিনি সেই রথের সারথি—যিনি কালের রথচক্র পরিচালিত করেন, মাসীমা তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন।

৩২

কণার বিবাহ দিবার জন্ম পূর্ণিমাও বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন; তাই সে বিষয়ে রেণুর আগ্রহ তাঁহার নিকট সমর্থন পাইল। স্বভাবতঃ পরনির্ভরশীল নীরেন্দ্র তাঁহাদিগের আগ্রহেই আগ্রহানুভব করিলেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যবস্থা সবই পূর্ণিমাকে ও রেণুকে করিতে হইল।

এক দিন বিবাহের একটি প্রস্তাব আলোচনা-প্রসঙ্গে রেণু যখন বলিয়া ফেলিল, "মা, কিন্তু এক বার ভেবে দেখুন, ওর মা থাক্লে তিনি কি এ সম্বন্ধে সম্মতি দিতেন?"—তখন পূর্ণিমা, নীরেন্দ্র ও রেণু তিন জনই সেই কথায় চমকিয়া উঠিলেন। রেণু চমকিয়া উঠিল, যে ভাব সে এত দিন গোপন করিয়া আসিয়াছে এবং গোপন করিতেই আপনার মানসিক শক্তি প্রযুক্ত করিয়াছে, সেই ভাব আজ তাহার সকল সতর্কতা প্রহত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল! নীরেন্দ্র চমকিয়া উঠিল, এ কি রেণু তাহারই এক দিনের একটি অসতর্ক উক্তির প্রতিশোধ লইল? যে দিন সে তাহার গৃহে আসিয়াছে, সেই দিন হইতে সে কণাকে ও অশোককে যেমন তাহাদিগের জননীর অভাব কখন অনুভব করিতে দেয় নাই, তেমনই আর কেহও কখন তাহাদিগের প্রতি তাহার ব্যবহার জননীর ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারে নাই—যে সব ঘটকী সম্বন্ধ লইয়া যাতায়াত করে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই জানে না—সে কণার বিমাতা। আর পূর্ণিমা চমকিয়া উঠিলেন, যখন তিনি আশা করিতেছিলেন, রেণু তাহার অভিমান ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তখন তাঁহাকে বুঝিতে হইল— তাঁহার সে আশা দুরাশা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূর্ণিমাই সর্ব্বাগ্রে কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, "কেন, তুমি কি কণার মা ছাড়া কিছু? যদি কোন সম্বন্ধে আমার আর নীরুর মত থাকে, আর তোমার মত না থাকে, তবে, তোমার অমতই প্রবল হ'বে—সে সম্বন্ধ গ্রহণ করা হ'বে না।"

রেণু এই কথায় লজ্জানুভব করিয়া নির্ব্বাক্ হইল না। সে বলিল, "আমি ওদের মা'র যা' কর্ত্তব্য তা' করব—এই ভেবেই আপনি আমাকে এনেছিলেন। যদি সে কায আমি আপনার মনোমত ভাবে সম্পন্ন করতে পেরে থাকি, তবে সে আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহের জন্য আপনি আমাকে যে অধিকার দিচ্ছেন, আমি যদি তা' আমার প্রাপ্য বলে গ্রহণ করি, তবে কি, সেটা প্রতারণা করাই হ'বে না? মা'র স্থান কেহ নিতে পারে না; আমার যে তা' বুঝ্বার বিশেষ অধিকার আছে, মা।"

পূর্ণিমা মাতৃহীনা রেণুর এই কথায় অনেক অর্থের আরোপ করিলেন এবং তাহা করিয়া ব্যথিতা হইলেন। রেণু কি তবে এমন কথা মনে করিবার কোন কারণ মনে পোষণ করিয়াছে যে, যদি তাহার বিবাহকালে সে মাতৃহীনা না হইত, তবে সে তাঁহার পুত্রবধূ হইত না? রেণু যে সত্য সত্যই কণার ও অশোকের মাতার স্থান গ্রহণ করিয়া কায করিয়াছে, সে কি কেবল তাহার ছদ্মবেশ? তবে কি তিনি যাহা মনে করিয়াছেন, তাহা কেবল আকাশ-কুসুম?

তিনি বলিলেন, "মা, তুমি কণার ও অশোকের প্রতি যে ব্যবহার করেছ, তা' যা'রা দেখেছে, তা'রা তোমার কথায় সায় দিতে পারবে না।"

"মা, এটা আমার সম্বন্ধে আপনার স্নেহেরই ফল। কিন্তু তা'ই ব'লে আমি ত কখন আপনার ত্রুটি উপেক্ষা করতে পারি না। যদি কোন পক্ষ মনে করে, যে মেয়ের মা নাই, তা'রা সে মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিবে না, তবে তা'দের সত্য কথা জানিয়ে দেওয়াই কি সঙ্গত নয়?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "তুমি কেন ও সব কথা মনে করছ? আর মা না হ'লেও যে মা'র অধিক হওয়া যায়, তা' তুমি যেমন দেখিয়েছ, তোমার মাসীমাও তেমনই দেখিয়েছেন।"

রেণু বুঝিল, এই বার তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। সে বলিল, "মা, মাসীমা'র সঙ্গে আমার তুলনা ক'রে আমাকে অপরাধী করবেন না। তিনি কেন যে মানুষ হ'য়ে জন্মেছেন, আমি তা'ই ভেবে পাই না।"

"কিন্তু মাসীমা তাঁ'র এই মেয়েকেই তাঁ'র গুণ দিয়েছেন"—বলিয়া পূর্ণিমা সস্নেহে বধূর পৃষ্ঠে করতল স্থাপিত করিলেন।

মাসীমা'র দেবদত্তের সহিত ব্যবহারে আর তাহার সপত্নী-সন্তানদিগের প্রতি ব্যবহারে যে মূলগত পার্থক্য ছিল, তাহা রেণু আপনি বুঝিলেও তাহা কাহাকেও জানাইতে পারে না। তাহার ব্যবহার কর্ত্তব্যবোধে কৃত—আর অভিমানেই সেই কর্ত্তব্যবোধ দৃঢ় হইয়াছিল। কেবল নারীর স্বভাব-সুলভ অপত্যস্নেহের আকর্ষণ বুঝি সে অতিক্রম করিতে পারে নাই এবং যে মাতৃহীনরা তাহাকেই মা মনে করিয়াছে—মা'র শূন্য আসনে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহাদিগের ব্যবহার বুঝি সে আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ না করিয়া প্রবল করিয়াছে। সে বহু বার যখন আপনার মনোভাবের ও ব্যবহারের বিশ্লেষণ করিয়াছে, তখন তাহার এই আক্ষেপ হইতে সে কখন অব্যাহতি লাভ করে নাই—যদি স্বামীর ব্যবহার তাহার এই স্নেহকে স্বাভাবিক নিয়মে পুষ্ট হইতে দিয়া—অভিমানের কৃত্রিমতায় পুষ্ট হইতে বাধ্য না করিত—তবে তাহা তাহার পক্ষে কত সুখের হইত! সে যখনই তাহা মনে করিয়াছে, তখনই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। আর তখনই তাহার মনে হইয়াছে—সে সপত্নীর সন্তানদিগের মা হইয়াছে, কিন্তু আপনার সন্তানকে পর করিয়া দিয়াছে। তখনই তাহার মাতৃত্ব তাহাকে পীড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার দৌর্ব্বল্য প্রবল হইবার চেষ্টা করিয়াছে।

দেবদত্তের প্রতি তাহার মাসীমা'র ব্যবহার কেবল অনাবিল স্নেহের উৎস হইতে উদ্গত—তাহাতে অভিমানের আবিলতা নাই, তাহার সহিত কর্ত্তব্যজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই। সে যেন যমুনার ও সরস্বতীর স্রোতঃ তাহাতে মিলিত হইবার পূর্ব্বে জাহ্নবীর ধারা। সে স্বয়ংও সেই স্নেহে কখন বঞ্চিত হয় নাই।

রেণু সেই জন্য যখন তাহার শাশুড়ীকে বলিয়াছিল—তাহার মাসীমা'র সহিত তাহার তুলনা করিলে তাহাকে অপরাধী করা হইবে, তখন সে মনের কথাই বলিয়াছিল।

সে দিনের সেই সব কথার পর পূর্ণিমা, নীরেন্দ্র ও রেণু তিন জনেরই মনে নূতন চিন্তার ছায়াপাত হইল। পূর্ণিমাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেদনানুভব করিলেন। সেই দিন তিনি সন্ধ্যার পর রেণুকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমি আজ তোমাকে একটি কথা বলব—একটি অনুরোধ করব; আমার এই কথাটি রেখ—এই অনুরোধটি রক্ষা করবে—বল।"

রেণু যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

পূর্ণিমা তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন, "কি বল, মা?"

রেণু বলিল, "আপনার স্নেহের ঋণ আমি জন্মান্তরেও শোধ করতে পারব না। আপনার কথা, আমি আমার মা'র আদেশ মনে ক'রেই রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

পূর্ণিমা সস্নেহে বধূকে আপনার বুকের কাছে লইয়া বলিলেন, "তা' হ'লেই হ'ল। আমি, মা, তোমাকে বৃথা লক্ষ্য করি নি; তুমি যা' করবে বলবে,—তা' করবে।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "আমি নীরুর, কণার আর অশোকের ভার তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। এ ভার কি বড়ই দুর্ব্বহ হ'বে?"

বলিয়াই যেন তাঁহার মনে হইল, যদি রেণু বলে, সে ভার দুর্ব্বহ! তাই তাহাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই তিনি বলিলেন, "আমার অনুরোধ—আমার প্রার্থনা—এ ভার তোমাকে নিতে হ'বে; তুমি এ ভার এত দিন আমার সঙ্গে নিয়েছ, এখন সব ভার তোমার।"

রেণু কি বলিবে? একটু ভাবিয়া সে বলিল, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি আপনার আদেশ পালন করতে পারি।"

সেই সময় কণাকে কক্ষদ্বারে দেখা গেল। কণা এখন বড় হইয়াছে। সে দেখে মা ও পূর্ণিমা প্রায়ই যে পরামর্শ করেন, তাহা তাহার বিবাহ সম্বন্ধে; কাযেই সে সকল সময় তাঁহাদিগের পরামর্শ স্থানে আইসে না।

তাহাকে দ্বারের কাছে দেখিয়া রেণু ডাকিল "কি, কণা? কি খুঁজছ।"

কণা হাসিতে হাসিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মা খুঁজছি।"

রেণু বলিল, "খুঁজলেই কি পা'বে?"

"এই ত পেয়েছি"—বলিয়া কণা রেণুকে জড়াইয়া ধরিল, আদর করিয়া ডাকিল—"মা গো! মা!"

রেণুর বুকের মধ্যে কেমন চাঞ্চল্য অনুভূত হইতে লাগিল।

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিলেন, "আমরা কিন্তু যা' খুঁজছি, তা' পাচ্ছি না।"

"কি—বল না?"

"তোমার মা'র জামাই।"

কথাটার অর্থবোধ করিয়াই কণা রেণুকে বলিল, "আচ্ছা, মা, তুমি আমাকে বিদায় করবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন?"

রেণু বলিল, "বিদায় কি, কণ? বিয়ে হয়ে গেলেই কি মেয়েকে বিদায় করা হয়?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "হয়ে যা'ক বিয়ে, তা'র পর আর মা'কে মনে থাকলে হয়! আর এ বুড়ী মরবার সময় তোমাকে দেখতে পা'বে কি না, তা' কে বলতে পারে?"

শুনিয়া কণার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসিল—মা'কে মনে থাকিবে না, ঠাকুরমা'র মৃত্যুকালেও হয় ত তাঁহার সহিত সাক্ষাত হইবে না!—সে বলিল, "না, আমি বিয়ে করব না।"

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিলেন, "অত ভয় কেন, দিদি? আমি যেমন আমার নাতি-নাতিনীদের পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি, মা বুঝি তেমনই হ'বেন না?"

কেহ লক্ষ্য করেন নাই, কখন অশোক আসিয়া পশ্চাতের দিকে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, "ঠিক, হ'বে দিদি, ঠিক হ'বে।"

রেণু জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'বে, অশোক?"

"তুমি যেমন আমাদের জব্দ করেছ, দিদির ছেলে হ'লে আমরা তেমনই তোমাকে জব্দ করব।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'বে রে?"

"মা'কে আমরা কত ক'রে বলেছি, 'দেবুকে নিয়ে এস'—মা আমাদের সব কথা শুনেন,ঐটি শুনেন নি; দিদির কাছে তা'কে দিয়ে আমাদের জব্দ করেছেন। দিদির ছেলে হ'লেই দিদি তা'কে তেমনই মা'র কাছে দিয়ে চ'লে যা'বে।"

বলিয়া অশোক আপনি হাসিয়া উঠিল।

পূর্ণিমাও হাসিলেন।

কেবল কণা হাসিল না; আর রেণুর মুখ যেন রক্তশূন্য হইয়া গেল। এ সম্ভাবনা সে কখন মনে করে নাই। কিন্তু ইহাও হয়ত সম্ভব হইতে পারে। যদি তাহাই হয়? সে যে কণার বিবাহ দিয়া তাহার পর অশোককে সংসারী করিয়া অব্যাহতিলাভের আশা করিতেছিল, সে আশা কি তবে পূর্ণ হইবার নহে? প্রথমে পূর্ণিমার অনুরোধ—আদেশ; তাহার পর কণার তাহাতেই তাহার মা'র অন্বেষণ; আর তাহার পর অশোকের এই কথা। তাহার অদৃষ্ট কি তাহাকে জড়িত করিবার জন্য আবার কোন জাল বয়ন করিতেছে? সে আতঙ্কিতা হইল।

অশোক বলিল, "মা, দিদির বিয়েতে লোক খাওয়াবে বলে কি আমাদের খাওয়া বন্ধ করবে?"

রেণু উঠিল, বলিল,—"চল, খাবার দিব।"

পূর্ণিমা বলিলেন, "মা'র সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে; ঠাকুরকে খাবার দিতে বল।"

অশোক বলিল, "তোমাদের পরামর্শ ত আছেই—ও সব হ'বে না। আমি ঠাকুরের কাছে খা'ব না—মা, তুমি চল।"

"মা'কে বুঝি একটুও বিশ্রাম করতে দিতে নেই?"

"না। যে দুষ্ট ছেলের মা হয় তা'র কি বিশ্রামলাভ করা চলে?"

রেণু উঠিয়া বলিল, "চল।"

অশোক তাহার কাছে নহিলে খাইতে চাহিত না।

খাবার দিয়া রেণু যখন কণাকে ডাকিতে আসিল, তখন সে দেখিল, পূর্ণিমা শয়ন করিয়া আছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, শরীর কি ভাল বোধ হচ্ছে না?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "আরও কি ভাল বোধ হ'বে?"

রেণু তাড়াতাড়ি যাইয়া ঔষধ আনিয়া দিল—বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া পূর্ণিমাকে ঔষধ সেবন করাইল। চিকিৎসকের নির্দ্দেশ ছিল—শরীর অসুস্থ বোধ করিলেই অবিলম্বে ঔষধ সেবন

করাইতে হইবে—হৃদ্‌রোগে কখন্ কি হয়, বলা যায় না।

রেণু নীরেন্দ্রকে সংবাদ দিতে ভৃত্যকে পাঠাইয়াছিল। নীরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, "বুকে কি যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে?"

তখন পূর্ণিমার বুকের যন্ত্রণাটা কমিয়া আসিয়াছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "একটু যে যন্ত্রণা ভোগ ক'রে মরব, বৌমা তা'ও করতে দেবেন না। যখন ডাক আসে, তখন কি আর রাখা চলে?"

পূর্ণিমার যন্ত্রণার উপশম হইয়াছে শুনিয়া রেণু কণাকে লইয়া গেল। নীরেন্দ্র মাতার নিকটে বসিয়া রহিল।

সেই দিন একটি সম্বন্ধ আসিয়াছিল। সে সম্বন্ধে নীরেন্দ্র কোন সংবাদ পাইয়াছে কি না, পূর্ণিমা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, নীরেন্দ্র বলিল, "তুমি চুপ করে শুয়ে থাক, মা। আজ রাত্রিতেই বিয়ে হ'বে না। তুমি যদি অত ব্যস্ত হও ত আমি এখন কণার বিয়ে দেব না।"

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিলেন, "তুই বলিস, মেয়ের বিয়ে দিবি না—মেয়ে ভয় দেখায়, সে বিয়ে করবে না; তবে যত দায় বুঝি আমার আর বৌমার?"

তাহার পর—সুস্থ হইয়া পূর্ণিমা বলিলেন, "আজ অশোক বৌমা'কে খুব ভয় দেখিয়েছে।"

তিনি অশোকের কথা পুত্রকে বলিলেন। কিন্তু তাহা শুনিয়া নীরেন্দ্র কি ভাবিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পুত্রকে যে রেণু তাহার মাসীমা'র নিকট দিয়া আসিয়াছে, তাহার মূলে যে তাহার একটি কথা ছিল, তাহা সে-ই জানিত। সেই বিষয় তাহার বক্ষে কণ্টকের মত বিদ্ধ হইয়া ছিল—যখন তখন তাহা তাহাকে পীড়া দিত।

তাহার পর পূর্ণিমা উঠিয়া বসিলেন।

নীরেন্দ্র চলিয়া যাইবার সময় বলিল,—"তুমি আজ আর বেশী নড়াচড়া ক'র না।"

সেই সময় রেণু কক্ষে প্রবেশ করিল। পূর্ণিমা হাসিয়া বলিলেন,—"তোকে আর কিছু বল্‌তে হ'বে না; যাঁ'কে ভয় করি তিনি এসেছেন।"

রেণু বলিল, "কেন, মা, আমি কি পাহারাওয়ালা?"

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিলেন—"ছেলেমেয়েরা যেমন মা'কে পাহারাওয়ালার মত ভয় করে, তেমনই বুড়া হ'লে মা-শাশুড়ীরাও মেয়ে-বৌকে ভয় করে।"

"কিন্তু, মা, আমি ত মনে করি—স্নেহের শাসনই বড় শাসন।"

"তা'তে কি আর সন্দেহ আছে? তোমার সেই শাসনেই ত কণা আর অশোক তোমার অত অনুগত।"

"না, মা—ওদের শাসন করবার অধিকার আমার নাই; আছে স্নেহ করবার অধিকার।"

পূর্ণিমা কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "মা, ঐটুকু কি তুমি মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পারবে না?"

"পারলে হয় ত আমিও শান্তি পেতাম।"—রেণুর স্বর কম্পিত। পূর্ণিমা বুঝিতে পারিলেন, রেণু ত তাহার হৃদয়ের সহিত সংগ্রামই করিতেছে। কিন্তু সে কি কিছুতেই সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে না?

সেই চিন্তা পূর্ণিমাকে বিশেষ চিন্তিত ও ব্যথিত করিল।

সে রাত্রিতে রেণুও ঘুমাইতে পারিল না।

আর নীরেন্দ্র? সে কেবল দেখিতেছিল, তাহার অদৃষ্টাকাশ হইতে মেঘ দূর হইতেছে না।

৩৩

বহু অনুসন্ধানে কণার জন্য যে পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেল, তাহার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ সকলেরই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হইল। এই "সকলের" বলিতে দুই জনকেই বুঝায়—পূর্ণিমা ও রেণু। কারণ, নীরেন্দ্র এ বিষয়ে—অন্যান্য বিষয়েরই মত—সম্পূর্ণভাবে এই দুই জনের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ তাহার এই স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য রেণুর সহিত এক দিন ব্যবহারে তাহার ভুলের পর হইতে যেন আতঙ্কে পরিণত হইয়াছে—পাছে, সে আবার ঐরূপ কোন ভুল করে। তাহা না হইলে সে কখনই দেবদত্তকে রেণুর মাসীমা'কে দিতে দিত না। কারণ, সে স্বভাবতঃ স্নেহশীল এবং তাহার এই পুত্রের প্রতি তাহার স্নেহ প্রকাশপথ না পাইয়া তাহাকেই সর্ব্বদা পীড়িত করিত।

কালিদাসের ব্যাখ্যাকার বিবাহে বর-সম্বন্ধে কে কি আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা লিখিয়াছেন :—

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥"

অর্থাৎ কন্যার ইচ্ছা বর রূপবান হউন, মাতা ধনবান্ জামাতা চাহেন, পিতা বরের বিদ্যাবত্তা ইচ্ছা করেন, বান্ধবগণের কামনা—বর সৎকুলজ হউক, আর অন্য লোক মিষ্টান্নের আশাই করে। বর্ত্তমানকালে এই উক্তির কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন

হইয়াছে। এখন বান্ধবদিগের কথায় কেহ বড় গুরুত্বারোপ করে না; কেন না, সমাজের পূর্ব্ববন্ধন শিথিল হইয়াছে; "অপর সকলের" কথা বিবেচ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। সুতরাং অবশিষ্ট—মাতা, পিতা ও কন্যা স্বয়ং। এই ক্ষেত্রে কন্যা স্বয়ং কোনরূপ মত প্রকাশ না করিলেও যে পাত্রের সন্ধান মিলিল, তাহার রূপের অভাব নাই, সে বিত্তবান্ এবং বিদ্বান্। রেণু কন্যার মাতা না হইলেও মা'র অধিক এবং তাহার মতই সকলের মত অপেক্ষা অধিক আদৃত। তাহার কারণ পূর্ণিমা মুখে বলিতেন—"দেখ, মা, আমি সেকালের লোক; এখন সব ধরণ বদ্‌লে গেছে; তুমি যা' ভাল বুঝবে, তা'ই কর।"—মনে মনে তিনি জানিতেন—রেণু সর্ব্বতোভাবে কণার কল্যাণকামনাই করে এবং তাঁহার দিন যখন ফুরাইয়া আসিয়াছে, তখন যাহা করিবার রেণুকেই করিতে হইবে।

বাস্তবিক রেণু মুখে যাহাই বলুক, সে তাহার অন্তর পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছে, তাহার স্নেহে সে কণাকে বঞ্চিত করিতে পারে নাই, পারিবার সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ, কণাকে স্নেহে বঞ্চিত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে—চুম্বক যেমন স্বভাবজ গুণে লৌহকে আকৃষ্ট করে, কণা তেমনই সকলের স্নেহ আকৃষ্ট করে। তাহার পর কণা তাহাকে পাইয়া আপনাকে আর মাতৃহীনা বলিয়া মনে করিতেই চাহে নাই। কণা যে ভাবে স্নেহে লালিতা-পালিতা, তাহাতে সে যে বিদ্বান্ পাত্রে—ধনীর ঘরে বিবাহিতা হইলেও কখন "বৌ-গাদার" বধূ হইলে স্বস্তি পাইবে না, তাহা রেণু বুঝিত এবং বুঝিত বলিয়াই অন্য দিকে আদরণীয় বহু সম্বন্ধ-প্রস্তাব সে-ই বর্জ্জন করিয়াছিল। এক জন ঘটকী বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিয়াছিল, "মা গো মা; তোমরা যে দেখছি, কম্বলের লোম বাছা ক'রে সম্বন্ধ বাছছ; তোমাদের মনের মত সম্বন্ধ আনা আমার সাধ্য নয়।" এমন কি, পূর্ণিমারও এক এক বার মনে হইয়াছে—কন্যার অদৃষ্ট সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইলেও হয়ত চলে না। কিন্তু তিনি রেণুর মতেই মত দিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ, সব দায়িত্ব রেণুকেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাকে সেই দায়িত্বগ্রহণ গ্রহণ করাইতে পারিলে তাঁহার আর কোন চিন্তা বা ক্ষোভ থাকিবে না। তাই ঘটকীদিগকে তিনি বলিতেন, "বাছা, আমরা বুড়া মানুষ—মেয়ের মা'কে সব বল।" মেয়ের মা! যে সব ঘটকী জানিত—রেণু মেয়ের বিমাতা, তাহারা হয়ত একটু হাসিত কিন্তু রেণুর দৃষ্টির সম্মুখে সে হাসি আর ফুটিতে পাইত না।

এই সম্বন্ধটি যখন রেণুর মনোমত হইল, তখন পূর্ণিমা বলিলেন, "দেখ মা, আমাদের পরামর্শ করবার লোকও অধিক নাই; আছেন—কেবল বেহান। তাঁ'র বুদ্ধিও এত বিমল যে, তাঁ'র পরামর্শ আমি সকলের পরামর্শের উপর মনে করি। এক বার তাঁ'র মত জান্‌তে হ'বে; তুমি এক বার তোমার মাসীমা'র সঙ্গে পরামর্শ কর।" এই বিষয়ে রেণু পূর্ণিমার সহিত একমত। সে বলিল, "মাসীমা'কে তবে একবার আস্‌তে বলি?

পূর্ণিমা বলিলেন, "সে কি হয়? তুমি তাঁ'র কাছে যাও।"

"আপনি যা'বেন না?"

"তাঁ'র কাছে যেতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করে—তাঁ'র কথা শুন্‌লে মন জুড়ায়, তাঁ'কে দেখলে পুণ্য হয়। কিন্তু আমি যে সদাই ভয়ে ভয়ে থাকি, যদি সেখানে গিয়ে অসুখ বোধ হয়, তবে তাঁ'কে বিব্রত করা হ'বে।"

"আপনি অত ভয় পাবেন না।"

"তুমি ভরসা দিলেই আর ভয় করি না—ভার ত তোমার, দায়ও তোমার। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিই—তোমাকে না পেলে আমার কি দুর্দ্দশা হ'ত।" তাঁহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

রেণু বলিল, "কি যে আপনি বলেন!"

"না, মা; আমি মনের কথাই বলি।"

"আমি যদি ছেলেমানুষ হতাম, তবে আপনি আমাকে আদর দিয়ে মাটী করতেন।"

"মা, তোমার মত বৌ না পেলে কণা আর অশোককে নিয়ে আমি কি করতাম?"

রেণু একটা কাযের ছল করিয়া উঠিয়া গেল। তাহার যাইবার উদ্দেশ্য—আপনার উদ্বেল মনোভাব সংযত করা—তাহার বিকাশ গোপন করা। সে নানা কথা ভাবিতেছিল—বাস্তবিক পূর্ণিমার স্নেহ অপরিসীম; আর কণা ও অশোক সত্য সত্যই তাহাকে মা মনে করে কিন্তু অদৃষ্টের কি কঠোর বিধান—সে কিছুতেই সুখী হইতে পারিল না!

সেই দিন অপরাহ্নে পূর্ণিমা রেণুকে লইয়া মৃণালিনীর গৃহে উপনীতা হইলেন। মৃণালিনী তখন ঠাকুর-ঘর হইতে আসিয়া কি পড়িতেছিলেন। রেণু জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি পড়ছেন, মাসীমা?"

মৃণালিনী বলিলেন, "ও কিছু নয়।"

"কিছু নয় কি ?" বলিয়া রেণু পুস্তকখানা তুলিয়া লইয়া দেখিল এবং বিস্মিতভাবে মাসীমা'র দিকে চাহিল। এ কি! মাসীমা একখানি ইংরেজী বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। পার্শ্বে একখানি অভিধান ছিল।

রেণু বলিল, "মাসীমা কি এখন গীতা ছেড়ে—এই পড়ছেন ?"

"না, মা, গীতা ত ছাড়তে পারি না—সে পরকালের সম্বল—তা' না হ'লে চলে না। কিন্তু যে ইহকাল মুছে আস্‌ছিল, তুই যে আবার তা'কে ফুটিয়ে তুল্‌লি।"

"আমি কি করলাম, মাসীমা ?"

"তুই যে দেবদত্তের ভার আমার উপর দিয়ে গেলি।"

"তাই তুমি এই কায করছ ?"

"দেখ, তোর মেস মশায় বল্‌তেন, যা' কর্‌বার মনে হয়, তা' ভাল ক'রে করতে হয়। যখন কর্ত্তব্য মনে ক'রে কায নিয়েছি, তখন সে কর্ত্তব্য পালন করতে হ'বে।"

পূর্ণিমা শ্রদ্ধায় যেন নির্ব্বাক্ হইয়া ছিলেন, এই বার বলিলেন, "আপনি কি দেবুকে পড়ান ?"

"না, বেহান—সে বিদ্যা কি আমার আছে ? কিন্তু ও যা' পড়ছে, তা'র উপর লক্ষ্য রাখবার চেষ্টা করি। ইংরেজী তাঁ'কেও পড়তে শুনেছি—দিন কয়েক দেবুর মাষ্টারের উচ্চারণ শুনে মনে কেমন সন্দেহ হ'তে লাগল। তাই চেষ্টা ক'রে দেখছি, যদি ওর কোন কাযে লাগি।"

পূর্ণিমা বলিলেন, "পা'র ধুলা দিন, বেহান। আপনি ধন্য।"

তিনি হাত বাড়াইলে মৃণালিনী ব্যস্তভাবে হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "করেন কি ?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "সত্য কথা বলতে কি, আমার সময় সময় বৌমা'র উপর অভিমান হয়েছে—ছেলেকে কেন নিজের কাছে থাকতে দিলেন না! আজ আমার সে অভিমান দূর হয়ে গেল। নীরেনের বহু পুরুষের ভাগ্য যে, তা'র ছেলে আপনার কাছে মানুষ হচ্ছে।"

মৃণালিনী বলিলেন, "ও কথা বল্‌বেন না, বেহান।"

রেণু ভাবিল, সে অভিমানভরে যে কায করিয়াছিল, তাহাতে সে মা'র কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছে। তাহার মনে হইল, তাহার মনের ভার একটু লঘু হইল।

তাহার পর তিন জন কণার বিবাহের প্রস্তাবের আলোচনা করিলেন। সব শুনিয়া মৃণালিনী বলিলেন "ভালইত মনে হচ্ছে—কেবল কথা, আমরা যেমন বেহান পেয়েছি, রেণু তেমনই বেহান পা'বে ত ?"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু সে সংশয় মিটাই কেমন ক'রে ?"

"কিন্তু মিটাবার চেষ্টা করতে হ'বে। শাশুড়ী যদি দজ্জাল হয়, আর স্বামী শক্ত না হয়, তবেই বিপদ।"

সে সংশয় মিটাইবার ভার মৃণালিনীকে দিয়া পূর্ণিমা রেণুকে লইয়া বিদায় লইলেন। ততক্ষণে দেবদত্ত স্কুল হইতে ফিরিয়াছে। পূর্ণিমা তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন।

গৃহে ফিরিবার সময় পূর্ণিমা রেণুকে বলিলেন, "তোমাকে অনেকগুলি অনুরোধ ক'রে, অনেক ভার দিয়ে যাচ্ছি—আর একটি অনুরোধ করব—যদি সময় পাও তবে মার্‌বার সময় কণা আর অশোকের সঙ্গে যেন দেবুকেও দেখতে দিও।"

মৃণালিনী যে কাযের ভার লইতেন, তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। তিনি যে পাত্রের সকল সংবাদ লইবার ভার পূর্ণিমার নিকট লইয়াছিলেন, সে কাযেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। তিনি পাত্রপক্ষের পরিচয় লইয়া তাহাদিগের আত্মীয়-কুটুম্বের সন্ধান করিলেন এবং যশ ও অপযশ দাস-দাসীর মুখে ব্যক্ত হয় বুঝিয়া সেই দিক্ হইতে সংবাদসংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন। পাত্রের মাতার পিত্রালয় হইতে যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাহাই নির্ভরযোগ্য ও সন্তোষজনক মনে করিয়া তিনি পূর্ণিমাকে বিবাহের প্রস্তাবে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিলেন।

তখন কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইল।

ক্রমে কার্য্যের অধিকাংশ ভারই মৃণালিনীর উপর পড়িল এবং তিনি সে বিষয়ে পূর্ণিমাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে লাগিলেন।

বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহে মৃণালিনীকে কার্য্যভার প্রদান—পূর্ণিমার নিকট বিশেষ স্বস্তির বিষয় হইয়াছিল। তিনি যেমন সকল কাযে রেণুকে সঙ্গে লইতেছিলেন, রেণুও তেমনই মাসীমা'র সঙ্গে কায করিতেছিল। শারীরিক অবস্থার সুযোগ লইয়া পূর্ণিমা যতটুকু পারিলেন সরিয়া থাকিলেন।

বিবাহের পর প্রথম বার শ্বশুরালয় হইতে ফিরিয়া জামাতা সুনীল কণাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"আমি শুনেছি, মা তোমার বিমাতা। তাই কি?"

কথাটা সত্য—কিন্তু সত্য হইলেও তাহা কণার প্রীতিপ্রদ হইল না; সে বলিল, "আমিও তা'ই শুনেছি, কিন্তু কোন দিন তা' বুঝতে পারি নি।"

সুনীল বলিল, "মা'র ব্যবহারে স্বভাবতঃই তাঁ'র প্রতি ভক্তি হয়; তোমার কথায় আমার সে ভক্তি আরও বেড়ে গেল।"

কণা বলিল, "কিন্তু মা'কে যে ভক্তি করতে হয়, তা' মা কোন দিন আমাকে শিক্ষা দেন নি।"

সুনীল হাসিয়া বলিল, "সে কি শিক্ষা দিতে হয়?"

"কেন?"

"তোমাকে যে ভালবাসতে হয়, তা' কি তুমি আমাকে শিখিয়ে দিবে?"

কণার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। সে লজ্জার সঙ্গে কি আনন্দ ও পরিতৃপ্তিও ছিল না?

কণা বলিল, "শিক্ষা যে কেবল কথা ব'লে দিতে হয়, তা' নয়—ব্যবহারেও তা' দেওয়া যায়। মা'কে আমি কোন দিন ভক্তি করিনি—কেবলই ভালবেসেছি।"

সুনীল শুনিতে লাগিল—"আমি যখন কোন মা'কে তাঁ'র ছেলেমেয়েকে তিরস্কার করতেও দেখি, তখন আমি বিস্মিত হই—মা কি ছেলেকে বকতে পারেন? কই—আমাদের মা ত কোন দিন এতটুকু বিরক্তি প্রকাশও করেন নি!"

সুনীল হাসিয়া বলিল, "সে উভয় পক্ষেরই প্রশংসার কথা।"

"কেন?"

"ছেলেমেয়ে দুরন্ত হ'লে মা বিরক্ত না হ'য়ে পারেন না। কিন্তু তা'তে স্নেহের অভাব বুঝায় না।"

"দুরন্ত! তুমি অশোককে যদি ছেলেবেলায় দেখতে, তা' হ'লে আর ও কথা বলতে না। ও যখন কোন আবদার ধরত, তখন ঠাকমা আর বাবা প্রমাদ মনে করতেন; কিন্তু মা'র কাছে গেলেই যেন আগুনে জল পড়ত।"

তাহার পর সুনীল জিজ্ঞাসা করিল, "আর যাঁ'কে তোমরা দিদিমা বল?"

"উনি দিদিমা। যে মা'র কথা শুনেছি, তাঁ'র মা নাই; যে মা'র কাছে মানুষ হয়েছি, তাঁ'র মা-ও তিনি আমাদের মা হ'বার আগেই দেহরক্ষা করেছিলেন; আমরা ঐ এক দিদিমাকেই জানি। উনি মা'র মাসীমা।"

"ঠাকমা ওঁর কথা মা'কে বলেছেন; শুনে আশ্চর্য্য মনে হয়।"

"তা'ই বটে।"

কণার বিবাহ উপযুক্ত পাত্রে হওয়ায় রেণুর আনন্দ লক্ষ্য করিয়া পূর্ণিমা ও মৃণালিনী উভয়েই বিশেষ আনন্দানুভব করিলেন বটে, কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত কারণ অনুমান করিতে পারিলেন না। সে তাহার জীবনকে বিবাহাবধি যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, তাহাতে সে অনেক সময়েই তাহার পিতৃবন্ধু প্রকাশচন্দ্রের তাহার সম্বন্ধে উক্তি স্মরণ করিত। সে যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তাহার কর্ত্তব্য কি শেষ হইবে না? তখন তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন—কণা আর অশোক যদি তাহার সন্তান হইত, তাহা হইলে সে হয়ত তাহাদিগকে কাহারও কাছে রাখিতে পারিত, কিন্তু তাহারা তাহার সন্তানের অধিক, তাই "কণার বিয়ে দিয়ে তা'কে যখন 'পরঘরী' ক'রে দিবে—তা'র নিজের সংসার নিয়ে সে ব্যস্ত হ'বে—অশোকেরও সংসার ক'রে দিবে—তখন তোমার কর্ত্তব্য শেষ হ'বে। তখন কর্ত্তব্য থাকিবে কেবল স্বামীর সম্বন্ধে।"

তাহার তিনটি বন্ধনের একটি হইতে সে মুক্তিলাভ করিল; উপযুক্ত পাত্রে কণার বিবাহ হইয়াছে; সে শীঘ্রই তাহার সংসার লইয়া ব্যস্ত হইবে। তাহার পর—কিন্তু তাহারও যে অনেক বিলম্ব! অশোককে সংসারী করিতে হইবে। তাহার পর? রেণু স্থির করিয়াছিল—বধূকে সে তাহার শ্বশুরের ভার দিবে; তখন তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইবে।

সে যখন এই কথা মনে করিত, তখনও কিন্তু সে শান্তি পাইত না; কারণ, দেবদত্তের কথা যে তাহার মনে উদিত হইত না, তাহা নহে। সে তাহার ভার মৃণালিনীকে দিয়াছে—তাহার সে ভার-দান কত সার্থক হইয়াছে, তাহা সে বিশেষ ভাবেই বুঝিয়াছে; কিন্তু সে যেমন মন হইতে পুত্রকে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই; তেমনই মৃণালিনীও তাহাকে বলিয়াছেন, "তুমি যে ভার দিয়েছ, তা' আমি দেবতার দান ব'লেই নিয়েছি বটে, কিন্তু এ কথা যেন কখন ভুল না—মা'র কর্ত্তব্য হ'তে তুমি মুক্তি পা'বে না; আমার পরও তোমাকে সে কর্ত্তব্য করতে হ'বে। সেজন্য প্রস্তুত থেক।"

তিনি যখন সে কথা বলিয়াছিলেন তখন সে তাহার গুরুত্ব অনুভব করে নাই। কিন্তু তাহার পর বৎসরের পর বৎসর গিয়াছে, এই সময়ের মধ্যে সে দেখিয়াছে—মৃত্যুর মত কঠোর সত্য আর নাই। তাহার আগমন কখন অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত, কখন মন্থর ও বিলম্বিত; কিন্তু সে আগমন অনিবার্য্য। এই সময়ের মধ্যে সে তাহার অতর্কিত আগমন দেখিয়াছে—তাহার পিতার সম্বন্ধে; আর এই সময়ের মধ্যে পিসীমা গিয়াছেন, প্রকাশচন্দ্র গিয়াছেন। আজ পূর্ণিমা যে স্থানে রহিয়াছেন, তাহা পদ্মার কূলের মত, যে কোন মুহূর্ত্তে নদীগর্ভে পতিত হইতে পারে। মাসীমা'রও বয়স হইতেছে। তিনি প্রস্তুত; কিন্তু সে কি তাঁহার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে? যদি সে মৃত্যু এখনই হয়, তবে সে দেবদত্তকে কাহার নিকট রাখিতে পারিবে? তাহা হইলে—সমুদ্রের বেলাবালুতে বালকের গঠিত খেলাঘর যেমন এক তরঙ্গে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তাহার এত দিনের সব ব্যবস্থা কি তেমনই হইয়া যাইবে না? যদি তাহা বিলম্বিত হয়, তবেই তাহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। সে কথা সে যখন ভাবিত, তখন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিত না। তাহার অদৃষ্ট-দেবতা কি তাহার সঙ্কল্পে অলক্ষ্যে হাসিতেছিলেন?

এদিকে সত্য সত্যই কণার বিবাহ দিয়া সে যেন এক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় আর এক বন্ধনে বদ্ধ হইল; কণা তাহার কন্যাই রহিল এবং তাহার আকর্ষণে সুনীলও তাহার পুত্রের মত হইল।

পূর্ণিমা তাহা লক্ষ্য করিতেন। এক দিন তিনি মৃণালিনীর সহিত সেই কথার আলোচনা করিয়া বলিলেন, "বেহান, কেবল ভাবি, আর কেন? এই পরিপূর্ণ সুখের মধ্যে মরতেই চাই, কিন্তু সে সৌভাগ্য কি হ'বে।"

মৃণালিনী বলিলেন, "যদিও বঙ্কিম বাবু লিখেছেন সময়ে কেহ মরে না; তবুও আপনার মরণ অসময়ে হ'বে না।"

৩৪

রেণু পূর্ণিমার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিত; ডাক্তাররা বলিয়াছিলেন, যে কোন মুহূর্ত্তে এক বার রোগের আক্রমণে প্রাণান্ত হইতে পারে। কণা যে দিন স্বামীর গৃহে গেল, সে দিন—কয় দিনের উত্তেজনায় ও তাহার গমনে অবসাদের ফলে, তিনি বক্ষে যাতনা অনুভব করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে রেণু তাঁহার প্রতি আরও অধিক মনোযোগ দিতে থাকে। সেই দিন সে ব্যবস্থা করিল, অশোক নীরেন্দ্রের নিকট রাত্রিতে শয়ন করিবে—সে পূর্ণিমার কাছে থাকিবে। পূর্ণিমা বলিলেন, "মা, এক মেয়ে তা'র ঘরে গেল ব'লে কি আর এক মেয়েকে কোলে টেনে নিচ্ছ?"

রেণু উত্তর দিল, "তা' নিব না?"

"কিন্তু আর ক'দিন? অনেক ভাগ্যে তোমার মত বৌ—মা পেয়েছি; কিন্তু তোমাকে দিয়ে সেবা করিয়েই গেলাম।"

"যে স্নেহ দিয়েছেন, তা' যে অসাধারণ, মা।"

কয় মাস কাটিল; মধ্যে মধ্যে বক্ষে বেদনা অনুভূত হইত—সঙ্গে সঙ্গে মুখ বিবর্ণ ও নাড়ীর গতি অনিয়মিত হইত। তখনই ঔষধ দিয়া, শুশ্রূষা করিয়া কোনরূপে সে আঘাত সহ্য করা সম্ভব হইত। কিন্তু রেণু লক্ষ্য করিয়াছিল—যত দিন যাইতে লাগিল, ততই আক্রমণের ব্যবধান হ্রাস পাইতে লাগিল। আর প্রতি আক্রমণের পর দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি যে কণাকে ও সুনীলকে, আর দেবদত্তকে শেষ সময় দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে কথা রেণু কণাকে ও সুনীলকে যেমন মৃণালিনীকেও তেমনই জানাইয়া রাখিয়াছিল।

এই ভাবে কয় মাস কাটিবার পর এক দিন অপরাহ্নে সহসা আক্রমণ আসিল। আক্রমণের বেগ দেখিয়া রেণু ভীত হইল। ব্যবস্থানুসারে তখনই কণাকে ও মৃণালিনীকে টেলিফোন করা হইল। সুনীল তখন গৃহে ছিল না; কিন্তু কণা সংবাদ পাইয়াই ব্যস্ত হইয়া আসিল। এদিকে মৃণালিনীও দেবদত্তকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ডাক্তার "ইনজেকশন" দিয়া রোগীর অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন—যেন ঔষধের কোন ক্রিয়া হয় নাই।

পূর্ণিমা এক বার মুদ্রিত নেত্র উন্মীলিত করিলেন রেণু বলিল, "মা, তোমার কণা এসেছে—মাসীমা দেবদত্তকে নিয়ে এসেছেন।"

পূর্ণিমা শুনিতে এবং শুনিলেও বুঝিতে পারিলেন কি না, বুঝা গেল না। তবে তাঁহার মুখে যাতনার যে চিহ্নটুকু ছিল, তাহা যেন প্রক্ষালিত হইয়া গেল—সে মুখে তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল—মনে হইল,রাত্রির অন্ধকারোপগমে ফুল ফুটিয়া উঠিল।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া উঠিয়া পড়িলেন—বলিলেন, "সব শেষ।"

কণা কাঁদিয়া উঠিল। আর নীরেন্দ্র মাতৃহারা বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

অশোক যেন প্রকৃত ব্যাপার উপলব্ধি করিতে পারিল না। জ্ঞান হইবার পর মৃত্যুর সহিত তাহার এই প্রথম পরিচয়।

রেণু স্থির—কিন্তু যেন কতকটা স্তম্ভিত।

মৃণালিনীই কণাকে সান্ত্বনা দিলেন—পূর্ণিমার শেষ ইচ্ছা ছিল, তাহাকে সুপাত্রে অর্পিতা দেখিয়া যাইবেন। তিনি পুণ্যবতী, তাঁহার সে ইচ্ছাও পূর্ণ হইয়াছে। মানুষকে যাইতেই হইবে। তিনি যে পরিপূর্ণ সুখের মধ্যে গিয়াছেন, ইহাই ভাগ্য বলিয়া মনে করা সঙ্গত।

তিনি নীরেন্দ্রকে বলিলেন, তাহাকেই স্থির হইয়া সকলকে শান্ত করিতে হইবে; মা'র শেষ কায করিতে হইবে। তাহার অধীর হইলে চলিবে না।

হিন্দুর শাস্ত্র মৃতের সম্বন্ধে যে কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহাই এইরূপ শোকে মানুষকে স্থির হইবার উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

নীরেন্দ্র তাহার কর্ত্তব্য বুঝিল, বুঝিয়া তাহা পালন করিবার আয়োজন করিল।

ততক্ষণে সুনীল ও তাহার পিতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুনীলের পিতা যাহাকে "পাকা লোক" বলে তাহাই। তিনি অগ্রণী হইয়া সব ব্যবস্থা করিলেন।

তাহার পর শ্রাদ্ধের আয়োজন।

পূর্ণিমার মৃত্যুর পর রেণু বিশেষভাবে অনুভব করিল—তিনি সংসারে কি ছিলেন এবং সে তাঁহার জন্য কত অভাব অনুভব করিতে পারে নাই, কত দায়িত্ব বুঝিতে পারে নাই। তিনি যত দিন জীবিতা ছিলেন, তত দিন সব কাযের দায়িত্ব তিনি রেণুকে দিলেও তাহা তাঁহার ছিল। এখন তিনি নাই—সংসারে সব দায়িত্ব তাহার। এই সংসার সে কিছুতেই তাহার বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে নাই এবং সেই জন্যই সে দায়িত্ব স্বাভাবিক নিয়মে তাহার উপর ন্যস্ত হইলেও সে তাহাতে আগ্রহানুভব না করিয়া বরং তাহা ভার বলিয়াই মনে করিতে লাগিল। কণার শ্বশুর ও শাশুড়ী আসিয়া শ্রাদ্ধের বিষয়ে তাহার সহিতই পরামর্শ করেন, অথচ সে কোন বিষয়ে আপনার মত প্রকাশ করিতে শঙ্কানুভব করে। কোন্ বিষয়ে প্রয়োজন হইলে সে কেবল মাসীমা'র সহিত পরামর্শ করে। কণার শাশুড়ী এক দিন বলিলেন, "বেহান, আপনার বেহাই বলছিলেন, বেহান কি এখনও আপনাকে ক'নে বৌটি মনে করেন? শাশুড়ী ছিলেন—পর্ব্বতের আড়ালে ছিলেন; এখন শক্ত হ'য়ে সব কায করতে হ'বে; পরের গণ্ডা যেমন পরকে বুঝিয়ে দিতে হ'বে; আপনার যা' পাওনা, তা' তেমনই কড়া হ'য়ে কড়ায় কড়ায় বুঝে নিতে হ'বে; চতুর না হ'লেই ফতুর হ'বেন।"

কথার যাথার্থ্য রেণু অনুভব করিল বটে, কিন্তু তাহার অবস্থা কে বুঝিবে?

কণা তাহাকে কেবলই বলিত, "মা, তুমি যদি এখনও সব কাযেই সঙ্কোচ বোধ কর, তবে আমি এসে দাঁড়াব কা'র কাছে?"

রেণু তাহাকে বলিয়াছিল, "কেন, কণা, উনি আছেন—যাঁ'র বাড়া নাই, তিনি রয়েছেন—তুমি ও কথা বলছ কেন?"

উত্তরে কণা বলিয়াছিল, "কিন্তু তুমি মা—তুমি কি নাই? বাবা স্নেহ করেন—কিন্তু মা'র যত্ন বাবা দিতে পারেন না। তুমি যা-ই কেন মনে কর না, আমি জানি—আমি তোমার মেয়ে, একমাত্র মেয়ে, আর তুমিই আমার মা। আমার আদর তোমাকেই করতে হ'বে—আমার সব আবদার অত্যাচার তুমি যেমন সহ্য করেছ, তেমনই তোমাকেই সহ্য করতে হ'বে।"

বলিতে বলিতে কণা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। রেণু তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিয়াছিল, "মা লক্ষ্মী, তুমি কি কোন দিন অত্যাচার করেছ?"

কণা তাহার কোন উত্তর দেয় নাই; মা'র বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়াছে।

সে ক্রন্দনের বেদনা যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত রেণুর হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তথায় বেদনার উদ্ভব করিয়াছিল। বাস্তবিক কণা ও অশোক তাহাকে কিছুতেই মনে করিতে দেয় নাই যে, সে তাহাদিগের মাতা নহে।

কণা বলিয়াছে, "মা, তুমি আমাকে দূর ক'রে দিতে চাইলেও আমি দূর হ'ব না; তুমি যদি বিরক্ত হও, তবুও সে বিরক্তি আমি মা'র আশীর্ব্বাদ মনে ক'রব।"

যে এমন মনে করে, তাহাকে কি দূরে রাখা যায়? প্রকাশচন্দ্র যে বলিয়াছিলেন, কণার বিবাহ দিলে তাহার একটি বন্ধন দূর হইবে—তাহাও কি হইবে না? তবে সে জানিত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন হইবে—কণা তাহার সংসারে সংসারী হইয়া পড়িবে।

তাহার লক্ষণ পুর্ণিমার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইবার দুই মাসের কিঞ্চিৎ অধিক কাল পরে আত্মপ্রকাশ করিল। কণার শাশুড়ী লক্ষ্য করিলেন, কণার শরীর ভাল নাই—বিবমিষা দেখা দিয়াছে। তিনি কণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল বৌমা—এখানে থাক্‌বে, না বাপের বাড়ীতে যা'বে?"

কণা উত্তর দিল "যদি পাঠান, মা'র কাছে যা'ব।"

শাশুড়ী বধুকে লইয়া আসিয়া হাসিয়া রেণুকে বলিলেন, "এই নিন্, বেহান্, আপনার আদরের মেয়ে, আপনি যা' হয় করবেন।"

রেণুর নূতন কায হইল। সে কাযের গুরুত্ব যেমন অধিক, তাহার দায়িত্ব তেমনই। তাহাকে যে কাযের ভার গ্রহণ করিতে হইল, তাহার সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা যৎসামান্য। সে কেবল মনকে সাহস দিত—চেষ্টায় যদি আন্তরিকতা থাকে, তবে তাহা ব্যর্থ হয় না; আন্তরিকতা ছিল বলিয়াই মাসীমা তাহার সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং কি ভাবে কায করিয়াছিলেন, তাহা আর তাহার অজ্ঞাত নাই।

সে এই কার্য্যে সর্ব্বদা মাসীমা'র পরামর্শ গ্রহণ করিত এবং সে ভয় পাইলে তিনিই তাহাকে সাহস দিতেন—মানুষের ক্ষমতা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; সুতরাং তাহাকে কেবল আপনার ক্ষমতায় নির্ভর না করিয়া আন্তরিক ভাবে কায করিতে হয়—সে কাযের ফল যাহা তাহা তাহার ক্ষমতার অতীত। তিনি প্রতিদিন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেন—বহু দিন পাঠের ফলে তাহা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল এবং বহু দিনের সাধনায় তিনি সেই উপদেশানুসারেই আপনার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন। তিনি বহু বার রেণুকে উহা হইতে আপনার কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশে রেণু গীতা-পাঠও করিয়াছিল ও করিত। মাসীমা তাহাকে বলিতেন, যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতেই হইবে—তাহাই ধর্ম্ম; সুতরাং ভয় পাইলে চলিবে না। তিনি বুঝাইতেন—"ভগবান্ মানুষকে উপদেশ—নির্দ্দেশ দিয়াছেন, কর্ম্মেই যেন তা'র অধিকার হয়, কর্ম্মফলে নয়; আর কর্ম্মপরিত্যাগে যেমন তা'র কামনা না হয়, তেমনই যেন কর্ম্মফল তা'র কাযের হেতু না হয়। সে ত তুমি জান। বিশেষ যে কারণেই কেন হ'ক না, তুমি ত আপনার জীবনে ঐ উপদেশই সার্থক করেছ। তবে তোমার ভয় কি?"

তাঁহার উপদেশে রেণু হৃদয়ে বল পাইত। আর কণার শাশুড়ীর সাহায্য তাহার পক্ষে বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। তিনি বৃহৎ একান্নবর্ত্তি-পরিবারের সন্তান—সেই জন্য তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে রেণুর কার্য্যে বিশেষ সাহায্য হইত। সর্ব্বোপরি রেণুর কার্য্যে আন্তরিকতা ছিল।

অশোক মধ্যে মধ্যে দিদিকে বলিত, "দিদি, এই বার মা'কে জব্দ করতে হ'বে; মা'কে তোমার ছেলেকে দিয়ে তুমি শ্বশুরবাড়ী যা'বে ত?"

কণা বলিত, "আপাততঃ আমি মা'কে যে জব্দ করছি, তা' থেকে মা অব্যাহতি পেলে নিশ্চয়ই দিদিমা'র বাড়ীতে গিয়ে ঠাকুরের পুজা দিবেন।"

রেণু বলিত, "সে কথা সত্য, কণা। তবে জব্দ তুমি করছ না। মাসীমা'ই ঠাকুরকে পূজা দিবেন—তোমার ছেলে হ'লে তাঁ'র সে ত্রুটি হবে না।

"সত্যই, মা, সময় সময় মনে হয়—তোমাকে কি কষ্টই দিচ্ছি! কিন্তু তা'তে আমার লজ্জা হয় না; আমি ভাবি—মা'কে যদি কষ্ট দি—সে ত মা'র পাওনা!"

এইরূপ কথা বলিয়া কণা যখন তাহাকে জড়াইয়া ধরিত বা তাহার কোলে মাথা রাখিয়া ছোট ছেলের মত শুইয়া পড়িত, তখন রেণুর অন্তরে সত্য সত্যই মাতৃস্নেহের উৎস উৎসারিত হইত। সে যে কত চেষ্টায় সেই উৎসমুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিত, তাহা সে-ই জানে। তাহার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিত।

এক দিন অশোক দিদিকে তাহার সেই কথা বলিলে—রেণু অসতর্ক মূহূর্ত্তে বলিয়া ফেলিয়াছিল, "কণা, এ কায ক'র না।"

শুনিয়া অশোক হাসিয়া উঠিয়াছিল—"দিদি, কেমন বলেছি, মা'কে জব্দ করার ঐ উপায়। দেখছ ত, মা ভয় পেয়েছেন!"

কিন্তু কণা তাহা মনে করিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল, রেণু যে ভাবে কথাটা বলিল, তাহাতে ভয় প্রকাশ পায় নাই—বেদনাই সপ্রকাশ ছিল। অথচ সে ইচ্ছা করিয়াই তাহার পুত্রকে মাসীম'াকে দিয়া তাহাদিগকেই বুকে লইয়া রহিয়াছে! তাহার এক বার মনে হইল, সে রেণুকে বলে, "মা, আমি সর্ব্বদা কাছে থাকি না—দেবুকে নিয়ে এস।" কিন্তু দুইটি বিষয় বিবেচনা করিয়া সে তাহা বলে নাই,—প্রথম, দিদিমা দেবদত্তকেই তাঁহার জীবনের অবলম্বন করিয়াছেন—তাঁহাকে সেই অবলম্বনচ্যুত করা নিষ্ঠুরতাই হইবে। দ্বিতীয়,—ঐ বিষয়ের আলোচনায় রেণু সর্ব্বদা এমন বিরত থাকিয়াছে যে, পাছে সে বিরক্ত হয় সেই ভয়েও কণা তাহা বলিতে পারিল না।

রেণুর আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হইল না—যথাকালে, কণার একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। প্রসব-বেদনা অনুভূত হওয়া হইতে প্রসব পর্য্যন্ত কণা তাহাকে ছাড়িয়া থকিতে চাহে নাই—রেণুকে তাহার কাছেই থাকিতে হইয়াছিল। দেখিয়া কণার শাশুড়ী মৃণালিনীকে বলিয়াছিলেন, "সার্থক মেয়ে তৈরী করেছিলেন বটে; ক'জন মা মেয়ের জন্য এমন করতে পারে?"

শুনিয়া মৃণালিনীর মন আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল।

নীরেন্দ্র উৎকণ্ঠিত হইয়া সূতিকাগারের সম্মুখে বারান্দায় ছিল; ধাত্রী যাইয়া তাহাকে সংবাদ দিল —কন্যা হইয়াছে। অশোক স্কুলে যায় নাই; পিতার কাছেই ছিল; সে বলিল, "বাবা, আমি কখন্ খুকী দেখব?" নীরেন্দ্র যখন বলিল, "বোধ হয়, বেশী দেরী হ'বে না।"—তখন সে সেই কথায় নির্ভর করিয়া স্থির হইতে পারিল না—দ্বারের নিকটে যাইয়া ডাকিল, "মা!" রেণু উত্তর দিল, "কি, বাবা?"

"বেশ লোক ত, আমি কখন্ খুকী দেখব?"

রেণু ধাত্রীকে বলিল, "একটু সব চাপাচুপি দেও—ও কিছুতেই শুন্‌বে না।"

অল্পক্ষণ পরেই রেণু ডাকিল, "অশোক, এস।"

অশোক ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কখন্ দেখবেন?"

রেণু সে প্রশ্নের উত্তর দিল না; ধাত্রী বলিল, "তুমি মামাবাবু—তুমি কি দিয়ে ভাগনীর মুখ দেখবে?"

অশোক এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে বলিল, "মা, আমি কি করব?"

রেণু তাহার গলার হার খুলিয়া অশোককে দিয়া বলিল, "এই দিয়ে দেখ।"

অশোক যেন বিজয়গর্ব্বে ধাত্রীর হাতে সেই হার দিয়া ভাগিনেয়ীর মুখ দেখিল।

তখন রেণু বলিল, "এই বার তুমি বাইরে যাও—তা'র পরে আবার দেখতে পা'বে।

বাহিরে আসিয়া অশোক পিতাকে বলিল—"বাবা, ছোট্ট মেয়ে।"

নীরেন্দ্র হাসিল।

রেণু আপনার পুত্রকে প্রসবান্তে দেখিতে পায় নাই, বলা যায়। এ বার সে সদ্য-প্রসূত শিশুকে দেখিল। শিশুর সম্বন্ধে সব কর্ত্তব্য তাহাকেই করিতে হইল। কণাকে সে বিষয়ে কেহ কোন কথা বলিলে সে বলিত, "মা' বল্‌তে হয়, মা'কে বল। আমি ও-সব জানি না।" তাহার শাশুড়ী হাসিয়া রেণুকে বলিতেন, "বেহান, এই হচ্ছে কর্ম্মফল। কিন্তু মেয়েটিকে এমন ক'রে তৈরী করলেন কেমন ক'রে? যখন শ্বশুরবাড়ীতে থাকে, একেবারে ভালমানুষ—গলার আওয়াজ কেউ শুন্‌তে পায় না, শ্বশুর-শাশুড়ীর কি যত্ন করে! আর আপনার কাছে এলে একেবারে মা'র আদুরে মেয়ে—সব কাযই মা করবেন!"

রেণু কেবল হাসিত।

বাস্তবিক রেণুকে কণা যেন জড়াইয়া ছিল।

কণার কন্যা রেণুর ক্রোড়েই "মানুষ" হইতে লাগিল। দুই মাস পরে কণাকে তাহার শাশুড়ী এক এক দিন লইয়া যাইতেন বটে, কিন্তু হয়ত মেয়ের অযত্ন হইবে মনে করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরাইয়া দিতেন।

এইরূপে যখন ছয় মাস অতীত হইল, তখন কণার শাশুড়ী তাহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তখন তাহাতে আপত্তি করিবার আর কোন কারণই ছিল না।

রেণু তাহার যাইবার সব ব্যবস্থা করিয়া দিল। কিন্তু কণা গাড়ীতে উঠিবার সময় যখন চক্ষু মুছিল, তখন তাহারও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। কণার কন্যাকে আদর করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিবার সময় সে-ও চক্ষু মুছিল।

পরদিন কণার শাশুড়ী আসিয়া বলিলেন, "বেহান, কি যে 'যাদু' করেছেন—মেয়ে আমাদের কা'কেও চায় না—কেবল আপনাকে খুঁজে।"

রেণু হাসিল এবং সেই হাসির আবরণে তাহার মনের মধ্যে অনুভূত বেদনা লুকাইতে চেষ্টা করিল।

রাত্রিতে শুইয়া সে যে অভাব অনুভব করিত—আর কখন তাহা করে নাই।

৩৫

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—বিশেষ বিবাহের পর ও মা হইয়া কণা পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারে নাই, তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রেণু তাহাদিগের জননী না হইয়াও তাহাদিগকে যে ভাবে, মা'র সব কর্ত্তব্য লইয়া, পালন করিয়াছে এবং এখন তাহাকে যে ভাবে মাতার সব কর্ত্তব্যপালনের উপদেশ দেয়, তাহাতে সে যে কেন ও কিরূপে দেবদত্তকে তাহার মাসীমা'কে দিয়া আসিয়াছে, তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। সে কিছুতেই রেণুর কার্য্যের কারণ-সন্ধান পাইত না।

একাধিক বার কণার মনে হইয়াছে, সে মা'কে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সে তাহা পারে নাই। তাহার কারণ, রেণুর যে গাম্ভীর্য্য তাহার স্নেহের পশ্চাতে সে লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতে রেণু যে কথার উল্লেখ কোন দিন কোনরূপে করে নাই, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সে সাহস পাইত না। সাহস না পাইবার প্রধান কারণ—পাছে রেণু তাহার প্রশ্নে ব্যথা পায়। বাস্তবিক যদি কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে কণা সেই কথা জিজ্ঞাসা করিত, তবে কি হইত বলা যায় না; কারণ, পাছে কেহ কোন দিন তাহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—সে আশঙ্কা রেণু অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে কখন কি হইবে, তাহাও সে অনেক সময় ভাবিত।

রেণু প্রথমে মনে করিয়াছিল, সে দেবদত্তকে জানিতেই দিবে না, সে তাহার মাতা। কিন্তু সে বিষয়ে তাহার আশা যে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হয় নাই, তাহাও সে বুঝিতেছিল। তবে সে বিষয়ে সে আপনাকে একান্তই অসহায় বলিয়া আর কোনরূপ বিরুদ্ধ চেষ্টা করে নাই।

কণা পূর্ব্বে যাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই, এখন তাহা লক্ষ্য করিতেছিল। রেণুর সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য-পালনে কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি দেখা না যাইলেও তাহার ও নীরেন্দ্রের ব্যবহারে কেমন একটু বৈশিষ্ট্য ছিল—যেন কোথাও কিছু অভাব ছিল। তাহা সে তাহার বিবাহের পূর্ব্বে, নূতন জীবনে প্রবেশলাভের পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই।

কণার শাশুড়ী যখন তাহাকে দেবদত্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন কণা বলিয়াছিল, সে তাহার কিছুই জানে না। পূর্ণিমার আশঙ্কা ছিল, কণার শ্বশুরালয় হইতে সে কথা হয়ত কোন দিন উঠিবে। সেই জন্য তিনিই কণার শাশুড়ীকে কিরূপ অবস্থায়—মাতার রোগশয্যায় দেবদত্ত প্রসূত হইয়াছিল এবং কিরূপ অসাধারণ যত্নে মৃণালিনী তাহাকে বাঁচাইয়াছেন, সে সব বিবৃত করিয়া বলিয়াছিলেন। "যদি নিজে না দেখতাম, তবে বিশ্বাস করতে পারতাম না, কেউ ঐভাবে শিশুকে 'মানুষ' করতে পারে।" তিনি স্পষ্ট করিয়া যাহা বলেন নাই, ইঙ্গিতে সেই কথা জানাইয়াছিলেন—মৃণালিনী ব্যতীত দেবদত্তকে কেহ বাঁচাইতে পারিত না।

কণার শাশুড়ী মনে করিয়াছিলেন, নিঃসন্তান মৃণালিনী শিশুকে সত্য সত্যই দেবতার দানরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কণার শ্বশুর বিষয়ী লোক; তিনি স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন—মাসীমা'র সম্পত্তিও সামান্য নহে, তিনি তাহা দেবদত্তকে দিতে চাহিলে তাহা গ্রহণ না করা কখনই সুবুদ্ধির কায হইত না।

এইরূপে যে সব আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতেই কণার স্বামিগৃহ হইতে কোন অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন কোন দিন হয় নাই।

কণা জানিত, সে আসিবার পর রেণুর নিশ্চয়ই বড় "একা-একা" মনে হয়। সে কথা সে বলিয়াছিল। তাই তাহার শাশুড়ীর নির্দ্দেশে কণা প্রায় প্রতিদিনই একবার মা'র কাছে যাইত। সে তাহার কন্যাকে লইয়া যাইত। কোন দিন সুনীল, কোন দিন কণার শ্বশুর বেড়াইয়া ফিরিবার সময় তাহাদিগকে লইয়া যাইতেন। কোন কোন দিন কণাই জিদ করিয়া রেণুকে লইয়া মৃণালিনীর কাছে যাইত। এক এক দিন সে রেণুকে লইয়া পিসীমা'র ঠাকুর-বাড়ী দেখিতে যাইত; সে বলিলে নীরেন্দ্রও সঙ্গে যাইত। ঠাকুর-বাড়ীর সব ভার নীরেন্দ্রকেই লইতে হইয়াছিল; সেই জন্য তাহাকে মধ্যে মধ্যে কার্য্য-ব্যপদেশেও তথায় যাইতে হইত। স্থানটি মনোরম—সম্মুখে গঙ্গা, উদ্যানে কুসুমের শোভা—যেন শান্তির সাধনক্ষেত্র।

এইরূপে মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল—কোন অতর্কিত ঘটনায় সংসারের স্থৈর্য্য নষ্ট হইল না।

কণার বিবাহের পরবৎসর অশোক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিল।

মৃণালিনী এক দিন রেণুকে বলিলেন, "মেয়ের বিয়ে ত দিলি—এ বার ছেলের বিয়ে দিয়ে আমাদের বৌ দেখাবি না?"

কথাটা রেণু যে মনে করে নাই, তাহা নহে; তবে সে অন্য কারণে। তাহার পিতৃবন্ধুর সেই কথা সর্ব্বদাই সে স্মরণ করিত—কণার ও অশোকের বিবাহ দিলে, তাহারা সংসারী হইলে, তাহার কর্ত্তব্যভার অনেকটা লঘু হইবে; কিন্তু এখনই অশোকের বিবাহ দেওয়া যাইবে কি না, তাহা সে ভাবিয়া দেখে নাই।

আজ সে মাসীমা'র কথায় আগ্রহ অনুভব করিলেও বিয়ের কথাও তাহার মনে পড়িল। এখন আর পূর্ণিমা নাই। কে উদ্যোগী হইয়া প্রস্তাব করিবে? সে কখন অগ্রসর হইয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যের প্রস্তাব নীরেন্দ্রের নিকট করে নাই; সংসারের যে কায স্বাভাবিক নিয়মে তাহার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, সে তাহাই যথাসাধ্য সুসম্পন্ন

করিয়াছে। কাযেই সে মাসীমা'র কথার কোন্ উত্তর দিতে পারিল না।

মৃণালিনীও আর সে কথা বলিলেন না।

রেণু যখন মাসীমা'র নিকট হইতে ফিরিয়া গেল, তখন কণা পিত্রালয়ে আসিয়াছে। কণা মা'কে দেখিয়া প্রথমেই অভিমানের সুরে বলিল, "বেশ লোক! দিদিমা'র কাছে যা'বে, তা' আমাকে জানালে না কেন?"

রেণু বলিল, "কেন—তা' হ'লে বুঝি আজ আর এ বাড়ী মাড়াতে না?"

"না—আমিও তাঁ'র কাছে যেতাম। মা, দিদি-মা'কে দেখলে যেন ঠাকুর দেখা হয়।"

রেণু হাসিয়া বলিল, "তা আমি মাসীমা'কে বলে দেব—তিনি এক দিন তোমাকে প্রসাদ পেতে বলবেন।"

"ঠাকুর বুঝি কাউকে প্রসাদ পেতে যেতে বলেন? যে প্রসাদ পেতে চায়, তা'কেই ত যেতে হয়। আমি আজই তাঁ'কে বলে দিচ্ছি, আমরা প্রসাদ পেতে এক দিন যা'ব।"

ততক্ষণে অশোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে বলিল, "দিদি, 'আমরা' মানে কি তুমি আর জামাই বাবু?"

কণার মুখে লজ্জার ভাব ফুটিয়া উঠিল।

অশোক বলিল. "আমিই টেলিফোন ক'রে দিচ্ছি, রবিবারে মা, তুমি, জামাই বাবু, আমি—আমরা সব যা'ব।"

রেণু বলিল, "জামাই বাবু বিনা নিমন্ত্রণে যা'বেন কেন?"

"আমি নিমন্ত্রণ করে আসব।"

কণা বলিল, "দিদিমা যেতে বলেছেন, বল্লেই হ'বে; শুন্‌লে হয়ত আমার শাশুড়ীও যেতে চাইবেন। তিনিও দিদিমা'কে যে ভক্তি করেন!"

রেণু বলিল, "অশোক, মাসীমা আজ কি বল্‌ছি-লেন জান?"

অশোক বলিল, "কি, মা?"

তিনি বলছিলেন, "তোমার বিয়ে দিতে হ'বে।"

"কখ্‌খন দিদিমা তা' বলেন নি।"

"সত্যই বলেছেন।"

"আচ্ছা সে ঝগড়া আমি দিদিমা'র সঙ্গে করব।"

কণা বলিল, "মা, তুমি দিদিমা'র কথাই শুন না কেন?"

রেণু বলিল, "আমিই কি অশোকের বিয়ে দিবার কর্ত্তা?"

"নিশ্চয়! দিদা ত আর"—বলিতে বলিতে কণার গলাটা ধরিয়া আসিল—"আর নাই। এখন তোমাকেই সব করতে হ'বে। আমি আজই বাবাকে দিদিমা'র কথা বল্‌ছি।"

অশোক বলিল, "দিদি, তোমার কি আর কোন কায নাই?"

"সে ভাবনা, তোমাকে ভাবতে হ'বে না।"

বাস্তবিক সেই দিনই কণা নীরেন্দ্রকে বলিল, "বাবা, দিদিমা মা'কে অশোকের বিয়ে দিতে বলেছেন।"

নীরেন্দ্র বলিল, "তোমার মা'কে বল—তিনি যা' ভাল বুঝবেন, করবেন।"

"সেই কথাই আমি মা'কে বলেছি।"

পরবর্ত্তী রবিবারে সকলে মৃণালিনীর গৃহে "প্রসাদ পাইতে" সমবেত হইলে কণাই অশোকের বিবাহের কথা তুলিল।

মৃণালিনী বলিলেন, "আজ কাল ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়ছে বটে, কিন্তু তা' ভাল হচ্ছে কি না, তা' কে বল্‌বে?"

কণার শাশুড়ী বিনা নিমন্ত্রণেই মৃণালিনীর গৃহে আসিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "বৌমা ঠিকই বলেছে—প্রসাদ পেতে হ'লে নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখ্‌তে নাই।" তিনি বলিলেন, "মাসীমা, আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু দিনকাল যা' পড়েছে, তা'তে খুঁজতে খুঁজতেই দেরী হয়ে যায়।"

মৃণালিনী বলিলেন, "তা'র মানে এই যে, আমরা মনে করি, আমরাই সব করবার কর্ত্তা; উপরে থেকে যিনি আমাদের সব কায নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁ'র উপর একটুও নির্ভর করতে চাহি না।"

"সে কথা সত্য! কিন্তু—"

কণা বলিল, "তবে কি লোক খুঁজবে না?"

"খুঁজবে, দিদি; কিন্তু সে খোঁজার সময় যদি তাঁ'কে স্মরণ না করি, তবে খোঁজা বৃথা হয়। এখন যে বাছ্‌তে বাছ্‌তে গাঁ উজাড় হয়ে যায়।"

যখন এই সব কথা হইতেছিল, তখন অশোক তথা হইতে সরিয়া দেবদত্তের পাঠকক্ষে যাইয়া তাহার পুস্তকগুলি দেখিতেছিল। যে কক্ষে মৃণালিনীর স্বামীর সংগৃহীত পুস্তকগুলি সজ্জিত ছিল, সেই কক্ষেই দেবদত্তের পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দেবদত্ত তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। উভয়ে সেই কক্ষে বসিয়া পুস্তকের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল।

ওদিকে আলোচনার পর স্থির হইল, এক বৎসর পরে—অশোকের পরীক্ষা হইয়া যাইবে—তাহার বিবাহ দেওয়া হইবে।

কণার শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন, "এই বার বেহানের স্বরূপ ধরা পড়বে। এক ঘরের এক সন্তান—এক ঘরের এক বধূ—বধূ নিয়ে 'ঘর করতে' গেলে বুঝা যা'বে—কেমন।"

কণা বলিল, "সে আপনি দেখে নেবেন, আমার মা'র নিন্দা করতে পারে, এমন লোক হয় নি।"

শাশুড়ী হাসিয়া মৃণালিনীকে বলিলেন, "দেখ্‌লেন—মা'কে কেউ কিছু বল্‌লে মেয়ের সহ্য হয় না।" তিনি কণার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এই আমিই ত তোমার মা'র নিন্দা করছি—তিনি আমাদের মেয়েকে এমন যাদু করেছেন যে, সে তাঁ'কেই চাহে।"

এই কথার পর মৃণালিনী উঠিয়া যাইলেন—আহারের আয়োজন কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা দেখিতে গমন করিলেন।

আহারের আয়োজন দেখিয়া সুনীল বলিল, "দিদিমা, এই কি প্রসাদ?"

মৃণালিনী বলিলেন, "প্রসাদ আছে, সঙ্গে আরও কিছু আছে; প্রসাদ ভক্তিসহকারে খেতে হয়, আর অবশিষ্ট অমনই।"

"না, দিদিমা অবশিষ্টও প্রসাদ—তবে সে স্নেহের দান ব'লে ভালবাসার সঙ্গে খেতে হয়।"

রেণু তথায় ছিল। সে বলিল, "মাসীমা, এই-বার আপনি হবিষ্যান্নের যোগাড় করুন।"

"এই সব সোণার চাঁদের আহার দেখে যে আনন্দেই পেট ভরে যায়, মা।"

সুনীল বলিল, "আপনি কি তবে আজ খাবেন না?"

"খাব, দাদা, কিন্তু ভাত না খেলে কি খাওয়া হয় না?"

রেণু বলিল, "ও ত মাসীমা'র আছেই।"

"সে কি?"

মৃণালিনী বলিলেন, "বার মাস ত্রিশ দিন কি কেবল খাবার ভাবনাই ভাবতে হয়?"

রেণু বলিল, "তবে চলুন, আমাকে ঠাকুরঘর থেকে ফল দিবেন—আমি ছাড়িয়ে রাখি।"

মৃণালিনী বলিলেন, "সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হ'বে না। তুমি চল—বসবে; তোমার জন্য আর সকলে ব'সে আছেন।"

তিনি অন্য কক্ষে—যে কক্ষে স্ত্রীলোকরা আহারে বসিবেন, তথায় গমন করিলেন। রেণু সঙ্গে গেল।

সকলের আহার শেষ হইলে সুনীল বলিল, "দিদিমা, আপনি যদি স্থির ক'রে থাকেন, আমরা না গেলে খাবেন না, তবে আমরা এখনই বিদায় নিচ্ছি।"

মৃণালিনী বলিলেন, "না, দাদা, আর একটু দেরী করতে হ'বে। তোমাদের ড্রাইভাররা খেতে বসেছে—তা'দের হ'ক।"

"আমরা যে যেতে ব্যস্ত, তা' নয়; কিন্তু আপনি যদি আমরা থাকৃতে জলগ্রহণ না করেন, তবে তাড়ানই হয়, দিদিমা।"

"তোমাদের তাড়া'ব! আমার ভাগ্য যে, এক দিন সব এসেছ।"

"যদি বলেন, তবে 'ভাগ্য' এত বেশী হ'তে পারে যে, মনে করবেন 'দুর্ভাগ্যই' ছিল ভাল।"

"সে তোমাদের ইচ্ছা। তবে এক দিন আসতে হ'বে—নিয়ে যেতে।"

"তা'র এখনও অনেক বিলম্ব আছে।"

"সে কামনা আর ক'র না, দাদা।"

তিনি ড্রাইভারদিগের আহারের স্থানে গমন করিলেন।

রেণু বলিল, "বাড়ীতে কেউ অভুক্ত থাকতে ত মাসীমা আহার করবেন না।"

রেণুর শাশুড়ী বলিলেন, "অনেক ভাগ্যে মাসীমা পেয়েছিলেন, বেহান। আমরা ওঁর পায়ের ধুলা নেবার যোগ্য নই।"

কণার কন্যা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; উঠিয়া কান্দিয়া উঠিল। সেই ক্রন্দনশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিলেই মৃণালিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রেণু হাসিয়া বৈবাহিকাকে বলিল, "ঐটি মাসীমা'র দৌর্ব্বল্য - ছেলের কান্না সহিতে পারেন না।"

মৃণালিনী বলিলেন, "ওটি আমার উত্তরাধিকার। আমার ঠাকুরমা'র যখন শেষ অবস্থা—তাঁ'কে উঠানে তুলসীতলায় লওয়া হয়েছে, তখন তিনি সকলকে বল্‌লেন—'যা' সব খেয়ে নে; তার পর আমায় গঙ্গাযাত্রা করাবি।' তিনি আর কোন কথা না ব'লে তুলসী-তলায় শেষ শয়নে মালা জপ করতে লাগলেন। সেই সময় আমরা কেউ এক জন কেঁদে উঠেছিলাম। শুনে তিনি বলেছিলেন—"কোন্ বৌয়ের ছেলে কাঁদে রে? এর মধ্যেই কি সব ভুলে গেল, আমি ছেলের কান্না সইতে পারি না?' আমার পিতৃকুলে তাঁ'র সে কথা অনেক দিন কেউ ভুলেন নি। আর সে সব দিন নাই।" তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ততক্ষণে রেণুর ক্রোড়ে শিশু শান্ত হইয়াছে।

মৃণালিনী হাত বাড়াইলে শিশু এক বার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল—তাহার পর তাঁহার কাছে যাইবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল। মৃণালিনী তাহাকে লইলেন। কণার শাশুড়ী বধূকে বলিলেন, "চল, ওকে তোমার দিদিমা'র কাছে রেখে যাই—ওর দিদিমা আর তোমার দিদিমা মেয়ে 'মানুষ' করুন।"

মৃণালিনী বলিলেন, "না, মা। মায়াতেই বন্ধন।"

"হ'লই বা।"

"এখন ছুটী হ'লেই ভাল; কেবল মনে হয়—
'গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘসংসারবর্ত্মসু।
যেন ভূয়ো নাগচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন'॥"

সকলে যাইবার আয়োজন করিলে রেণু রহিল। তাঁহারা যাইবার পর মৃণালিনী যাইয়া আবার স্নান করিলেন এবং তাহার পর রেণুর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সামান্য কিছু আহার করিলেন।

তিনি আহার করিতে উপবিষ্ট হইলে, রেণু তাঁহার কাছে বসিল।

মৃণালিনী বলিলেন, "কেমন যেন ভাবিত দেখছি কেন, রেণু?"

রেণু বলিল, "সেই জন্যই ত আপনার কাছে রইলাম; অশোককেও পাঠিয়ে দিলাম।"

"কি বল্ ত?"

"সত্যই কি অশোকের বিয়ে দেওয়া হ'বে?"

"তুমি ত, মা, কর্ত্তব্যপালনই করছ। তবে অশোকের সম্বন্ধে তোমার কর্ত্তব্য পালন করবে না কেন?"

রেণু কিছু বলিল না—একটু ভাবিয়া বলিল, "তাই হ'বে।"

তাহার পর সে বলিল, "মাসীমা, যা' করবার, আর যা' ভাববার সে আপনি করবেন।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "এ বুড়ী আর কত দিন?"

৩৬

অশোকের পরীক্ষার পর তাহার বিবাহ হইয়া গেল। পাত্রীর সন্ধান প্রথমে কণার শাশুড়ী দিয়াছিলেন; তাহার পর মৃণালিনী যখন বিবেচনা করিয়া সম্বন্ধ অনুমোদন করেন, তখনই কথা 'পাকা' করা হইয়াছিল।

মৃণালিনী রেণুকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"ভাল ঘরের মেয়ে আনবে; সহজেই মনের মত ক'রে গ'ড়ে নিতে পারবে।"

রেণু মনে মনে হাসিয়াছিল, মুখে কিছু বলে নাই। তাহার হাসির কারণ, সে স্থির করিয়াছিল, অশোকের বিবাহ দিয়া বধূকে সংসারের ভার দিয়া সে অবসর লইবে। কিন্তু সে কথা সে কাহাকেও বলে নাই; সে কথা বলিবারও নহে।

অশোকের বিবাহের সময় যে কণা পিত্রালয়ে আসিল, তাহাতে রেণু যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলিতে পারিল। যে সব বিষয়ে নীরেন্দ্রের মত গ্রহণ প্রয়োজন—সে সব কণাকে বলিলে, কণাই যাইয়া মত গ্রহণ করিত। তবে মত গ্রহণে কখন কোন অসুবিধা ঘটিত না; কারণ, নীরেন্দ্র সব ভার রেণুকে দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত।

বিবহের পর বধূ অমলা এক দিন কণাকে বলিল, "দিদি, আপনি আর আপনার ভাই কেবলই আমাকে উপদেশ দেন—মা'র কাছে থাকৃতে, ম'ার কথা সকল বিষয়ে শুন্‌তে আর মা কেবলই উপদেশ দেন, বাবার কাছে থাকৃতে আর সকল বিষয়ে বাবার কথা শুন্‌তে; কেন, বলুন ত?"

কণা হাসিয়া বলিল, "আমরা জানি, মা তোমাকে যা' বল্‌লেন, তা' কখন ভুল হ'বে না; কারণ, তিনি কখন কোন কাযে কোন ভুল করতে পারেন, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। বাবা বরাবরই অপরের উপর নির্ভর করেন। যত দিন ঠাকুরমা ছিলেন, তত দিন সব ভার তাঁ'র উপর ছিল—তবে তিনি সে ভার মা'কে দিতে চাহিতেন। মা'র এখন আমাদের নিয়ে—বিশেষ তাঁ'র নাতিনীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাই তিনি বাবার ভার কতকটা তোমাকে দিতে চা'ন।"

অমলা দিদির কথা সঙ্গত বলিয়া মনে করিল বটে, কিন্তু—তাহার মনের মধ্যে একটু সন্দেহ—শরতের নদীতে লঘু মেঘের প্রতিবিম্বের মত রহিয়া গেল। কণা যে সংসারে পালিতা হইয়াছে, তাহাতে সে রেণুর স্বামীর প্রতি ভাবই স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু অমলা তাহার পিত্রালয়ে যে পরিবেষ্টনে পালিতা হইয়াছে, তাহাতে সে ভাব সে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতে পারিতেছিল না। যে জল পরিষ্কৃত হইয়া পরিবেশিত হয় তাহাতে দোষ কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না; বরং বলা যায়, তাহাতে কোন মলিনতা নাই; কিন্তু তবুও তাহাতে সব থাকিলেও একটি গুণের অভাব অনিবার্য্য হয়, তাহাতে সুস্বাদ থাকে না। তেমনই কাহারও কাহারও ব্যবহারে কোনরূপ ত্রুটি থাকে না বটে, কিন্তু ব্যবহারে যে

একটা আগ্রহ স্বভাবতঃ দেখা যায়, এ ক্ষেত্রে সে তাহারই অভাব লক্ষ্য করিত। সে তাহার পিত্রালয়ে ও মাতুলালয়ে গৃহিণীদিগের স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে ভাব তাঁহাদিগের ব্যবহারে লক্ষ্য করিয়াছে এবং যাহা সে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেই অভ্যস্ত হইয়াছে—নীরেন্দ্রের ও রেণুর ব্যবহারে তাহারই অভাব দেখিত। অথচ সে অভাব কি, তাহা কাহাকেও বুঝান যায় না এবং সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ সে কাহাকেও বলিয়া, সে সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে পারে না।

কণা সেই ভাবেই অভ্যস্তা বলিয়া তাহা যেমন সে লক্ষ্য করিতে পারে নাই, তেমনই তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে জিজ্ঞাসা নিষ্ফল হইত, সন্দেহ নাই। অশোকের সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে হয়।

রেণু তাহার স্নেহে অমলাকে আকৃষ্ট করিয়া কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা কর্দ্দমে পরিণত করিয়া তাহা ইচ্ছামত গঠিত করিতে পারে, তেমনই অমলাকে ইচ্ছামত গড়িয়া তুলিতে লাগিল। পুর্ণিমার মৃত্যুর পর—তিনি রোগকাতর হইবার পর হইতেই—নীরেন্দ্রের যে সব কাযের ভার বাধ্য হইয়াই তাহাকে লইতে হইয়াছিল, সে প্রথমে সেই সব অমলাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। অমলা অল্প দিনের মধ্যেই সে সব ভার গ্রহণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিল এবং শ্বশুরের পক্ষে সে অপরিহার্য্য হইয়াই উঠিল।

স্নেহশীল নীরেন্দ্রও স্নেহের নূতন অবলম্বন পাইয়া প্রীতি লাভ করিল। কণা শ্বশুরালয়ে যাইবার পূর্ব্ব হইতেই অশোক অনেক সময় তাহার অধ্যয়ন লইয়া ব্যাপৃত থাকিত। কাযেই নীরেন্দ্র অনেকটা নিঃসঙ্গতা অনুভব করিত। সেই ভাবের যে অভাব তাহা এখন অনেকটা পূর্ণ হইল। যে দিন কণা না আসিত, সে দিন নীরেন্দ্র যখন বেড়াইতে যাইত, তখন পুত্রবধুকে সঙ্গে লইয়া যাইত। অশোক সকল দিন সঙ্গে যাইতে পারিত না বটে, কিন্তু যে দিন সে যাইত, সে দিন মা'কে না লইয়া যাইত না। রেণু না যাইবার যে কোন কারণই দেখাইত, তাহাই সে অবজ্ঞা করিত—বলিত, "তোমার হাজার কারণ ত, মা, থাক্‌তেই পারে! কিন্তু সব চেয়ে যেটা বড় কারণ—সেটা তুমি উপেক্ষা করতে পারবে না। সেটা—তোমার ছেলের আব্দার।" ইহার উপর আর কিছু বলা যায় না—স্নেহের অত্যাচার সকল অত্যাচার অপেক্ষা ভীষণ হইলেও তাহা হইতে মানুষ অব্যাহতি পায় না—বুঝি অব্যাহতি লাভ করিতেও চাহে না। বিশেষ সে যাইবে না বলিলে, অশোক যখন সে-ও যাইবে না বলিয়া অভিমানভরে যাইয়া মা'র শয্যায় শুইয়া পড়িত, তখন রেণুকে বলিতেই হইত—"আচ্ছা, চল যাই।"

অশোক যে দিন সঙ্গে থাকিত, সে দিন প্রায়ই যাইবার বা ফিরিবার পথে হয় কণার গৃহে, নহেত মৃণালিনীর গৃহে যাওয়া হইত; সে-ই সে ব্যবস্থা করিত।

অশোক অমলাকেও শিখাইয়া দিয়াছিল, মা যাইবেন না বলিলেই সে যেন তাঁহাকে না ছাড়ে। "বার মাস ত্রিশ দিন ঘরে বদ্ধ—একটু বা'র হ'বেন না। কেন? আমাদের সম্বন্ধে মা'র কর্ত্তব্য আছে, মা'র সম্বন্ধে বুঝি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই?" সে স্ত্রীকে বলিত—"তুমি জিদ করলে মা'কে যেতে হ'বেই। আমি জিদ করলে ত মা কখন না বল্‌তে পারেন না! নিশ্চয়ই আমি মা'কে যেমন ভালবাসি, তুমি তেমন ভালবাস না।"

সে কথা কিন্তু অমলা স্বীকার করিত না। রেণুকে কি ভাল না বাসিয়া থাকা যায়? পিত্রালয় হইতে আসিয়া সে যে কখন মা'র অভাব অনুভব করিতে পারে নাই, সে যে রেণুর অসাধারণ স্নেহে। তবে অশোকের মত অভিমান সে করিতে পারিত না। অশোকের ব্যবহারে মনে হইত, সে-ই মা'র সব স্নেহ আত্মসাৎ করিতে চাহে। তাহার সব পরামর্শ মা'র সঙ্গে—যেন সে এখনও মা'র ছোট্ট ছেলেটি। সে কথা কেহ বলিলে সে বলিত, "আমি ত মা'র ছেলে—ছোটই হই, আর বড়ই হই, মা'র ছেলে। মা কি কখন আমার উপর রাগ করতে পারেন? তিনি কি আমার ব্যবহারে বিরক্ত হ'তে পারেন? আমি যখন বঙ্কিম বাবুর 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়ি, তখন একটা কথা শিখেছিলাম—'মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি'?"

অমলার কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে রেণু যখন সে কথা নীরেন্দ্রকে জানাইতে বলিত, তখন তাহা শুনিলে অশোক বলিত, "কেন আমি ত কখন কোন জিনিষের জন্য বাবাকে বলি নি!"

অমলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা'কেই বল্‌তে?"

"বল্‌তাম! এখনও বলি। বিয়ের পর মা বল্‌লেন, 'তুমি মাসে মাসে কিছু টাকা নিও—ইচ্ছামত খরচ করবে!' আমি ত প্রথমে কারণ বুঝতে পার্‌লাম না; তা'র পর বুঝলাম, যদি তোমার জন্য কিছু খরচ করি। আমি মা'কে বলেছিলাম, 'যা দরকার হ'বে, তোমাকে বলব—আমি টাকা নেব কেন?' তাই মা তোমাকে টাকা দেন।"

"কিন্তু কোন জিনিষ বাবার কাছে চাইলে তিনি যে কত আনন্দ করেন!"

"বেশ ত—বাবাকে বল্‌বে, মা তাঁ'কে ঐ কথা বল্‌তে বলেছেন।"

অমলা লক্ষ্য করিত, কণা স্বয়ং মা হইলেও রেণুর কাছে ছোট মেয়েটির মতই আব্দার করিত; আর রেণু হাসিমুখে তাহার ও অশোকের সব আব্দার পূর্ণ করিত। অশোক এক দিন তাহাকে বলিয়াছিল, "দিদির আর আমার মা'র কাছে আব্দার দেখে তোমার হিংসা হয় না?"

অমলা স্বীকার করিয়াছিল, হিংসা হয়।

এই ভাবে দিন কাটিতেছিল। অনেকেই মনে করিত, নীরেন্দ্রের সংসারে সুখের সীমা নাই—রেণু সর্ব্বতোভাবে সুখী। কিন্তু তিন জন জানিতেন, তাহা নহে। নীরেন্দ্র সর্ব্বদাই অনুভব করিত—তাহার এক মুহূর্ত্তের ভুলে সে যে জীবনব্যাপী দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহা হইতে তাহার অব্যাহতি নাই। যে তাহাকে ক্ষমা করিলে সে অব্যাহতি লাভ করিত—সে তাহাকে ক্ষমা করে নাই। সে যৌবনে ইংরেজীতে পাঠ করিয়াছিল—সমুদ্র হইতে মানুষের হস্তের মত ক্ষুদ্র যে মেঘ উঠে, তাহা আকাশ আচ্ছন্ন করিতে পারে। সে সর্ব্বদা ভয় করিত, কবে তাহার ভাগ্যে সেইরূপ মেঘ দেখা দেয়। সেই মেঘের বক্ষে বজ্রানল থাকিতে পারে—তাহা যে কোন মুহূর্ত্তে সব ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। রেণু জানিত, সে সুখী নহে—সে জীবনে সুখী হইতে পারিবে না। তাহার জীবনে সুখী হইবার সুযোগ বহু বার আসিয়াছে, কিন্তু সে-ই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সে যদি ভুলিতে পারিত, তবেই সে সব সুযোগ গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত। কিন্তু সকলে ভুলিতে পারে না; তাই যে বিস্মৃতিতে সুখ, তাহারই অভাবে তাহারা দুঃখ ভোগ করে। যাহারা আপনাদিগের দুঃখের কারণ দৃঢ়হস্তে পাষাণকঠিন হৃদয়ে ক্ষোদিত করে, তাহারা আর তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারে না। রেণুর তাহাই হইয়াছিল। সে সেই জন্যই আপনার সমগ্র জীবন স্বতন্ত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। কর্ত্তব্যে মানুষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে—সুখলাভ করিতে পারে না। আর এক জন তাহা জানিতেন। তিনি মৃণালিনী। মৃণালিনী জানিতেন, যে ভুল হইয়াছে, তাহার আর সংশোধনোপায় নাই। যাহা অনিবার্য্য, তাহা সহ্য করা ব্যতীত উপায় নাই, কিন্তু তাহাতে অসুখের নিবৃত্তি হয় না। যে দৃঢ়তায় রেণু তাহার পুত্রকে তাঁহাকে দিয়াছে, যে সেই দৃঢ়তার অধিকারী, তাহাকে বুঝাইয়া কিছু করা যায় না। কিন্তু রেণু যে সুখী হয় নাই, এ দুঃখ সর্ব্বদাই তাঁহাকে পীড়িত করিত। কণা, অশোক, কণার কন্যা—এ সবই বন্ধন এবং তাহারা রেণুকে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু মৃণালিনী জানিতেন, যে দেবদত্তকে পর করিয়া দিয়াছে, এ সব বন্ধন কখনই তাহাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না। দেবদত্তকে সে কত ভালবাসিত, তাহা তিনি দেবদত্ত নিকটে আসিলে রেণুর মুখভাবে বুঝিতে পারিতেন।

দেবদত্ত সর্ব্ববিষয়ে যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে রেণু যে তাহাকে পুত্র বলিয়া বক্ষে লইতে চাহিল না, ইহা মৃণালিনীর পক্ষে দুঃখের কারণ হইয়াছিল। রেণু যে তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া তাহার পুত্রকে দিয়াছিল, তাহা মৃণালিনী সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতেন এবং তাহা স্মরণ করিয়াই যেন দ্বিগুণ সতর্কতা ও যত্নসহকারে তাহাকে "মানুষ" করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যে তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য আপনিও শিক্ষা করিয়াছেন তাহা রেণুও দেখিয়াছে। কিন্তু রেণুও বুঝিতে পারে নাই—কাহার প্রতি স্নেহহেতু তিনি তাহা করিতেন। তাহা রেণুও জানিতে পারে নাই।

রেণু আরও একটি কথা জানিতে পারে নাই—সে যেমন মনে করিতেছিল; অশোকের বিবাহ হইয়া গিয়াছে—বধুকে সে তাহার শ্বশুরের কার্য্যভার দিয়াছে, সংসারের কাযও শিখাইয়াছে—এই বার সে মুক্তির সন্ধান করিবে, মৃণালিনীও তেমনই মনে করিতেছিলেন, দেবদত্তের বিবাহ দিয়া, বধূকে দেবসেবার ভার প্রদান করিয়া, তিনি কোন তীর্থস্থানে বাস করিবেন—তাঁহার মাতামহীর প্রতিষ্ঠিত যে দেবালয় জগন্নাথক্ষেত্রে ছিল, হয়ত তথায় যাইবেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তিনি যখন সর্ব্বতোভাবে ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে যাইবেন, তখন রেণুই প্রয়োজনে দেবদত্তকে দেখিবে—সে তাহার জননী।

এই সময় কণা এক দিন বলিল, "দিদিমা, তোমার উদ্যোগেই ত অশোকের বিয়ে হ'ল—এই বার দেবুর বিয়ে দিন।"

মৃণালিনী বলিলেন, "মনের কথা টেনে বলেছ, দিদি! আমি কেবলই ঐ কথা ভাবছি; কিন্তু কোন দিকে কেউ বলছে না ব'লে সাহস পাচ্ছি না।"

কণা হাসিয়া বলিল, "দিদিমা, তা' হ'লে আপনারও ভয় আছে?"

"তা' আবার নেই! এই দেখ না, তোমাদের কত ভয় করি—পাছে রাগ কর।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "মা কি বলে?"

"আপনি মা'র মা—আপনার উপর কি আর কা'রও কথা থাকৃতে পারে?"

"লুচি খাবার জন্য বুঝি আমাকে এত তোষামোদ!"

"না, দিদিমা, দেবুর বিয়ে দিন।"

"আমি একা দেব—না তোমরা সকলে দিবে?"

"তাই হ'বে—আপনার মত হ'লেই হয়।"

"আমার ত 'সেধো ভাত খাবি? হাত ধুয়ে বসে আছি।' এখন ক'নে খোঁজ।"

"ক'নে আমি খোঁজ কর্‌ব। সে এক রকম ঠিক ক'রেই রেখেছি।"

"কে?"

"অমলার ভগিনী হ'লে হ'বে না?"

"বোধ হয় ভালই হ'বে।"

"আমলা যেমন হয়েছে, তা'তেই ত আমার ইচ্ছা আর একটিকেও আনি।"

"হাঁ, প্রথমে ভাবনা থাকে—কি রকম হ'বে। তোমরা হ'বার আগে যখন মোটর গাড়ী চল হয় নি, তখন রেণুর বাবার একটা ঘোড়া কিনে আন্‌বার পর দেখা গেল দুষ্ট—মধ্যে মধ্যে 'জমে' যায়—দাঁড়ালে চল্‌তে চায় না। তাই তোমার বড় দাদাবাবু ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন,

'ঘড়ী আর ঘোড়া
বরাতে হয় খোঁড়া'

—এক একটা ঘড়ী যেমন এক একটা ঘোড়াও তেমনই 'উৎরে' যায়; বধূ সম্বন্ধেও তা'ই।"

কণা হাসিল, বলিল, "কিন্তু বধূর সম্বন্ধে একটা কথা বল্‌তে হয়—'গাধা পিটিয়ে যেমন ঘোড়া করা' চলে, তেমনই শাশুড়ীর গুণ থাকৃলে বধূ মনের মত ক'রে গড়তে পারেন। সে গুণ আমার মা'র আছে—আর তাঁ'র গুরুমশায়ের ত কথাই নাই।"

"আমি ত তোমার কথায় সম্মতিই দিয়েছি—তবে আর আমার এত তোষামোদ করা কেন?"

"নাঃ—আর আপনার তোষামোদ কর্‌ব না; যাই, মা'র তোষামোদ করি।"

"এখনই কি মা'র কাছে যা'বে?"

"যা'ব।"

"নীরেনকে ব'লে দেখ।"

"কেন, আপনি কি আপনার জামাইকে জানেন না? তিনি কি আবার আপত্তি করবেন?"

"ছেলে মেয়ে বল্‌লে সে কিছুতেই 'না' বল্‌তে পারে না, বটে।"

মৃণালিনীর গৃহ হইতে কণা পিতৃগৃহে গেল এবং যাইয়াই রেণুকে বলিল, "মা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

রেণু বিস্মিতভাবে কণার দিকে চাহিল, যে সদানন্দ সে এমন গম্ভীরভাবে কি বলিবে? সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, কণা?"

"আমি দিদিমা'র কাছ থেকে আসছি, তাঁ'কে সম্মত করিয়ে এসেছি—এখন তোমাকে মত দিতেই হ'বে।"

"ব্যাপারটা কি?"

"দেবুর বিয়ে দিতে হ'বে।"

ক্ষণেকের জন্য রেণু যেন নির্ব্বাক—স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্য দিয়া কত কথা, কত ভাব অতি দ্রুত চলিয়া গেল, তাহার পর কত আশঙ্কা! তাহার মুখ যেন রক্তশূন্য হইয়া গেল।

দেখিয়া কণা শঙ্কানুভব করিল।

কিন্তু প্রবল চেষ্টায় সে ভাব দমিত করিয়া রেণু বলিল, "সে কথা আমাকে বলা কেন, কণা।"

"দিদিমা বল্‌লেন।"

রেণু ততক্ষণে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়াছে, সে হাসিয়া বলিল, "বিয়ে ক'বে?"

"কেন, সেই গল্প ত জান। রাজপুত্র এক মেয়ে দেখে এসে মন্ত্রীকে বল্‌লেন, 'আপনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি আমার বিয়ে দিবেন কি দিবেন না; যদি দেন তবে আজ দিবেন, কি কাল দিবেন।"

তাহার কথা বলিয়া কণা যখন চলিয়া গেল তখন রেণু ভাবিতে লাগিল—সে ভাবনার যেন অন্ত নাই।

৩৭

সম্মুখে দেবদত্তের পরীক্ষা ছিল। পাছে তাহার অধ্যয়নে কোন ক্ষতি হয়, সেই জন্য মৃণালিনী তাহার বিবাহের যে আয়োজন করিতে লাগিলেন, তাহা কতকটা গোপনেই হইতে লাগিল। আয়োজনের অনেকটা আর করিতে হইবে না—মৃণালিনীর যে অলঙ্কার ছিল, তাহাই যথেষ্ট। এক দিন তিনি কণাকে ও রেণুকে ডাকিয়া সে সব দেখাইয়া বলিলেন—"এখন ত সব নূতন ধরণ হয়েছে; তোমরা দেখ, কোন্‌খানা রাখবে, কোন্‌খানা ভেঙ্গে নূতন করবে, ভেবে দেখ।" বলিতে বলিতে তিনি এক জোড়া

বালা সরাইয়া রাখিলেন। সে জোড়াটি দেখিয়া কণা বলিল, "ঐ জোড়াটি সরাচ্ছেন কেন?"

মৃণালিনী বলিলেন, "ও জোড়াটি ভাঙ্গা হ'বে না।"

কণা হাসিয়া বলিল, "ওর উপরে অত মায়া কেন, দিদিমা?"

"বালা জোড়াটি আমার শাশুড়ীর ছিল; তিনি 'বৌ-পরিচয়ে' ঐ দিয়ে আমাকে দেখেছিলেন—ও দেবুর বৌ পা'বে—তা'র ইচ্ছা হয়, সে ভেঙ্গে নূতন গহনা গড়াবে।"

কণা বালা জোড়াটি হাতে লইয়া বলিল, "অনেক দিন ব্যবহার হয়েছে—এই বুঝি সে সময়ে চলিত ছিল?"

"হাঁ। ওর নাম অমৃতিপাক।"

রেণু বলিল, "কোন গহনাই বদলান হ'বে না—।"

মৃণালিনী বলিলেন, "বলিস্ কি, মা, এ সব যে সেকেলে—দেখ্‌লে লোক হাসবে।"

"তা' হাসুক। তোমার শাশুড়ীর বালা ভাঙ্গতে তোমার যেমন ব্যথা বোধ হয়, তোমার গহনা ভাঙ্গতে কি আমার তেমনই কষ্ট হয় না?"

কণা বলিল, "মা ঠিক বলেছেন—ও সব আপনার গায়ে দেওয়া—ও সব পরা বৌয়ের ভাগ্য বলতে হ'বে।"

মৃণালিনী বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, যেন আমার ভাগ্য তোমরা কেউ না পাও।"

স্থির হইল, সব গহনাই যেমন আছে, তেমনই থাকিবে—বরং নূতন ধরণের দুই চারিখানি প্রস্তুত করান হইবে।

কণার ও অশোকের জননীর যে সব অলঙ্কার ছিল, সে সব কণাকে ও অমলাকে দেওয়া হইয়াছিল—রেণু কখন সে সব ব্যবহার করে নাই।

কাপড় কিনিবার ভার কণাকে দেওয়া হইল—সে তাহার শাশুড়ীর সহিত পরামর্শ করিয়া সে সব কিনিবে। রেণু কখন সখ করিয়া কোন কাপড় কিনে নাই, জামা করায় নাই। কাযেই তাহাকে সে ভার দেওয়া বৃথা।

অমলার ভগিনী কমলাকে আর নূতন করিয়া "দেখিতে" হইল না।

দেবদত্তের পরীক্ষা হইয়া গেল। তাহার পরীক্ষার পূর্ব্বে মৃণালিনী তাহাকে প্রতিদিন আপনার কাছে বসাইয়া আয়-ব্যয়ের বিষয় বুঝাইয়া দিতেন—কেবল পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিন মাস আর তাহা করেন নাই। কাযেই বৈষয়িক ব্যাপারেও তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিতেছিল। মৃণালিনী আপনি প্রস্তুত হইতেছিলেন—তিনি দেবদত্তকে কার্য্যভার দিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করিবেন। তিনি জানিতেন, এই কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অসাধারণ; ইহাতে যে সতর্কতা প্রয়োজন, তাহা একটু শিথিল হইলেই ক্ষতি অনিবার্য্য হয়। কাযেই ইহা শিক্ষাসাপেক্ষ। সে শিক্ষা তাঁহাকে "ঠেকিয়া" লাভ করিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা, যথাসম্ভব, দেবদত্তকে দিতে-ছিলেন যে, সে "দেখিয়া" শিখিতে পারে এবং তাহার শিক্ষা তাহাকে তাহার স্বার্থরক্ষায় সমর্থ করে।

দেবসেবার অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া মৃণালিনী এখন তাহাতে যেরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সে কাযে তিনি আনন্দ বা তৃপ্তি অনুভব করিতেন। কিন্তু বিষয়কর্ম্মে তিনি কখন সে তৃপ্তি লাভ করেন নাই; কেবল কর্ত্তব্যবোধেই তিনি তাহা করিতেন এবং তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ এমনই প্রবল ছিল যে, সে কার্য্যে তিনি দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন—তাঁহাকে প্রতারিত করা কাহারও পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিল না।

দেবদত্তের পরীক্ষা শেষ হইবার পর তাহার বিবাহের আয়োজন আর কাহারও নিকট গোপন রহিল না। কিন্তু মৃণালিনী লক্ষ্য করিলেন, দেবদত্তের মুখে চিন্তার ভাব দেখা যাইতে লাগিল। তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রথমে আপনি তাহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেন এমন হইতেছে? যখন বসন্তাগম হয়, তখন যেমন তরুলতায় পত্র ও পুষ্প স্বভাবতঃ আত্মপ্রকাশ করে—যেমন পিককণ্ঠে গীত আপনি ব্যক্ত হয়, তেমনই কৈশোরের পর মানুষের মনে ভালবাসিবার ও ভালবাসা লাভ করিবার বাসনা স্বতঃই স্ফূর্ত্ত হয়; তাই ইংরেজ কবি টেনিসন লিখিয়াছেন, বসন্তকালে বিহঙ্গমের অঙ্গে নূতন বর্ণপাত হয় আর যুবকের চিন্তা স্বভাব-তঃই প্রেমের দিকে অগ্রসর হয়। যৌবনই মানবের জীবনে বসন্ত। আমাদিগের এই দেশে ঐ বাসনা তাহার পরিতৃপ্তির পাত্র সন্ধান করিয়া যাহাতে ভুল না করে, সেই জন্য সামাজিক নিয়মে—বিবাহের দ্বারা সেই পাত্র তরুণ-তরুণীকে—পত্নী ও পতিকে প্রদান করা হইত। ধর্ম্মের বন্ধন সেই পাত্রেই তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিত। এই অবস্থায় বিবাহের কথায় দেবদত্ত কেন চিন্তিত হইল, তাহা বুঝিবার চেষ্টা মৃণালিনী করিতে লাগিলেন। তিনি সে বিষয়ে রেণুর ও কণার সহিত আলোচনাও করিলেন। কিন্তু কেহই কারণ নির্ণয় করিতে পারেন

নাই। রেণু বলিয়াছিল, সে তাহার স্বামীকে এই কথা বলিয়াছিল, সে বলিয়াছে—কেবল অধ্যয়ন করিয়া দেবদত্ত অত্যন্ত গম্ভীর-প্রকৃতি হইয়াছে এবং সব বিষয়েই অকারণ অধিক গুরুত্বারোপ করে, সেই জন্য সে বিবাহ বিশেষ দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেছে—ও ভাব থাকিবে না। তাহার পর সুনীল যাহা বলিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া কণার মুখে লজ্জার অরুণ আভা ফুটিয়া উঠিল। সুনীল বলিয়াছিল, "হয় ত আমিও কত কথা ভেবেছিলাম—কিন্তু তুমি এসে সে ভাবনা ভালবাসায় ভাসিয়ে দিলে"—বলিয়া সে পত্নীকে আদর করিয়াছিল।

শুনিয়া মৃণালিনী বলিলেন, "হবেও বা। বুড়ো মানুষের কাছে থেকে দেবু যেন অকালে গম্ভীর হয়েছে।"

রেণু কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু সংবাদটা তাহার চিন্তার কারণ হইল। সে মনে করিল, তাহার যে অদৃষ্ট, তাহাতে না জানি কি হয়! যে অদৃষ্ট তাহার সমস্ত জীবন ব্যর্থতায় পরিণত করিয়াছে, সেই অদৃষ্ট কি তাহার সন্তানকেও অনুসরণ করিবে? সে দিন গৃহে ফিরিবার সময় সে মাসীমা'র ঠাকুর-ঘরে দেবতাকে প্রণাম করিবার সময় দেবতার চরণে নিবেদন জ্ঞাপন করিল—সে তাহার ব্যর্থ জীবনে আরও যাহা সহ্য করিতে হয় অকাতরে করিবে, কিন্তু দেবদত্ত যেন সুখী হয়।

কণার কথা শুনিয়া মৃণালিনী অনেকটা আশ্বাস পাইয়াছিলেন; কাযেই তিনি ঐ বিষয়ে আর অধিক মনোযোগ দিলেন না।

মৃণালিনীর সকল দিকে লক্ষ্য থাকিত, তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন, নীরেন্দ্র যতই নির্লিপ্ত থাকিতে চাহুক না কেন, তাহার কর্ত্তব্যে তাহাকে বঞ্চিত করা হইবে না। তিনি নীরেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার সহিত পরামর্শ করিবার চেষ্টা করিলেন। নীরেন্দ্র বলিল, "আমাকে আবার কি জিজ্ঞাসা করবেন, মাসীমা? আপনি যা' করবেন, তা'তে কোন কথাই থাকতে পারে না। তা'র উপর আবার আপনি আপনার মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করছেন।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "এখন আরও এক জন—এক জন কেন, দু'জন পরামর্শ করবার লোক জুটেছেন।"

"কে কে, মাসীমা।"

"প্রথম কণা—তিনিই ত এর মূলে আছেন—তিনি একাধারে বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তা, ঘটক।"

"তিনি ত এক জন, আর এক জন?"

"অমলা। তাঁ'র ভগিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ।"

নীরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "অবশিষ্ট কেবল অশোক?"

মৃণালিনী বলিলেন, "বাবা, তুমিও যখন পাশ কাটাবার চেষ্টা করছ, তখন আমরা মনে করছি, কাযটায় আমরা আর পুরুষের সম্পর্ক রাখব না।"

"তা' যদি করেন, মাসীমা, তবে দেখবেন, কাযটা যেমন সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হ'বে, তেমনই সুসম্পন্ন হ'বে।"

"যত গোল তোমরাই পাকিয়ে তুল?"

নীরেন্দ্র বলিল, "সে বিষয়ে আমি কবুল-জবাব দিচ্ছি, মাসীমা।"

তাহার পর মৃণালিনী নীরেন্দ্রকে ফর্দ্দ দেখাইলেন ও জিনিষগুলি দেখাইবার জন্য আহ্বান করিলেন।

নীরেন্দ্র বলিল, "আপনি দেখা'বেন, আমি দেখছি; কিন্তু আমি যে কোন মতপ্রকাশের অধিকারী নই, তা' আমি ভালরূপই জানি।"

এ দিকে আয়োজন চলিল। ও দিকে কন্যাপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশ্য সে বিষয়ে কোন গোল হইল না—হইবে, এমন বিশ্বাসও কাহারও ছিল না। কন্যাপক্ষ অমলার বিবাহ দিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা কমলার এই বিবাহ-প্রস্তাবে আপনাদিগকে বিশেষ ভাগ্যবান বলিয়াই মনে করিলেন।

কিন্তু মৃণালিনী যতই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, দেবদত্তের মুখে চিন্তার ছায়া, ততই তাঁহার মন অস্থির করিতে লাগিল। তিনি যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অন্তরের মধ্য হইতে সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কোন কায করিবার পূর্ব্বে দেবতাকে স্মরণ করিতেন। এ বারও তিনি তাহাই করিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার মনের সন্দেহ ঘুচিল না, তখনই তিনি অস্বস্তি অনুভব করিলেন। তিনি রেণুকে ও কণাকে ডাকিয়া বলিলেন, তিনি দেবদত্তের নিকট তাহার মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

শুনিয়া কণা রাগ করিল—"দিদিমা, আপনি কি ছেলেকে ইংরেজ ভাবছেন?"

মৃণালিনী বলিলেন, "না, দিদি, দেবুকে ত কখন আমি চিন্তিত দেখিনি! তাই আমার ভয় হচ্ছে!"

কণা হাসিয়া বলিল, তা'হলে মেয়ের মতও জিজ্ঞাসা করবেন ত?"

মৃণালিনী বলিলেন, "সে তোমরা বল্‌তে পার; এ কালের কথা ত আমরা বল্‌তে পারি না।"

"কিন্তু আপনি যে একেবারে এ কালের ব্যবহারই করছেন, দিদিমা। কই আশোককে ত কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি।"

"তা'কে ত চিন্তিতও দেখিনি, দিদি। বরং তার মুখে হাসিই ফুটে উঠতে দেখেছি।"

"অর্থাৎ সেই

'মুখের হাসি চাপলে কি হয়—
প্রাণের হাসি চোখে খেলে।'

কি বলেন, দিদিমা।"

রেণু বলিল, "আপনার যখন জিজ্ঞাসা করতেই ইচ্ছা হয়েছে' তখন তা'ই করুন।"

মৃণালিনী বলিলেন, "তাই করব। মন নারায়ণ"।

সে দিন সন্ধ্যায় ঠাকুর-ঘরে বসিয়া মৃণালিনী বহুক্ষণ ভাবিলেন, আর ঠাকুরকে ডাকিলেন। তিনি তাহার পর যাইয়া যখন শয়ন করিলেন, তখন দেবদত্ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কাযেই তখন আর তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল না। তিনি যখন সে ঘুমাইয়াছে কি না দেখিতেছিলেন, তখন তিনি লক্ষ্য করিলেন, একগুচ্ছ চুল তাহার কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি অতি সাবধানে সেই কেশগুচ্ছ সরাইয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন।

কিন্তু তাহাতেই দেবদত্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু সে চক্ষু উন্মীলিত করিল না। তাহার মনের মধ্যে যে ভাব কয় দিন তাহাকে চঞ্চল করিতেছিল, তাহার পক্ষে মৃণালিনীর এই স্নেহপরিচয়—এই স্পর্শ যেন সে বিক্ষুব্ধ ভাবের ভেষজ বলিয়া তাহার মনে হইল।

অতি ধীরে তাহার মস্তকে করতল অর্পিত করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মৃণালিনী যাইয়া পার্শ্বে তাঁহার শয্যার শয়ন করিলেন। কিন্তু বহুক্ষণ তাঁহার নিদ্রা হইল না। তিনি কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন না দেবদত্তও বিনিদ্রাবস্থ হইয়া অনেক কথাই ভাবিতেছিল। তাহার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহা যেন সে আর গোপন করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু মনে কোন দ্বিধা—কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে যাঁহার নিকট তাহা জানাইয়া সে শান্তিলাভ করিত, এ বার সে তাঁহাকেই সে কথা জানাইতে পারিতেছিল না। তিনি তাহাকে যে স্নেহে পালন করিয়াছেন, তাহা সে জানে এবং জানিয়া সে কিছুতেই তাঁহার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কোন কায করিতে পারে না। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে যে অভিমান বেদনায় পরিণত হইয়াছিল, তাহা তাহাকে ব্যথিতই করিতেছিল। সে কি করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না।

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করা দেবদত্তের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু মৃণালিনী তাহারও পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া যাইতেন। তিনি যখন কক্ষ ত্যাগ করিতেন, তখনও দেবদত্তের নিদ্রাভঙ্গ হইত না। পরদিন শয্যাত্যাগ করিয়া যাইবার সময় মৃণালিনী দেখিলেন, মুক্ত বাতায়নপথে যে আলোক কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে মনে হইল—দেবদত্ত জাগিয়া আছে। তিনি অলোকটি জ্বালিলেন। দেবদত্ত জাগিয়া ছিল—শয্যাত্যাগ করিল।

মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "ঘুম কি এখন ভেঙ্গে গেল?"

দেবদত্ত কখন মৃণালিনীর নিকট মিথ্যা কথা বলিবার কথা কল্পনাও করিতে পারে নাই; সে বলিল, "না—আগেই ভেঙ্গেছে।"

"ভাল ঘুম হয় নি?"

"না।"

মৃণালিনী মনে বরিলেন, তিনি যাহা স্থির করিতেছিলেন, তাহাই করণীয়। তিনি বলিলেন, "দেবু, আমি ক' দিন থেকেই লক্ষ্য করছি, তুমি যেন বিষণ্ণ—চিন্তিত।"

দেবদত্ত কোন কথা বলিল না।

মৃণালিনী বলিলেন, "আমি—আমরা তোমার বিয়ের আয়োজন করছি। আমরা মনে করেছিলাম, তুমি মনে করবে, আমরা যা' করব, তা' তোমার মঙ্গল হ'বে বলেই করব।"

দেবদত্ত বলিল, "তা'তে আমার কোন সন্দেহই নাই।"

"কিন্তু আমি দেখছি, তুমি বিষণ্ণ।"

দেবদত্ত কোন কথা বলিল না।

"তাই আমি রেণুকে আর কণাকে বলেছি, হয়ত এ বিয়েয় তোমার আপত্তি আছে—আমি তোমাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করব শুনে কণা আমার উপর রাগ করেছে; বলেছে, আমি তোমাকে ইংরেজ ভাবছি। কিন্তু আমি মনে করেছি, তোমায় জিজ্ঞাসা করব।"

দেবদত্ত চুপ করিয়া রহিল।

মৃণালিনী বলিলেন, "আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, এ বিয়েতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

দেবদত্ত বলিল, "আপনি যা' করবেন, তা'তে আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।"

মৃণালিনী লক্ষ্য করিলেন, দেবদত্তের দেহ মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "আমার কাছে তোমার সুখের চেয়ে বড় আর কিছু নাই; আমার জন্য নিজের কষ্ট বরণ করে নিও না।"

দেবদত্ত যেন আর আপনাকে সংযত রাখিতে পারিতেছিল না। সে বলিল, "তা' নয়। তবে—"

মৃণালিনী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেবদত্তের দিকে চহিলেন। দেবদত্ত বলিল, "কিন্তু যে সংসারে মা আপনার ছেলেকে বিলিয়ে দিতে পারেন, সে সংসারে আর ভার বাড়ান কেন?"

যে অভিমান এত দিন তাহার মনে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, আজ সহসা তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। মনের ভার যে লঘু হইল, তাহা সে অনুভব করিতে পারিল না—কারণ, কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেবদত্তের মনে হইল, তাহার কথায় মৃণালিনী আঘাত পাইলেন না ত?

মৃণালিনী কিরূপ আঘাত পাইলেন, তাহা সে প্রথমে অনুমান করিতেও পারিল না—অনুভব করা ত পরের কথা। কিন্তু যে আঘাতে কেহ কেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে, কেহ কেহ তাহা সহ্য করিয়া তাহা প্রহত করিতেও পারে। দেবদত্তের কথা মৃণালিনীর নিকট এমনই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, তিনি মুহূর্ত্তের জন্য যেন প্রাণহীন পাষাণ-প্রতিমার মত প্রতীয়মান হইলেন। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। তাহার পরই তিনি বলিলেন, "তুমি কিন্তু একটা দিকই দেখেছ; আর একটা দিক দেখ নি। সন্তানের কল্যাণ হ'বে বিশ্বাস ক'রে—সে বিশ্বাস ভুলও হ'তে পারে—মা যেমন তা'র সন্তানকে বিলিয়ে দিতে পারে; তেমনই মা'র স্নেহের ক্ষুধায় নিঃসন্তান নারী পরের সন্তানকে বুকে নিয়ে আপনার মনে ক'রে।"

শেষ দিকে মৃণালিনীর গলাটা যেন কেমন "ধরিয়া" আসিতেছিল।

দেবদত্ত কখন মৃণালিনীকে বিচলিতা হইতে দেখে নাই; তাই সে তাহার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিল। সে এতক্ষণ দৃষ্টি নত করিয়াই ছিল; এই বার মুখ তুলিয়া চাহিল—তাহার মনে হইল, মৃণালিনীর দুই চক্ষুতে অশ্রু আসিয়াছে।

সে কি করিয়াছে? দেবদত্ত একেবারে বসিয়া পড়িয়া মৃণালিনীর দুই পদ জড়াইয়া ধরিল; আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "মা, আমি আপনাকে ব্যথা দিয়েছি—আপনি কি আমার উপর রাগ করবেন?"

মৃণালিনী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনিও বসিয়া পড়িলেন; দেবদত্তকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "আমি তোমার উপর রাগ করতে পা'রি না—কেবল তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতেই পারি।"

দেবদত্ত বলিল, "আমাকে আশীর্ব্বাদই করুন—মা, আশীর্ব্বাদই করুন।"

মৃণালিনী তাহার কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিলেন, সে কাঁদিতেছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "আমি রাগ করিনি—করতে পারি না।"

তাহার পর মৃণালিনী আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে চলিয়া যাইলেন।

দেবদত্ত ভাবিতে লাগিল।

৩৮

মৃণালিনী হৃদয়ে যে চাঞ্চল্য অনুভব করিলেন, সেরূপ চাঞ্চল্য তিনি বহুদিন অনুভব করেন নাই। যে দিন বিনা মেঘে বজ্রঘাতের মত সুধীরের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যু-সংবাদ তাঁহাকে শুনিতে হইয়াছিল, সে দিন তাঁহাকে আপনার হৃদয়ের চাঞ্চল্য দমিত করিতে হইয়াছিল—সে কার্য্যে রেণুর সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্যই তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। তিনি কর্ত্তব্যই বড় মনে করিয়া তাহা পালন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে তাঁহার ভগিনীর যে দিন মৃত্যু হয়, সে দিন তাহাতে আকস্মিকতার লেশমাত্র ছিল না; সেই শেষ দিনের জন্য সকলেই বহু দিন হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ? বালক-বালিকারা খেলার জন্য যেমন বেলাবালুতে বালুর গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং সমুদ্রের একটি তরঙ্গ তাহা মুছিয়া দিয়া যায়, তিনি দেবদত্তকে লইয়া আপনার যে ঘর রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আজ তেমনই ভাবে মুছিয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহার চিহ্ন যায় নাই—ভগ্নস্তূপের আকারে পতিত রহিয়াছে। আজ তিনি যেন সত্য সত্যই আপনাকে সংযত করিতে পারিতেছিলেন না।

কিন্তু তিনি অন্যান্য দিনেরই মত যখন স্নান করিয়া ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহার পরিবেষ্টনে তিনি যেন আপনার অভ্যস্ত স্থৈর্য্যের সন্ধান পাইলেন। দেবতার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার সময় যেন ব্যঙ্গের বাতাসে তাঁহার হৃদয় হইতে বেদনার মেঘ দূর হইয়া গেল। তিনি আপনাকে আপনি

বলিলেন—সুখে যাহার অধিকার নাই—সে সুখের আশা কর কেন? তাঁহার অদৃষ্ট ত তাঁহাকে সুখ-সম্ভোগের জন্য প্রস্তুত করে নাই—সে কেবল মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সুখের মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ করিয়া সুখ-লাভের আশার অসারত্বই বুঝাইয়া দিয়াছে। তিনি শৈশবে পিতামাতার স্নেহে বঞ্চিতা; প্রৌঢ়ে তিনি স্বামীকে হারাইয়াছেন ;তাঁহার একমাত্র ভগিনী দীর্ঘ-কাল রোগ ভোগ করিয়া সকল ভোগের অতীত লোকে গমন করিয়াছেন; ভগিনীর একমাত্র সন্তানকে তিনি আপনার সন্তানের প্রাপ্য স্নেহের অধিক স্নেহ দিয়াছেন—সে যে সুখী হয় নাই, তাহা তিনি জানেন। তথাপি তিনি আশা করিয়াছিলেন, তাহার পুত্রকে পুত্র করিয়া তিনি সংসারের সুখ লাভ করিবেন! তিনি প্রথমে কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া তাহাকে লালন-পালনের ভার লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই কর্ত্তব্য যে কিরূপ স্নেহ-সরস হইয়াছিল, তাহা তিনি আজ যত বুঝিতে পারিয়াছেন, পূর্ব্বে কখন তত বুঝিতে পারেন নাই। তাই তিনি আপনাকে আপনি ব্যঙ্গ করিলেন—তিনিই ভুল করিয়াছেন। চলচ্চিত্রে যেমন চিত্রের পর চিত্র দর্শকের চক্ষুর সম্মুখে চলিয়া যায়, আজ তাঁহার মানস-চক্ষুর সম্মুখে তেমনই ঘটনার পর ঘটনার স্মৃতি আত্মপ্রকাশ করিল। সে সবই দুঃখের ছবি।

তিনি পূজার ফুল গুছাইতে গুছাইতে এক বার মনে করিলেন, তিনি যাঁহার সেবা-কার্য্যে সত্যই শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন—তিনি কি তাঁহার সেবিকাকে আজ নূতন শিক্ষা দিলেন? তিনি কি তাঁহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেছিলেন?

ঠাকুর-ঘরের পরিবেষ্টনে যেমন তাঁহার চিত্তের চাঞ্চল্য অপনীত হইয়াছিল, ঠাকুরের স্মরণে তেমনই তিনি তাঁহার অভ্যস্ত ভাব পাইলেন। তিনি যখন পূজায় বসিলেন, তখন তাঁহার মন মেঘমুক্ত আকাশের মত—ভক্তির রবিকরোজ্জ্বল; তাহাতে আর কোন চিন্তাই রহিল না। কিন্তু আজ তাঁহার পূজার পর প্রণাম অন্যদিনের প্রণাম অপেক্ষাও দীর্ঘ হইল। তিনি প্রতিদিনপ্রণামকালে যাহাদিগের মঙ্গল কামনা করেন, তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া আজ দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলেন—তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি যেন আর মায়ায় বদ্ধ না হন—জীবনের অবশিষ্টকাল তাঁহার সেবায়ই কাটাইতে পারেন। তিনি যে দেবদত্তকে সংসারী করিয়া বধূকে দেবসেবায় শিক্ষা দিয়া কোন তীর্থস্থানে যাইয়া—সংসারের সব-আকর্ষণ হইতে দূরে দেবতার চিন্তায় কালাতিবাহিত করিবেন—এ কল্পনা তিনি পূর্ব্বেও করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তাহা সুদূরে ছিল; আজ একটি ঘটনায় যাহা দূরে ছিল, তাহা একান্ত নিকটস্থ হইল। কল্পনা যখন সঙ্কল্পে পরিণত হইল, তখন তিনি মনে সম্পূর্ণ শান্তিলাভ করিলেন।

কি একটা কাযে ঠাকুর-ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনি দেখিলেন, দেবদত্ত সেই ঘরের দ্বারপার্শ্বে বসিয়া আছে! তাহার মুখ ম্লান—চিন্তার ভাবে পূর্ণ। যে বয়সে মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না—সেই বয়সে তাহার মুখে চিন্তার ছায়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক বোধ হয় এবং তাহা সহজেই লক্ষিত হয়।

মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে ব'সে কেন, দেবু?"

দেবদত্ত বলিল, "আপনার জন্য।"

"কেন?"

অভিমানে দেবদত্তের বাক্যস্ফুরণে বিলম্ব হইল—তিনি কি বুঝিতে পারেন নাই, কেন সে আসিয়া বসিয়া আছে? আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "আমি অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।"

তাহার কথায় মৃণালিনীর অন্তরে স্নেহ উথলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমি কি তোমার উপর রাগ করতে পারি?"

"সে কথা আপনি বলেছেন; কিন্তু বলেন নি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন।"

মৃণালিনী তাহাকে তুলিয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ক্ষমা কি আবার চাহিতে হয়?"

দেবদত্ত বলিল, "আপনি তা'ই বলুন, আমি অপরাধ করলেও আপনার কাছে ক্ষমা পা'ব—চাহিবার আগেই তা' পাব।"

"তা'তে কি তোমার সন্দেহ আছে, দেবু?"

"সন্দেহ ছিল না—থাকবেও না; কিন্তু আজ সন্দেহ হয়েছিল; তাই তা' ভঞ্জন না ক'রে কিছুতেই শান্ত হ'তে পারছিলাম না।"

তাহার পর সে বলিল, "আবার অপরাধ করলাম; ঠাকুর-ঘরের কাষ শেষ হয় নি, ছুঁয়ে দিলাম।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ত ছোঁও নি—আমিই তোমাকে ছুঁয়েছি।"

"আবার স্নান করতে হ'বে?"

"তা'তে কি?"

তিনি বলিলেন, "খেয়েছ?"

"না।"

"কি পাগল

তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেবুর খাবার দাও নি?"

ভৃত্য বলিল, "আমি খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম, দাদাবাবু খেলেন না।"

"যাও, দেবু, খাও গে—পিত্ত পড়ছে।"

দেবদত্ত চলিয়া গেল; তাহার বক্ষে যে বেদনা গুরুভার প্রস্তরের মত ছিল, তাহা তখন অপসারিত হইয়াছে।

মৃণালিনী আবার স্নান করিতেই গমন করিলেন—ভাবিতে ভাবিতে যাইলেন, এ ছেলের উপর রাগ বা অভিমান করিবারও উপায় নাই। কিন্তু ইহার বন্ধনই তাঁহাকে ছিন্ন করিতে হইবে। কেন তাহা করিতে হইবে, তাহা তিনি বুঝিয়াছেন।

সেই দিন কণা বিবাহের জন্য কতকগুলি জিনিষ দেখাইতে রেণুকে লইয়া মৃণালিনীর নিকট উপস্থিত হইল। সে মৃণালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার ত আপনি বলবেন না, দেবুকে জিজ্ঞাসা করবেন?"

মৃণালিনী বলিলেন, "না। ও আর আপত্তি করবে না।"

তিনি কেন "আর" বলিলেন, তাহা কণা জিজ্ঞাসা করিল না—রেণু তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে-ও সে কথা আর বলিল না।

কণা বলিল, "বাঁচা গেল।"

মৃণালিনী বলিলেন, "না হয়, তুমিই এক বার জিজ্ঞাসা কর।"

"আচ্ছা"—বলিয়া কণা দেবদত্তের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। দেবদত্ত একখানা পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছিল।

কণা বলিল, "তোমার বিয়ের সব ঠিক ক'রে ফেলছি। কি বল?

দেবদত্তের মুখ সহসা যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কি কিছু বলেছেন?"

"না তিনি প্রথমে বলেছিলেন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। আজ তিনি বললেন, তুমি আপত্তি করবে না।"

দেবদত্ত স্বস্তির শ্বাস ফেলিল, "তিনি যা' করবেন, তা'র উপর কি আমার কোন কথা থাকতে পারে?"

"তাই ত আমার শ্বশুর সে দিন বলছিলেন—আমাদের শাস্ত্রকাররা পিতাকে ধর্ম্ম ও স্বর্গ বলেছেন, আর বলেছেন—মা স্বর্গ হ'তে গরীয়সী।"

দেবদত্ত যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। মা যদি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী হয়েন, তবে যিনি মা না হইয়াও মাতার অধিক, তাঁহাকে কি মনে করিতে হয়? সে আজ তাঁহার মনে ব্যথা দিয়াছে

তিনি যে বলিয়াছেন, সে আর বিবাহে আপত্তি করিবে না, তাহাতে তাহার মনে হইল, তিনি সত্যই তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। তাহা মনে করিয়া সে যেন অগাধ শান্তি লাভ করিল।

কণা বলিল, "তা'হ'লে আমরা সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলছি।"

দেবদত্ত বলিল, "মা যা' বলবেন, তা'ই হ'বে।"

কণা যদি দেবদত্তকে ভালরূপ না জানিত, তবে সে হয়ত মনে করিত, এই মাতৃভক্তির সঙ্গে যুবকের হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেমাসক্তির মিশ্রণও আছে। কিন্তু সে তাহা মনে করিতে পারে না। তাই সে মৃণালিনীর নিকটে আসিয়াই বলিল, "সত্যই দিদিমা, আপনি যাদু জানেন। এমন ছেলে করেছেন যে, কেবল এক কথা—মা যা' বলবেন, তা'ই হ'বে।"

আকাশে যেমন বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়—মৃণালিনীর মনে তেমনই বেদনা চমকিয়া গেল। সে দিন প্রভাতের ঘটনা! কিন্তু তিনি তাহা বলিতে পারেন না—বলিবেন না। বিশেষ রেণু যদি তাহা শুনে, তবে ছেলের দারুণ অভিমানের কথা তাহাকে কিরূপ বেদনা প্রদান করিবে, তাহা অনুমান করিয়া তিনি স্থির করিলেন, তাঁহার সেই বেদনা তিনিই সহ্য করিবেন—আর কাহাকেও তাহা জানিতে দিবেন না।

তিনি হাসিয়া কণাকে বলিলেন, "মা, দিদিমা—এরা কি যাদু জানে? যাদু কে জানে, তা' নাতজামাইকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে। দেবুর ত এখনও সেই যাদুকরী আসেন নি।"

কণা বলিল, "এ কথায় কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারি না, দিদিমা। আপনি সকলকেই যাদু করেন—আপনার ব্যবহারে—"

মৃণালিনী বলিলেন, "সে দিন দেবুর একখানা বহিতে সাপের কথা পড়ছিলাম। এক রকম সাপ তা'র দৃষ্টিতেই শিকার আকৃষ্ট করে। আমাকে কি সেই দলের বলতে চাও?"

"তা' নয়, দিদিমা, দেবতারা তাঁ'দের আশীর্ব্বাদেই সকলকে আকৃষ্ট করেন।"

"আমাকে বুঝি দেবতা দেখেছ? 'শালুক চিনেছেন—গোপাল ঠাকুর।' মানুষকে দেবতা বলতে নাই।"

তিনি উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিলেন।

কণা বলিল, "দেবতা কখন দেখিনি—কিন্তু আপনাকে দেখে দেবতার ধারণা করতে পারি।

আমি বলে দিচ্ছি, আপনি আমার মা'কে, আমাদের সকলকে যেমন মুগ্ধ করেছেন, বৌকেও তেমনই মুগ্ধ করবেন। দেবুর মত সে-ও বলবে 'মা মা' বলুবেন তা'ই হ'বে'।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "সে আর ক' দিন?"

"কেন, দিদিমা? মরণের কথা কি কেউ বল্‌তে পারে?"

"এমন ভাগ্য কি ক'রে এসেছি, দিদি, যে, এখনই পলাতে পারব? তবে সংসারের পাঁক ত অনেক দিন ঘাঁটলাম—এইবার ছুটী।"

"কিন্তু পাঁকের মধ্যে থেকেও যে আপনি কখন পাঁক মাখেন নি!"

মৃণালিনী কথাটা আর অগ্রসর হইতে দিলেন না;—বলিলেন, "এখন জিনিষ কি কি হ'ল, আর কি কি বাকি দেখ।"

তখন কণা ও রেণু তাঁহার সঙ্গে জিনিষগুলির আলোচনা করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে মৃণালিনী বলিলেন, "আচ্ছা রেণু, তোমরা বৌমা'কে আননি কেন? তোমার মেয়ে যেন আর কাউকে কর্ত্তৃত্ব করতে দেবে না।"

কণা বলিল, "কি ঝগড়া করবার আগ্রহ! দোষ আমার নয়—আপনার মেয়ের। আমি তা'কে আন্‌তেই চেয়েছিলাম—মা বললেন, আমাদের ফিরতে দেরী হ'বে—বাবার চা ক'রে দিতে হ'বে।"

"তা' না হয়, তা'র আগেই যা'বে। সে বাড়ীর এক বৌ—তা'তে কনের দিদি। তা'কে আনিয়ে নেওয়া যাক'।"

তখন সেই জন্য গাড়ী পাঠান হইল।

এইরূপে দেবদত্তের বিবাহের আয়োজন হইল এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল।

বিবাহের পূর্ব্ব হইতে পরে কয় দিন আর সকলের আনন্দে অতিবাহিত হইল বটে, কিন্তু তিন জনের তাহা হইল না।

মৃণালিনীর মনের চাঞ্চল্য কেহ বুঝিতে পারিল না বটে, কিন্তু সে চাঞ্চল্য অসাধারণ। কত দিনের কত কথা তাঁহার মনে পড়িতেছিল—তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছিল। ভগিনীর কথা তাঁহার পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতেছিল—দেবদত্ত তাহার স্নেহের অবলম্বন কন্যার পুত্র—একমাত্র সন্তানের একমাত্র সন্তান। আর সঙ্গে সঙ্গে সুধীরের কথা—সেই পূতচরিত্র, তাঁহার সোদরাধিক সুধীর—সে তাহার কন্যাকে কত ভালবাসিত এবং কন্যা যে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, সেই বেদনা তাহাকে কিরূপ আহত করিয়াছিল, সে সব মৃণালিনী জানিতেন। আজ তাহারা কেহই নাই।

রেণুর মনে যে ব্যথা, তাহা কে বুঝিবে? তাহার জীবন কি কেবল দাবদাহই নহে? এক এক বার তাহার মনে হইতেছিল, অভিমানবশে সে ভুল করিয়াছে—সে যদি দেবদত্তকে মাসীমা'কে না দিত, তবে হয়ত তাহার বেদনার দাবদাহ স্নেহের স্নিগ্ধ বর্ষণে নির্ব্বাপিত হইতে পারিত। সে সংসারে নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছে—সম্মুখে স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ-সলিল থাকিতে যে ইচ্ছা করিয়া তৃষ্ণায় কাতর হয়, তাহার অবস্থা তাহারই মত। তাহার স্বামী, তাহার পুত্র—সে তাহার সংসার আপনার মনে করিতে পারিত। কণা ও অশোক তাহাকে মা বলিয়াই মনে করিয়াছে। পূর্ণিমা তাহাকে কন্যার মত স্নেহ দিয়াছেন। স্বামীর ব্যবহারে এক দিনের সেই অসতর্ক উক্তি ব্যতীত সে আর কোন ত্রুটি এই দীর্ঘকালে কখন পায় নাই। সেই অসতর্ক উক্তি যে তাঁহার সন্তান-স্নেহের ফল, তাহা সে এখন আর সন্দেহ করে না। কিন্তু সেই ত্রুটির জন্য সে তাঁহার যে দণ্ডবিধান করিয়াছে, তাহাও অসাধারণ। যাঁহার সন্তানস্নেহ অতি প্রবল, তিনিই পুত্র দেবদত্তকে আপনার বলিবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন। এই সব কথা সে যতই ভাবিয়াছে ততই বেদনানুভব করিয়াছে।

দেবদত্তও চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। মৃণালিনীর অসীম স্নেহ যে তাহাকে অভিমানপ্রবণ করিয়াছে, তাহা সে তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছিল। সে দিনের সেই কার্য্যের জন্য দুঃখ সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাহার পর সে যতই আপনার মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়াছে, ততই তাহার মনে হইয়াছে—সেরূপ অভিমানপ্রবণতা কখন মানুষকে সুখী করিতে পারে না। কিন্তু তাহাই যে তাহার প্রকৃতিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। সেইজন্য সে চিন্তিত হইয়াছিল। সে নূতন জীবনে প্রবেশ করিল—এই জীবনে যে পর ছিল, তাহাকে আপনার করিতে না পারিলে অসুখ অনিবার্য্য, যাহাকে আপনার করিতে হইবে, সে-ও ত অভিমানপ্রবণ হইতে পারে। দেবদত্ত এই সব কথা ভাবিতেছিল।

আর নীরেন্দ্র? সে তাহার পরিপূর্ণ সংসারের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়াও সুখ পায় নাই—কিন্তু যে তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহাই সে সানন্দে বরণ করিয়া লইয়া

সুখের শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে প্রয়াস করিয়াছে। রেণু সংসার তাহার কর্ত্তব্যক্ষেত্র মনে করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছে—তাহাতে কোনরূপ সুখের সন্ধান বা কোনরূপ সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা করে নাই। নীরেন্দ্র—স্বভাবতঃ দুর্ব্বল নীরেন্দ্র সে দৃঢ়তার অনুশীলন করিতে পারে নাই; তাই সে তাহার কর্ত্তব্যের মধ্যেই সুখের সন্ধান করিয়াছে এবং তাহাতেই অভ্যস্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় সে আশা ত্যাগ করিতে পারে নাই। কণার ও অশোকের বিবাহের পর সে আশা করিয়াছিল, হয়ত রেণুর ভাবের পরিবর্ত্তন হইবে—এ বার—দেবদত্তের বিবাহেও সে আশা করিতেছিল, তাহা কি হইতে পারে না? তাহার অনেক আশাই হতাশায় পরিণত হইয়াছে—এ বারও কি তাহাই হইবে? কে তাহা বলিতে পারে? কিন্তু তবুও সে আশা ত্যাগ করিতে পারিল না।

দেবদত্তের বিবাহের উৎসব শেষ হইয়া গেল।

৩৯

বিবাহের পর সাংসারিক সব ব্যবস্থার কথা উঠিল। কণা বলিল, "দিদিমা, কমলা কি পড়বে?"

মৃণালিনী দৃঢ় ভাবেই বলিলেন, "না।"

"ও কিন্তু খুব ভাল পড়ছিল?"

"বেশ ত—নিজে পড়বে, দেবুর কাছে পড়বে।"

"দেবুর কি কলেজের পড়া প'ড়ে আবার সময় থাকবে।"

"দেবুর ত আর কলেজে পড়া হ'বে না।"

"কেন, দিদিমা?"

"পড়া যদি জ্ঞানলাভের জন্য হয়, তবে তা' অনিবার্য্য কাযের অবসরে অনায়াসে হ'তে পারে।"

কণা হাসিয়া বলিল, "তা' যে বুড়া বয়সেও হ'তে পারে তা' আপনিই দেখিয়েছেন।"

"যদি তা'-ই হয়, তবে সে-ই ত ভাল। আমি যেমন ছেলের জন্য পড়েছি, কমলাও তেমনই পড়বে, আপনার ছেলেমেয়েদের পড়া'তে পারবে। মা'র চাইতে ভাল শিক্ষক কি হ'তে পারে?"

"দেবুর পড়ায় যে আগ্রহ—ও কিন্তু পড়া ছাড়তে হ'লে দুঃখিত হ'বে।"

"পড়া ছাড়বে কেন? কলেজে পড়া বন্ধ করবে।"

"কেন?"

"আমি ওকে বিষয়ের কায শিখাবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু সকল সময় ওর অবসর হয় নি। এখন ওকে সব বুঝে নিয়ে আপনি কায করতে হ'বে। যে ভার এতদিন বহেছি, আজ যখন যা'বার ডাক এসেছে, তখন তা' দুর্ব্বহই বোধ হচ্ছে।"

"আপনাকে এখন ছাড়বে কে?"

"ও কথা আর যেন ব'ল না, দিদি। কমলাকেও আমি সংসারের কায, ঠাকুরসেবা সব শিখিয়ে দিতে চাই।"

"সে ত ভালই। বিশেষ, এ বার দেখছি, আপনি বুড়া হয়েছেন। এই বিয়ের পরিশ্রমে আপনাকে যেন দশ বৎসর বেশী বয়সের মনে হচ্ছে।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "বয়সের যে 'গাছ পাতর' নাই। যখন ভাবি, তখন আপনিই চম্‌কে উঠি—কত দিন হয়ে গেল! আর সব চ'লে গেছে—একা প'ড়ে আছি।"

কি চিন্তায় ও কি বেদনায় মৃণালিনীর বয়স যেন দশ বৎসর অধিক হইয়াছে মনে হইতেছিল, তাহা কি কণা অনুমান করিতে পারে? দেবদত্তের কথায় জন্য তিনি রাগ করেন নাই—কিন্তু তাহার বেদনা হইতে ত তিনি অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই! বাণ যদি একবার বিদ্ধ হয়, তবে তাহা উৎপাটিত করিলেও আহত স্থান অনেক সময় স্বাভাবিক অবস্থা পুনরায় প্রাপ্ত হয় না—অনেক সময় সেই আঘাতের ফলে সমস্ত দেহে স্বাস্থ্যের অভাব ঘটে।

কিন্তু কেবল দেবদত্তের কথাই নহে, তাহার সঙ্গে—আরও অনেক কথা আছে। তিনি যে দেবদত্তের বিবাহ দিয়া ধর্ম্ম-চর্চ্চায় জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিবেন, তাহা তাঁহার কল্পনা ছিল—এখন সঙ্কল্প হইয়াছে। তিনি যে ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহাতে গৃহে থাকিয়াও যে সে কায করা যায় না, তাহা নহে; বিশেষ এই গৃহ তাঁহার নিকট যেমন দেবমন্দির, তেমনই দেবতার স্মৃতিপূত মন্দির। বধূরূপে বালিকাবয়সে তিনি এই গৃহে আসিয়াছিলেন—জীবনের সব সুখ তিনি এই গৃহেই লাভ করিয়াছেন—এই গৃহেই তিনি জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের সব স্মৃতি এই গৃহের সহিত বিজড়িত। এই গৃহ তিনি ত্যাগ করিয়া যাইবেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, হয়ত তিনি গৃহে থাকিয়াই সংসারের সব কার্য্য ত্যাগ করিবেন—করিতে পারিবেন। কিন্তু দেবদত্তের সে দিনের কথায় দেবতা যেন তাঁহাকে তাঁহার ভুল বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন—আমাদিগের শাস্ত্রের যে উপদেশ "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ"—তাহার বিশেষ সার্থকতা আছে—সংসার গতিশীল, পরিবর্ত্তনশীল—কিন্তু মানুষ সকল সময়

সেই গতির ও সেই পরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। তাই পরবর্ত্তীদিগকে শিক্ষা দিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া অবসর গ্রহণ করাই ভাল। তিনি তাহাই করিবেন।

কিন্তু স্থির করিলেই কায সহজসাধ্য হয় না। মৃণালিনীর পক্ষেও তাহা সহজসাধ্য হইতেছিল না। গৃহদেবতা—সে-ও তাঁহার স্বামীর দান, আর স্বামীর স্পর্শপূত দ্রব্যাদি—সে সব তিনি যে ভাবে রাখিয়া মগযাত্রা করিয়াছিলেন, মৃণালিনী সেই ভাবেই রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন—এই সব ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। ইহার মধ্যে যে বেদনা আছে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? যখনই সে কথা তাঁহার মনে হইয়াছে, তখনই তিনি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—যে দিন তাঁহাকে এ সব ত্যাগ করিয়া যাইতেই হইবে—তিনি থাকিবেন, মনে করিলেও এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে পারিবেন না—সে দিনও ত নিকটবর্ত্তী। তবে আর কেন? আর ইহা ত দেবদত্তের প্রতি তাঁহার স্নেহেরও পরীক্ষা। তিনি যদি তাহার প্রতি স্নেহবশে তাহাকে যাহা মৃত্যুর পরে দিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহা মৃত্যুর পূর্ব্বেই দিতে না পারেন, তবে তাঁহার স্নেহও কার্পণ্যদুষ্টই হইবে।

তিনি কোথায় যাইবেন এবং গৃহদেবতা সঙ্গে লইয়া যাইবেন কি না, এই দুইটি বিষয় তাঁহাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইয়াছিল।

গৃহদেবতা সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বেই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ছিলেন। গৃহদেবতা গৃহেই থাকিবেন; তাঁহাকে তাঁহার গৃহ হইতে কোথাও লইয়া যাইবার অধিকার তাঁহার নাই। দেবদত্তকে যখন তিনি দেবসেবার অধিকারী করিয়াছেন, তখন সে ভার তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

বাস্তবিক বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া মৃণালিনী যে ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে ধারণায় তিনি—দেবতার আশীর্ব্বাদে—উপনীত হইয়াছিলেন।

তিনি যখন গৃহ হইতে যাইয়া কোথাও ধর্ম্মাচরণ করিবার কথা বলিতেন, তখন দেবদত্তের মনে হইত তিনি কেন কোথাও যাইতে চাহিতেছেন? কবি গোল্ডস্মিথের ধর্ম্মযাজকের বর্ণনা তাহার মনে পড়িত—তিনি ত্যাগ ও ভগবানে নির্ভরশীলতার অনুশীলন করিয়া পরলোকের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং এই জগতেই তাঁহার স্বর্গ আরম্ভ হইয়াছিল। সে কথা সে এক দিন মৃণালিনীকেও বলিয়াছিল। শুনিয়া মৃণালিনী বলিয়াছিলেন, "আমাদের কি সে সাধনা আছে? তুমি ত জনক রাজার কথা শুনেছ—তিনি রাজা হয়েও রাজর্ষি ছিলেন। তিনি আদর্শ। কিন্তু ক' জন আদর্শের মত হ'তে পারে? তা' ছাড়া যা'কে আমরা 'স্থান-মাহাত্ম্য' বলি, সে-ও বিবেচনা করতে হয়। যে স্থান দেবতার রাজধানী—প্রতিদিন হাজার হাজার লোক—লক্ষ 'শালগ্রামে গড়া কোটি ভক্ত মন্ত্রপড়া' রত্নবেদীতে দেবতার পূজা ক'রে জীবন সার্থক মনে করে, সেখানে যে পরিবেষ্টন থাকে, তা' মানুষকে মায়ামুক্ত করে।"

তাহাতে দেবদত্ত বলিয়াছিল, "কিন্তু আপনি ত বাড়ীতেই সেই পরিবেষ্টনের সৃষ্টি করেছেন।"

"মানুষ মোহবদ্ধ। তোমার যদি 'মাথা ধরে' তবে যে স্থির থাকতে পারি না, দেবু।"

"কিন্তু আপনি যেখানে যা'বেন, সেখানেই কি আমাদের বিপদে আপদে স্থির থাকতে পারবেন?"

"তা' হয়ত পারব না। আশীর্ব্বাদ করি, অস্থির হ'বার কারণ যেন না হয়—তোমরা সকলেই যেন সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আমাকে আর কোন সংবাদ দিও না।"

"আপনি দেখবেন, আমার মাথা ধরবার আগেই আমি আপনার কাছে যা'ব।"

"না, দেবু, তা' কর না।"

কিন্তু তখন দেবদত্ত মনে করে নাই, সত্য সত্যই তিনি চলিয়া যাইবেন। মৃণালিনীও কবে যাইবেন মনে করেন নাই।

এখনও তিনি পূর্ব্বাহ্নে সে কথা কাহাকেও বলিলেন না; কেবল আপনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার আয়োজন দেখিয়া দেবদত্তের মনে সন্দেহ হইল, সত্যই তিনি যাইবেন।

প্রায় ছয় মাসে মৃণালিনী এক দিকে যেমন দেবদত্তকে সম্পত্তিসম্পর্কীয় কার্য্যভার বুঝাইয়া দিলেন, অপর দিকে তেমনই কমলাকে সংসারের কায—সর্ব্বোপরি ঠাকুর-ঘরের কায শিখাইয়া দিলেন। দেবদত্তের তুলনায় কমলার শিক্ষায় বিলম্ব হইল—কারণ, সংসারের কাযে যত খুঁটিনাটি থাকে, বৈষয়িক ব্যাপারে তত থাকে না; গৃহিণীর কায সহজসাধ্য নহে। বিশেষ যখন সেই কাযের মধ্যে দেবসেবার কায থাকে, তখন তাহার দায়িত্ব ও গুরুত্ব উভয়ই অধিক হয়। মৃণালিনী হাতে হাতে সব কায কমলাকে শিখাইতেন—আর বলিতেন, "এখন এ সব তোমার ভাল লাগছে না, জানি—কিন্তু ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ যদি লাভ কর, তবে ভাল লাগবে।" তাহাতে কমলাব লিয়াছিল,

"আমার ত ভাল লাগে। বাড়ীতে পিসীমা আমাদের ঠাকুর-ঘরের কাযে সঙ্গে নিয়ে যেতেন—" মৃণালিনী বলিয়াছিলেন, "এ বুঝি তোমার বাড়ী নয়?"—লজ্জা পাইয়া কমলা বলিয়াছিল, "আমার ভুল হয়েছে। পিসীমা বল্‌তেন, ঠাকুর-ঘরের কাযে যে সুশিক্ষা হয়, তা' আর কিছুতেই হয় না। তিনিই এক দিন বলেছিলেন, মা যখন কণেবৌ আসেন, তখন একটু চঞ্চল ছিলেন, তাই তাঁ'র খুড়শাশুড়ী তাঁ'কে ঠাকুর-ঘরে নিয়ে যেতেন; তিনি মা'কে প্রতিদিন 'মালা করাতেন,' বল্‌তেন, ওতে মনঃসংযোগ হয়। মা সে মালা আজও জপ করেন; আবার তাঁ'র কাকীমা মরবার সময় তাঁ'র স্ফটিকের মালা মা'কেই দিয়ে গেছেন, 'যদি বুঝ বৌরা কেউ জপ করবে না, তবে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দেবার ব্যবস্থা ক'রবে।' শুনিয়া মৃণালিনী প্রফুল্ল মুখে বলিয়াছিলেন, "দেবতার সেবার ব্যবস্থা দেবতাই করেন—আমরা কিছুই নহি।"

যখন কয় মাসে মৃণালিনী দেখিলেন, দেবদত্ত যেমন তাহার কাযে, কমলা তেমনই তাহার কাযে অভ্যস্ত হইয়াছে, তখন তিনি এক দিন রেণুকে ও কণাকে আনাইলেন। তিনি বলিলেন, "এইবার আমার ছুটী।"

কণা বলিল, "সে কি?"

"আমি যা'ব।"

"কোথায়?"

"সেইটুকুই এখনও স্থির করতে পারি নি। কখন বাড়ী ছেড়ে যেতে পারি নি। এখন যা'দের ভার তা'দের দিয়ে এক বার তীর্থদর্শনে যা'ব—যে স্থানে দেবতা চরণে আশ্রয় দিবেন, সেই স্থানেই থাকব।"

"কেন, দিদিমা, দেবতা কি আপনাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?"

"তাঁ'র ইচ্ছা নহিলে কি যেতে পারতাম?"

"এখন যাওয়া হ'বে না। কমলার ছেলে না দেখে আপনি যেতে পারবেন না।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার হয়ে দেখবে। রেণু রহিল, আমার ভাবনা কি?"

"ও সব বদলীতে চলে না, দিদিমা।"

"কি বলব বল, তোমার দাদা থাকলে তোমাকেই বদলী দিয়ে যেতাম।"

"ও সব কথা রাখুন, যাওয়া হ'বে না।"

মৃণালিনী কেবল একটু হাসিলেন।

রেণু মাসীমা'র কথা শুনিল। সে যেন সকল আঘাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। মাসীমা যাইলে তাহার বেদনায় সান্ত্বনালাভের—জুড়াইবার শেষ স্থানও যাইবে। কিন্তু সে সেই জন্য কখন তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিবে না। কারণ, সে জানিত, তিনি বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া কোন কায করেন না। নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণে তিনি এই সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাই কণা যখন তাহার উপর অভিমান করিয়া বলিল, "একি, মা—তুমি কিছু বলবে না? তুমি বারণ করলে তোমার মাসীমা কখন যেতে পারবেন না।" তখন রেণু বলিল, "এখন ত, মা, তোমাদেরই অধিকার; তোমরা যদি না পার—আমি কি পারব?"

মৃণালিনী রেণুকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কণাকে বলিলেন, "আমার মেয়ে কি ওর মেয়ের মত যে, মা'র কাযে বাধা দেবে?" তিনি যে ভাবে রেণুকে আদর করিলেন, তাহাতে মনে হইল, রেণু যে আর ছোটটি নাই, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। স্নেহ কালের ব্যবধান ভুলাইয়া দেয়।

যাহার যত আপত্তি সবই খণ্ডন করা গেল বটে, কিন্তু দেবদত্ত যখন আসিয়া বলিল, "মা, আপনি কি আমার উপর রাগই করেছেন?" তখন তাহার উত্তর দেওয়া মৃণালিনীর পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। শেষে তিনি বলিলেন, "আমি তীর্থদর্শনে যা'ব—তীর্থক্ষেত্রে বাস করব। তোমারই ত আগ্রহ ক'রে সে ব্যবস্থা করবার কথা, দেবু!"

দেবদত্ত বলিল, "আমি কোন কথা শুনব না। আমি আপনাকে যেতে দেব না। যদি আপনি যা'ন আমি বুঝব, আপনি আমাকে ক্ষমা করেন নি।"

"অমন কি বল্‌তে আছে?"

মৃণালিনী দেবদত্তের মস্তকে করতল রক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ কথা মনে রেখ না।"

দেবদত্তের মনে যে চাঞ্চল্য অনুভূত হইতেছিল, তাহা শান্ত করিবার জন্যই সে মৃণালিনীর কোলের উপর মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল—"সে, হ'বে না, মা।"

মৃণালিনী তাহার কেশের মধ্যে সস্নেহে অঙ্গুলী চালন করিতে করিতে বলিলেন, "এখন বুঝতে পারছি, কমলা কেন ক' দিন থেকে কেবল বলছে, 'মা, যাওয়া হ'বে না।' সে তোমারই শিখান।"

"না, মা, তোমার বৌয়ের কান্নায় আমি যখন কোন সান্ত্বনাই দিতে পারলাম না, তখন বল্‌লাম, 'তুমি যে বল, মা আমার চাইতেও তোমাকে ভালবাসেন—দেখ দেখি, কেমন মা'কে রাখতে পার।' শিখাতে আর হয় নি।"

"আহা, ছেলেমানুষ ক' দিন কাঁদছে!"

"আপনি না গেলেই ত কান্না বন্ধ হয়।"—বলিতে বলিতে দেবদত্ত কাঁদিয়া ফেলিল।

মৃণালিনী তাহাকে বলিলেন, "গল্প আছে, এক জন জগন্নাথদর্শনে গিয়ে বাড়ীতে যে পুঁইমাচার কথা ভাবছিল, তা'ই দেখেছিল। তোমরা কি চাও যে, আমি তীর্থে গিয়ে তোমাদের কান্না মুখই দেখি?"

বাস্তবিক মৃণালিনী যদি সঙ্কল্পের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে না পারিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে যাওয়া দুষ্কর হইত।

তাঁহার সঙ্কল্প বিচলিত হইবে না বুঝিয়া শেষে দেবদত্তই প্রস্তাব করিল—তিনি যদি তীর্থদর্শনে যাইতেই চাহেন, তবে তাহাতে সে আপত্তি করিবে না; কিন্তু তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং সে তাঁহার সঙ্গে যাইবে।

এই প্রস্তাব যখন কথা তাঁহাকে জানাইল, তখন মৃণালিনী মনে করিলেন, পরের কথা পরে হইবে, এখন যাওয়া হউক। তবে তিনি বলিলেন, "দেবু আমার সঙ্গে যা'বে, সে কি কখন হ'তে পারে?"

দেবদত্ত বলিল, "কেন হ'তে পারে না?"

"এ বাড়ীর ভার, কমলার ভার, ঠাকুরসেবার ভার, তুমি কা'র উপর দিয়ে যা'বে?

কমলা বলিল, "আপনি যেমন ভাল হয় ব্যবস্থা করুন। আমিও সঙ্গে যা'ব।"

মৃণালিনী বলিলেন' "যত কথা বলেছি, সবই তাসের ঘর হ'ল—একটু বাতাসেই পড়ে গেল।"

"কেন?"

"যে ঠাকুরের সেবা আমি এক দিন আর কাউকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারিনি, সেই ঠাকুরের সেবার ভার আমি তোমাকে দিয়েছি। তুমি সে ভার ফেলে যেতে পারবে না, কমলা।"

শেষে মৃণালিনীর কথাই থাকিল—তাঁহার যাত্রার আয়োজন হইল। তাঁহার যে দাসী দীর্ঘকাল তাঁহার কাছে ছিল, তিনি তাহাকে নানা তীর্থ দর্শন করাইয়া আনিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে কমলার কাছে রাখিয়া যাইবেন, স্থির হইল। সে বলিল, "মা, তোমার যে অসুবিধা হ'বে।"

মৃণালিনী উত্তর দিলেন, "কেবল কি নিজের সুবিধাই খুঁজব? তীর্থেও অসুবিধা!"

শেষে সে এক দিন মৃণালিনীকে বলিল, "কিন্তু, মা, ব'লে রাখছি, যদি সত্য সত্যই তীর্থবাসী হও, তবে যেন আমাকে ফেলে যেও না।"

মৃণালিনী বলিলেন, "ঠাকুর করুন, তোর কথাই ফলুক।"

যাত্রার "দিন দেখিবার" কথায় মৃণালিনী বলিলেন "আমার জন্যও দিন দেখতে হবে?"

দিন স্থির হইল।

সকলে যাইয়া মৃণালিনীকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। আসিবার সময় দেবদত্ত অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না—আর রেণু যেন পাষাণ প্রতিমার মত রহিল। তাহার মনে হইল—মা নাই, পিতা নাই, শেষে যিনি ছিলেন, সেই মাসীমাও চলিয়া যাইলেন। সে আজ একা—কেবল একা নহে, সংসারে লোক যাহাকে সব বলে, সেই সব থাকিতেও সে একা। অদৃষ্টের এ কি দারুণ উপহাস।

৪০

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। মৃণালিনীর মনে হইল, তিনি যে চেষ্টায় আপনাকে তাঁহার জীবনের সব বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন—সে চেষ্টায় তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; কিন্তু সে চেষ্টা যে তিনি করিয়াছেন, তাহা অন্তরের প্রেরণায়। তিনি ভাবের আবেগে বা উত্তেজনায় তাহা করেন নাই। তাঁহার মনে হইয়াছে, দেবতা তাঁহাকে যাহা দেন নাই, তিনি তাহা পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—ভুল করিয়াছেন। তাই তিনি সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। যে দীর্ঘকাল তিনি সংসারে থাকিয়াও আপনাকে বন্ধনহীন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই দীর্ঘকালের মধ্যে কি তাঁহারও অজ্ঞাতে—অপ্রত্যাশিত বন্ধনের উদ্ভব হয় নাই? রেণুর পুত্রকে তিনি যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কি নারীর স্বাভাবিক স্নেহের জন্যই নহে? আর তাহার ফল কি ভালই হইয়াছে? রেণু যদি দেবদত্তকে তাহার জন্মগত অধিকারে আপনার অঙ্কেই রক্ষা করিত, তবে হয়ত সে তাহার তাপতপ্ত জীবনে শান্তি পাইত। সে যে তাহা পায় নাই, তাহা তিনি জানেন।

তবুও যদি তীর্থযাত্রার আকর্ষণ না থাকিত, তবে হয়ত তাঁহার দৌর্ব্বল্য তাঁহাকে অভিভূত করিত। কারণ, বিদায়কালে তিনি দেবদত্তের নয়নে যে অশ্রু দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছিল।

তিনি যখন দীর্ঘ দিনের দীর্ঘ স্মৃতি লইয়া তন্ময় ছিলেন, তখন ট্রেণ দ্রুত পথ অতিক্রম করিতেছিল। কিন্তু ট্রেণের গতি কখন চিন্তার গতির সমান হয় না। দেবদত্ত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কি ভাবিতেছে—সে তাঁহাকে নির্ম্মম মনে করিয়াছে কি না, এই সব

কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল। বুঝি তাঁহারও অজ্ঞাতে একটি দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল।

তাহার পর মৃণালিনী দেবতাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া স্নেহভাজনদিগের কল্যাণ কামনা করিয়া শয়ন করিলেন।

নীরেন্দ্র ও কণার শ্বশুর উভয়ে মৃণালিনীর জন্য তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়াছিলেন। সে ব্যবস্থা যে সর্ব্বতোভাবে পালিত হইল, তাহা নহে; কারণ, কোন কোন স্থানে যাইয়া মৃণালিনী তীর্থের আকর্ষণে ব্যবস্থা-নির্দ্দেশ অতিক্রম করিলেন। কিন্তু কোথাও দীর্ঘ দিনের জন্য নির্দ্দেশ অতিক্রম করিতে পারিলেন না; কারণ, সকলেই বলিয়া দিয়াছিলেন—নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে তিনি সকলের সংবাদ পাইবেন এবং তাঁহারাও তথা হইতে তাঁহার সংবাদ পাইবার আশা করিবেন। তবে সে কথা মনে করিয়া মৃণালিনী মনে মনে হাসিয়াছেন—বলিয়াছেন, যদি সংবাদ দিবার ও সংবাদ পাইবার জন্য এত ব্যাকুলতা থাকে, তবে তিনি কিরূপে তীর্থবাসী হইবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন?

স্থানে স্থানে তাঁহার বিলম্বের আরও কারণ ছিল—তিনি মনে করিয়া আসিয়াছিলেন—যে স্থানে মনে হইবে, দেবতা চরণে স্থান দিবেন, তিনি সেই স্থানেই জীবনের শেষ কাল অতিবাহিত করিবেন।

হরিদ্বারে আসিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল—গঙ্গার অবতরণ-স্থান কি শান্তিপ্রদ! মনে হইয়াছিল, এই স্থানেই কি গঙ্গা তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন? কিন্তু তখনও বহু তীর্থে গমন করা হয় নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন—কে জানে কোথায় স্থান পাইব?

তীর্থের পর তীর্থ দর্শন করিয়া উত্তর ভারতের প্রধান তীর্থগুলির পর মৃণালিনী দক্ষিণ ভারতের তীর্থদর্শনে গমন করিলেন। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরসমূহের বিশালতাই সে সকলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সেই বিশালতার জন্যই তাহারা দর্শকদিগকে যেন স্তম্ভিত করে। সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া একের পর এক তীর্থ দর্শন করিয়া তিনি শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থস্থানের আর এক বৈশিষ্ট্য—দেবতাকে লইয়াই নগর। শ্রীক্ষেত্র তেমনই জগন্নাথের রাজধানী। যাহারা সমুদ্র-দর্শনের বা স্বাস্থ্যসঞ্চয়ের জন্য তথায় গমন করে, তাহারাই যেন তথায় অনধিকার-প্রবেশ করে। তথায় যাইয়া মৃণালিনী পত্র লিখিলেন, তিনি আপাততঃ কিছুদিন তথায় থাকিবেন।

তথায় তিনি কণার পত্র পাইলেন—তাঁহাকে তাহার একটি অনুরোধ রাখিতে হইবে; অনুরোধ তাহার একার নহে—অমলার ও কমলার তাহাতে "ঢেরা সহি" আছে—যদি তিনি তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিতেই চাহেন, তবে আসিয়া পিসীমা'র মন্দির-বাড়ীতে বাস করুন—তাহারা প্রতিশ্রুতি দিতেছে, যখন তখন যাইয়া তাঁহার "যোগ-ভঙ্গ" করিবেন না; তিনি নিকটে থাকিলেই তাহারা সুখী হইবে।

মৃণালিনী সে পত্রের উত্তর দিলেন:—

দিদিমণি,

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি যদি অমলার ও কমলার "ঢেরা সহির" কথা না লিখিতে, তাহা হইলেও মনে করিতাম, তুমি একটা ষড়যন্ত্রের মুখপাত্র। অমলার আর কমলার কথা লিখিয়াছ—সুনীলের নামটি কি লজ্জায় লিখ নাই? তোমরা যে আমার কত বড় প্রলোভন তাহা তোমরা বুঝিতে পার না। দূরে থাকিলে উপায় নাই বলিয়া প্রলোভন সম্বরণ করা যায়—নিকটে যে তাহা পারা যায় না, দিদি। পিসীমা'র ঠাকুরবাড়ীতে থাকিলে যে প্রলোভন সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইবে। সন্ন্যাসীর সংসারী হইবার গল্প জান ত? তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন—ঈশ্বরচিন্তা করিবেন। সম্বল লোটা, কম্বল আর কৌপিন। ইন্দুরে কৌপিন কাটে বলিয়া ইন্দুর তাড়াইতে বিড়াল পুষিলেন; তাহার পর বিড়ালের ছানাদিগের দুগ্ধের জন্য গোপালন; গোপালনের জন্য চাকর রাখা; এইরূপে শেষে বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন—থাকিল কেবল 'বাবাজী' নাম।

তুমি লিখিয়াছ, দেবু এত রাগ করিয়াছে যে, পত্র লিখিল না। দেবু যদি আমার উপর রাগ করিত তবে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম; জগন্নাথের দয়ার জন্য "আটকে বাঁধিতাম"। কিন্তু আসিবার সময় তাহার চোখে যে জল দেখিয়াছিলাম, তাহাই ভুলিতে পারিতেছি না।

তোমরা যখন ডাকিয়াছ, তখন যাইতেই হইবে—কারণ, তোমরাও কম নহ। তবে জগন্নাথ কবে ছুটি দিবেন, তাহা তিনিই জানেন।

তুমি সকলের সংবাদ দিও।

ইহার পর তিনি লিখিয়াছিলেন—

তুমি মা'কে লইয়া এক বার বেড়াইয়া যাইবে?

কিন্তু সেটুকু কাটিয়া দিয়া তাহার পর লিখিয়াছিলেন—

ঠাকুর তোমাদিগের সকলের কল্যাণ করুন।

পত্র পাইয়া সুনীল একখানা পরকলার সাহায্যে যে অংশ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া কণাকে বলিল, "চল, তুমি আর আমি যাই। এই পত্রেই বুঝা যাচ্ছে, তিনি মায়া কাটা'তে পারেন নাই।"

প্রস্তাব শুনিয়া কণার শাশুড়ী বলিলেন, "বেশ ত! আমরা বুঝি যেতে জানি না?"

শেষে স্থির হইল, কণা ও সুনীলই যাইবে; কণার শিশুরা তাহাদিগের পিতামহীর নিকটে থাকিবে।

কণা বলিল, "আমি দিদিমাকে নিয়ে আসব।"

সে বিষয়ে সকলেরই বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইল, কেবল রেণু মনে করিল, হয়ত কণার যাওয়া ব্যর্থ হইবে। মাসীমা কত বিচার-বিবেচনা করিয়া কোন কায করিতেন, তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। কাযেই তিনি যখন তীর্থস্থানে বাস করিবেন বলিয়া গিয়াছেন, তখন আর ফিরিবেন কি না, সে বিষয়ে রেণুর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

কণার উৎসাহ দেখিয়া অশোকের শাশুড়ী বলিলেন, "দেখ, যদি তাঁ'কে আনতে পার। তিনি আমাদের কাছে থাকবেন, সে সৌভাগ্য কি আমাদের হ'বে? কিন্তু যেন অমনি ফিরে এস না। জান ত সে কালের যাত্রার সেই কথা—

'যাবি তোরা মানে মানে,
ফিরে আসবি অপমানে;
দেখে মোরা মরব প্রাণে'।"

দেবদত্ত কিছু বলিল না বটে, কিন্তু তাহার মন আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মৃণালিনীর যাইবার সহিত তাহার এক দিনের একটি অসতর্ক মুহূর্ত্তে উক্ত কথার যে সম্বন্ধ আছে, সে বিশ্বাস সে কিছুতেই দূর করিতে পারে নাই। তাহার মনে হইতেছিল, তিনি বলিয়াছেন বটে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু সে সেই ক্ষমার শাস্তি পায় নাই; তিনি যদি ফিরিয়া আইসেন, তবেই সে সেই শান্তি লাভ করিবে। সেই জন্য কণার যাইবার প্রস্তাবে সে বিশেষ উৎসাহ অনুভব করিল। আশা অতি সামান্য ভিত্তির উপর প্রাসাদ রচনা করে, তাই মৃণালিনীর পত্রের যে অংশের পাঠোদ্ধার সুনীল করিয়াছিল, সেই অংশে নির্ভর করিয়া সে-ও আশা করিয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য যখন মৃণালিনীর এখনও আগ্রহ আছে, তখন কণা যাইলে তাঁহাকে আনিতে পারিবে। তাহার পর তিনি আসিলে সে আর তাঁহাকে যাইতে দিবে না। সে বিষয়ে সে কমলার সহিত পরামর্শও করিয়াছিল।

দুই দিন পরেই সুনীলের ও কণার ফিরিবার কথা। সে দিন দেবদত্ত কমলাকে লইয়া ষ্টেশনে গিয়াছিল। কিন্তু যখন সে দেখিল, মৃণালিনী আইসেন নাই, তখন তাহার হতাশা এমন অভিমানের উদ্ভব করিল যে, সে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিল না। কিন্তু তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া কণাই বলিল, "দিদিমা এত তাড়াতাড়ি এলেন না—তবে বলেছেন, আস্‌বেন।"

দেবদত্ত মনে করিল, সে কথা কেবল প্রত্যাখ্যানের মৃদু রূপ।

কিন্তু সে ভুল বুঝিয়াছিল।

তাঁহাকে বিস্মিত করিবে বলিয়া সুনীল ও কণা কোন সংবাদ না দিয়াই তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিল। চিরদিনের অভ্যাস প্রায় স্বভাবের মতই প্রবল হয়। তাই কয় দিন তিনি শ্রীক্ষেত্রে থাকিবেন, তাহা স্থির না থাকিলেও তিনি একটি পরিচ্ছন্ন গৃহ ভাড়া লইয়াছিলেন। সন্ধান করিয়া সুনীল যখন সেই গৃহে উপনীত হইল, তখন মৃণালিনী মঙ্গলারতি দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

দ্বারে "দিদিমা"—ডাক শুনিয়া তিনি ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

কণা উত্তর দিল, "কি সর্ব্বনাশ, এর মধ্যেই আমাদের ভুলে গেছেন?"

মৃণালিনী তখন বুঝিয়াছেন, কে ডাকিতেছে। তিনি ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ভুল্‌বার কি উপায় রেখেছ?"—কণার সঙ্গে সুনীলকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এ যে মেঘ না চাইতেই জল! যুগল যদি এলেন, তবে বৃন্দাবনে দেখা দিলেন না কেন?"

তিনি মনে করিয়াছিলেন, দেবদত্তও আসিয়াছে; তাই আর কাহাকেও না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সব?"

সুনীল বলিল, "দেবু? তা'কে ত আপনিই ক'রে এসেছেন 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।' তাই সে আপনাকে ধ'রে নিয়ে যেতে আমাদের পাঠিয়েছে।"

"তা' ভাল হয়েছে।"

তিনি বলিলেন, "স্নান কর—মন্দিরে যা'বে ত?"

কণা বলিল, "যা'ব না? আপনি কি গেছলেন?"

"কেন, এক বার গেলে কি আর যেতে নাই?"

পাণ্ডার "ছাড়িদার" সুনীল ও কণার গাড়ীতেই আসিয়াছিল। মৃণালিনী তাহাকে বলিলেন, "গাড়ী দাঁড়াতে বল। আমরা মন্দিরে যা'ব।"

মন্দিরে যাইবার সময় তিনি কণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরের ভোগ খা'বে? না—"

সুনীল বলিল, "ভোগই খা'ব।"

"নিরামিষ কি ভাল লাগবে?"

"খুব ভাল লাগবে।"

মন্দির হইতে আসিবার পথেই মৃণালিনী কলিকাতায় সকলের সংবাদ লইলেন।

তখনই কণা বলিল, "খোঁজ আমি দেব কেন? আপনি ত আমাদের ফেলে পালিয়েছেন!" তাহার কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুর বাজিয়া উঠিল।

মৃণালিনী বলিলেন, "দিদি, আর কত দিন ধ'রে রাখতে পারবে? ডাক যে এসেছে।"

"যত দিন পারি। আপনার কি সত্যই আমাদের কথা মনে পড়ে না?"

"তীর্থস্থানে এসেও কি মিথ্যা কথা বলাবে, দিদি?—মনে পড়ে না—এমন—এমন কৃপা যে ঠাকুর এখনও করেন নি।"

"সে কৃপায় আর কায নাই, দিদিমা।"

"এই বুঝি তোমরা দিদিমাকে ভালবাস?"

"আমাদের ভালবাসা ত দৌরাত্ম্য। কিন্তু আপনারা যদি তা' না সইবেন, তবে আমরা যা'ব কোথায়?"

মৃণালিনী সুনীলকে দেখাইয়া বলিলেন "কেন, দিদি, দৌরাত্ম্য করার লোক ত পেয়েছ।"

সুনীল বলিল, "দিদিমা, ও সর্ত্তে ত আমাকে নাতিনীটি দেন নি!"

"ঐ ত সর্ত্ত, ভাই। গোড়াতেই সাত পাক—চৌদ্দ পাকে সে বাঁধন খুলা যায় না।"

কণা ও সুনীল যতই তাঁহার যাইবার কথা বলিল, ততই মৃণালিনী তাহা এড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় দিন সুনীল ও কণা কলিকাতায় যাইবে। কণা বলিল, "দিদিমা, এখন আসল কথায় কি, তা'ই বলুন।"

মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"হাঁসের গায়ে জল পড়লে সে যেমন তা'তে গা' ভিজতে দেয় না, আপনি তেমনই আসল কথাটা ঝেড়ে ফেল্‌ছেন। আপনাকে না নিয়ে ত আমরা যা'ব না।"

"কেন, দিদি?"

"সবাই আপনার যা'বার আশা করে আছেন।"

"জগন্নাথ যে দিন যেতে দিবেন, সেই দিনই যা'ব। দিদি, বুড়ীকে কি অত তাড়া দিতে হয়?"

"কিন্তু আমি যে বড়মুখ ক'রে ব'লে এসেছি, দিদিমা, আপনাকে নিয়ে যা'ব!"

"আমি কি যা'ব না, বলছি, দিদি?"

কণার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইল। সে ধরা গলায় বলিল, "ভগবান দর্পহারীই বটেন। আমি আপনার যে স্নেহের গর্ব্ব নিয়ে এসেছিলাম, তা'ই তিনি চূর্ণ ক'রে দিলেন।" বলিতে বলিতে কণা কাঁদিয়া ফেলিল। মৃণালিনী ইতঃপূর্ব্বে কখন তাহার কোন আবদার অপূর্ণ রাখেন নাই। কাযেই আজ এই প্রথম প্রত্যাখ্যান তাহার পক্ষে বড়ই বেদনার কারণ হইল।

তাহার ক্রন্দন দেখিয়া মৃণালিনীর চক্ষুও অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। মায়ার এ কি বন্ধন! তিনি কণাকে আপনার বুকে টানিয়া আনিয়া লইয়া বলিলেন, "দিদি, তোমরা যখন বলছ, আমি যা'ব। এ প্রতিশ্রুতি আমি তোমাকে দিচ্ছি।"

কণা কিন্তু এই কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না।

যাইবার সময় কণা যখন আবার কাঁদিল, তখন মৃণালিনী তাহার মুখখানি তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "দিদি, যা'বার সময় কি কাঁদতে হয়? যে দিন যাত্রা করি, সে দিন দেবুর চোখে যে অশ্রু দেখেছিলাম—তা' আমি কিছুতেই ভুলতে পার্‌ছি না; তা'র উপর আবার তোমার এই অশ্রুধারা!"

কণা বলিল, "আপনি আমাকে বিদায় ক'রে দিলেন—কিন্তু আমি কোন্ মুখে আপনার দেবুকে বল্‌ব, 'দিদিমা এলেন না'? সে যে আপনারই জন্য ষ্টেশনে এসে থাকবে, তা' আমি জানি। সে কি মনে করবে?"

এই কথা মৃণালিনীকে নিরুত্তর করিল।

তিনি বহুক্ষণ ভাবিলেন।

তাহার পর পাণ্ডার "ছড়িদার" যখন আসিল, তখন তিনি মন্দিরের আরত্রিকের জন্য গমন করিলেন। আরত্রিকের পর রত্নবেদীতে প্রণাম করিয়া তিনি যখন মুখ তুলিলেন, তখন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে যেন দেবদত্তের মুখ ভাসিয়া গেল। তিনি দেবদর্শন করিয়া ফিরিলেন—ভাবিতে ভাবিতে আসিলেন; কণার কথা বার বার তাঁহার মনে হইতে লাগিল—দেবদত্ত কি মনে করিবে? সে কি সত্যই বড় ব্যথা পাইবে?

রাত্রিতে তাঁহার সুনিদ্রা হইল না; নিদ্রাও স্বপ্নবহুল।

তিনি প্রাতে মন্দিরে যাইয়া দেবদর্শন করিয়া দেবতার নিকট নিবেদন জানাইলেন—তিনি যেন তাঁহার এই দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া তাঁহাকে চরণে স্থান দেন।

গৃহে ফিরিয়া তিনি, পরিচারকদিগকে নির্দ্দেশ দান করিলেন, তিনি সন্ধ্যায় কলিকাতা যাত্রা করিবেন,—আপাততঃ তাঁহার বাসার সব ব্যবস্থা থাকিবে; তিনি তাহার পর যেরূপ নির্দ্দেশ দিবেন, তাহাই পালিত হইবে

তিনি মনে করিলেন, কলিকাতায় যাইয়া সকলকে বুঝাইয়া আবার তীর্থস্থানে আসিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে যাহারা এক বার অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহারা আর তাহা পূর্ব্বের মত অনুভব করিবে না।

যে বৃদ্ধ সরকার তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মৃণালিনী কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল—পাণ্ডা বিদায় লইলেন।

মৃণালিনী ভাবিলেন, এ কি ভগবানের পরীক্ষা? তিনি ফিরিয়া যাইবেন মনে করিয়া বাহির হয়েন নাই; কিন্তু তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। কে তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছে?

সে রাত্রিতেও মৃণালিনীর সুনিদ্রা হইল না এবং তাঁহার মনে কেবল অশান্তিরই উদ্ভব হইতে লাগিল।

৪১

সমস্ত দিন দেবদত্ত তাহার অবসাদের ভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই—আহারেও যেন তাহার রুচি ছিল না। শেষ রাত্রি হইতে সে অসুস্থতা অনুভব করিতে লাগিল। কমলা বলিল, "ডাক্তার বাবুকে টেলিফোন করি।"

দেবদত্ত বলিল, "এখন টেলিফোন ক'রে কায নাই; বুড়া মানুষ ব্যস্ত হ'য়ে আস্‌বেন; সকালে যা' হয় করা যা'বে।"

কিন্তু তাহার অসুস্থতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া কমলা ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার বাবুকে এবং সঙ্গে সঙ্গে রেণুকে ও তাহার পিত্রালয়ে সংবাদ দিল।

সংবাদ পাইয়া সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেরই মনে উদ্বেগ ও আশঙ্কা—শেষ রাত্রিতে বিসূচিকার বিকাশ আরম্ভ হইলে তাহা প্রায়ই সাংঘাতিক হয়।

ডাক্তার বাবু রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

দেবদত্ত বলিল, "ডাক্তার বাবু, একটা কায করুন—এম্বুলেন্স আনতে ফোন করুন।"

ডাক্তার বাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"আমি বুঝতে পেরেছি, আমার কলেরাই হয়েছে। আমি হাসপাতালে যাব।"

"কলেরা কি না, তা' বুঝবার সময় এখনও হয় নি। কিন্তু যদি তা'-ই হয়, তবে তোমার হাসপাতালে যা'বার কি প্রয়োজন?"

"আমি আর কাউকে বিপন্ন কর্‌তে পারি না।"

"কি বলছ? যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আর আমরা দরকার মনে করি, তবে তোমার জন্য পাঁচ জন ডাক্তার দশ জন 'নার্স' আনাই কি অসম্ভব হ'বে?"

"আমি কাউকে বিব্রত করতে চাই না—সে—"

ডাক্তার বাবু এই বাড়ীর বহু দিনের চিকিৎসক। তিনি বাড়ীর সব কথা জানিতেন। তিনি বলিলেন, "তোমাকে পাগলামী করতে দেওয়া হ'বে না। তুমি হাসপাতালে গেছ শুনলে, তোমার মা কি মনে করবেন?"

নীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁ'কে কি টেলিগ্রাফ ক'রে দেব?"

উত্তেজিত হইয়া দেবদত্ত বলিল, "না! না! তিনি আমাকে ছেড়ে গিয়ে শান্তিতে আছেন—তাঁ'কে বিরক্ত করা হ'বে না।"

ডাক্তার বাবু তিরস্কারের ভাবে দেবদত্তকে বলিলেন, "তুমি কি আমাদের কি করতে হ'বে—না হ'বে, তা' বলবে? আমরা যা' দরকার মনে করব তা'ই করব।" তিনি নীরেন্দ্রকে বলিলেন, "আমি ত এখনও রোগটাই কি তা' বল্‌তে পারি না। আর একটু দেখে কর্ত্তব্য স্থির করা হ'বে।"

রেণু স্তম্ভিতবৎ বসিয়া ছিল।

কমলার মুখ আশঙ্কায় যেন রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছিল। তাহার পিতা তাহাকে অভয় দিতেছিলেন—"ভয় কি, মা?" বৃদ্ধা দাসী বলিল, "এ মা'র পুণ্যের সংসার—কোন ভয় পেও না, বৌদিদি।"

দেবদত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিল—তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে—সে কাহাকেও বিপন্ন বা বিব্রত করিবে না।

ডাক্তার বাবু দৃঢ়ভাবে তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন।

প্রবীণ ব্যক্তিদিগের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রকাশ করা - মৃণালিনীর শিক্ষায়—দেবদত্তের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হইয়াছিল। তাই ডাক্তার বাবুর দৃঢ়তায় সে বলিল, "যদি আমাকে হাসপাতালে পাঠা'তে আপনার একান্তই আপত্তি থাকে—তবে আপনি কলেরা নার্স আনিয়ে নিন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "তোমাকে কে বল্‌লে, তোমার কলেরা হয়েছে?"

"যদি দরকার না হয়, তাঁ'দের প্রাপ্য দিয়ে বিদায় ক'রে দিলেই হ'বে। আপনি টেলিফোন ক'রে দিন।"

"আচ্ছা, বাপু, তা'ই করছি। তোমার সেবা করবার কি লোকের অভাব আছে?"

তিনি রেণুকেও বাল্যাবধি দেখিয়াছেন; রেণুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তুমি কি বল? এক দাগ ঔষধ দাও।"

তিনি টেলিফোন করিবার জন্য পার্শ্বের কক্ষে গমন করিলেন।

রেণু পুত্রের শয্যাপার্শ্বস্থ টেবলের উপর হইতে ঔষধের শিশি লইয়া এক দাগ গ্লাসে ঢালিয়া দিল। তাহা পান করিয়া দেবদত্ত বলিল, "আপনি আর কলেরার রোগীর কাছে থাক্‌বেন না?"

রেণুর মাতৃ-হৃদয়ের উৎকণ্ঠা তাহাকে তাহার অভ্যস্ত সংযমচ্যুত করিল। সে বলিল, "আমি—আমিও থাক্‌ব না?"

"যা'কে একান্ত অসহায় অবস্থায় বুকে স্থান-দান করা হয় নি—তা'র জন্য বিপদ বরণ করা কেন?"

দীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিমান, আজ রোগের ও উৎকণ্ঠার দৌর্ব্বল্যে সংযমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

বলিয়াই দেবদত্তের মনে হইল—কেন তাহার সংযমের শৈথিল্য ঘটিল?

আর রেণু? তাহার মনে হইল, তাহার দৃষ্টিতে পৃথিবীর আলো নিবিয়া গেল—আর তাহার অন্তরে যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তাহা নিবাইবার কোন উপায় নাই।

সেই সময় ডাক্তার বাবু টেলিফোন করিয়া রোগীর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন এবং রেণুর দেহ কম্পিত হইতেছে দেখিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকের ধাতুতেই 'হিষ্টিরিয়া' থাকে। তোমার মাসীমা ছাড়া আমি ত আর কোন স্ত্রীলোককে 'হিষ্টিরিয়া'-বর্জ্জিত দেখলাম না। রোগীর পাশে ব'সে কাঁপতে হ'বে না—চল, তোমাকে অন্য ঘরে রেখে আসি।"

তিনি উঠিয়া রেণুকে ধরিলেন। রেণু কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিল। ডাক্তার বাবু তাহাকে ধরিয়া অন্য কক্ষে একখানি কৌচের উপর বসাইয়া নীরেন্দ্রকে ডাকিলেন—"তুমি এসে এঁকে দেখ। আমি রোগীর কাছে যাই।"

নীরেন্দ্র যখন সে কক্ষে আসিল, তখন রেণু সংজ্ঞা হারাইয়াছে—কৌচের উপর যেন এলাইয়া পড়িয়াছে।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "কিছু করতে হ'বে না। আপনিই জ্ঞান হ'বে।"

তিনি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন।

ততক্ষণে কণা ও সুনীল আসিয়াছে—সঙ্গে সুনীলের পিতামাতাও আসিয়াছেন। তাঁহারা রোগীর ঘরের দ্বারে আসিলেই ডাক্তার বাবু বলিলেন, "রোগীর ঘরে আর এসে কায নাই। আমি ত দেখছি, রোগী ভালই আছে। ভয় পাবার কোন কারণ নাই।"

কণা জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমা'কে টেলিগ্রাম করা হয়েছে?"

"না। তা'র বোধ হয়, কোন দরকার হ'বে না।"

কণার শাশুড়ী বলিলেন, "জগন্নাথ তা'-ই করুন।"

তিনি উদ্দেশে জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া বলি-লেন, "তবুও তাঁ'র জিনিষ; ভাল হয়েছে, এ সংবাদটা দিতে হ'বে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "তা' দিবেন। অসুখটা বাড়তে পারত। ছেলে মানুষ হ'লেও বৌমা'টির বুদ্ধি খুব ভাল—সংবাদ দিতে বিলম্ব ক'রেন নি। আরও আগে সংবাদ দিতেই চেয়েছিল—রোগী নিজে বারণ করেছেন— আমি বুড়া মানুষ, রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গাবেন না! আরে, বুড়াদের তোমরা যা' ভা'ব, তা'রা তা' নয়—যা'কে মা'র পেট থেকে বা'র করেছি, তা'র ভাবনা ডাক্তারের কাছে রোগীর ভাবনাই নয়—তা'তে আরও কিছু আছে।"

সকলে অন্য কক্ষে গমন করিলে ডাক্তার রেণুর কথা স্মরণ করিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "পাশের ঘরের ঐ দরজাটা বন্ধ করে দে; আর সদর দরজায় গিয়ে দ্বারবানকে বলে আয়, দু'জন নার্শ আসবেন—তাঁ'দের নীচের ঘরে বসিয়ে আমাকে খবর দিবে।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

প্রায় একই সময়ে দুইখানি মোটর গাড়ী আসিয়া গৃহের সম্মুখে স্থির হইল। একখানি হইতে দুই জন শুশ্রূষাকারিণী—শুশ্রূষাকারিণীর বেশে অবতরণ করিয়া দ্বারবানকে বাড়ীর নম্বর জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিতে বলিলেন। ভৃত্য তাঁহাদিগকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল।

দ্বারবান গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিতে না দিতে দ্বিতীয় মোটর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহা হইতে মৃণালিনী অবতরণ করিলেন।

দ্বারবান নমস্কার করিবার পূর্ব্বেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বারবানজী, কা'রা এলেন?"

দ্বারবান বলিল, "দাদাবাবুর অসুখ—ডাক্তার বাবু ওঁদের আনিয়াছেন।"

মৃণালিনী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না—অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া শুশ্রূষাকারিণীদ্বয়কে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইলেন। তিনি আর কাহাকেও লক্ষ্য করিলেন না—একেবারে দেবদত্ত যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেবদত্তের জন্য জগন্নাথের যে প্রসাদীমালা আনিয়াছিলেন, অঞ্চল হইতে তাহা বাহির করিয়া দেবদত্তের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া উপাধানতলে রক্ষা করিলেন এবং তাহার পর ডাকিলেন, "দেবু!"

দেবদত্ত চাহিয়া দেখিল, তাহার দৃষ্টিতে অসীম তৃপ্তি।

মৃণালিনী দেবদত্তের মস্তকে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "ভাবিয়ে তুলেছিলেন বটে কিন্তু অল্পে অল্পেই গেছে। কলেরাই বলতে হয়, তবে খুব মৃদু প্রকৃতির।"

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—শুশ্রূষাকারিণী দুই জন আসিয়াছেন। ডাক্তার বাবু কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মৃণালিনী বলিলেন, "তাঁ'দের 'ফীস' আর গাড়ী ভাড়ার টাকা দিয়ে বিদায় ক'রে দাও; কোন দরকার নাই।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "ছেলের জিদ, হাসপাতালে যা'বেন—কাউকে বিব্রত করবেন না।"

মৃণালিনী বুঝিলেন, কি অভিমানে দেবদত্ত উহা বলিয়াছে।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "এখন আপনার ধন আপনি বুঝে নিন।"

মৃণালিনী মুখ নত করিয়া দেবদত্তের মস্তক চুম্বন করিলেন। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমলা কোথায়?"

বৃদ্ধা দাসী দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়াছিল; সে বলিল, "বৌদিদি আমাকে কি করবেন জিজ্ঞাসা করে ছিলেন—আমি বলেছিলাম, মা বিপদের সময় ঠাকুর-ঘরের দোরে পড়ে ঠাকুরকে ডাকতেন। বৌদিদি তাই শুনে ঠাকুর-ঘরের দোরেই পড়ে আছেন ঠাকুরকে ডাকছেন। তাঁ'র মা সেখানে ব'সে আছেন। আমি ডেকে দিচ্ছি।"

মৃণালিনী বলিলেন, "না তা'কে ডেক না। যখন সে তা'র মনের মধ্যে থেকে বল পা'বে তখন সব ভয় কেটে যা'বে—আমি গিয়ে তা'কে ডাকব।"

ডাক্তার বাবু মুগ্ধ হইয়া মৃণালিনীর কথা শুনিতে লাগিলেন।

ততক্ষণে রেণুর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে। সে সংজ্ঞালাভ করিয়া সম্মুখে নীরেন্দ্রকে দেখিতে পাইল। সে বলিল, "আজ তুমি সব শুনেছ। আমার এক অনুরোধ—শেষ ভিক্ষা—আমাকে বিদায় দাও। আমার নারীত্ব আমার মাতৃত্বকে যে পীড়া দিয়েছে আমি আজ আর তা' সহ্য করতে পারছি না। আমাকে বিদায় দাও।" রেণু আর কিছু বলিতে পারিল না—সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

নীরেন্দ্র বলিল, "আমার আর কিছু বলবার অধিকার নাই। কিন্তু তুমি কোথায় যা'বে?"

"তা' কিছুই বলতে পারি না। জানি, আমি যত দিন বেঁচে থাকব, তত দিন শান্তি পা'ব না, তত দিন এ জ্বালা জুড়াবে না। তবে প্রথমে মাসীমা'র কাছে যা'ব।"

সম্মুখের দালান হইতে আহ্বান আসিল—"রেণু! মা!"—রেণু চমকিয়া উঠিল, সেই চিরস্নেহস্নিগ্ধ আহ্বান—এ যে মাসীমা'র কণ্ঠস্বর!

সম্পূর্ণ

মুক্তির মূল্য

[উপন্যাস]

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

মুক্তির মূল্য

১

প্রাসাদে বেগম-মহলের যে দ্বার নবাবের আদেশে গত রাত্রিতে বন্ধ হইয়াছিল আজ—দিনের আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে নহে, তাহার অনেক পরে তাহা মুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে, আংশিক-রূপে। বেগম-সাহেবা আপনার দায়িত্বে এই পর্য্যন্ত আদেশ করিয়াছেন—নিতান্ত প্রয়োজনে যাহারা মহল হইতে যাইতে পারিবে, তাহারা "নজরবন্দী" অবস্থায় যাইবে ও ফিরিয়া আসিবে। কালবৈশাখীর ঝড় অতর্কিতভাবে আবির্ভূত হইয়া ধূলির ধ্বজা উড়াইয়া বহিয়া যাইবার পর সযত্নরক্ষিত উদ্যানের যে অবস্থা দেখা যায়—নবাবের বিলাসকুঞ্জ বেগম-মহলের যেন সেই অবস্থা ; হাসির উচ্ছ্বাস নাই, রঙ্গব্যঙ্গ স্তব্ধ হইয়াছে, সকলের মুখে আতঙ্কের ছায়া। গত রাত্রিতে এই মহলে সত্য সত্যই কালবৈশাখীর ঝড় বহিয়া গিয়াছে। বেগম-সাহেবার প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব ও সাহস ব্যতীত কি হইত, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কোনরূপে রাত্রির অবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু দিবাগমের সঙ্গে সঙ্গে আবার সকলের আতঙ্ক-বৃদ্ধি হইয়াছে—নবাবের সুরাসঞ্জাত নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি কাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন, কে জানে ?

নবাব সামন্ত রাজ্যের শাসক, বিলাসিনীর যৌবন গত হইলেও যেমন তাহার যৌবনের সাজ-সজ্জার বিলাস-বিভ্রমের অভ্যাস থাকে—সে সব লোকের হাস্যোৎপাদন করিলেও বিলাসিনী তাহা বুঝিতে পারে না, কালের পরিবর্ত্তন হইলেও এই রাজ্যে শাসকের সব ব্যবস্থা তেমনই মোগল রাজত্বকালের ব্যবস্থার মত আছে। প্রাসাদ দুর্গের মধ্যে অবস্থিত—কিন্তু যুদ্ধসজ্জাও নাই, তাহার প্রয়োজনও নাই ; দুর্গ-প্রাকারের পরিবেষ্টন-পরিখায় এখন আর বৎসরের সকল সময় জল থাকে না—প্রাচীরের উপর সে কালের কামানগুলি এখন কেবল শোভার্থ বিদ্যমান, গোলাও নাই, গোলন্দাজও নাই ; কিন্তু ঠাট আছে। ভাল কিছু না থাকিলেও, মন্দ সবই আছে। আর যুদ্ধবিগ্রহাদিতে মনোযোগের কারণ না থাকায় বুঝি শাসকের মনোযোগ বিলাসব্যসনেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। বেগম-মহল আছে, বাঁদী আছে। বেগম-মহলে সুন্দরীরা আছে—ষড়যন্ত্র আছে। থাকিবারই কথা ; কারণ, যে স্থানে সৌন্দর্য্য লালসার বহ্নিতে ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত, সে স্থানে পুঞ্জীভূত পাপের মধ্য হইতেই ষড়যন্ত্র উদ্ভূত হয়।

গত রাত্রিতে একটা ষড়যন্ত্রের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দুই বৎসরের কিছু অধিককাল পূর্ব্বে দিল্লীর উপকণ্ঠে দরিদ্রের গৃহ হইতে যে প্রস্ফুটোন্মুখ ফুলের মত তরুণী সংগৃহীতা হইয়া বেগম-মহলে স্থান পাইয়াছিল এবং এত দিন যাহাকে নবাবের মনোরঞ্জন করিবার সকল "বিদ্যায়" সুশিক্ষিতা করা হইয়াছিল, গত সন্ধ্যায় নবাব তাহার কক্ষে আসিবেন বলিয়া যাহাকে মহলের প্রধান প্রসাধিকা বিবিধ মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা করিয়া হেনা ও সুর্মার সঙ্গে "রুজ" ও "লিপষ্টিক" ব্যবহার করিয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কৃত্রিম উপায়ে বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছিল—সেই নেজমা বেগম অন্তর্হিতা হইয়াছে। প্রসাধিকা তাহার সজ্জায় শেষ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে আসিয়া যখন দেখিল, পিঞ্জর শূন্য—বিহঙ্গী পলাইয়াছে, তখন শঙ্কা-কম্পিত হইয়া সে সে সংবাদ প্রতিহারীকে দিয়াছিল। ভয়ে প্রতিহারী যদি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া না হইত, তবে সে বেগম-সাহেবাকে সে সংবাদ দিত এবং তাহা হইলে হয়ত সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইত না—যদি হইত, তবে সে ঘটনার অনেক পরে এবং নবাবের পক্ষে যখন তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইবার সম্ভবনা থাকিত না, সেইরূপ সময়ে। কিন্তু সে তাহা না করিয়া সম্ভব ও অসম্ভব স্থানে নেজমা বেগমের অনু-সন্ধান করিতে আরম্ভ করায় সংবাদ সমগ্র মহলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে—বহু বেগম ও বাঁদীর আলোচনার বিষয় হয় ; আর সেই সময় নবাব মহলে প্রবেশ করায় ঝড় উঠে।

এমন ঘটনা যে পূর্ব্বে কখন ঘটে নাই, এমন নহে ; বরং ঘন ঘন যে ঘটে নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। কারণ, শব সুসজ্জিত করিলেও যেমন প্রাণের অভাবেই তাহা ত্যাজ্য হয়, তেমনই যে ভালবাসায় বন্দিজীবনও সহনীয় হয়, তাহার একান্ত অভাবে এই মহলে নারীর জীবন একান্তই অসহনীয় হয়। ইহার পূর্ব্বেও কখন কখন প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া বা প্রহরীকে বশীভূত করিয়া কোন কোন

তরুণী পলাইয়াছে বা পলাইবার চেষ্টায় ধরা পড়িয়াছে। যে পলাইয়াছে, তাহার জন্য হয়ত অন্য কেহ পৈশাচিক দণ্ড ভোগ করিয়াছে; যে পালাইবার চেষ্টায় ধরা পড়িয়াছে, মুক্তিলাভের চেষ্টাই অনেক সময় তাহার শেষ মুক্তির কারণ হইয়াছে, সে আর দিবসের আলোক ও রজনীর অন্ধকার দেখিতে পায় নাই।

পূর্ব্বে এই জাতীয় যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সকলের পরিণতি নবাবের প্রকৃতির ও বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়াছে। কোন নিষ্ঠুর-প্রকৃতি শাসক যেমন পৈশাচিক ব্যবস্থা করিয়াছেন—পলায়ন-চেষ্টায় চেষ্টিতাকে বা অপরাধী বাঁদী বা প্রতিহারীকে পালিত ব্যাঘ্রের পিঞ্জরে দিয়া তাহার মৃত্যু দেখিয়াছেন, তেমনই কোন মৃদুস্বভাব শাসক হয়ত ব্যাপারটা গোপন রাখিবার জন্য যেন কিছুই ঘটে নাই, এমনই ভাব দেখাইয়াছেন। যে গিয়াছে, তাহার অভাব কেহই অনুভব করে নাই—নবাবও নহেন। যে উদ্যানে শত ফুল সর্ব্বদা ফুটিয়া থাকে, তথায় যদি একটি ফুল তুলিবার পূর্ব্বে ঝরিয়া যায়, তবে কে সেজন্য অভাব অনুভব করে? বেগম-মহলে কখন সুন্দরীর অভাব হয় না, বরং কাল যাহাদিগের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে, তাহাদিগের স্থান অন্যের দ্বারা পূর্ণ করিতে বিলম্ব হয় না। যাহারা অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হয়, তাহারা ব্যর্থতার বেদনায় কেবল অপরের অভ্যুদয়ে ঈর্ষ্যায় জ্বলিতে থাকে। তাহাদিগেরও আহারের, সজ্জার ও দাসীর ব্যবস্থা থাকে; কিন্তু প্রসাধিকা আর তাহাদিগকে সজ্জিত করিতে আইসে না—দাসীদিগের ব্যবহারেও উপেক্ষা যেন আর আত্মগোপন করিতে পারে না।

গত রাত্রির ব্যাপার যখন নবাবের কর্ণগোচর হয়, তখন যাহা ঘটে, তাহা ভূমিকম্প বা ঐরূপ কোন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মত বলা যায়। নবাব যখন নেজমা বেগমের কক্ষে আসিলেন, তখন রীতি অনুসারে কেহ তাঁহাকে কুর্ণিশ করিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিল না—দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তাঁহার আগমনে কাহারও সুরমা-আঁকা নয়নে আনন্দের দীপ্তি দেখা দিল না। কক্ষ শূন্য। তিনি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—কক্ষ সুসজ্জিত, কক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র কৃত্রিম ফোয়ারায় গোলাব জল উঠিয়া ফোয়ারার পাত্রে পড়িতেছে; আতরের সৌরভে কক্ষ আমোদিত; পান-পাত্র সজ্জিত; সুরা আছে, কিন্তু সুন্দরী?

কথাটা যদি প্রতিহারী প্রথমে বেগম-সাহেবাকে জানাইত, তবে তিনি যে ব্যবস্থা করিতে পারিতেন তাহাতে সুন্দরীর অভাব নবাবের দৃষ্টিতে পড়িত না। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই কথাটা নবাবের কর্ণগোচর হইয়াছিল এবং সঞ্চিত বারুদের স্তূপে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গপাত হইয়াছিল। প্রথমেই আদেশ হইয়াছিল—বেগম-মহলের প্রবেশদ্বার বন্ধ করা হইবে—যাহারা মহলে আছে, তাহাদিগের মধ্যেই কাহারও বা কাহারও কাহারও যোগে এই কায হইয়াছে। নবাব দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া বলিলেন, "বাঘের মুখ হইতে যে শিকার লইয়া গিয়াছে, তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দেওয়া হইবে।" তাঁহার মুখ হইতে শ্রাব্য ও অশ্রাব্য যে সব কথা বাঁধভাঙ্গা জলের মত বাহির হইয়াছিল, সে সকলের অধিকাংশই অশ্রাব্য। সে সব শুনিয়া সকলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিল—কে জানে, কাহার উপর রোষখড়্গ পতিত হইবে! তাঁহার স্বভাব ও তাঁহার কৃত কার্য্যের কথা সকলেই জানিত—বিশেষ বেগম-মহলে সে সব কাযের বিবরণ নানারূপে অতিরঞ্জিত হইয়াই আসিত। সেই জন্য যে সব অন্তঃপুরিকা আপনাদিগের উপেক্ষা স্মরণ করিয়া মনে করিতেছিল—লোকের মনে ব্যথা দিলে তাহার ফলভোগ করিতে হয়, ভগবানের বিচার সূক্ষ্ম—তাহারাও আনন্দ অপেক্ষা আতঙ্কই অধিক অনুভব করিতেছিল—কি জানি, এই অব্যবস্থিতচিত্ত নবাবের কোপ কাহার উপর পতিত হয়! ইহাদিগের পরিচয় কেবল সৌন্দর্য্যে। ইহারা কেহ দরিদ্র গৃহস্থের গৃহ হইতে, কেহ বা পঙ্কিল পথিপার্শ্ব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদিগের অনেকেরই মন অতি সঙ্কীর্ণ এবং যে পরিবেষ্টনে তাহারা ভোগার্থ আনীত হইয়া বাস করে, তাহার প্রভাব তাহাদিগকে সর্ব্ববিধ উদার ভাবে বঞ্চিত করিয়াছে।

নবাবের আদেশে বেগম-মহলের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমগ্র মহলে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আদেশ গেল—নগরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সন্ধান করা হউক। নগরের চারিটি দ্বার চারি দিকে পাষাণ-প্রাচীরে ছিদ্র করিয়া অবস্থিত। এককালে যখন শত্রুর আক্রমণভয় ছিল তখন, যেমন পরিখায় জল ছিল, তেমনই দ্বার বন্ধ করিবার ব্যবস্থাও ছিল; লৌহকীলকপূর্ণ স্থূল কবাট কপিকলে তুলিবার ও ফেলিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রয়োজনাভাবে—অব্যবহারে কবাট এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে—তুলা-ফেলা যায় না। কিন্তু নবাব তাহা জানিতেন না।

নবাবের ক্রোধ বাড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল।

ততক্ষণে সংবাদ বেগম-সাহেবার নিকট পৌঁছিয়াছে। তিনি আহারে বসিতেছিলেন ; নানারূপ স্নেহপদার্থপক্ক আমিষ তাঁহার জন্য রৌপ্যপাত্রে সজ্জিত ছিল। তিনি যে অংশে বাস করেন, তাহা মহলের এক প্রান্তে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুসজ্জিত। সংবাদ পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন সন্ধান পাওয়া গেল না ?"

দাসীরা উত্তর করিল, "না।"

"যে গিয়াছে, তাহার হাড় জুড়াইয়াছে।"

"কিন্তু আমরা গরীব—আমাদিগের হাড় আর মাস যে এক সঙ্গে থাকে না।"

"নবাব খুব রাগ করিয়াছেন ?"

"মহল যেন কাঁপিতেছে ; কেহ কি সে দিকে যাইতে পারে ?"

বেগম সাহেবার গর্ব্বে আঘাত লাগিল। কেহ নবাবের সম্মুখীন হইতে পারে না ? তিনি পারেন। তিনি বলিলেন, "চল্, যাই।"

আহার্য্য যেমন ছিল তেমনই রহিল। মেদাতিশয্যহেতু বিপুব দেহ লইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একটু চিন্তা করিয়া দুইটি উপেক্ষিতা তরুণীকে যাইবার সময় তিনি তাহাদিগের কক্ষ হইতে ডাকিয়া নবাবের নিকট লইয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিয়া স্বয়ং সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। যাইবার সময় তিনি দেখিলেন, প্রভাতের ঝড়ের সম্ভাবনায় যেমন পারাবতগুলি স্ব স্ব কক্ষ হইতে মুখ বাহির করে, তেমনই কক্ষে কক্ষে বেগম ও বাঁদীরা দ্বারের কাছে আসিয়া কি হইতেছে জানিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল।

বেগম-সাহেবা বপুর বিপুলতাহেতু মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন ; কাযেই তিনি নবাব যে কক্ষে ছিলেন, সেই কক্ষে উপনীত হইবার পূর্ব্বে আদিষ্টা তরুণীদ্বয় তাঁহার নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। তিনি বলিলেন, "তোমাদিগকে নবাবের কাছে থাকিতে হইবে।" তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার সাহস মহলে কাহারও ছিল না।

কেবল বেগম-মহলে নহে, সমগ্র রাজ্যে তিনিই কেবল নবাবকে ভয় করিতেন না। ভয় না করিয়াই তাঁহার সাহস পুষ্ট হইয়াছিল। যখন বালিকা-বয়সে নবাবের সহিত তাঁহার বিবাহ-হয়, তখন নবাব বালক ; তাঁহার সহিত নবাবের বিবাহ কুলক্রমাগত রাজনীতিক ব্যাপার। বেগম-সাহেবা যে সামন্ত রাজ্যের শাসকের কন্যা, সে রাজ্যের বিস্তার তাঁহার স্বামীর রাজ্যের বিস্তার অপেক্ষা অধিক এবং সে রাজ্যের শাসকের ইংরেজ রাজার নিকট সম্মান যে অধিক, তাহা তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট তোপের সংখ্যায় বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার সহিত বিবাহে নবাবের পরিবারের সম্ভ্রমবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহার পর দরবারের চিরাগত নিয়মানুসারে রাজ্যে কোন নারী তাঁহার তুল্য সম্মানের অধিকারিণী হইতে পারেন না—কোন সুন্দরী নবাবের প্রেয়সী হইলেও বেগম-সাহেবার সম্মানের অংশ পায় না। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা—তাঁহার পুত্রই রাজ্যের উত্তরাধিকারী। বেগম-মহলে আসিয়া তাঁহার দিন যে সুখেই কাটিয়াছে, তাহা না হইলেও—তিনি পিতৃগৃহে যে পরিবেষ্টনে অভ্যস্তা ছিলেন, তাহাও এই পরিবেষ্টন হইতে ভিন্নরূপ নহে। তাই তিনি ইহাই স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য মনে করিতে শিখিয়াছিলেন। সুখ ও দুঃখ অনেক স্থলেই ধারণার উপর নির্ভর করে।

বেগম-সাহেবাকে সম্মুখে দেখিয়া নবাবের উগ্র ভাব যেন সহসা হ্রাস পাইল। তিনি বলিলেন, "শুনিয়াছ ত, কি হইয়াছে ?"

বেগম-সাহেবা বলিলেন, "তাহা আর শুনি নাই? তোমার বুদ্ধিতে রাজ্যে কাহারও এ লজ্জার কথা শুনিতে বাকি থাকিবে না।"

নবাব একটু উগ্রভাবে বলিলেন, "কেন ?"

যে রোগের যে ঔষধ তাহা বেগম-সাহেবা জানিতেন। তিনি স্বর আরও উগ্র করিয়া বলিলেন "আঁস্তাকুড় হইতে এঁটো পাত কুড়াইয়া আনিয়াছিলে—গিয়াছে, ভালই হইয়াছে। সে কথা আবার ঢেঁটরা পিটাইয়া প্রজাদিগকে জানাইয়া দেওয়া কেন ? তাহাতে কি ইজ্জৎ বাড়িবে ?"

নবাব চুপ করিয়া থাকিলেন।

বেগম-সাহেবা বুঝিলেন ঔষধ "ধরিয়াছে"। তিনি আর এক মাত্রা ঔষধ দিলেন—"গিয়াছে আপদ গিয়াছে। থাকিলে কি করিত, তাহা কে বলিতে পারে ?"

"কি আবার করিত ?"—নবাবের স্বর আর উগ্র ও উষ্ণ নহে।

"কি করিত! হয়ত তোমাকে বিষ দিত। বিশ্বাস কি ?"

"বিষ পাইত কোথায় ?"

উপহাসের হাসিতে কক্ষ মুখরিত করিয়া বেগম-সাহেবা বলিলেন, "তোমার সিপাহী-শান্ত্রী সকলকে যাদু করিয়া যে পলাইয়াছে, সে কোন্ উপায়ে পাইত কে বলিতে পারে ?"

"সিপাহী-শান্ত্রীদিগের ধড়ে মাথা রাখিব না।"

কখন কি ভাবে কথা বলিতে হয়, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় বেগম-সাহেবার তাহা অজ্ঞাত ছিল না। তিনি বলিলেন, "সে ত নিশ্চয়! তবে আগে দেখ, অপরাধ কাহার। যদি হতভাগী পুকুরে ডুবিয়া মরিয়া থাকে, তবে ত কাল না হইলে ভাসিয়া উঠিবে না।"

নবাব চমকিয়া উঠিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুকুরে ডুবিয়াছে?"

"ডুবিয়াছে বলিতেছি না; ডুবিতেও ত পারে।"

"পুকুরটা ভরাট করাইয়া দেওয়াই ভাল।"

বেগম-সাহেবা হাসিয়া বলিলেন, "যত দোষ পুকুরেরই হইল! পুকুর না থাকিলে এত বড় বাগান, এত ফোয়ারা—মহলে এত জল কোথা হইতে আসিবে?"

নবাব ভাবিতে লাগিলেন।

ততক্ষণে বেগম-সাহেবা দুই বার পাত্র পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন—দুই পাত্র মদ্য নবাব পান করিয়াছিলেন। নেশার রং তখন ধরিয়া আসিতেছিল।

বেগম-সাহেবা বলিলেন, "এখন বৃথা হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিয়া শরীর ও মেজাজ খারাপ করিও না।"

তিনি তরুণীদ্বয়কে বলিলেন, "নবাব-সাহেবকে আর দুই পাত্রের উপর সরাব দিবে না।"

"তুমি এখন ঘুমাইবার চেষ্টা কর"—নবাব-সাহেবকে এই কথা বলিয়া বেগম-সাহেবা বাহির হইয়া আসিয়া দ্বারের পুরু ভারী মকমলের পর্দ্দা টানিয়া দিলেন।

নবাব দিল্লী হইতে আসিবার পর নেজমাকে কখন দেখেন নাই—সে তাঁহার দৃষ্টিপাতের উপযুক্ত রূপে সংস্কৃত হইতেছিল। কিন্তু দুই পাত্র সুরা পানের পর বিলোল-কটাক্ষ-নিক্ষেপকারিণী যে তরুণীদ্বয় পাত্র পূর্ণ করিতেছিল তাহাদিগকে তাঁহার নিকট মন্দ বলিয়া বোধ হইল না।

বেগম-সাহেবা অনুচ্চস্বরে প্রতিহারীদিগকে নির্দ্দেশ দিয়া যাইলেন—যত জরুরী সংবাদই কেন থাকুক না, সে জন্য যেন নবাব-সাহেবকে বিরক্ত করা না হয়; তাঁহার নিদ্রার যেন ব্যাঘাত না ঘটে; কারণ, না ঘুমাইলে তাঁহার ক্রোধের অবসান হইবে না।

নবাব ঘুমাইলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার সাহস অমনই কাহারও হয় না; তাহার উপর যখন বেগম-সাহেবা এই নির্দ্দেশ দিলেন, তখন আর কোন কথাই রহিল না। তাই প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সহর-কোতয়ালের সহকারী যখন সংবাদ বহিয়া আনিল—ইংরেজের এলাকার একখানি ভাড়াটিয়া মোটর যান সন্ধ্যার পরই আসিয়া রাজধানীর বাজারে দাঁড়াইয়া ছিল; চারি ঘণ্টার কিছু অধিককাল পূর্ব্বে তাহা দ্রুতগতি পথ অতিক্রম করিয়া সাত মাইল দূরে সীমান্ত পার হইয়া ইংরেজাধিকৃত সহরে গমন করিয়াছে—তখন সে বেগম-মহলের রুদ্ধ দ্বারের অপর দিক হইতে গয়াদের মধ্য দিয়া শুনিতে পাইল—নবাব-সাহেব নিদ্রিত, তাঁহাকে কোন সংবাদ দিবার আদেশ নাই।

বেগম-সাহেবা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিয়াছিলেন—বিশেষ জরুরী সংবাদ যদি থাকে, তবে যেন তাঁহাকে জানান হয়, নহিলে নহে। প্রতিহারী সহকারী কোতয়ালের দত্ত সংবাদের গুরুত্বানুভব করিতে পারিল না; কাযেই তাঁহাকেও তাহা লইয়া বিরক্ত করিল না। বৃটিশাধিকারে আর মোটর যানখানির অনুসরণের কোন আয়োজন সে রাত্রিতে হইল না। নির্দ্দেশের অভাবে রাজধানী হইতে কেহ ঐ যানে গিয়াছে কি না, তাহার অনুসন্ধান-ব্যবস্থাও আর সে রাত্রিতে হইল না।

বেগম-সাহেবা তাঁহার কার্য্য-সাফল্যগর্ব্বে খাবার আনিতে বলিলেন এবং খাস দাসীকে তাঁহাকে প্রত্যুষে ডাকিয়া দিতে বলিলেন। সে তাঁহার জন্য অকারণ মমত্ব দেখাইয়া বলিল, "এই এত রাত্রি অবধি জাগিয়া রহিলেন—আবার ভোর হইলেই উঠিবেন?" তিনি সে কথায় মনোযোগ দিলেন না—আহারে বসিলেন।

কালবৈশাখীর ঝড় বহিয়া গেল।

বেগম-সাহেবা যে প্রত্যুষে তাঁহার সুপ্তিভঙ্গের নির্দ্দেশ-দান করিয়াছিলেন, তাহার একাধিক কারণ ছিল। নবাবের একটি অভ্যাস ছিল, তিনি যত বিলম্বেই শয্যাগ্রহণ করুন না—প্রত্যুষে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে। পূর্ব্বরাত্রিতে তাঁহার কথায় ও সুরায় নবাবের ক্রোধ স্তিমিত হইয়াছিল; কিন্তু নবাবের প্রকৃতি দীর্ঘকালের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তিনি জানিতেন—তিনি বুঝিয়াছিলেন, ক্রোধ নির্ব্বাপিত হয় নাই—তাহা নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে অনেক সময় প্রধূমিত থাকে এবং সেই সময়ের মধ্যে তাহা আবার প্রজ্বলিত হইতে পারে। তাহা নির্ব্বাপিত না হইলে কাহাকে দগ্ধ করিবে, কে বলিতে পারে? তাহাতেই বেগম-সাহেবার আপত্তি ছিল। তাঁহার প্রভাব কখন কাহারও অনিষ্ট করে নাই এবং তিনি সকলকে আপদে বিপদে রক্ষা করিবার চেষ্টাই করি-

তেন। তাঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, যে পলাইয়াছে, সে পলাইয়া দূরে যাইবার দীর্ঘ সময় পায়, ইহাই অভিপ্রেত। কারণ, সে যদি ধরা পড়ে, তবে তাহার যে দণ্ড অনিবার্য্য তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার আরও উদ্দেশ্য ছিল, এই ব্যাপার লইয়া আর কোন গোল না হয়। তাঁহার পুত্রের স্বার্থ এই উদ্দেশ্যের মূলে ছিল। যদি নবাবের পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিরা পলায়িতাকে ধরিবার চেষ্টায় কোন উৎকট কায করে, তবে যে তাহার ফলে রাজ্যের সব ব্যবস্থা ইংরেজ সরকার পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারেন, তাহা তিনি পুত্রের নিকট শুনিয়াছিলেন। নর্ত্তকী মমতাজের উদ্ধার-সাধন-চেষ্টায় যে ইন্দোরের শাসককে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইয়াছিল, তাহা পুত্র মাতাকে বলিয়াছিল।

দাসী তাঁহাকে জাগাইয়া দিয়াই গত রাত্রির সংবাদ দিল, সন্ধ্যার পর একখানি মোটর গাড়ী সহর হইতে বাহির হইয়া রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া ইংরেজাধিকারে প্রবেশ করিয়াছে। গাড়ীখানি কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "সকলকে বল, এ সংবাদ নবাবকে এখন কেহ যেন না জানায়।" দাসী যাইয়া প্রতিহারীকে আদেশ জানাইয়া আসিল। বেগম-সাহেবা যথাসম্ভব শীঘ্র সজ্জা করিয়া নবাবের নিকট গমন করিলেন।

নবাবের তখনও সুপ্তিভঙ্গ হয় নাই। কিন্তু বেগম-সাহেবা জানিতেন, তাহার আর বিলম্ব নাই। তিনি যে তরুণীদ্বয়কে নবাবের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা জাগিয়াই ছিল—বেগম-সাহেবাকে পর্দ্দা একটু সরাইয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইবার উদ্যোগ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ইঙ্গিতে তাহাদিগকে উঠিতে নিষেধ করিলেন। তাহারা আদেশ পালন করিল।

বেগম-সাহেবার জন্য দাসীরা একখানি পুরু গদী আঁটা কেদারা আনিল—তিনি দালানে তাহাতে বসিয়া নবাবের নিদ্রাভঙ্গ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই তরুণীদ্বয় ঘর হইতে বাহির হইয়া জানাইল, নবাবের সুপ্তিভঙ্গ হইয়াছে। বাঁদীরা তাঁহার জন্য তপ্ত ও শীতল জল প্রভৃতি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বেগম-সাহেবা কক্ষে প্রবেশ করিলেন; প্রথমেই বলিলেন, "কই—এখনও ত পুকুরে ভাসিয়া উঠিল না!"

নবাব একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "কে তোমাকে বলিয়াছে, সে জলে ডুবিয়াছে?"

বেগম সাহেবা সুর একটু চড়াইয়া বলিলেন, "কেহ বলে নাই—কিন্তু সম্ভবগুলা বিবেচনা করিতে হয়।"

বলিতে বলিতে তিনি কক্ষসংলগ্ন সজ্জাকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রথমেই দুইটি জিনিষ তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল—হর্ম্মতলে পতিত সজ্জা, পাতরের মেজের উপর স্তূপাকার অলঙ্কার। তিনি দাসীকে বেশ গুছাইয়া সরাইয়া রাখিতে ইঙ্গিত করিলেন; কারণ, নেজমা যখন ঐ বেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে মহল ত্যাগ করিয়াছে; নবাব সে কথা জানিলে বাঁদী প্রভৃতির উপরই তাঁহার সন্দেহ হইবে—তাহাদিগের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। আর এক জন দাসীকে অলঙ্কারগুলি আনিতে নির্দ্দেশ দিয়া তিনি যখন নবাবের নিকট আসিলেন, তখন তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বেগম-সাহেবা বলিলেন, "তবুও ভাল। আমিও তাই ভাবিতেছিলাম—বেগম-মহলের অলঙ্কার দেখিলে লোক তখনই সন্দেহ করিবে।"

নবাব বলিলেন, "কি?"

"অলঙ্কার সব খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

ততক্ষণে দাসী অলঙ্কারগুলি লইয়া আসিয়াছে। বেগম-সাহেবাই সেগুলি রাখিতে বলিয়া যাহার নিকট অলঙ্কারের ঘরের চাবী থাকে, তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন—সে যেন গত সন্ধ্যায় নেজমা বেগমের জন্য প্রদত্ত সব অলঙ্কারের তালিকা লইয়া আইসে।

নবাব কুর্শীতে বসিয়া ইঙ্গিত করিলেই দাসীরা চিলমচী ও রৌপ্যপাত্রে জল তোয়ালিয়া লইয়া আসিল। তিনি মুখে চক্ষুতে জল দিলেন। সুরার ও সুন্দরীর প্রভাবের অবশেষ যেন নিমেষে অন্তর্হিত হইল। নবাবের কার্পণ্য অসাধারণ ছিল। গত রাত্রিতে উত্তেজনার মধ্যে তাঁহার অলঙ্কারের কথা মনে পড়ে নাই বটে, কিন্তু আজ বেগম-সাহেবার কথায় মনে হইল—এ সবও ত যাইতে পারিত! বেগম-সাহেবা জানিতেন, অলঙ্কার যে যায় নাই, এই সুসংবাদ নবাবের ক্রোধের বহ্নিতে জলসেচ করিবে। সেই জন্যই তিনি আবার বলিলেন, "অনেক টাকার গহনা—এ সকলের কেরামত ও ইজ্জৎ সে কি বুঝিতে পারে? এ সব তাহাকে দেওয়া আর গাদার গলায় মোতির মালা দেওয়া এক।" তিনি ইচ্ছা করিয়া প্রথমে এক ছড়া মুক্তার মালা ও তাহার পর এক ছড়া পান্না বসান হার তুলিয়া

যেন পরীক্ষা করিতেছেন, এমনই ভাবে ঘুরাইয়া বলিলেন, "এ সব তাহার সহিবে কেন?"

মহলের তোষাখানার প্রতিহারী যখন তালিকা লইয়া আসিল, তখন সে এক একখানি অলঙ্কারের নাম পাঠ করিতে লাগিল, আর বেগম-সাহেবা সেইটি বাছিয়া তাহাকে দিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নবাবের চক্ষু যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। তালিকায় লিখিত সব অলঙ্কার পাওয়া গেল, কেবল একটি হীরকাঙ্গুরী পাওয়া গেল না। নবাব উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দামের?"

প্রতিহারী তালিকা দেখিয়া বলিল, "আপনি যে গোলাপী-আভা হীরাখানা দশ হাজার টাকায় কিনিয়াছিলেন—"

তাহার কথা শেষ না হইতেই নবাব বলিলেন, "সেইখানা!"

বেগম-সাহেবা বলিলেন, "আরও ত কয়খানা গহনা রহিয়াছে, দেখি যদি ইহার মধ্যে থাকে।"

"আরও কয়খানা?"

"যেগুলা রোজ পরার, সেগুলাও দেখিতেছি রাখিয়া গিয়াছে।"

সেগুলার মধ্যেও কিন্তু অঙ্গুরীটি পাওয়া গেল না।

বেগম-সাহেবা নবাবকে প্রবোধ দিবার জন্যই বলিলেন, "যাউক অল্পের উপর দিয়াই গিয়াছে। সবই ত যাইতে পারিত।"

এই উক্তিতে ও ইহার যুক্তিতে যতটুকু সান্ত্বনা লাভ করা সম্ভব, নবাব সেইটুকু সান্ত্বনাই লাভ করিলেন—তাহার অধিক নহে। বিশেষ যে হীরকখানি গিয়াছে, তাহা দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার মনে হইল, তিনিই ভুল করিয়াছিলেন—হীরক বেগম-মহলে না পাঠাইয়া আপনার খাস তোষাখানায় রাখিলেই ভাল করিতেন।

অলঙ্কারগুলি যথাস্থানে রাখিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া বেগম-সাহেবা সকলকে কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলে সকলে বাহির হইয়া গেল। নবাবও যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময় বেগম-সাহেবা বলিলেন, "আমার একটা কথা আছে।"

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি।"

"যে গিয়াছে তাহার আর সন্ধান করিও না।"

শুনা যায়, ফ্রান্সের কোন রাজার রাজ্ঞী তাঁহাকে রাজ্য-সংক্রান্ত কোন কথা বলিলে রাজা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমি সন্তান লাভের জন্য তোমাকে বিবাহ করিয়াছি—উপদেশলাভ করিবার জন্য নহে।" যে মনোভাবে তিনি সেই কথা বলিয়াছিলেন, নবাবের মনে প্রথমে সেই ভাবই সমুদিত হইল। তিনি তাহা কথায় প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রধান কারণ, তিনি জানিতেন, উগ্র উক্তিতে বেগম-সাহেবা পরাভব স্বীকার করিবেন না। তদ্ভিন্ন তিনি দীর্ঘকাল বেগম-সাহেবার ভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলেন—তিনি যে পলায়িতার সন্ধান করিতে বারণ করিতেছেন, তাহা ঈর্ষ্যাহেতু নহে। তিনি আরও জানিতেন, বেগম-সাহেবা সত্যই তাঁহার কল্যাণ কামনা করেন। তিনি কোনরূপ উগ্রতা প্রকাশ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

"কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। সে যেদিন তোমার আদর লাভ করিবে, ঠিক সেই দিনই পলাইয়াছে, সে সে আদর ঘৃণা করে—তাহাকে আনিলে সে যে কোন অনিষ্টই করিবে না, তাহা কে জানে?"

বেগম-সাহেবা লক্ষ্য করিলেন, নবাব তাঁহার কথায় অধীর হইলেন না—বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। তিনি বলিলেন, "তাহার পর তোমার বেগম-মহল হইতে যে এক জন পলাইয়া গেল, তাহাতে প্রজার কাছে রাজার দৌর্ব্বল্যই ব্যক্ত হইবে। প্রজারা এই কথা লইয়া হাসাহাসি করিবে—তাহাতে রাজার মুখ উজ্জ্বল বা সম্ভ্রম অধিক হইবে না। একেত এখন শাসকের আসন ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই প্রজার আগ্রহ।"

নবাব একটু চমকিয়া উঠিলেন, এ সব কথা কি বেগম মহলেও গোপন থাকে না? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বলিল?"

"কাহার মুখে চাপা দিবে? এই যে আজ পলাইয়াছে, এ কোন শাসকের ঘরেরও নহে, বিদেশ হইতেও আইসে নাই। উহাকে দিল্লী হইতে—গরীবের ঘর হইতে আনা হইয়াছিল। দিল্লী আবার রাজধানী হইয়াছে—তোমরা দিল্লীতে যাও। লোক তোমাদিগের কথার আলোচনা করে। কাযেই সে-ও সব কথা শুনিয়াছিল। সে কি সে কথা মহলে বলে নাই?"

"বুঝি মহলে বিষ ছড়াইয়াছে?"

"সাপ আনিলে তাহাই হয়।"

নবাব গমনোদ্যোগ করিলেন।

বেগম-সাহেবা বলিলেন, "আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই।"

"এখনও শেষ হয় নাই?"

বেগম-সাহেবা দৃঢ়ভাবে—একটু তীক্ষ্ণভাবেই বলিলেন, "না। জানি যাহারা তোমার মুখে চুণকালী মাখাইয়া যায়, তাহাদিগের কথাই তোমার ভাল লাগে; সেই জন্য কথা বলা ত ছাড়িয়াই দিয়াছি। কিন্তু কি ভুল, তবুও তোমার অমঙ্গলের—বিপদের কারণ দেখিলে কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না।"

নবাব বলিলেন, "বাহিরে লোক অপেক্ষা করিতেছে।"

"করুক। তাহারা তাহাদিগের স্বার্থে অপেক্ষা করিতেছে—তোমার নহে।"

নবাব আর কিছু বলিলেন না; বুঝিলেন, কথায় কথা বাড়িবে ব্যতীত কমিবে না।

"আর একটা কথা বলিয়াই চলিয়া যাইব। তোমার লোক তুমি ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনিবার চেষ্টাই করিবে—পুরস্কার পাইবে। তাহার ফল কি হইতে পারে তাহাও ত জান।"

"কি হইতে পারে?"

"সে ত ইন্দোরের ব্যাপারেই দেখিয়াছ।"

নবাব ভাবিলেন, কি আপদ! এ সব কথাও গোপন থাকে না—বেগম-মহলে প্রচারিত হয়!

নবাব বিরক্ত হইলেন বটে, কিন্তু বুঝিলেন, বেগম-সাহেবার কথা উপেক্ষার নহে।

নেজমার পলায়নের কথা বাহির মহলেও গোপন থাকে নাই—কেহ কেহ মনে করিয়াছিল, তাহা হইতেই কিছু উপার্জ্জন হইবে। যখন নবাব সে বিষয়ের উল্লেখও করিলেন না, তখন তাহারা হতাশ হইল; কিন্তু সাহস করিয়া সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেও পারিল না। কোতয়াল গত রাত্রিতেই সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল—একখানি মোটর গাড়ী বাহির হইয়া গিয়াছে; তাহার পর সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, চাঁদনী চকে যে লোকটি দিল্লীর জিনিষ লইয়া দোকান খুলিয়াছিল—সে নিরুদ্দেশ; কিন্তু নবাব সে সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। যখন নবাব কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, তখন অনেক ভাবিয়া, পূর্ব্বরাত্রির আদেশ স্মরণ করিয়া আপনার দোষ কাটাইয়া রাখিবার চেষ্টায় কোতয়াল নিভৃতে নবাব-সাহেবকে বলিল, গত সন্ধ্যায় রাজ্যের বাহিরের একখানি মোটর গাড়ী সহরে আসিয়াছিল।

নবাব সে কথায় কোনরূপ আগ্রহ বা কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "প্রতিদিনই ত রাজ্যের গাড়ী বাহিরে যায়—বাহিরের গাড়ী রাজ্যে আইসে।"

কোতয়াল নিবেদন করিল, "গত রাত্রির আদেশ—"

নবাব মনে মনে বলিলেন, সে আদেশ বহাল থাকিলে তোমাকে এতক্ষণ কারাগারে যাইতে হইত—কায যাহা কর তাহা বুঝা গিয়াছে—কেবল ঘুষ লইতেই পটু। তিনি মুখে বলিলেন, "সে হুকুম বাতিল।"

কোতয়াল স্বস্তির শ্বাস ফেলিল—যতদূর সম্ভব নত হইয়া কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেল।

স্বস্তির শ্বাস আরও অনেকে ফেলিল বটে, কিন্তু নবাবের অব্যবস্থিতচিত্ততার অনেক পরিচয় তাহারা পাইয়াছে বলিয়া আতঙ্কের যে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহা ধীরে—অতি ধীরে দূর হইতে লাগিল। প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা সংবাদটি বিকৃত বা অবিকৃতভাবে শুনিয়াছিল, তাহারা মনে করিল, বেগম-মহলের কথা—উহার আলোচনায় কেবল বিপদই থাকে।

বেগম-মহলে সকলেই জানিল, বেগম-সাহেবা ক্রোধ-সর্পকে তাহার বিবরে প্রেরণ করিয়াছেন, নহিলে সে কাহাকে দংশন করিত, তাহা বলা যায় না।

বেগম-সাহেবার কার্য্য সত্য সত্যই ইন্দ্রজালের মত হইয়াছিল। যে অশ্ব মন্দুরা হইতে বাহির হইয়া ছুটিতে থাকে—দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া অগ্রসর হয়, সে যদি সম্মুখে বাধা পায়, তবে যেমন থমকিয়া দাঁড়ায়—তাহার গতি বন্ধ হয়, নবাবের চিন্তার তেমনই হইয়াছিল। তিনি নির্ব্বোধ নহেন—বেগম-সাহেবার উক্তির যুক্তি বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পলায়িতার সন্ধান-চেষ্টা ব্যর্থই হইবে; কারণ, যে বেগম-মহলের প্রহরী ও প্রাচীর অতিক্রম করিয়া পলাইয়াছে, সে যে বাহির হইয়া নিরীহভাবে তাহার পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবে, তাহা বাতুলের কল্পনা। যে ষড়যন্ত্র করিয়া সে পলাইয়াছে, তাহার উদ্ভব সম্ভবতঃ তাহার মস্তিষ্কে নহে—তাহা অন্য কাহারও সৃষ্টি। সে যে নেজমাকে তাহার পিতৃগৃহে লইয়া যাইতে বিপদের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিবে, তাহা অবশ্যই অনুমান করা যায়। কাযেই তাহার সন্ধানে অর্থের ও উদ্যমের অপব্যয়মাত্র হইবে। অর্থের অপব্যয় তিনি উত্তেজনার সময় ব্যতীত করিতেন না—তাহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। আর এই ব্যর্থ চেষ্টায় কেবল যে তাঁহার সম্ভ্রমহানি হইবে, তাহা বেগম-সাহেবা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

কাযেই ব্যাপারটি আর অগ্রসর হইল না।

কিন্তু হীরকখানির কথা আবার নবাবের মনে হইল। তিনি বেগম-সাহেবাকে আর এক বার নেজমা যে ঘরে ছিল, তাহাতে উহার সন্ধান করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। বেগম-সাহেবা মনে মনে বলিলেন, আগুনের ঐ একটু এখনও আছে—উহা নিবাইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাঁহার মনে হইল, তিনি যদি হীরাখানি দেখিতেন, তবে যেমন করিয়াই হউক সেইরূপ একখানি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহার উপায় নাই। তিনি যাইয়া দাসীদিগকে লইয়া আর এক বার নেজমার অধিকৃত ঘরগুলিতে সন্ধান করাইলেন—কোন স্থান হইতে আলোকপাতে আলোক বিচ্ছুরিত হইল না।

নবাব ঘটনাটি আর বাড়িতে দিলেন না বটে, কিন্তু স্বয়ং তাহা যে ভুলিতে পারিলেন, তাহা নহে। যে দিন তিনি প্রথম সেই দরিদ্র পরিবারের গ্রাম্য বালিকাকে দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, সে ফুল ফুটিলে তাঁহার বেগম-মহলে স্থান লাভের উপযুক্ত হইবে, সে দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার নিযুক্ত লোকরা সন্ধান আনিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, হিন্দুদিগের একটা কথা আছে—স্ত্রীরত্ন দুষ্কুল হইতেও সংগ্রহ করা যায়। তাহাকে দেখিয়া তিনি তাহার মূল্য দিতে সম্মত হইয়াছিলেন - মূল্য লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। শেষে মূল্য স্থির হয় এবং তখন নগদ যে মূল্য দেওয়া হইয়াছিল—তাহা ব্যতীত এত দিন তাহার পিতা মাসিক ৫০ টাকা পাইয়া আসিতেছে। তাহার পর দুই বৎসরের কিছু অধিককালে বেগম-মহলের শিক্ষার ও সংস্কারের ফলে—যখন তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন, কোরক প্রস্ফুটিত হইয়াছে, হীরকখণ্ড শিল্পীর দ্বারা কর্ত্তিত হওয়ায় তাহার সৌন্দর্য্য সমুজ্জ্বল হইয়াছে—সে নবাবকে তাহার কক্ষে পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে, তখনই সে পলাইয়াছে। অনেকগুলি টাকা বৃথা গিয়াছে। তখনই কৃপণের মনে হইল—আর যেন টাকা নষ্ট না হয়; তিনি খাস দপ্তরের হিসাব-রক্ষককে তলব দিলেন এবং সে উপস্থিত হইলে, আদেশ করিলেন—নেজমার পিতার মাসহারা বন্ধ হইল।

হিসাব-রক্ষক হুকুমের চাকর—হুকুম তামিল করিবে বলিয়া চলিয়া গেল।

সে সময়ের মত নেজমার অন্তর্ধান-নাটকের অভিনয়ে যবনিকাপাত হইল। বেগম-সাহেবাও সর্ব্বপ্রযত্নে যাহাতে নূতন অঙ্কে যবনিকা না উঠে, সে বিষয়ে অবহিত রহিলেন।

৩

দিল্লী বিস্ময়কর নগরী। যেমন ইহার কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ তাহা বুঝিবার উপায় নাই, তেমনই ইহার অধিবাসি-বৈচিত্র্যও অসাধারণ। ইহা যেমন বহু রাজবংশের উত্থান-পতন লক্ষ্য করিয়াছে, তেমনই ইহা যে কত দেশের নরনারীকে আশ্রয় দিয়াছে, তাহা আজ আর স্থির করিবার উপায় নাই। ইহার বিদ্যমান এবং ভগ্নপ্রায় বহু হর্ম্ম্যে যেমন নানা স্থাপত্য-রীতি সপ্রকাশ তেমনই ইহার মুসলমান অধিবাসীদিগের মধ্যে বহু জাতির শোণিত আছে। কেবল মোগল পাঠানই নহে, পরন্তু ইরাণী, তুরাণী ইহুদী, জিয়র্জ্জিয়ান, য়ুরোপীয়—নানা জাতি নানা কারণে দিল্লীতে আসিয়াছিল—কেহ বা ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে, কেহ বা ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য আসিয়াছিল—অনেকে আর যে যাহার দেশে ফিরিয়া যায় নাই। কেহ ব্যবসাব্যপদেশে, কেহ বা রাজকার্য্যে আসিয়াছিল; আবার নানা জাতীয় নরী বিলাসী সম্রাটদিগের অন্তঃপুরের জন্য আহরিতা হইয়াছিল—তাহাদিগের আত্মীয়স্বজনও দিল্লীতে স্থান পাইয়াছিল। মুসলমানদিগের মধ্যে নানা জাতির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপনে বাধা নাই, আবার অন্য ধর্ম্ম হইতে ইসলামে দীক্ষালাভও হয়। কাযেই ধর্ম্মই জাতিত্বের স্থান অধিকার করিয়াছে। যে সব খৃষ্টান বা ইহুদী-পরিবার আজও তাহাদিগের বংশানুক্রমিক ধর্ম্মমত রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহারাও বেশে, বাসে, গৃহসজ্জায়, আচার-ব্যবহারে বহু পরিমাণে মুসলমান-প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। বেগম সমরু, কর্ণেল স্কীনার প্রভৃতির কথা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু বহু অখ্যাত ব্যক্তির কথা ইতিহাসে স্থান পায় নাই। দিল্লীর অর্থাৎ যাহাকে সাহাজাহানাবাদ বলা হয়, তাহার উপকণ্ঠে নানা স্থানে এক একটি দরিদ্র পরিবারের নরনারীকে দেখিলে মনে হয়, ইহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষরা বিদেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং কাল ইহাদিগের দেহের বৈশিষ্ট্যে সেই দেশের বৈশিষ্ট্য এখনও মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই।

ফতেপুরী মহল্লায় যে দরিদ্র পরিবারে নেজমা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার বংশ-প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট সাহজাহানের রাজত্বকালে ইরাণ হইতে আসিয়াছিলেন—প্রাসাদের প্রাচীরে পাতরে পাতর বসাইয়া মীনার কাযে দক্ষতাহেতু তাঁহাকে আনা হইয়াছিল। তিনি সপরিবারে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন এবং

তাঁহার পরবর্ত্তীরাও তাঁহারই মত আর ইরাণে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। সে সময় এক এক স্থানের লোক এক এক স্থানে বাস করিত। সেই জন্য দিল্লীর একটি পল্লী ইরাণী পল্লী নামে পরিচিত হইয়াছিল। এখনও তাহা সেই নামেই পরিচিত; কিন্তু সে নামের আর সার্থকতা নাই। কারণ, যে ধর্ম্মে বর্ণভেদের সমর্থন নাই এবং যে ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মাবলম্বীর ও দীক্ষার অধিকার স্বীকার করে—তাহাতে লোককে উৎসাহিতও করে, সেই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে শোণিতের বিশুদ্ধি রক্ষা কখনই সম্ভব হয় না—ইচ্ছা থাকিলেও জন-সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিশ্রণ অনিবার্য্য হয়। মানুষের প্রকৃতির প্ররোচনায় যেমন, আর্থিক কারণেও তেমনই ব্যবধান নষ্ট হইয়া যায়। ইরাণীদিগেরও তাহাই হইয়াছিল। ইরাণী কন্যাদিগের সৌন্দর্য্য যেমন ধনীদিগকে আকৃষ্ট করিত, ধনীর অর্থ তেমনই দরিদ্র ইরাণী অভিভাবকদিগকে প্রলুব্ধ করিত। মোগল ও পাঠানদিগের বংশসম্ভূতদিগের সহিত যেমন, ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুদিগের সহিতও তেমনই ইরাণীদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।

ইরাণী পল্লীর অধিবাসীদিগের আর্থিক অবস্থা হীন হইয়াছিল এবং তাহাদিগের দারিদ্র্য তাহাদিগের ঘরগুলির জীর্ণতায় সপ্রকাশ ছিল। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ব্যবসায় বা চাকরীতে অর্থশালী হইয়াছিল, তাহারা দরিদ্র পল্লী ও দরিদ্র প্রতিবেশীদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বা অন্য পল্লীতে যাইয়া বসবাস করিয়াছে—ইরাণী পল্লী "যে তিমিরে সে তিমিরে" রহিয়াছে; তাহার কোনরূপ উন্নতি হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে হয়—যখন ইরাণী পল্লীতে ইরাণীরা সত্য সত্যই ইরাণী ছিল, তখন হইতে ইহার আরম্ভ—ইরাণীরা শিয়া সম্প্রদায়ের; কিন্তু সুন্নীপ্রধান দিল্লীতে বৈবাহিক আদান-প্রদানে—বিশেষ প্রদানে ঐ সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লক্ষ্ণৌ নগর ও কাশ্মীর রাজ্য প্রভৃতি দুই চারিটি স্থান ব্যতীত ভারতবর্ষে এই স্বাতন্ত্র্য আর কোথাও এখন লক্ষিত হয় না। ইরাণী-কন্যারা সুন্নী ব্যতীত বোরা, খোজা প্রভৃতি সম্প্রদায়েও বিবাহিতা হইয়াছে এবং ইরাণী বালকরাও অন্য সম্প্রদায়ের পরিবারেও গৃহীত হইয়াছে। নির্ব্বাপিতাগ্নি আগ্নেয়গিরির মধ্যে মধ্যে শ্রুত গম্ভীর গর্জ্জনে যেমন অগ্ন্যুৎপাতের স্বরূপ উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য, তেমনই কোন কোন স্থানে "মাধে সাহেবা" ও "তাবাররা" লইয়া হাঙ্গামায় ইরাকে ও আরবে এই সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের প্রাবল্য বুঝিতে পারা যায় না। লক্ষ্ণৌ সহরে বহু দিন শিয়া নবাব ছিলেন—তাই এখনও তথায় সেই স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। দারিদ্র্য-দোষকে গুণ-রাশিনাশী বলা হইয়াছে; তাহা গুণ ব্যতীত আরও অনেক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে। আবার ধনীরা বিলাস-লালসায় সামাজিক ও ধর্ম্মগত বৈশিষ্ট্যও উপেক্ষা করেন। এক দিকে দারিদ্র্যের অপর দিকে ধনীদিগের দ্রুত প্রলোভনের আক্রমণে শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত এই ইরাণীদিগের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যের মূল শিথিল হইয়া আসিয়াছিল—কালও সেই কার্য্যে সহায় হইয়াছিল। কেবল মহরমের তাজিয়া লইয়া যাইবার সময় কেহ কেহ সেই বৈশিষ্ট্যের সম্মান ও স্মৃতি রক্ষা করিত।

এই ইরাণী পল্লীর এক যুবক—তাহের চাঁদনী চকে এক ব্যবসায়ীর নিকট চাকরী করিত। সে প্রতি দিন প্রাতে ব্যবসায়ীর গৃহে যাইত—মধ্যাহ্নে গৃহে আসিয়া আহার করিয়া আবার কর্ম্মস্থানে যাইত—সন্ধ্যার পর ফিরিত। তখনও চাঁদনী চকের রাজপথের মধ্যস্থলে বৃক্ষশ্রেণী। লর্ড হার্ডিং যখন দিল্লীকে ইংরেজের রাজধানী করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে তাহাতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার করিপৃষ্ঠে বোমার বিস্ফোরণ হওয়ায় সাহজাহানের সময়ে ছায়াদানজন্য রোপিত সেই সকল বৃক্ষ নির্ম্মূল করা হয়। কিন্তু ছায়া থাকিলেও গ্রীষ্মকালে তাহাতে মধ্যাহ্নিক গতায়াত কষ্টকর ছিল—তবুও সে ইরাণী পল্লী ত্যাগ করে নাই। তাহার স্ত্রীরই পল্লীত্যাগে বিশেষ আপত্তি ছিল। তাহার পিতৃগৃহও ঐ পল্লীতে এবং তাহার মাতা তাঁহার কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কন্যা সেই জন্য মাতার নিকট হইতে দূরে যাইতে চাহিত না। প্রভু দুই চারি বার তাহাকে চাঁদনী চকের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাসা করিতে বলিয়াছিলেন—সে তাহা করে নাই।

তাহেরের প্রভু চতুর ব্যবসায়ী ও দূরদর্শী ছিলেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পত্নীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল; কাজেই পুত্রকন্যার সংখ্যাও অধিক হইয়াছিল। যাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পরও তাহারা স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সেইজন্য তিনি ব্যবসার প্রসার বৃদ্ধি করিবার সুযোগ কখন ত্যাগ করিতেন না—সুযোগের বিষয় চিন্তাও করিতেন। তিনি যে সকল পণ্যের বাবসা করিতেন খর্জ্জুর সে সকলের অন্যতম।

তখনও ইরাক স্বতন্ত্র রাজ্য হয় নাই—মেসোপোটেমিয়া নামে তুর্কীর অধীন ছিল এবং ওয়ালী বা গভর্ণরের অধীনে কতকগুলি বিলায়েং (ওয়ালীয়াৎ) বা প্রদেশে বিভক্ত হইয়া শাসিত হইত। তথা হইতে, বড় বড় নৌকায়, খর্জ্জুর এ দেশে আসিত। সেই সব নৌকা—মাহেলা ও বাঘলা—আরব নাবিকরাই চালাইয়া আনিত। তাহেরের প্রভু সন্ধান লইয়া জানিতে পারেন—ইরাকে একাধিক প্রকার খর্জ্জুর হয়; সে সকলের মধ্যে হালাভী আমেরিকায়, খাদরাভী অষ্ট্রেলিয়ায়, সার য়ুরোপে অধিক রপ্তানী হয়—ঝড়তি পড়তি যাহা থাকে প্রধানতঃ তাহাই এ দেশে আইসে। তিনি মনে করিয়াছিলেন—এই ব্যবসায় উন্নতিসাধন সম্ভব, আর সঙ্গে সঙ্গে যে ছিটের রুমাল আরবরা মাথায় বাঁধে তাহা রপ্তানী করা যাইতে পারে। বাজার ও সুবিধা বুঝিবার জন্য তিনি ইরাকে যাইবার ইচ্ছা করেন।

কিন্তু ব্যবসার কল্পনা পূর্ব্বে প্রকাশ করিতে নাই—পাছে আর কেহ উহা "লুফিয়া" লয়। তাই তিনি অনেক ভাবিয়া প্রকাশ করিলেন, তিনি তীর্থে যাইবেন—বাগদাদ তাঁহার গন্তব্য স্থান।

তিনি যে মসজেদে নামাজের জন্য শুক্রবারে যাইতেন, সেই মসজেদের ইমাম প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহার সঙ্গী হইবার প্রস্তাব করিলেন। ক্রমে যাত্রার সব আয়োজন হইল। প্রভু স্বয়ং আরবী ভাষা জানিতেন না—ইমাম যদিও বলিলেন, তিনি সঙ্গে থাকিলে সে জন্য কোন অসুবিধা হইবে না, তথাপি প্রভু তাহাতে নির্ভর করিতে পারিলেন না; কারণ, ব্যবসা সম্বন্ধে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই—ধর্ম্মযাজককেও নহে। তাহের তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিল। সে জুম্মা মসজেদের মক্তব বা পাঠশালায় আরবী শিখিয়াছিল এবং পাঠশালায় তাহার ছাত্র হিসাবে সুনাম ছিল। প্রভু তাহাকে বলিলেন, তিনি তাহাকে সঙ্গে লইতে পারেন, তবে সে যে বেতন পাইতেছে তাহাই পাইবে—অতিরিক্ত পাইবে আহার। দেশ দেখিবার আগ্রহে এবং হয়ত এ দেশে যে কপাল পাতরচাপা, বিদেশে তাহা পাতাচাপা না হইতে পারে মনে করিয়া তাহের তাহাতেই সম্মত হইল। সে জানিত, কোন চতুর লোক—চাকরীহীন অবস্থায় নবাবের নিকট চাকরীপ্রার্থী হইলে নবাব যখন তাহাকে বলেন, "চাকরী নাই," তখনও সে চাকরীর জন্য প্রার্থনা করিতে থাকায় তিনি তাহাকে বিনা বেতনে নদীর তরঙ্গ গণিবার চাকরী দেন। সে তাহাতেই সম্মত হইয়া যায় এবং নদীর কূলে বসিয়া যে নৌকা যাইত তাহাকেই "ঢেউ ভেঙ্গ না—নবাবের হুকুম" বলিয়া উৎকোচ লইতে থাকে। তাহের ভাবিল, সেও ঐরূপ একটা উপায় করিয়া লইতে পারিবে।

তাহার পর যাত্রা। তিন জনের মধ্যে কেহই পূর্ব্বে সমুদ্র-যাত্রা করেন নাই—নূতন অভিজ্ঞতা। সমুদ্র শান্ত ছিল। জাহাজ পারস্যোপসাগরে আসিল; তথা হইতে আরবদিগের নৌকা ভাড়া করিয়া যাত্রীরা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস্ নদীদ্বয়ের সম্মিলনে জাত সেতল-আরব নদীতে প্রবেশ করিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইলেই দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল—মধ্যে মধ্যে খর্জ্জুরের বাগান। মৌলবী বলিলেন—"পয়গম্বর বলিয়াছেন, এই গাছ এ দেশের লোকের পিতৃস্বসা (ফুফী)—ইহা লোককে খাদ্য, ইন্ধন ও গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ যোগায়।" ফাও ও মহামেরা অতিক্রম করিয়া নৌকা যথাসময়ে বসোরায় উপনীত হইল। বসোরা খেজুর ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। এই স্থানে ব্যবসা সম্বন্ধে সংবাদ লওয়া তাহেরের প্রভুর প্রয়োজন ছিল। সকলে বসোরায় অবতরণ করিলেন। তথায় তিন চারি দিনেই তাহেরের প্রভু তাঁহার প্রয়োজনীয় সব সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। দেশের শাসন-ব্যাপারের বিশৃঙ্খলা ও দেশের লোকের ব্যবহারাদি লক্ষ্য করিয়া তিনি ব্যবসা-বিস্তারের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া কেবল দুই জন মধ্যাবস্থ খর্জ্জুর ব্যবসায়ীকে মাল পাঠাইবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন—দেশের দুরবস্থার সর্ব্বপ্রধান পরিচয়—খর্জ্জুর ব্যবসায়ে প্রধান ব্যবসায়ীরা য়ুরোপীয়; দেশে খাদ্যদ্রব্যের—এমন কি শাকসব্জীরও—অভাব; কারণ, যে জমিতে তাহার চাষ হয়, তাহার রাজস্ব অত্যন্ত অধিক এবং লুণ্ঠন স্বাভাবিক ব্যাপার।

তাহেরের প্রভুর এক বার মনে হইল, তিনি বসোরা হইতে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু কয়টি কারণে তিনি তাহা করিলেন না—প্রথমতঃ যখন তীর্থদর্শনের কথাই প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, তখন তাহা না করিয়া যাইলে লোক কি মনে করিবে? বিশেষ তীর্থদর্শনে হয়ত কিছু পুণ্যলাভ হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইমাম সাহেব সঙ্গে আছেন; তিনি বাগদাদ পর্য্যন্ত যাইবেন বলিয়াই আসিয়াছেন। সুতরাং মধ্যপথে যাত্রার বিরত হওয়া যায় না। তবে দেশের ও দেশের লোকের অবস্থা জানিলে তিনি যে কখনই এই বিশৃঙ্খলার ও দস্যুর দেশে আসিতেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তিনি ইমাম সাহেবকে

বলিলেন, পথে কোথাও না নামিয়া বসোরা হইতে বাগদাদে গমন করিতে হইবে এবং তথা হইতে যথাসম্ভব শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইবে।

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের সঙ্গম অতিক্রম করিয়া যান টাইগ্রিসে প্রবেশ করিল এবং এজরার কবর ও আমারা প্রভৃতি অতিক্রম করিল। দেশের কতকাংশ মরুভূমি—কতকাংশ অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর। রাত্রিকালে প্রহরীরা বন্দুক লইয়া পাহারা দিত—দস্যুর আক্রমণভয় আছে। তাহেরের প্রভু কেবলই মনে করিতেন, এমন দেশে মানুষ ইচ্ছা করিয়া আইসে! এখন কোনরূপে ফিরিয়া দিল্লীতে পৌছিতে পারিলে হয়। যে কয় দিন তাঁহারা বসোরায় ছিলেন, সে কয় দিন ক্ষুদ্র মক্ষিকা পিশুর অত্যাচারে যেমন সুনিদ্রা সম্ভব হয় নাই, পথে তেমনই দস্যুভয় তাঁহাকে জাগ্রত রাখিয়াছে।

অবশেষে যাত্রীরা বাগদাদে পৌছিলেন। বাগদাদ বৃহৎ ও পুরাতন সহর—বিশেষ ওয়ালী বা প্রাদেশিক শাসকের অবস্থিতিস্থান। সেই জন্য বাগদাদে দস্যুভয় অপেক্ষাকৃত অল্প। বাগদাদ সঙ্কীর্ণ রাজপথের ও আবর্জ্জনার সহর হইলেও মরুমধ্যে অবস্থিত নহে এবং সেই জন্য বৃক্ষলতায় শ্যামসুন্দর। বিশেষ টাইগ্রিস খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া তটভূমির আবর্জ্জনা বহন করিয়া লইয়া যায়। খরস্রোতে টাইগ্রিসকে দেশের লোক "দাজলা" বা তীর বলে। স্রোতের জন্য নদীর তীর পোস্ত গাঁথিয়া রক্ষা করিতে হইয়াছে। কূলে ধনীদিগের গৃহ—তাহাতে উদ্যান—উদ্যানে করবী ও গোলাপ ফুলের গাছ—গাছ পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকনম্র; আর আঙ্গুরের লতায় গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর।

বাগদাদে উপনীত হইয়া যাত্রীরা আবদুল কাদের জিলানীর মসজেদের ইমামের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনিই মসজেদের নিকটে তাঁহার একখানি গৃহে যাত্রীদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পারস্যোপসাগরে জাহাজ হইতে অবতরণের পর তাহেরের প্রভু প্রথম একটু স্বস্তিলাভ করিলেন—আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" বাগদাদে আসিয়া তাহেরের প্রভু ব্যবসায়ের ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন—এ দেশে ব্যবসা-বিস্তার হইল না; এখন যত শীঘ্র ফিরিয়া যাওয়া যায়, ততই ভাল; কারণ, যাহার গৃহে অনেক পত্নী ও পুত্র এবং যাহার ব্যবসা বড়, তাহার পক্ষে গৃহ ও ব্যবসা ছাড়িয়া দূরে থাকা নিরাপদ নহে।

ইমাম সাহেব মনে করিলেন, বাগদাদে আসিয়া আবদুল কাদের জিলানীর মসজেদে নামাজ পড়িয়া তিনি যেন সার্থকসাধন হইলেন।

আর তাহের? ধর্ম্মে তাহার আকর্ষণ ছিল না, ব্যবসায়ে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই; সে বাগদাদে সুন্দরীর বাহুল্য লক্ষ্য করিতে লাগিল—পত্রের আবরণতলে যেমন ফুল থাকে, তেমনই কি বোরকার আবরণে কেবল সৌন্দর্য্যই থাকে? শুনা যায়, কেশচন্দ্র সেনের কোন সহযাত্রী বিলাতে যাইয়া প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিলেন—মৎস্য-বিক্রয়কারিণীরাও "মেম"। তেমনই তাহের লক্ষ্য করিয়াছিল, অতি দরিদ্র আরব যুবতীও স্বাস্থ্যে ও বর্ণে সুন্দরী—তাহার সৌন্দর্য্য যেন তাহার দেশের আঙ্গুরেরই মত পুষ্ট ও পূর্ণ।

তাহেরের প্রভু তাহার ভাবগতি দেখিয়া তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন—তাহেরের জন্য উৎকণ্ঠা সেই ব্যস্ততা প্রকাশের মূল হইল। তিনি ইমাম সাহেবকে বলিলেন, "ছেলেটাকে দেশ হইতে আনিয়াছি, ভালয় ভালয় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিলে হয়। উহাকে লইয়া দেখিতেছি বিপদ হইল।" ইমাম সাহেব সরল লোক; বলিলেন, "তাহাই না কি?" তাহেরের প্রভু বলিলেন, "আপনারা পৃথিবীর কথা ভাবেন না—তাই মানুষ চিনেন না!" ইমাম সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "তাই বুঝি? বৈজ্ঞানিকের গল্প আছে—তিনি নক্ষত্রের অবস্থান লক্ষ্য করিতেন—আকাশের দিকে চাহিয়া পথ অতিক্রম করিতে একটা কূপে পড়িয়া গিয়াছিলেন। আপনার বোধ হয়, বিশ্বাস, আমাদিগেরও তেমনই হইবে।"

প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিতে আর বিলম্ব হইল না।

তাহেরের প্রভু দীর্ঘকাল ব্যবসায়ে মানুষকে ঠকাইয়া ও মানুষের কাছে ঠকিয়া মানুষ চিনিবার স্বাভাবিক অসাধারণ শক্তি অনুশীলনের দ্বারা শাণিত করিয়াছিলেন। তিনি যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই সত্য হইল—এত অল্প দিনে তাহের বাগদাদ হইতে ফিরিতে চাহিল না। সে বলিল, সে একটা কাযের সন্ধান পাইয়াছে, কাযটা লাভজনক—তাহা শেষ করিয়া সে শীঘ্রই ফিরিবে, তাহাকে এক মাসের ছুটী দিতে হইবে। প্রভু মনে মনে বলিলেন, "তোমার ব্যবসা আমি জানি—এ ব্যবসার লাভ

সর্ব্বনাশ। কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাইয়াই ভুল করিয়াছি।" প্রকাশ্যে তিনি বলিলেন, "বিদেশে বিনা মূলধনে তুমি কি কায করিবে?" তাহেরকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এটা মরুভূমির দেশ। এখানে মরীচিকা আছে; কিন্তু তাহাতে জীবের প্রাণ যায়। শেষে যেন প্রাণ না হারাও। দরিদ্রের প্রাণই সম্বল।" তাহের যখন বলিল, সে শীঘ্রই ফিরিয়া যাইবে, তখন তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন; এই বিদেশের আইন কি, তাহা তিনি জানেন না, কোন রাজকর্ম্মচারীর সহিতও তাঁহার পরিচয় নাই; কাযেই তাঁহার পক্ষে তাহেরকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা বৃথা হইবে। সে চেষ্টা তিনি করিবেন না। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে আসিয়াছ; তুমি না ফিরিলে তোমার আপন লোকরা যখন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তখন কি উত্তর দিব?" তাহের আবার বলিল, সে অল্পদিনেই ফিরিবে। প্রভু বলিলেন, "তোমার কথাই সত্য হউক। কিন্তু আবার ভাবিয়া দেখ, বিনা মূলধনে কেবল জুয়াচুরী ব্যবসা হয়, আর কোন ব্যবসা না। আবার ভাবিয়া দেখ, —কি করিবে। এ হিন্দুস্থান নহে; এ দেশে দস্যুর প্রভাব —তরবার, বন্দুক এ দেশে আইনের স্থান অধিকার করিয়া আছে।" তাহের তবুও তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না।

তাহার পর তাহেরকে রাখিয়াই যাত্রীদিগকে হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করিতে হইল। যাত্রাকালে তাহার প্রভু তাহাকে ফিরিবার আনুমানিক ব্যয়ের টাকা ও অতিরিক্ত এক শত টাকা দিলেন—মনে মনে বলিলেন, "আল্লা তোমাকে সুমতি দিউন।"

তাহের যাইবে না জানিয়া আবদুল কাদের জিলানীর মসজেদের ইমাম, তাহাকে একটা চাকরী দিলেন—সে ইমাম-পরিবারে বালকদিগকে উর্দ্দু শিক্ষা দিবে। হিন্দুস্থানে তাঁহাদিগের "শিষ্য" অনেক এবং হিন্দুস্থান হইতে বহু যাত্রীও তীর্থস্থানে আসিয়া থাকেন —উর্দ্দু জানা না থাকিলে তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহারে অসুবিধা ঘটে। এই চাকরী তাহেরের যেন সোণায় সোহাগা হইল।

তাহের বসোরা-গোলাপের কথা শুনিয়াছিল। বসোরায় সে কোন যুবককে বলিয়াছিল, যে গোলাপের এত প্রশংসা, তাহা ত সে বসোরায় আসিয়া দেখিতে পাইতেছে না—কোথায় গোলাপ-কুঞ্জে বুলবুলের গান? শুনিয়া বসোরাবাসী যুবক বলিয়াছিল—কবির কথা রূপক—বসোরার সুন্দরীরাই বসোরা-গোলাপ নামে কবিতায় পরিচিত; বুলবুলের মত প্রণয়গুঞ্জন লইয়া না যাইলে, তাহাদিগের সন্ধান পাওয়া যায় না। বোরকা তাহাদিগের পত্রের আবরণ। তাহেরের অজ্ঞতায় ব্যঙ্গ করিয়া যুবক বলিয়াছিল "কিন্তু সাবধান! গোলাপ তুলিতে কাঁটার ভয় থাকে।" তাহের উত্তর দিয়াছিল, "সে ভয়ে কেহ কি গোলাপ তুলিতে বিরত হয়?" যুবক বলিয়াছিল, "ঠিক বলিয়াছ—কবি ওমরের কথাই তাহাই—নগদ যাহা পাওয়া যায়, তাহা লওয়াই সুবুদ্ধির কায—

'নগদ যা' কিছু পাও
তা'ই হেসে নিয়ে যাও—
ধারে কায বৃথা বলি গণি।'

মানুষ ভুলিয়া যায়—ইহকাল আমরা পাইয়াছি, পরকাল অনিশ্চিত।"

"সদুপদেশ" তাহেরের মনের সুরে মিলিয়াছিল, তা'ই তাহার চিন্তা ঐ দিকে ধাবিত হইয়াছিল।

বসোরায় তাহার অবসর ছিল না—বাগদাদে অবসর হইয়াছিল। বিশেষ যুবক যাহাকে বসোরা-গোলাপ বলিয়াছিল, তাহার প্রাচুর্য্য বাগদাদে—বসোরায়—নহে। বাগদাদ বহুকাল-প্রসিদ্ধ নগর—রাজধানী--বিলাসীর স্বর্গ; বিলাসীর পর বিলাসী নানাস্থান হইতে যে সব সুন্দরী সংগ্রহ করিয়াছিল তাহাদিগের সৌন্দর্য্যের চিহ্ন বাগদাদের সুন্দরীদিগের সৌন্দর্য্যে লক্ষিত হয়। তাই যে সব যুবতী টাইগ্রিসে জল লইতে আইসে, তাহারা যখন, এ দিকে ও দিকে চাহিয়া নিকটে কোন পুরুষ নাই দেখিলে, বোরকার অবগুণ্ঠন সরাইয়া মুখে জল দেয়, তখন সেই কৃষ্ণবর্ণ বেশের মধ্যে যে সুন্দর মুখ দেখা যায়, তাহা মেঘান্ধকার আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের মত মনে হয়। আর শনিবারে যখন অপরাহ্নে নানা উজ্জ্বল ও গাঢ় বর্ণের বেশ পরিধান করিয়া—তুর্কীর বিধানে স্ত্রীলোকের পক্ষে অনবগুণ্ঠিতা থাকা নিষিদ্ধ বলিয়া সূক্ষ্ম "রেশমী নেটের" আবরণে মুখ আবৃত রাখিয়া ইহুদী যুবতীরা দলে দলে রাজপথে বাহির হয়, তখন বাগদাদের অপরিচ্ছন্ন রাজপথ যেন চলমলয়ান্দোলিত বিকশিত কুসুমশোভিত উদ্যান বলিয়া মনে হয়। তখন মনে হয়, বাগদাদ উপন্যাসের মণি-মঞ্জুষা, কবিকল্পনার কল্পলোক, সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। কালিদাস উজ্জয়িনীর বর্ণনায় মেঘকে বলিয়াছিলেন:—

"স্ফুরিত বিদ্যুন্মালা ভয়ে বালা
চকিত নয়ন,
সে আঁখির ঠারে যদি না মজিলে
বৃথা এ জীবন।"

তাহেরের মনে হইত, বাগদাদে থাকিলে জীবন সার্থক করা হয়। দিল্লী ইহার তুলনায় তুচ্ছ—একটি দুর্গ ও দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদ, একটি জুম্মা মসজেদ, আর দুই একটি সমাধি-সৌধ যেন তথায় শ্রীহীনতার মধ্যে শ্রীসঞ্চারের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে—যে নারীর দেহে সৌন্দর্য্য নাই, দুই চারিখানি বহুমূল্য অলঙ্কার কি তাহাকে সুন্দরী করিতে পারে? বালু-বিস্তারশীর্ণা যমুনার সহিত পরিপূর্ণা বেগবতী টাই-গ্রিসের যে প্রভেদ দিল্লীর সহিত বাগদাদের সেই প্রভেদ। আর দিল্লীর অধিবাসিনীরা—তাহার পত্নী—হায় দুর্ব্বহ জীবন!

সে কালে যাত্রার দলে সং গান গাহিত—
"প্রাণটা সখের বটে, হাতে কিন্তু পয়সা নেই।"

মাসাধিককাল বিলাসে অতিবাহিত করিয়া তাহেরের সেই অবস্থা হইল। ইংরেজী প্রবাদ—বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না, আর আধ পয়সায় যাহা পাওয়া যায় তাহা পাইবার উপযুক্ত হয় না। সম্বল ইমামের গৃহে চাকরী। তিনি যখন তাহাকে বাসস্থান ও আহার্য্য দানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন সে প্রস্তাব সে গ্রহণ করে নাই; সে যে "স্বাধীনতার" সন্ধান করিতেছিল, সে প্রস্তাব সেই "স্বাধীনতার" বিরোধী। এখন সে বুঝিল, অল্প দিনেই সেই দুইটিরও অভাব তাহাকে ভোগ করিতে হইবে।

সেই অবস্থায় তাহার বিলাসানুশীলনের এক সঙ্গী তাহার নিকট একটি প্রস্তাব করিল। মোয়াজ্জম গ্রাম বাগদাদের উপকণ্ঠে অবস্থিত। গ্রামখানির বৈশিষ্ট্য—খর্জ্জুরের বাগানে—বাগানের মৃৎপ্রাচীরের গাত্রে আঙ্গুর লতার বাহুল্য। গ্রামে যাহাদিগের বাস তাহারা প্রায়ই দরিদ্র। ঐ গ্রামে তাহেরের পরিচিত যুবকের মাতুলালয়; সে কয় দিন পূর্ব্বে তথায় যাইয়া জানিয়া আসিয়াছিল, তথায় এক পতিপরিত্যক্তার কিশোরী কন্যাকে লইয়া গ্রামে অনেক আলোচনা চলিতেছে। যে ব্যক্তি কিশোরীকে বিবাহ করিয়াছিল, সে বিবাহের অল্পদিন পরেই কোন ব্যবসায়ীর কাযে পুস্তিকো পর্ব্বতে গিয়াছিল, আর ফিরে নাই। তাহার না ফিরিবার কারণ, গ্রামের লোক জানিত—তাহার পক্ষে স্ত্রী ও শাশুড়ী দুই জনকে পালন করিবার মত অর্থার্জ্জন সম্ভব হয় নাই—বিশেষ মুখরা শাশুড়ীর বাক্যযন্ত্রণা তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। সে যাইবার পর হইতে গ্রামের কতকগুলি যুবকের অতিরিক্ত মনোযোগ এই তরুণী যে ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে এবং তাহার মাতা তাহাতে যেরূপ প্রশ্রয় দিতেছে তাহাতে তাহারা গ্রামের প্রধানদিগের নিকট বিপদের কারণ বলিয়া বিবেচিতা হইতেছে। অথচ ইরাকে আরবদিগের প্রচলিত প্রথানুসারে এইরূপ নারীকে কোন গ্রামের লোক গ্রামান্তরে বিতাড়িত করিতে পারে না অর্থাৎ তাহারা গ্রামের লোকেরই অভিভাবকত্বে থাকে। গ্রামের প্রধানরা বার বার বৈঠক করিয়াও অব্যাহতিলাভের কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। এক দিন বৈঠকে কোন প্রধান বলিয়াছিলেন, যদি বস্তায় পুরিয়া মা ও মেয়েকে তাঁহারা নদীতে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। একমাত্র উপায় তরুণীর একটি পতি সংগ্রহ করা। সম্প্রতি গ্রামের এই ব্যাপার অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছিল—কারণ, গ্রামের স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন দুই জন গৃহস্থের দুই পুত্র তরুণীর প্রতি অকারণ অতিরিক্ত মনোযোগ প্রদান করায় উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য এক রাত্রিতে একটা হাঙ্গামায় পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই ব্যাপার সকলেরই চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। এই সময় তাহেরের বন্ধুটি তাহাকে এই তরুণীর সন্ধান দিয়া এক দিন তাহাকে মোয়াজ্জমে তাহার গৃহে লইয়া গেল।

তাহের ফাঁদে পা দিল। গ্রামের প্রধানরা তাহাকে ধরিয়া তরুণীকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিলেন। তাঁহাদিগের ভাব দেখিয়া তাহের বুঝিল, যে সব আরব গ্রামে বাস করে—কৃষিকার্য্য বা ব্যবসা করে, তাহাদিগের সহিত দস্যুবৃত্তি জলাভূমির আরবসমূহের প্রভেদ প্রকৃতিগত নহে,—মাত্রাগত মাত্র। সে ভয় পাইল।

নানা কারণে তাহের এই বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া পলাইবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। প্রথম—দারিদ্র্য; তাহার আয় সামান্য, সেজন্য তাহার মুখরা শাশুড়ীর বাক্যযন্ত্রণা তাহাকে সর্ব্বদাই সহ্য করিতে হইত। দ্বিতীয়—স্ত্রীর ও শাশুড়ীর "ইতিহাস" সে যাহা অবগত হইয়াছিল, তাহা তাহাকে তাহাদিগের প্রতি বিমুখ করিয়াছিল; তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, সে হিন্দুস্থানের লোক এবং দীর্ঘকাল প্রতিবেশিরূপে বসবাস করায় হিন্দুরা যেমন মুসলমানের,

মুসলমানরা তেমনই হিন্দুর কতক ভাব গ্রহণ করিয়াছে। মেহেরউন্নিসা তাঁহার জন্য তাঁহার বিবাহিতা স্বামীকে হত্যাকারীর অঙ্কশায়িনী হইয়া সাম্রাজ্ঞী নূরজিহান হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা সেই সূত্রে সম্রাটের দরবারে উচ্চপদ সম্ভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানে মুসলমানরাও সতীত্ব সম্বন্ধে হিন্দুর মতকে মর্য্যাদা দান করেন। তৃতীয়—গ্রামের কোন কোন যুবক পথে তাহাকে দেখিলে তাহাকে শুনাইয়া যে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিত না, তাহাও যেমন নহে, বিবাহ যে তাহার স্ত্রীর প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করে নাই তাহাও তেমনই সত্য।

সে যখন বন্ধনমুক্ত হইবার উপায় সন্ধান করিতেছিল এবং ভয়ে কোন উপায় পাইতেছিল না, তখন গ্রামের প্রধানরাও—গ্রামের বিপদ একেবারে দূর হইল না দেখিয়া—তরুণীকে তাহেরের সঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করাইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন।

অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে প্রধানরা একটা উপায় পাইলেন। তাহের শুনিয়াছিল, টাইগ্রিসের এক পারে যেমন বাগদাদে সুন্নীদিগের পীরের সমাধি—অপর পারে তেমনই শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম্মস্থান কাজমেন। কাজমেনের মসজেদের ঐশ্বর্য্যের কথা সে শুনিয়াছিল এবং তাহা দেখিবার ইচ্ছাও করিয়াছিল। নানা দুশ্চিন্তায় পীড়িত হইয়া সে এক দিন ইমাম সাহেবের গৃহ হইতে বাহির হইয়া গুফা নামক জলযানে নির্ম্মিত সেতু অতিক্রম করিয়া নদীর পরপারে উপনীত হইল এবং তথায় বড় বড় ঘোড়ার ট্রাম গাড়ীর লোককে "কাজমেন! কাজমেন!" চীৎকার করিতে শুনিয়া সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী মসজেদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে সে নামিল এবং যখন মসজেদে প্রবেশ করিল, তখন কেহই তাহাকে বাধা দিল না।

সে দিন মধ্যাহ্নে সে মোয়াজ্জমে যাইতে পারিল না; সন্ধ্যার পর যখন ছাত্রকে পড়াইয়া তথায় গেল, তখন তাহার শাশুড়ী উগ্রকণ্ঠে তাহার বিলম্ব হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিল, সে কাজমেনে গিয়াছিল, তখন সে চীৎকার করিয়া উঠিল—কি সর্ব্বনাশ! সে বিধর্ম্মীর তীর্থস্থানে গিয়াছে!

তাহের দীর্ঘ পাঁচ মাস এই অসহনীয় "বিবাহিত জীবন" যাপন করিয়াছে। তাহার মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সে শাশুড়ীকে বলিল, সে বিবাহ করিয়াছে বলিয়া তাহার পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম টাইগ্রিসের জলে ফেলিয়া দিয়াছে, এমন কথা যেন কেহ মনেও না করে। পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম! শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর রেল এঞ্জিনের বাঁশীর মত তীব্র হইয়া উঠিল, "তুমি শিয়া?" তাহেরের তখন ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে; সে বলিল, "হাঁ। আমার পূর্ব্বপুরুষ ইরাণ হইতে দিল্লীর বাদশাহের আহ্বানে হিন্দুস্থানে গিয়াছিলেন।" শাশুড়ীর চীৎকারে পল্লীর লোক আসিয়া সমবেত হইল—তাহারা মনে করিয়াছিল, তাহের বুঝি কাহাকেও হত্যা করিয়াছে।

সে যে কাজমেনে গিয়াছিল, সেই কথার সুযোগ লইয়া গ্রামের প্রধানরা তাহাকে সস্ত্রীক বিদায় করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন এবং মুখে বলিলেন, পরদিন তাহার বিচার হইবে। "বিচার হইবে" শুনিয়া তাহেরের অত্যন্ত ভয় হইল—তাহার যে দৈহিক নির্য্যাতনের ব্যবস্থাই হইবে, তাহা নিশ্চয় বুঝিয়া সে রাত্রিতে পলাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু সে জানিত না, তাহার জন্য প্রহরীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে গ্রাম অতিক্রম করিবামাত্র ধৃত হইল এবং যথেষ্ট দৈহিক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া এক ঘরে রাত্রির মত বন্দী হইল। তাহার প্রভুর কথা তাহার মনে পড়িল, "শেষে যেন প্রাণ না হারাও।"

প্রভাতে প্রধানরা তাহার "বিচার" করিলেন—বিচারফল তাঁহারা স্থির করিয়াই রাখিয়াছিলেন। আদেশ হইল, সে যখন শিয়া, তখন সে আর গ্রামে থাকিতে পারে না; তাহাকে অবিলম্বে গ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে এবং সে আর কখন গ্রামে প্রবেশের অধিকার পাইবে না; আর সে যে তরুণীকে বিবাহ করিয়াছে, তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে—কেন না, গ্রামে শিয়াপত্নীর স্থান হইতে পারে না। তাহের একবার ভয়ে ভয়ে বলিল, সে যদি তরুণীকে তালাক দেয়? প্রধানরা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, সে তাহার কৃত কার্য্যের ফল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চাহে!

গ্রামের প্রধানদিগের বিচারে তরুণীকে তাহার পৃষ্ঠে বাঁধিয়া দেওয়া হইল—গ্রামের সীমা পর্য্যন্ত তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

তরুণীর মাতা চীৎকার করিতে লাগিল, তাহার কি হইবে? প্রধানরা উগ্রভাবে বলিলেন, "শস্য ঝাড়িয়া খাইবে।"

শাশুড়ীকেও যে সঙ্গে লইতে হইল না, তাহের তাহাই মন্দের ভাল মনে করিল।

তাহের যখন ইমাম সাহেবের নিকট যাইয়া কান্দিতে কান্দিতে সব অপরাধ স্বীকার করিল, তখন তিনি দয়াপরবশ হইয়া ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহার যে

কর্ম্মচারী হিন্দুস্থানে যাত্রী সংগ্রহ করিতেছে, সে-ই তাহেরকে ও তাহার স্ত্রীকে তাঁহার ব্যয়ে হিন্দুস্থানে লইয়া যাইবে এবং দিল্লীতে পৌঁছাইয়া দিবে। তাঁহার ভয় ছিল, নহিলে তাহের পথিমধ্যে তরুণীকে ফেলিয়া পলাইবে।

তাহাই হইল।

আরবী তরুণীকে লইয়া নিঃসম্বল তাহের আবার দিল্লীর ইরাণী পল্লীতে তাহার মলিন জীর্ণ গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার পূর্ব্বপত্নী উগ্র হইয়া উঠিল। পূর্ব্বপ্রভু, বহু সাধ্যসাধনায়, তাহাকে পূর্ব্বের চাকরী দিলেন বটে, কিন্তু তাহার যে সংসারে পূর্ব্বে শান্তি ছিল, তাহা অশান্তিতে নরক হইয়া উঠিল। একে প্রথমা পত্নীর গঞ্জনা, তাহাতে দুর্ভাবনা—দরিদ্রের গৃহে আরবী তরুণীর সৌন্দর্য্য, কি জানি কি হয়! সেই নরকে দিল্লীতে আগমনের দুই মাস পরে আরবী তরুণীর এক কন্যা প্রসূত হইল। তাহার ছয় মাস পরে কন্যার মাতার মৃত্যু হইল—তাহা মৃত্যু কি অপমৃত্যু সে সম্বন্ধে পল্লীর কাহারও কাহারও সন্দেহ ছিল।

বাগদাদের জীবন স্বপ্ন হইয়া গেল—সত্য রহিল ঐ একটি শিশু কন্যা। তাহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ এবং বিমাতার অযত্নে সেই স্বাস্থ্য আরও ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। কাযেই সে শৈশব অতিক্রম করিয়াও গৃহকার্য্যে বিমাতার কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিত না। বিমাতা এই "সতীন কাঁটা" বিদায় করিতেই ব্যস্ত হইয়াছিল এবং বালিকা-বয়সেই ইরাণী পল্লীতে কোন দরিদ্র-গৃহে তাহার বিবাহ দিয়া স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়াছিল।

তাহার দেহে ইরাকের আরব নারীর যে সৌন্দর্য্য প্রতিকূল অবস্থাহেতু প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাই, তাহা তাহার কন্যা নেজমার দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নেজমা মাতামহীর বর্ণ ও রূপ পাইয়াছিল—বিশেষ আরব নারীর রূপে যে উগ্রভাব থাকে, ভারতের রক্ত মিশ্রণে তাহা কোমলত্বে পরিণত হইয়া তাহাকে আরও সুন্দরী করিয়াছিল।

কথায় বলে—"সুখের ঘরে রূপের বাসা।" সংসারে সুখ বহু পরিমাণে অর্থের উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু কতকগুলি লোকের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে—আপনাদিগের মনে সন্তোষের যে উৎস রচনা করে, তাহা হইতেই সুখ উদ্গত হয়। নেজমার মাতা সেই শ্রেণীর লোক ছিল। শৈশবে মাতৃহীন হইয়া সে বিমাতার নিকট যে ব্যবহারে অভ্যস্তা হইয়াছিল, তাহার পতিগৃহের ব্যবহার তাহার তুলনায় তাহার পক্ষে বিশেষ তৃপ্তিপ্রদই হইয়াছিল। ছাইচাপা আগুন যেমন ছাই সরিলে উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তুষারাচ্ছন্ন কুসুমকলি যেমন তুষার গলিয়া যাইলে আপনার সৌন্দর্য্য বিকশিত করে—তাহারও তেমনই হইয়াছিল। তাহার যে রূপ অতিশ্রমে, স্বল্পাহারে ও দুর্ব্যবহারে বিকাশলাভ করিতে পারে নাই, তাহা স্বামীর গৃহে যাইয়া এবং সদ্ব্যবহার পাইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর তাহার সেই সৌন্দর্য্য-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে স্বামীর আদর-যত্ন অধিক পরিমাণে পাইয়া আরও পরিতৃপ্ত ও সুখী হইয়াছিল। সংসারে অর্থের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও শান্তি ছিল—স্বামী যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতে সে সংসার সুব্যবস্থায় চালাইয়া লইত। তাহার পর কন্যাটি জন্মগ্রহণ করিল। তাহাকে দেখিয়া কেহ বলিল, "যেন জুঁই ফুল"—কেহ বলিল, "যেন শুকতারা"। স্বামিস্ত্রী তাহার নাম রাখিল—নেজমা।

নেজমার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি যখন সমগ্র ইরাণী পল্লীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন তাহা যে তাহেরের ও তাহার স্ত্রীর অগোচর রহিল, তাহা নহে। তাহেরের সংসারে সুখ ও শান্তি উভয়েরই অভাব ছিল। তাহার বেতন বর্দ্ধিত না হইলেও পুত্র-কন্যার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। "একটা মুখ সোনা দিয়া ভরান যায়—দশটা ছাই দিয়া ভরানও দুষ্কর।" তাহার সংসারে তাহাই হইয়াছিল। আর সেই "ডাহিনে আনিতে বাঁয়ে কুলায় না" অবস্থায় তাহার স্ত্রীর মুখরতা বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাহেরের পক্ষে সে অবস্থা নীরবে সহ্য করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। সেই অবস্থায় তাহেরও কখনও সাহস করিয়া নেজমার মাতার সংবাদ লয় নাই—লইবার আগ্রহও যে তাহার ছিল না তাহার একাধিক কারণও ছিল। আর তাহার স্ত্রীর ত কথাই নাই; সে মনে করিত, আপদ বিদায় করিয়াছে। তবুও যখন নেজমার সৌন্দর্য্যের খ্যাতিতে সমগ্র পল্লী মুখরিত হইল এবং পল্লীর কোন কোন স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "খোরসেদের মেয়ে দেখিয়াছ? কি সুন্দর!" তখন কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া তাহেরের স্ত্রী এক দিন সপত্নী-পুত্রীর গৃহে গেল।

সৌন্দর্য্যের এমন শক্তি আছে যে, তাহা হিংসা দ্বেষ ও শত্রুতাকেও স্তম্ভিত করিতে পারে। নেজমাকে দেখিয়া তাহেরের পত্নী প্রশংসার ভাবে

অভিভূতা হইল। তাহার আপনার পুত্রকন্যা এবং দৌহিত্রীটি ইহার তুলনায় কত মলিন—ইহার পার্শ্বে কিরূপ কুশ্রী! যে সপত্নীকন্যা স্বভাবতঃ রুগ্ন বলিয়া মনে হইত, তাহার সৌন্দর্য্য কিরূপ বিকশিত হইয়াছে! কখন কখন সে যে পূর্ব্বে তাহাকে দেখে নাই, তাহা নহে; কিন্তু এমন ভাবে কখন লক্ষ্য করিবার সুযোগ গ্রহণ করে নাই। এত দিন হিংসায় সে যাহা মনে করে নাই, এখন তাহার তাহাও মনে হইল—ইহার মাতাকে দেখিয়া তাহের যদি মুগ্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহার সে দৌর্ব্বল্য ক্ষমার্হ। নেজমাকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে! সে ইচ্ছা দমন করা দুষ্কর।

সেই দিন সে তাহেরকে বলিল, "শুনিয়াছ, খোরসেদের মেয়েটি বড় সুন্দরী হইয়াছে?"

তাহের শঙ্কিত হইল। যে ধূলি ভূমিতে পতিত ছিল—বুঝি ঝড়ে তাহা আবার উত্থিত হয়—সেই পুরাতন কথা লইয়া আবার নূতন অশান্তির উদ্ভব হয়! সে বলিল, "তাহাই না কি?"

"আমি আজ দেখিতে গিয়াছিলাম।"

"তুমি?"

"হাঁ। মেয়েটার ত আর খোঁজ লওয়া হয় না। সে হুঁস কি তোমার আছে?"

তাহের কোন কথা বলিল না; মনে মনে ভাবিল, "হুঁসের পরিচয় পাইলে তুমি কি আর রক্ষা রাখিতে?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "অমন মেয়ে আমাদিগের জ্ঞানে এ পল্লীতে হয় নাই।"

"বটে!"

"তুমি এক বার যাইয়া দেখিয়া আইস।"

"আচ্ছা।"

"তবে খালি হাতে যাইও না—ভাল দেখায় না।"

"কিন্তু আমার হাত যে কত খালি, তাহা ত তোমার অপেক্ষা অধিক কেহ জানে না।"

"কিন্তু সংসার করিতে হইলে এ সব না করিলে চলে না।" বলিয়া, তাহেরের স্ত্রী বলিল, "যাও না আর এক বার ইরাকে—সে বার ভাগ্যে জুটিয়াছিল কামিনী—এ বার হয়ত কাঞ্চন জুটিবে।"

আর কথায় কথা বাড়াইতে তাহেরের সাহস হইল না। সে চলিয়া গেল।

সেই দিন সে দরিবা হইতে কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া তাহা লইয়া গৃহে ফিরিবার পথে খোরসেদের গৃহে গেল। সহসা বিমাতাকে দেখিয়া খোরসেদ যেমন বিস্মিতা হইয়াছিল, তাহেরকে দেখিয়াও তেমনই বিস্মিতা হইল। তাহের বলিল, "আসিতে পারি না। তোমার মেয়েটিকে দেখিতে আসিলাম।" সে মিষ্টান্নের ছোট ঝুড়িটি তাহাকে দিল। কন্যাটি তখন তাহার মাতার নিকটে ছিল না—পিতার ক্রোড়ে ছিল। পিতা মেয়েটিকে তাহেরকে দেখাইলে, তাহের বলিল, "কি সুন্দর মেয়েই হইয়াছে। ঠিক উহার দিদিমা'র রং আর শ্রী পাইয়াছে—বুঝি তাহার অপেক্ষাও সুন্দরী হইবে। থাকুক বাঁচিয়া—ভগবান উহাকে সুখী করুন।"

তাহার পরে সে খোরসেদকে ও তাহার স্বামীকে বলিল, "যে দেশ হইতে ইহার দিদিমা আসিয়াছিল, সে দেশের ঘোড়া সব দেশের ঘোড়ার সেরা। ঘোড়ার বাচ্ছা হইলে মালিক ভাল করিয়া সেটি দেখে। যদি বুঝে, ভালই হইবে, তবে সেটিকে বিশেষ যত্নে পালন করে—যাহাতে সে আঘাত না পায়, ভাল খাবার পায়—সে সব দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে—সেটির জন্য অধিক মূল্য পাইবে। দেখিবে, এ মেয়ের খুব আদর হইবে—কপালে থাকিলে এ গরীবের ঘর হইতে রাজার ঘর আলো করিতে যাইবে। ইহাকে খুব যত্ন করিবে।"

সে চলিয়া যাইলে খোরসেদের স্বামী স্ত্রীকে বলিল, "কি ব্যাপার বল দেখি, সে দিন আসিলেন তোমার বিমাতা—আজ ইনি।"

খোরসেদের স্বভাবে—শৈশবে ও বাল্যে লব্ধ ব্যবহারফলে—শঙ্কার ভাব সঞ্জাত হইয়াছিল—আশঙ্কা তাহার প্রকৃতিগত হইয়াছিল। সে বলিল, "কি জানি—বুঝিতে পারিতেছি না। পোড়া মেয়েকে যে দেখে সে-ই এত প্রশংসা করে যে, আমার ভয় হয়—আমাদিগের ভাগ্যে এ মেয়ে সহিবে ত?"

তাহের কন্যাকে আদর করিয়া বলিল, "ও আমাদিগের ভগবানের আশীর্ব্বাদ; যখন আসিয়াছে, তখন যাইবে কেন?"

"তুমি মেয়েকে লইয়া বাহিরে যাইও না।"

"একে ত এই ঘর—তাহাতে জীর্ণ। রাত্রিদিন ইহার মধ্যে থাকিলে যে অসুখে পড়িবে।"

"সকলের দৃষ্টি ত সমান নহে।"

"ও সব মিথ্যা ভয়।"

কন্যার রূপের প্রশংসায় পূর্ব্বে সে গর্ব্ব ও আনন্দই অনুভব করিত। আজ তাহেরের কথায় তাহার মনে হইল—সে রূপের খ্যাতি যত বিস্তৃতিলাভ করে, ততই ত ভাল। সে তাহেরের কথা স্মরণ করিল, যে ঘোড়ার অধিক লাভের সম্ভাবনা, সেটিকে অধিক যত্ন করিতে হয়। সে স্ত্রীকে বলিল, "ও

হইতে হয়ত আমাদিগের অবস্থা ফিরিবে, উহাকে খুব সাবধানে—খুব যত্নে রাখিবে।”

“উহার অদৃষ্টে ভগবান যদি সুখ দেন—ও-ই তাহা লাভ করুক। উহার ভাগ্য লইয়া আমাদিগের ভাগ্য ফিরাইবার দরকার নাই।”

স্বামী হাসিয়া বলিল, “কি বুদ্ধি! তোমাকে এক দিন আগ্রা দেখাইয়া আনিব। দেখিবে, নূরজিহান বেগমের পিতার কবর। তাঁহার অদৃষ্ট ঐ মেয়ের জন্যই ফিরিয়াছিল। জান ত, তিনি যখন ভাগ্যের সন্ধানে হিন্দুস্থানে আসিতেছিলেন, তখন পথে ঐ কন্যা প্রসূত হইলে, প্রথমে তাহাকে পথেই ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অবস্থা এমন ছিল।”

কথাটা কিন্তু খোরসেদের ভাল লাগিল না। বোধ হয়, শৈশবাবধি দারিদ্র্যের পীড়নে তাহার অর্থ সম্বন্ধে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও সঙ্কুচিত হইয়াছিল। কন্যাকে সে আর দেখিতে পাইবে না—এমন করিয়া আপনাদিগের অবস্থা “ফিরাইবার” কল্পনা তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিল না। কিন্তু সে সে সব কথার আলোচনা না করিয়া বলিল, “কবে ঈদের চাঁদ উঠিবে সে ভাবনা আগে কেন? এই ত একরতি মেয়ে—উহার বিবাহ—তাহার এখনও অনেক দেরী।”

তাহার স্বামীও ভাবিয়া দেখিল, তাহাই বটে। সে হাসিয়া উঠিল।

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস, এইরূপে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল। নেজমার রূপ যেন বৎসরের পর বৎসর অধিক হইতে লাগিল।

সে বোরকা ব্যবহার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল এবং তাহার রূপের খ্যাতি দিল্লীর একাধিক ধনিপরিবার হইতে তাহার বিবাহ-সম্বন্ধের কারণ হইল। কোন্ সময়ে উক্ত কোন্ কথার কি ফল ফলে, তাহা কে বলিতে পারে? সেই যে শিশুকে দেখিয়া তাহের বলিয়াছিল—কপালে থাকিলে নেজমা দরিদ্রের ঘর হইতে যাইয়া রাজার ঘর আলো করিবে—সে কথা নেজমার পিতা ভুলিতে পারে নাই। সে সত্য সত্যই এক বার স্ত্রীকে ও কন্যাকে আগ্রায় লইয়া গিয়াছিল - নূরজিহানের পিতার সমাধি-সৌধ দেখাইয়া আনিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও খোরসেদের মন প্রসন্ন হয় নাই; সে মনে করিয়াছিল—যে নূরজিহান স্বামীর হত্যাকারীর অঙ্কশায়িনী হইয়াছিল, তাহার তুলনায় মমতাজমহল কত বড়! দিল্লীর কোন কোন ধনিপরিবার হইতে কন্যার যে সব বিবাহ-সম্বন্ধ আসিয়াছিল, সে সব নেজমার পিতা—“মেয়ে এখনও ছোট”—“আমার ঐ এক সন্তান, বড় হউক। মেয়ে পরের ঘরে দিতেই হইবে—তবে যত দিন কাছে থাকে, তত দিনই আনন্দ”—ইত্যাদি বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

এই ভাবে নেজমার জন্মের পর যখন একাদশ বর্ষ অতীত হইয়া গেল, তখন খোরসেদ কন্যার বিবাহ দিতে ব্যাকুল হইল। আবার সেই সময়, এতদিন পরে, তাহার দ্বিতীয় সন্তান পুত্র প্রসূত হইল।

খোরসেদ স্বামীকে বলিত, “দেখ, আমরা গরিব—গরিবের ঘরে রত্ন আছে জানিলে যাহাদিগের লোভ হয়, তাহাদিগের সাহসও বাড়ে। পোড়া মেয়েও এমন যে, কিছুতেই বোরকা পরিতে চাহে না—বলে, পাড়ার মধ্যে বোরকা পরিতে লজ্জা করে!”

স্বামী শুনিয়া বলিত, “ওর রূপের খ্যাতি যেমন ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে বোরকা পরা না পরা সমান—সকলেই জানে, ও অসাধারণ সুন্দরী।”

“তুমি আর দেরী করিওনা—উহার বিবাহ দাও।”

“ভাল সম্বন্ধ কই?”

“এত সম্বন্ধ আসিল—কোনটাই ভাল নহে?”

প্রকৃত কথা, সে সব সম্বন্ধে নেজমার পিতার “মন উঠে” নাই। সে আরও বড় ডালের ফুল পাই-বার আশা করিতেছিল। স্ত্রীকে সে কথা না বলিয়া সে বলিত, “জান ত আমাদিগের সম্প্রদায়ের ধনীদিগের ব্যবস্থা। গরিবের ঘরে সতীনে পড়িয়া তোমার মা'র দুর্দ্দশার কথা ত শুনিয়াছ। আর এ ধনীর ঘরে।”

স্বামী যাহা বুঝাইল স্বভাবতঃ মৃদু খোরসেদ তাহাই বুঝিল। স্বামীর মনে যে অন্য ভাব ছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তবুও সে বলিল, “যাহাই হউক, তুমি এই বার মেয়ের বিবাহ দাও।”

স্বামী বলিল, “আমি ত ভাল সম্বন্ধই দেখিতেছি।”

“হাঁ—ভাল সম্বন্ধ দেখ।”

স্বামিস্ত্রীতে এইরূপ আলোচনা প্রায়ই হইত। নেজমার পিতা তাহার মনোমত ভাল সম্বন্ধের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল।

দুই বৎসর পরে সেইরূপ সম্বন্ধের সন্ধান হইল।

দিল্লীতে সামন্ত রাজ্যের শাসকদিগের বার্ষিক সম্মিলন হয়। সে সম্মিলনে বড় বড় রাজ্যের শাসকরা রাজনীতিক অধিকার-সম্পর্কিত ব্যাপারের আলোচনা করিতে আইসেন। অধিকাংশেরই প্রকৃত কায মন্ত্রীরা করেন। তাঁহারা বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও বড়লাটকে গৃহে সম্বর্দ্ধনা করিয়া

অবশিষ্ট সময়টা দিল্লীর ও দিল্লীর উপকণ্ঠের নানা দ্রষ্টব্য গৃহাদি দেখিয়া—চাঁদনী চক হইতে আগত পণ্যবিক্রেতাদিগের পণ্য ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কিনিয়া সম্মিলনের সময়টা কাটাইয়া দেন। এক এক জনের সঙ্গে আট দশখানা মোটর যান—রোলস-রয়েস হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ থাকে; আবার রাণীর বা বেগমের বহরও অল্প হয় না।

এই সব রাজন্যের মধ্যে যাঁহারা অধিক উচ্ছৃঙ্খল, তাঁহাদিগের চররা দিল্লীতে আসিয়াও সংগ্রহযোগ্যা সুন্দরীর সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। তাহারা ইরাণী পল্লীতে এক বার যাইয়া থাকে—তথায় সন্ধান লয়। আবার তাহারা যে কাযের কাযী, সে কাযে তাহাদিগের দালালও থাকে। তাহাদিগের দ্বারা যখন ইরাণী পল্লীর নেজমার সংবাদ নীত হইল, তখন সন্ধান লইয়া সংগ্রহকারকরা আর কালবিলম্ব করিল না। তাহারা যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়া থাকে।

দেখিয়াই তাহারা বুঝিল—

অসংখ্য রতনরাজি উজ্জ্বল কিরণ—
গোপনে লুকায়ে রহে জলধি মাঝার;
নিভৃতে ফুটিয়া ঝরে পুষ্প অগণন—
পবনে বিলায়ে দেয় সৌরভের ভার।

এ ফুল দরিদ্রের কুটীরে শোভা পায় না—ইহা প্রাসাদে স্ফটিকাধারে শোভা পাইবার উপযুক্ত; এ রত্ন দরিদ্রের জন্য নহে—ইহা নৃপতির অঙ্গেই শোভা পায়।

ইহার পর দালালীর পর্ব্ব আরম্ভ হইল—নবাবের পক্ষে একের পর এক জন লোক আসিয়া নেজমাকে দেখিতে লাগিল—চুল, চলন, বর্ণ—পরীক্ষিত হইতে লাগিল। খোরসেদ বিরক্তি প্রকাশ করিলে তাহার স্বামী বলিত, "এ তোমার বড় অন্যায়। মানুষ একটা এক পয়সার মাটির হাঁড়ী কিনিলে দুই বার বাজাইয়া দেখে, আর যে অতগুলা টাকা দিবে সে ভাল করিয়া দেখিবে না?"

কত টাকা—খোরসেদ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার স্বামী বলিত, "সেইটাই ত ঠিক হয় নাই। জিনিষ অনুসারে দাম।"

শেষে যখন প্রস্তাব হইল, নবাবকে দেখাইবার জন্য নেজমাকে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন খোরসেদ দৃঢ়ভাবে বলিল, "না।" তাহার স্বামীও তাহার আপত্তির সমর্থন করিল—নবাব 'এক বার নেজমাকে গৃহে লইতে পারিলে—তখন আর কে কি করিতে পারিবে? তখন যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? শেষে কি আম ও থলি উভয়ই যাইবে?

অবশেষে স্থির হইল, নবাব এক দিন ইরাণী পল্লী যে পথের পার্শ্বে অবস্থিত সেই পথে যাইবেন—সেই সময় নেজমাকে আনিয়া পথের পার্শ্বে রাখিতে হইবে—তিনি দেখিয়া যাইবেন।

তাহাও হইল।

দেখিয়া নবাব বলিলেন, আসল হীরা বটে, তবে সংস্কার করিয়া লইতে হইবে। পারিষদরা বলিল, সংস্কার করিবার লোকের আর ব্যবস্থার অভাব নবাবের অন্তঃপুরে নাই।

দর স্থির হইল। দালালরা তাহাদিগের অংশ বাদ দিয়া টাকাটা নেজমার পিতাকে দিল।

পল্লীর অনেকেই বলিল, রূপের উপযুক্ত ঘর হইয়াছে, আর কন্যা হইতেই নেজমার পিতামাতার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল।

স্বামীর সান্ত্বনা-বাক্যও খোরসেদের কন্যাবিরহ-সম্ভাবনা-ব্যথিত হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করিতে পারিল না—সে কান্দিতে লাগিল।

নেজমা অত্যন্ত অপ্রসন্নমনে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিল।

৬

যাহারা ইরাণী পল্লীর অধিবাসী তাহাদিগের অধিকাংশের ধারণা যে পূর্ব্বকালের প্রভাবমুক্ত হয় নাই, তাহা তাহেরের পত্নীপুত্র বর্ত্তমানে ইরাক হইতে আর এক যুবতীকে আনয়নে বুঝা গিয়াছিল। একাধিক বিবাহ যে সম্প্রদায়ে চলিত থাকে, সে সম্প্রদায়ে সেই প্রথা দূর হওয়া সময়সাক্ষেপ। কিন্তু সঙ্কীর্ণ ও বক্র গ্রাম্যপথেও যেমন বসন্তের বায়ু প্রবাহিত হয়, তেমনই সেই পল্লীতেও নূতন ভাবের প্রভাব যে একেবারে প্রবেশ করে নাই, তাহা নহে। বালকরা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত এবং তাহারা যে সব পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিত, সে সকল একালের ভাবে ও প্রভাবে পূর্ণ। যাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া স্কুলে প্রবেশ করিত, তাহারা প্রতীচীর সংস্কারের সহিত পরিচিত হইত। আবার যাহারা ইংরেজী উপন্যাস মূল ইংরেজীতে অথবা তাহাদিগের মাতৃভাষায় অনুবাদে পাঠ করিত, তাহারা যেন নূতন অবস্থার সহিত পরিচিত হইত। বিবাহ, প্রেম, বিদেশ—এ সকল সম্বন্ধে তাহাদিগের ধারণা আমূল পরিবর্ত্তিত হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইরাণী পল্লীতে কাশেম নামক এক যুবক ছিল। এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা চতুর এবং মধুর ব্যবহারের অনুশীলন করে, আপনার কায যত করুক আর না-ই করুক প্রয়োজন বুঝিলে পরের কায সুসম্পন্ন করে—যাহাদিগের সম্বন্ধে বলা যায়, তাহারা ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে সবই করিতে পারে, কিন্তু কোন একটা কাযই করিবার ইচ্ছা অনুভব করে না, চেষ্টা প্রযুক্ত করে না। কাশেম সেই শ্রেণীর লোক। চাঁদনী চকে তাহার পিতার একখানি দোকান ছিল; দোকান ভালই চলিত এবং সেই জন্য তাঁহার অর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। পিতা পুত্রকে মোক্তবে পড়িতে না দিয়া ইংরেজী স্কুলে দিয়াছিলেন। কাশেম স্কুলে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল এবং শিক্ষকদিগের প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর আর বিদ্যালয়ের পাঠে তাহার মনোযোগ ছিল না সে ইংরেজী উপন্যাস পাঠেই অধিক সময় ব্যয় করিত। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই কিন্তু বাজারের বড় বড় মুসলমান ব্যবসায়ীদিগের কায করিয়া দিবার জন্য তাহার আদরের অভাব ছিল না। এই প্রাচীন ব্যবসায়ীরা অনেকেই ইংরেজী জানিতেন না—তাঁহাদিগের বাল্যকালে বহু মুসলমানের ধারণা ছিল, দুই কারণে মুসলমানের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষা করা দোষের—প্রথম, ঐ শিক্ষায় ইস্‌লামের অনেক বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়—উহা ইসলাম-বিরোধী; দ্বিতীয়—যে ইংরেজ মুসলমানকে হিন্দুস্থানের সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনি বাদশাহ হইয়াছে, তাহার বিদ্যা অর্জ্জন করা মুসলমানের পক্ষে অপমানজনক। অথচ ব্যবসা-ব্যাপারে ইংরেজীর প্রয়োজন এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, ইংরেজীতে লিখিত পত্রাদি পড়িতে ও সে সকলের ইংরেজীতে উত্তর দিতে হয়। সেই জন্য প্রত্যেক বড় ব্যবসায়ীর ঐ সব কায করিবার জন্য লোক থাকিত এবং তাহারা প্রায়ই হিন্দু হইত। সেইরূপ বহু ব্যবসায়ীর কায কাশেম করিতে আরম্ভ করে এবং তাহাতে তাহার উপার্জ্জনও মন্দ হয় না। উপার্জ্জনের টাকা অধিকাংশই সে পোষাকে, গন্ধদ্রব্যে, সিনেমা দেখায় ব্যয় করে। কিন্তু তাহার চেষ্টায় তাহার পিতার ব্যবসার উন্নতি সাধিত হওয়ায় পিতা পুত্রের কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না।

তবে পুত্রের একটি কার্য্যে তাহার পিতামাতা দুঃখিত। তাঁহারা এক প্রতিবেশীর কন্যা রসুলানের সহিত তাহার বিবাহ দিবেন—বহুদিন পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। পুত্র তাঁহাদিগকে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিতে দেয় নাই। সে যে রসুলানকে বিবাহ করিবে না, এমন কথা সে বলে নাই, কিন্তু বিবাহও সে করে নাই।

এদিকে রসুলানও বাল্য অতিক্রম করিয়া কৈশোরে উপনীত হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই সে শুনিয়া আসিয়াছে, কাশেমের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। কাশেম যেরূপ লোক, তাহাতে সে লোকের চিত্ত সহজেই জয় করিতে পারে—তাহার বেশভূষা, কথা—এ সব সহজেই লোককে আকৃষ্ট করে। বিশেষ কাশেমের সহিত যে তাহার বিবাহ হইবে, তাহা উভয়ের পিতামাতার সম্মতিতে সে বাল্যকালাবধি শুনিয়া আসিয়াছে এবং তাহাই তাহার অদৃষ্টলিপি বলিয়া বুঝিয়াছে। সে কাশেমকে ভাল বাসিয়াছে। উভয়ে এক পল্লীর অধিবাসী। কাশেমের সহিত সে শৈশবাবধি পরিচিত—একসঙ্গে খেলা করিয়াছে, বড় হইয়া নিঃসঙ্কোচে আলাপ করিয়াছে।

স্ত্রীলোকের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে—সে তাহার প্রেমাস্পদের ব্যবহার যে ভাবে লক্ষ্য করে, আর কেহ সে ভাবে লক্ষ্য করিতে পারে না। সেই জন্যই দেখা যায়, স্বামী যে কথা বা যে ব্যথা অতি যত্নে—বহু চেষ্টায় গোপন রাখে, আর কাহাকেও জানিতে দেয় না—স্ত্রী তাহাও জানিতে পারে এবং অনেক সময় তাহাই যে দাম্পত্য সুখের ও পরিবারিক প্রীতির অন্তরায় হয়, তাহার কারণ—স্বামী যেমন মনে করে, সে—পাছে স্ত্রীর মনে ব্যথা লাগে বলিয়া —সে কথা বা সে ব্যথা তাহাকে বলে নাই, স্ত্রী তেমনই মনে করে, তাহার স্বামী তাহাকে বিশ্বাস করিয়া আপনার কথা বা ব্যথা জানাইল না—সে ত তাহার ব্যথারও অংশ গ্রহণ করিয়া তাহা লঘু করিতেই চাহে। তাহার পিতামাতা যখন কাশেমের সহিত তাহার বিবাহে বিলম্বের বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন,—তখন রসুলান সে বিষয় বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিল— ফলে সে কাশেমের ব্যবহার লক্ষ্য করিতে লাগিল। তখন সে বুঝিতে পারিল, কাশেম নেজমাকে পাইতে চাহে।

তবে রসুলান জানিত, কাশেমের সে আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা—নেজমার পিতা বহু ধনীর গৃহে কন্যার বিবাহের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—সে বিষয়ে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষার পক্ষে অম্বরচুম্বী বলা যায়। কিন্তু তাহা অন্যায় বা অসম্ভব বলাও যায় না; কারণ, ইরাণী পল্লীর যে সব

বালিকা রূপের জন্য ধনীর গৃহে সাদরে গৃহীতা হইয়াছে—তাহাদিগের রূপ নেজমার রূপের তুলনায় তুচ্ছ ও মলিন। তাহাদিগের বাসপল্লীতে সকলেই বলাবলি করিত, নেজমা ধনিগৃহেই যাইবে—কিন্তু সে কত ধনবানের গৃহে যাইবে, তাহাই কেবল তাহার পিতার বিবেচনার বিষয়।

রসুলান জানিত, নেজমার তুলনায় তাহার রূপ তুচ্ছ। কিন্তু তবুও যে পল্লীতে লোক তাহাকে ভালবাসিত এবং কাশেমের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পূর্ব্বে যে বহু গৃহ হইতে এবং পরেও কোন কোন পরিবার হইতে তাহার বিবাহ-প্রস্তাব আসিয়াছে, তাহাও সত্য। সে নেজমার মত রূপবতী নহে কিন্তু তাহার দুইটি বৈশিষ্ট্য লোককে আকৃষ্ট করিত—স্বাভাবিক প্রফুল্লতার বহির্বিকাশ—মৃদু ও মধুর হাস্য, আর তাহার চক্ষু। সে হাসি মৃদু ও মধুর, তাহা কুসুমে সুগন্ধের মত—সুগন্ধ যেমন লোককে কুসুমের আদর করিতে আকৃষ্ট করে, এইরূপ হাসি তেমনই মানুষকে বালিকাকে—কিশোরীকে—যুবতীকে আদর করিতে আকৃষ্ট করে। কোন কোন সুন্দরীর মুখভাবের কঠোরতা অপ্রীতির উৎপাদন করে—বুঝি যে কুসুমের উৎপাদক বৃক্ষে কণ্টকের বাহুল্য, তাহা এই ভাবে ভ্রমরকে দূর করে; কাহারও কাহারও মুখে প্রফুল্ল হাসির অভাব তাহাদিগের সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ করে। আর যাহাদিগের মুখে স্বাভাবিক স্নিগ্ধ ও মধুর হাসি যেন মাখান থাকে, তাহারা সেই হাসির জন্যই লোকেব প্রীতি লাভ করে। মুখ যদি মানুষের মনের পরিচায়ক হয়, তবে সেই হাসি মনের সৌন্দর্য্যই ব্যক্ত করে। রসুলানের কথায় সেই মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিত। বিশেষ রঙ্গে ও ব্যঙ্গে তাহার স্বাভাবিক পটুত্ব ছিল—তবে তাহার রঙ্গ ও ব্যঙ্গ কাহাকেও আঘাত দিত না। বলিয়াছি, তাহার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—চক্ষু। যে চক্ষুকে "বিশালায়ত" বলে তাহার চক্ষু তাহাই—আবার তাহাতে তারকার পার্শ্বে শ্বেতের ভাগ সামান্য অধিক হইয়া তারকার দীপ্তি বর্দ্ধিত করিয়াছে। যাহাকে "চোখের খেলা" বলে তাহা এইরূপ চক্ষুতেই শোভা পায়। এইরূপ চক্ষু স্বভাবতঃ শান্ত দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ মনে হয়, কিন্তু তাহার সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি দেখিতে দেখিতে বিদ্যুতের মত দীপ্ত হইয়া উঠে—স্নিগ্ধতা হইতে দীপ্তির পরিণতি লোকের বিস্ময়ের ও আকর্ষণের কারণ হয়। বাল্যের পর কৈশোরের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নারীর চাঞ্চল্য যেমন স্বভাবতঃ বৃদ্ধি পায়—চক্ষুর খেলাও তেমনই, শিক্ষার অপেক্ষা না রাখিয়া, আত্মপ্রকাশ করে। যৌবনে যখন নারীর দেহে লাবণ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, যেন প্রকৃতির বসন্তাগম হয়, তখন চক্ষুর সেই খেলা অধিক দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। কেহ তাহার অনুশীলন করে, কেহ তাহা করে না—যাহারা অনুশীলন করে, তাহাদিগের তুলনায় যাহারা তাহার অনুশীলন করে না, তাহারাই সে জন্য অধিক সৌন্দর্য্যে সুন্দরী হয়। চক্ষুর সেই বৈশিষ্ট্য রসুলানের সৌন্দর্য্য-সম্পদ ছিল। সেই জন্যই কোন কোন স্থান হইতে তাহার বিবাহের সাগ্রহ প্রস্তাব আসিয়াছে। সে সব প্রস্তাবে তাহার পিতামাতা বলিয়াছেন, "কথায় আটকে পড়েছি। কাশেমের বাপমা কথা দিয়েছেন—কথা ফিরিয়ে নেন নি।" প্রকৃত কথা, তাঁহারাও কাশেমকে বাঞ্ছনীয় পাত্র মনে করিতেন এবং সেই জন্য তাহার আশা সহজে ত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন না। আর কাশেম যে তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে নাই, তাহারও দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ ইরাণী পল্লীর গৃহগুলি যেমন পুরাতন—তাহার সংস্কার ও ব্যবহারও তেমনই পুরাতন। কন্যার ত কথাই নাই, পুত্রেরও পিতামাতার—বিশেষ পিতার আদেশ ও নির্দ্দেশ অমান্য করা নিন্দার বিষয় ছিল। যে কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ে"—সেই কথা তখনও অল্পশিক্ষিত ইরাণী পল্লীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ—নেজমা অসাধারণ সুন্দরী, কিন্তু যাহারা রূপে তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইতেও পারে না তাহাদিগের মধ্যে রসুলান "ফেলা যায় না।" ইংরেজীতে একটা কথা আছে, যে পাখীটা ধরা পড়ে—সেটা ঝোপে অবস্থিত দুইটি পাখীর সমান। অর্থাৎ অধ্রুব অপেক্ষা ধ্রুবের মূল্য অধিক। তাহা যে কাশেম বুঝিত না, তাহা নহে; তবে সে জানিত—সে যে দিন ইচ্ছা করিবে, সেই দিনই রসুলানকে পাইতে পারিবে, সুতরাং যদি তাহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তাহা পরিতৃপ্তির চেষ্টা সে কেন করিবে না?

নেজমাকে লাভের পথে যে বিঘ্ন ছিল, তাহা কাশেম জানিত এবং জানিয়া সেই বিঘ্ন দূর করিবার জন্য তাহার বুদ্ধি ও মনোযোগ প্রযুক্ত করিয়াছিল। নেজমার পিতার মনোভাব সে জানিত। তিনি যে বহু ধনীর গৃহে কন্যার বিবাহের প্রস্তাব "এহ বাহ্য"

বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহা সে অবগত ছিল। সেই জন্য সে তাঁহাকে তাহার প্রস্তাবে সম্মত করাইবার আশা দুরাশা জানিয়া সে দিকে চেষ্টা করে নাই। কিন্তু চতুর সেনাপতি যেমন দুর্গের সিংহদ্বারে আক্রমণ ব্যর্থ হইবেই বুঝিলে দুর্গপ্রাচীরে কোথায় আক্রমণ করিলে সিদ্ধকাম হইতে পারে তাহার সন্ধান লয়, চতুর কাশেম তেমনই সন্ধান লইয়া নেজমার মনোভাব পরিবর্ত্তনের চেষ্টাই করিয়াছিল। সে নেজমাকে বুঝাইয়াছে—নানা সত্য ও কল্পিত, ইতিহাসের ও উপন্যাসের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, যে ধনী দরিদ্রের কন্যাকে কেবল তাহার সৌন্দর্য্যের জন্য বিবাহ করে, সে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করে না। সে সৌন্দর্য্য অনর্থক হয় না। প্রেমই তাহা সার্থক করিতে পারে। সে ইংরেজ কবি পোপের কবিতার নায়িকার সেই কথা বার বার নেজমাকে শুনাইয়াছে :—

"ভূমণ্ডলপতি যদি চরণে আমার
ধরি' লয় ভূমণ্ডল—সিংহাসন তা'র
তুচ্ছ করি' দূরে ফেলি; মনে যদি ধরে
ভিখারীর দাসী হয়ে থাকি তা'র ঘরে।"

চতুর ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবকের কথা শুনিয়া শুনিয়া সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা কিশোরীর মনে তাহাতে বিশ্বাসের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল। কাশেম তাহা বুঝিতে পারিয়া যাহাতে সেই অঙ্কুর দৃঢ়মূল বৃক্ষে পরিণত হয়, সে বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করিত না। নেজমার পিতা যে নুরজিহানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তাহা কাশেম তাঁহার সপরিবারে আগ্রায় গমনে জানিতে পারিয়াছিল এবং সে জানিত, সেই "যুক্তিই" নেজমার জননীর সকল আপত্তি নষ্ট করিয়াছিল। তাই সে নুরজিহানের কথাটা নেজমাকে যে ভাবে বুঝাইয়াছিল, তাহাতে মনে হওয়াই স্বাভাবিক—নুরজিহান যে পতিহন্তা দুশ্চরিত্র বাদশাহের কণ্ঠলগ্না হইয়াছিলেন, সে কেবল সম্রাজ্ঞী হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য। এখন সে দিনও আর নাই। ইতিহাস নুরজিহানের যে নিন্দা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, সে তাহা নেজমাকে শুনাইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়াছে, সে দিন আর নাই—কাযেই এখন সেরূপ ক্ষমতা-লাভও সম্ভব নহে।

যখন কাশেম এইরূপে আপনার অভিষ্টসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছিল, তখন নবাবের চররা নেমজার সন্ধান পাইল। তাহার পর ঘটনা দ্রুতবেগেই ঘটিতে লাগিল।

কাশেম ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না বটে, কিন্তু তবুও আশা ত্যাগ করিল না। ঐরূপ লোকের অন্তঃপুরে কিরূপ ঘটনা ঘটে ও ঘটিতে পারে, তাহা সে নেজমাকে বলিতে আরম্ভ করিল। সে যে তথায় যাইয়া নবাবের প্রিয় কুকুরের অধিক আদর ও লাঞ্ছনা পাইবে না, তাহা সে নেজমার মনে যেন বদ্ধমূল করিয়া দিল। নেজমা ভয় পাইল। যদি সে স্বভাবতঃ ভীরু না হইত, তবে হয়ত সে কাশেমের প্রস্তাবিত দুঃসাহসের কাযেও সম্মতা হইত—তাহার সহিত—গৃহত্যাগ করিত। কিন্তু সে সে সাহস করিতে পারে নাই। কেবল যখন তাহার যাইবার দিন আসন্ন হইল—তাহার মূল্য অর্থে স্থির হইল এবং তাহার পিতা তাহা গ্রহণ করিলেন, তাহার মাতা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অশ্রু সম্বরণে অসমর্থা হইলেন, তখন সে সুযোগ পাইয়া কাশেমকে বলিল, "আমার উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে?"

প্রতিশ্রুতি-পালনের অসুবিধা ও বিপদ বিচার না করিয়াই কাশেম বলিল, "পারিব।"

নেজমার প্রশংসমান দৃষ্টি কাশেমের মুখে স্থাপিত হইল। সেই দৃষ্টি কাশেম নেজমার আদর বলিয়া মনে করিল—তাহা তাহার নিকট অমূল্য বলিয়া মনে হইল। নেজমা তাহার পরই সরিয়া গেল।

নবাবের দর্শনের পর যখন তাঁহার দালালরা যত সত্বর সম্ভব সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল—পাছে অব্যবস্থিতচিত্ত নবাবের ভাবপরিবর্ত্তন হয়, তখন পল্লীর বহু গৃহের মহিলারা আসিয়া নেজমার জননীকে অভিনন্দিত করিলেন, অনেক পুরুষ আসিয়া তাহার পিতার কপাল যে পাতরচাপা দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে পাতাচাপা তাহাই বলিলেন এবং তাহার সমবয়সী ও তাহার অপেক্ষা অল্প-বয়সী কিশোরীরা আসিয়া বলিল, সে ভাগ্যবতী বটে, তখন সেই সব অভিনন্দন তাহাকে প্রফুল্ল করিতে পারে নাই এবং সে বিমর্ষতার কালিমা মুখে লইয়া নবাবের প্রেরিত বৃহৎ মোটর যানে উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল—সে যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতেছে, সে কি বিপদের ও দুঃখের সাগরে?

রসুলানও আসিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিল; কিন্তু তাহার মনের কথা আর কেহ অনুমান করিতে পারে নাই। সে মনে করিয়াছিল, এই বার তাহার পথ নিষ্কণ্টক হইল—সে যে আশা করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইল। সে কাশেমকে সত্য সত্যই ভালবাসিত।

৭

কাশেম যখন নেজমাকে বলিয়াছিল, সে নবাবের অন্তঃপুর হইতে তাহার উদ্ধার-সাধন করিবে, তখন সে যে বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই তাহা বলিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে একটা উত্তেজনাবশে তাহা বলিয়াছিল এবং নেজমাকে পাইবার, সম্ভবই হউক—আর অসম্ভবই হউক, আকাঙ্ক্ষা তাহার সেই উত্তেজনার মূলে ছিল। যে হারেমে কত ষড়যন্ত্র—কত গুপ্তহত্যা—কত নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান হয় তথা হইতে নবাবের প্রিয় নারীকে লইয়া আসা যে, ব্যাঘ্রের বাসগুহা হইতে তাহার শীকার আনার মতই বিপজ্জনক—অসম্ভব, তাহা সে যে বুঝিত না, তাহা নহে। তবুও সে নেজমাকে ঐ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল।

সে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিবে সঙ্কল্প করিয়াই যে সে কথা বলিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। কিন্তু নেজমা যখন সত্য সত্যই তাহার কাছে অপ্রাপ্য হইল, তখন সে কেবলই তাহার কথা ভাবিতে লাগিল। উত্তেজনাবশে মানুষ যে কায করে, উত্তেজনার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা শ্রান্তিকর মনে হয়—অবসাদ আনয়ন করে। নেজমা যাইবার পর দুই তিন দিন কোন কাযে তাহার আগ্রহ রহিল না—সে গৃহে তাহার শয্যায় শয়ন করিয়াই অনেক সময় কাটাইতে লাগিল।

রসুলান সে সংবাদও রাখিল। তাহার এক ভ্রাতা কাশেমের ভ্রাতাভগিনীদিগের সহিত খেলা করিতে তাহাদিগের গৃহে যাইত। রসুলানের শিক্ষায় তাহারাই সে সংবাদ আহরণ করিয়া আনিল। শুনিয়া রসুলান হাসিল—পুরুষের পক্ষে কিরূপ দুরাশা পোষণ করা সম্ভব হয়!

নেজমা যখন চলিয়া গেল, তখন রসুলানের পিতামাতা তাহার সহিত কাশেমের বিবাহের প্রস্তাব নবোদ্যমে উপস্থাপিত করিলেন। কাশেমের পিতামাতার সে প্রস্তাবে কখনই আপত্তি ছিল না—বরং পুত্রের ব্যবহারে তাঁহারা ব্যথিত হইয়াছিলেন। পুত্রের নেজমাকে লাভের দুরাশা জানিতে পারিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা রসুলানের পিতামাতাকে বিবাহের একরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। এখন পুত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারাও সেই প্রস্তাব সোৎসাহে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা, দীক্ষা ও ইরাণী পল্লীতে লব্ধ অভিজ্ঞতা তাঁহাদিগকে মনে করাইল—এ রোগের এক ব্যতীত দুই ভেষজ নাই—বিবাহই সেই ভেষজ। বিশেষ ইরাণী পল্লীতে রসুলান দেখিতে ভাল বলিয়াই পরিচিতা ছিল এবং তাহার দেহে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষেত্রজ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছিল। যে বয়সে কৈশোর যেমন তাহার অধিকারচ্যুতি বুঝিতে পারে না, যৌবন তেমনই তাহার অধিকার স্থাপিত করিবে কি না বুঝিতে পারে না, তাহার সেই বয়স। যে বয়সে নয়নের দৃষ্টিতে চাঞ্চল্য, ব্যবহারে চাপল্য দেখা দেয়—যে বয়সে দেহ যেন পুষ্পিত হইয়া উঠে—দেহের পুষ্টিহেতু যে স্থানের যে অপূর্ণতা ছিল তাহা পূর্ণতা পায়, সেই বয়সহেতু তাহাকে সুন্দরী দেখাইত। কাশেমের পিতামাতা মনে করিলেন, ইহাকে বিবাহ করিলে অল্প দিনেই পুত্রের অসম্ভব সম্ভব করিবার চেষ্টার ব্যর্থতাজনিত দুঃখের অবসান ঘটিবে। কাশেম পূর্ব্বে যেমন কখন তাঁহাদিগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নাই, যেমন নানা অছিলায় বিলম্ব করিয়াছে, এখনও তেমনই করিতে লাগিল।

নেজমার নবাবের সঙ্গে গমনের কয় দিন পরে দিল্লীর উপকণ্ঠে নিজামুদ্দীন নামক স্থানে বার্ষিক মেলা। ঐ স্থানে অলৌকিক কীর্ত্তিশালী বলিয়া খ্যাত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার অবস্থিতিস্থান ছিল এবং তাঁহার সমাধিও বিদ্যমান। তাঁহার নামে স্থানটির নামকরণ হইয়াছে। ইরাণী পল্লীর অধিবাসীরা বহুদিন হইতে ঐ মেলায় যাইয়া থাকে—কেহ মেলা দেখিতে, কেহ পণ্য বিক্রয় করিতে, কেহ বা কিনিতে, কেহ বা কেবল এক দিন মুক্ত স্থানে ঘুরিয়া আসিতে তথায় যায়। তাহা যেন একটা প্রথা হইয়াছে। কয় দিন গৃহে বদ্ধ থাকিয়া স্বভাবতঃ চঞ্চল কাশেম বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তাহার মাতা তাহাকে সে মেলায় যাইবে কি না জিজ্ঞাসা করায় সে তখনই বলিল, সে নিশ্চয়ই যাইবে। সে অভ্যস্ত যত্নে কেশ-বিন্যাস করিল—উত্তম বেশ পরিধান করিল; তাহার পর মেলায় যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল—তাহার মাতা ও ভ্রাতাভগিনীরা যাইবেন কি না, তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না।

যাইবার সময় সে তাহার অর্থের পরিমাণ দেখিয়া লইল—কয়টি টাকা মাত্র আছে। তাহার মনে হইল, কয় দিন কাযে বাহির হইলে সে আরও কিছু ব্যয় করিতে পারিত। তাহার চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হইল; সে ভাবিল, এই কয় দিনে তাহার অভাবে হয়ত তাহার পৃষ্ঠপোষকদিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। সে সঙ্কল্প

করিল, পরদিন হইতে যথারীতি কাযে যাইবে। কি করা কর্ত্তব্য তাহা জানিলেও অনেকে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে না। নেজমার কথা মনে হইলে তাহারও সেইরূপ হইতে লাগিল। রাত্রির অন্ধকার যখন মানুষকে আবৃত করে, তখন সে যেমন তাহা দূর করিয়া মুক্ত হইতে পারে না—নেজমার চিন্তাও তাহাকে আবৃত করায় সে যেন তেমনই কিছুতে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছিল না।

সে দিন অনেক মোটর "বাস" চাঁদনীচক হইতে নিজামুদ্দীনে গতায়াত করিতেছিল; সবই যাত্রীতে পূর্ণ। যাত্রীরা হাসিতেছে—গল্প করিতেছে; যে যাহার উৎকৃষ্ট পরিধেয় পরিধান করিয়াছে—স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয়ে বর্ণের বাহুল্য। কিছুক্ষণ পথিপার্শ্বে অপেক্ষা করার পর কাশেম একখানি "বাসে" স্থান পাইল।

মেলায় মেলার আনন্দ কাশেমকে অভিভূত করিল। সকলেই তথায় আনন্দলাভ করিতে আসিয়াছে—তাই তথায় আনন্দের আবেষ্টন সৃষ্ট হইয়াছে। সে মনে করিল, ভ্রাতাভগিনীদিগের জন্য অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও কিছু কিছু জিনিষ কিনিবে। কিন্তু এ বার তাহার ব্যয় করিবার ক্ষমতা অতি অল্প। সে কখনই মিতব্যয়ী ছিল না; যেন "মনটা সখের বটে, হাতে কিন্তু পয়সা নাই" অবস্থা তাহার সঙ্গের সাথী ছিল; তাই সে কোন পরিচিতের সন্ধান করিতে লাগিল—যদি গোটা কয়েক টাকা সংগ্রহ করিতে পারে। পরিচিতদিগের মধ্যে প্রথমেই সে প্রতিবেশী ও সমবয়সী রসুলানের ভ্রাতা করিমকে দেখিতে পাইল। করিম তাহাকে অভিবাদন করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর, কাশেম, বাড়ীর আর সকলে কোথায়?"

কাশেম বলিল, "আমি আগেই চলিয়া আসিয়াছি; এখন তাহাদিগকে খুঁজিতেছি।"

"এই ভিড়ে কোথায় খুঁজিবে?"

"কিন্তু খোঁজা দরকার হইয়াছে।"

"কি ব্যাপার?"

"গোটা কয়েক টাকা দরকার—জিনিষ কিনিব।"

"সে আমি দিতেছি"—বলিয়া করিম তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ভগিনী রসুলানের নিকট হইতে কয়েকটি টাকা লইয়া কাশেমকে দিল।

সেই সময় কাশেমের দৃষ্টি রসুলানের মুখে পতিত হইল—রসুলানের মুখে প্রফুল্লতা, আর তাহার যে চক্ষুর প্রশংসা পল্লীতে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল, সেই চক্ষুর উজ্জ্বল ও চঞ্চল দৃষ্টিতে সে যেন নূতন সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিল। দিল্লীর দারুণ শীতে লোক যেমন সূর্য্যকর উপভোগ করিতে আকৃষ্ট হয়, কাশেম যেন তেমনই সেই দৃষ্টি উপভোগ করিতে আকৃষ্ট হইল। তাহারা এক সঙ্গে মেলায় ঘুরিতে লাগিল। কাশেম কতকগুলি জিনিষ কিনিল।

অপরাহ্ন হইতে না হইতে রসুলানের মনে পড়িল, সে তাহার মাতাকে বলিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছে—তাহাদিগের এক আত্মীয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনি সন্ধ্যায় তাহাদিগের গৃহে আসিয়া আতিথ্য স্বীকার করিবেন। সে ফিরিয়া যাইতে ব্যস্ত হইল। কিন্তু তাহার ভ্রাতা তখন যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। ভ্রাতা অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও রসুলান ব্যস্ত হইল। কারণ, যিনি আসিবেন, তিনি অকারণ অধিক অভিমানিনী, অকারণে আপনাকে উপেক্ষিতা মনে করেন।

রসুলান ফিরিতে চাহে শুনিয়াই কাশেম বলিল, তাহারও ফিরিবার প্রয়োজন আছে; সে রসুলানকে লইয়া যাইবে। রসুলানের ভ্রাতা যেন স্বস্তি লাভ করিল—তাহার তখনও মেলা দেখিবার—বিশেষ সন্ধ্যায় বাজী পুড়ান দেখার ইচ্ছা ছিল।

কাশেম ও রসুলান মেলা হইতে বাহির হইল—জনতার জন্য উভয়ে উভয়ের নিকটে থাকিয়া অগ্রসর হইল। যখন কাশেম আসিয়াছিল, তখন "বাস" যে স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন জনতাহেতু তথা হইতে কিছু দূরে দাঁড়াইতেছিল।

তখন ক্ষেত্রে শস্য সংগৃহীত হইয়াছে—প্রান্তর শূন্য—তাহাতে কেবল শুষ্ক তৃণ। পথের দুই পার্শ্বে বহুদিনের পুরাতন অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষগুলি তাহাদিগের পক্ক পত্র ত্যাগ করিয়াছে—রিক্ত শাখাগুলি বসন্তের আগমন-প্রতীক্ষায় রহিয়াছে—তখন নবপত্রোদ্গম হইবে। বাতাসে তাহাদিগের শীর্ণ শাখা কম্পিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে এক এক ঝাঁক কাক মাঠ হইতে যেন কোন শব্দে বা কোন জন্তুর আবির্ভাবে ভয় পাইয়া উড়িয়া আসিয়া গাছের শাখায় বসিয়া ডানা মেলিয়া ও নাড়িয়া কা-কা করিতেছে। প্রান্তরের পরপারে দূরে আকাশ অস্তগমনোন্মুখ রবির আলোকে উজ্জ্বল ও রঞ্জিত হইয়া মরণোন্মুখ মানব যেমন চরম ঔষধে আপনার জীবন রক্ষার চেষ্টা করে, তেমনই ব্যবহার করিতেছে। দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে রাজপথ অজগরের মত পড়িয়া আছে। পশ্চাতে মেলার জনকোলাহল ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

যখন তাহারা জনতা অতিক্রম করিল, তখনও রসুলান কাশেমের পার্শ্বে—নিকটেই রহিল। কাশেম এক বার ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিল। সে তাহার দেহের উষ্ণতা অনুভব করিতেছিল। কাশেম তাহার দিকে চাহিতেই চারি চক্ষুর মিলন হইল। কাশেমের মনে হইল, সে যেন ঝটিকায় বাহিত হইয়া চলিয়া গেল—কোথায় গেল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। রসুলানের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার জন্য কি কিনিলে?"

কাশেম তাহার জন্য কিছু কিনে নাই বটে, কিন্তু তাহা স্বীকার না করিয়া জামার পকেট হইতে একটি সুর্ম্মার কৌটা বাহির করিয়া তাহাকে দিল। রসুলানও জানিত, সে তাহার জন্য উহা ক্রয় করে নাই। কিন্তু এই মিথ্যাও যেন তাহার নিকট প্রিয় মনে হইল। সে হাত বাড়াইয়া দিল—কাশেম তাহাকে ঐ কৌটাটি দিল। উভয়ের হাত পরস্পরকে স্পর্শ করিল। রসুলান কাশেমের আরও কাছে সরিয়া আসিল।

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা বলিল না। কোন কথা বলিবার প্রয়োজন আছে, রসুলানের এমন মনেও হইল না।

তাহার পর রসুলানই বলিল, "নেজমাকে হারাইয়া তুমি নিশ্চয়ই বড় দুঃখিত হইয়াছ।"

তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া কাশেম চমকিয়া উঠিল—কেমন অস্বস্তিও অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু সে চেষ্টা করিয়া সেই ভাব অতিক্রম করিল এবং রসুলানের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "ধনীর অলঙ্কার দরিদ্রের অঙ্গে সাজে না। কাশেম দরিদ্র। ভগবানকে ধন্যবাদ—রসুলানকে হারাইবার কারণ এখনও ঘটে নাই।"

একটু অভিমানের সুরে রসুলান বলিল, "কিন্তু তাহাকে পাইবার আগ্রহও তুমি কোন দিন দেখাও নাই। সেই জন্য তাহাকে হারাইবার ভয়ও হয় নাই। যাহাকে পাইতে আগ্রহ হয় না, তাহাকে হারাইতে ভয় কি?"

রসুলানের শেষ কথা কয়টি যেন অশ্রুবাষ্পের উচ্ছ্বাসে অস্পষ্ট হইয়া গেল।

কাশেম বিচলিত হইল। সে জানিত, রসুলান তাহারই অপেক্ষায় রহিয়াছে—নহিলে এতদিনে তাহার বিবাহ হইয়া যাইত। তাহার চক্ষুর সৌন্দর্য্য যে সত্যই মুগ্ধকর তাহা কাশেম বহু বার অনেকের মুখে শুনিয়াছে, সে-ও পূর্ব্বে তাহা লক্ষ্য করিয়াছে; কিন্তু আজ এই নির্জ্জন স্থানে তাহার পার্শ্বে অবস্থিতা—তাহার প্রতি অভিমানে বিচলিতা—অশ্রুপূর্ণ-নয়নার চক্ষুর সেই সৌন্দর্য্য সে যেমন অনুভব করিল, তেমন আর কখন করে নাই। সেই অনুভূতিতে যেন মাদকতা ছিল। সেই সময় সম্মুখে অবস্থিত একখণ্ড প্রস্তর দেখিতে না পাইয়া রসুলানের পদ তাহাতে আঘাত পাইল, সে পড়িয়া যাইবার মত হইল। সে আপনাকে সামলাইয়া লইবার পূর্ব্বেই কাশেমের বাহু তাহাকে বেষ্টিত করিয়া তাহার পতন নিবারণ করিল। কিন্তু সে আপনাকে সামলাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কাশেমের বাহু সরিয়া গেল না—এবং সে যেন কোন আকর্ষণে আকৃষ্টা হইয়া তাহার আরও নিকটে গেল। তাহার মস্তক কাশেমের বক্ষ স্পর্শ করিল। তখন সে তাহার ওষ্ঠাধরে কাশেমের ওষ্ঠাধরের তপ্ত স্পর্শ অনুভব করিল।

এক বার রসুলানের মনে হইল, তাহার নারীজন্ম সার্থক হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরমুহূর্ত্তেই সে আপনাকে কাশেমের বাহুপাশমুক্ত করিয়া একটু সরিয়া গেল।

ততক্ষণে তাহারা "বাসের" নিকটে আসিয়াছে।

উভয়ে উঠিয়া "বাসে" বসিল।

সমগ্র পথ কেহ কোন কথা বলিল না।

যখন "বাস" ইরাণী পল্লীর নিকটস্থ দাঁড়াইবার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রসুলানের মনে হইল, এত শীঘ্র পথ অতিক্রম হইল! সে যে স্বপ্ন-রাজ্যে ছিল তাহাতে দূরত্ববোধ থাকে না।

উভয়ে "বাস" হইতে অবতরণ করিল। সে "বাসে" ইরাণী পল্লীর আর কোন যাত্রী ছিল না। উভয়ে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। যখন পল্লীর গৃহগুলির আলোক অদূরে দেখা গেল তখন কাশেম সহসা বলিল, "রসুলান, আমি নেজমাকে বলিয়াছি, আমি তাহার উদ্ধার সাধন করিব।"

রসুলানের মুখ এমন রক্তাভারঞ্জিত হইয়াছিল যে, দেখিলে কেহ মনে করিত পারিত, সে প্রবল জ্বরভোগ করিতেছে। কাশেমের কথায় তাহা শীতের জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের মত পাণ্ডু হইয়া গেল। সে আপনাকে ধিক্কার দিল।

এই সময় কাশেম বলিল, "তুমি আমাকে সাহায্য করিবে?"

এমন নিষ্ঠুর আঘাত যে মানুষ মানুষকে দিতে পারে তাহা সে পূর্ব্বে অনুমান করিতেও পারে নাই। ক্ষতে এ কি ক্ষার প্রক্ষেপ! তাহার কল্পনা স্বপ্নের

যে জাল বয়ন করিয়া চলিতেছিল সে তাহা প্রবল চেষ্টায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। আহত অভিমান তাহাকেও কঠোরতা প্রদান করিল। সে ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "সপত্নীর দাসীবৃত্তি করিবার জন্য ?"

কাশেম দৃঢ়স্বরে বলিল "না।"

রসুলান কাশেমের দিকে চাহিল।

কাশেম বলিল, "তুমি আমাকে ভালবাস। সেই ভালবাসার দিব্য, আমি নেজমার উদ্ধার সাধন করিতে পারিলেও তাহাকে বিবাহ করিব না; তোমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।"

রসুলান বলিল, "আমি তোমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করিলাম। তুমি তোমার স্ত্রীকে যাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব।"

আবার তাহাদিগের ওষ্ঠাধর মিলিত হইল।

সহসা রসুলান জিজ্ঞাসা করিল, "নবাবের অন্তঃপুর হইতে নেজমার উদ্ধার-সাধন কি বিপজ্জনক হইবে না ?" কাশেমের বিপদের সম্ভাবনা তাহাকে উৎকণ্ঠিতা করিল। ইহাই প্রেমের লক্ষণ।

কাশেম বলিল, "যদি কোন বিপদ ঘটে, তবে তুমি মনে করিতে পারিবে—তোমার কাশেম তাহার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বিপদ বরণ করিতেও ভয় পায় না; সে জানে, তাহার কথার মূল্য আছে।"

তাহার পর কেহ আর কোন কথা বলিল না—পল্লীতে প্রবেশ করিয়া কাশেম ও রসুলান যে যাহার গৃহে গেল।

৮

গৃহে ফিরিয়া জিনিষগুলি রাখিয়াই কাশেম আবার বাহির হইয়া গেল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মাতা তাহাকে বলিলেন, "এই ত ঘুরিয়া আসিলি—আবার কোথায় গিয়াছিলি ?"

কাশেম বলিল, সে ভ্রাতাভগিনীদিগের জন্য গণিয়া জিনিষ কিনিয়াছিল, কিন্তু মেলায় প্রতিবেশী-দিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় রসুলানকে একটা দিতে হইয়াছে—সেইটি সে আবার কিনিতে বাজারে গিয়াছিল।

মা বলিলেন, "বেশ মেয়েটি! জিনিষটা পাইয়া খুব আনন্দ করিল ?"

"হাঁ।"

"উহাকেই তোর বধূ করিয়া আনিব, কথা দিয়াছিলাম; কিন্তু ভগবান সে কথা রক্ষা করিতে দিলেন না।"

"কথা রাখিলেই ত হয়।"

মা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "ঠিক ত ?"

কাশেম বলিল, "তোমাদিগের কথা আমি কি কখন অমান্য করিয়াছি ?"

মাতার মন—সন্তান দোষ করিলেও তাহা মনে রাখিতে পারে না।

কাশেমের মাতা তখনই স্বামীকে সংবাদ দিতে গমন করিলেন, বিবাহে কাশেমের মত হইয়াছে।

তাহার পর বিবাহ হইতে আর বিলম্ব হইল না।

কাশেম নেজমাকে—সে তাহার উদ্ধার সাধন করিবে বলিয়াই—তাহার উপায় চিন্তা করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল। এখন সে আবার রসুলানকেও তাহা বলিয়াছে। কাযেই তাহার প্রতিশ্রুতি পালনের আগ্রহ বর্দ্ধিত হইল। রসুলান বলিয়াছে, সে তাহার স্ত্রীকে যাহা বলিবে, সে তাহাই করিবে। সে যেন স্ত্রীকে দেখাইতে পারে, তাহার কথার মূল্য আছে।

রসুলান যে নেজমার উদ্ধার সাধনের কার্য্যেও তাহার সহায় হইতে সম্মতা হইয়াছে, তাহাতে সে সাফল্যের অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনা লক্ষ্য করিল। সে আবার ভাবিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ব্বে সে যেমন কোন উপায়ের সন্ধান পায় নাই, এখনও তেমনই তাহা পাইল না।

রসুলানের মনে হইল, স্বামী অসম্ভবকে সম্ভব করিবার দুরাশা ত্যাগ করিয়াছে।

এই সময় এক দিন একখানি উর্দ্দু পত্রে কাশেম একটি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ পাঠ করিল। রাজপুত নারীর সহমরণ সেই কবিতার বিষয়। রাজপুত রাজার অন্তঃপুরে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা পত্নীর অভাব ছিল না। কিন্তু রাণীর সম্মান এক জনেরই ছিল—তিনি প্রথম বিবাহিতা—রাজকন্যা। তিনি সেই অন্তঃপুরে সুখী ছিলেন কি না, তাহা কে বলিতে পারে ? কিন্তু সকলেই জানিত—রাণীর সম্মান তাঁহার। কিছু দিন রোগভোগের পর রাজার মৃত্যু হইল। ইংরেজের আইনে সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ। সেই জন্য রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আদেশ প্রচারিত হইল—রাণী যেন প্রাসাদের প্রাচীরের বাহিরে রাজার চিতার নিকটে যাইতে না পারেন। রাণীকেও সেই নির্দ্দেশ জানাইয়া দেওয়া হইল। চিরাগত সংস্কারবশে রাণী সে নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিবার জন্যই ব্যস্ত হইলেন—কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া

মনোভাব প্রকাশ করিলেন না। ও দিকে চিতা প্রস্তুত করা হইল—রাজার শব চিতার নিকটে লইয়া যাইয়া দাহের ব্যবস্থা করা হইতে লাগিল। রাণী এক দাসীকে অর্থে বশীভূত করিয়া তাহার সহিত পরিধেয়-পরিবর্ত্তন করিলেন। অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া তিনি দাসীর বেশে প্রাসাদ-প্রাচীরের বাহিরে চিতার নিকটে গমন করিলেন। প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দাসী বলিয়াই আপনার পরিচয় দিলেন। তাহার পর চিতা যখন জ্বলিয়া উঠিল, তখন রাণী সেই চিতায় পড়িয়া আত্মাহুতি দিলেন।

কবিতাটি হিন্দুদিগের কুসংস্কারের বর্ণনা বলিয়া মুসলমান সম্পাদক সাম্প্রদায়িকতার অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন-যোগের চেষ্টা করিয়াছেন এবং হিন্দু শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনকে কেবল ইসলামের নহে, পরন্ত বিশ্বের সভ্যতার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া মত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে যে হত্যা করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ সমর্থন করিতে না পারিলেও পরোক্ষভাবে হত্যাকারীর কার্য্য ধর্ম্মোত্তেজনা-প্রসূত বলিয়া অপরাধীর সমর্থনই করা হইয়াছে।

বাতাস যখন অশ্বত্থফলের অতি ক্ষুদ্র একটি বীজ উড়াইয়া লইয়া কোথাও ফেলে, তখন কে কল্পনা করিতে পারে, তাহা হইতে পরে কত বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে? একটি অসতর্ক কথায় কখন কখন যে ফল হয়, তাহা বিস্ময়কর। জনরব, ওয়ারেন হেষ্টিংশের দাওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর—বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী "লালা বাবু" যখন সংসারের সুখে সুখী, তখন তাঁহার গৃহের সম্মুখে কোন রজক পত্নীর "বেলা গেল—বাসনায় (অর্থাৎ কদলীবৃক্ষের শাখায়) আগুন দিতে হ'বে"—উক্তি শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, জীবনের "গণা দিন" ফুরাইতেছে, এখন কামনার বিলোপ না করিলে পরামুক্তিলাভ হইবে না; তাই তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া দেবতার আরাধনা করিতে থাকেন। এই কবিতাটি পাঠে কাশেম যেন অন্ধকারে আলোকের বিকাশ দেখিতে পাইল, যে উপায় সন্ধান করিতেছিল তাহা যেন লাভ করিল। যদি দাসীর ছদ্মবেশে সতর্ক প্রহরী প্রভৃতিকে প্রতারিত করিয়া রাণীর পক্ষে প্রাসাদ-প্রাচীর অতিক্রম করা সম্ভব হইয়া থাকে, তবে ঐ উপায়েই ত নেজমার উদ্ধার সাধিত হইতে পারে! কাশেমের চিন্তা নূতন পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সেই দিন রাত্রিকালে কাশেম কবিতাটি পাঠ করিয়া রসুলানকে শুনাইল। রসুলান বলিল,—"সুন্দর।" স্বামীর প্রতি প্রেমে রাণীর আত্মত্যাগের কথা তাহাকে মুগ্ধ করিল। নারী স্বভাবতঃ তাহার স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে—কেবল শিক্ষা ও আচারের ফলে অনেক সময় সেই পূত ও সংযমাত্মক আদর্শ রক্ষিত হয় না এবং সেই জন্যই যে সব সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং নারীরও বার বার বিবাহ প্রচলিত আছে, সে সব সমাজে হিন্দুর বৈবাহিক জীবনের আদর্শ অনুসৃত হয় না। যে ইংরেজ কবি স্বয়ং উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই বায়রণও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় লিখিয়াছেন—স্ত্রীলোক তাহার প্রথম প্রণয়ে প্রণয়ীকেই ভালবাসে অর্থাৎ প্রেমাস্পদ তাহার প্রেমের প্রতীক হয়; সেই প্রেম যখন বিকৃত হয়, তখন তাহা এক হইতে বহুতে প্রদত্ত হয় এবং নারীর ভালবাসা বহু পুরুষ লাভ করে। তাই রাণীর আদর্শ রসুলান যে সম্প্রদায়ে আবির্ভূতা তাহার আদর্শ না হইলেও তাহাকে মুগ্ধ করিল। সে বলিল, "স্বামীর জন্য এইরূপ ত্যাগ ত স্বাভাবিক।"

কাশেম মনে করিল, সে সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। সে রসুলানকে জিজ্ঞাসা করিল—সে কি স্বামীর জন্য বিপদ বরণ করিতে পারে?

রসুলান বলিল, "নিশ্চয়।"

"যদি আমার জন্য তোমাকে নবাবের অন্তঃপুরে গোপনে—আত্মগোপন করিয়া যাইতে হয়?"

"সে কায কি অসম্ভব?"

"আর যদি আমি অন্যকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তাহার পালনে সহায় হইয়া সে কায করিতে হয়?"

রসুলানের উত্তর দিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কাশেম বলিল, "এই বুঝি তোমার ভালবাসা? এই ভালবাসায় নির্ভর করিয়া তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, তোমার স্বামী যাহা করিতে বলিবে, তুমি তাহাই করিবে?"

রসুলান বলিল, "আমি মিথ্যা কথা বলি নাই।"

কাশেম তাহার কথায় সত্য সত্যই মুগ্ধ হইল। সে তরুণী পত্নীকে বাহুবেষ্টনে বদ্ধ করিয়া তাহার মুখে চুম্বনের পর চুম্বন দান করিল।

রসুলান মনে করিতে পারিত, যে কায অত্যন্ত বিপজ্জনক, সে কায কাশেম আপনি না করিয়া তাহাকেই করিতে দিতেছে। কিন্তু সে তাহা মনে করিল না। তাহার প্রগাঢ় প্রেমই তাহাকে তাহা মনে করিতে দিল না।

সে বহুদিন হইতেই কাশেমকে ভালবাসিয়াছে—কুমারীর অনাবিল প্রেম তাহাকে নিবেদন করিয়াছে। তাহার পর সে এত দিন কাশেমকে পাইবার জন্য অপেক্ষা করিয়াছে যে, সেই দীর্ঘ কালে—আশার ও নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে তাহা গাঢ়ই হইয়াছে। সে যখন দীর্ঘ দিন অপেক্ষার পর কাশেমকে পাইয়াছে, তখন তাহার মনে আনন্দের মধ্যে সন্দেহের—জিজ্ঞাসার কোন স্থান নাই।

তখনও কাশেমের কার্য্য-পদ্ধতি সম্পূর্ণ হয় নাই। সে তখনও ভাবিতেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কোন উদ্দিষ্ট স্থানের জন্য অন্ধকার বনপথ অতিক্রম করে, তখন এক জন সঙ্গী পাইলে সে যেমন ভরষা পায়—সাহস লাভ করে, রসুলান তাহার কার্য্যে সাহায্য করিবে জানিয়া সে তেমনই ভরষা ও সাহস পাইল। সঙ্গে সঙ্গে রসুলানের প্রতি তাহার আকর্ষণ প্রশংসায় ও শ্রদ্ধায় দৃঢ়তর হইল। সেই আকর্ষণের পরিচয় রসুলান তাহার ব্যবহারে যতই উপলব্ধি করিতে লাগিল—সে ততই উৎফুল্ল হইতে লাগিল—স্বামীর প্রতি প্রেম এবং তাহার স্বামীকে প্রীত করিবার আগ্রহ ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। স্বামিস্ত্রীর এই ভাব উভয়ের পক্ষেই বিশেষ সুখের কারণ হইল।

এই অবস্থায় কাশেম হয়ত নেজমাকে ভুলিতে পারিত। কিন্তু তাহার আপনার সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা তাহাকে তাহার প্রতিশ্রুতিতে অতিরিক্ত গুরুত্ব অরোপ করাইতে লাগিল। যদি কখন তাহার মনে হইত, হয়ত নেজমা—তাহাদিগের সম্প্রদায়ের অন্য বহু তরুণীর ও অতিক্রান্তযৌবনার মত—তাহার নূতন অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-সাধন করিয়াছে—হয়ত ঐশ্বর্য্যের পরিবেষ্টনে সে সুখীই হইয়াছে—হয়ত বা সে নবাবের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া হারেমে প্রভুত্বলাভ করিয়াছে—তবে সে তখনই সে চিন্তা কাপুরুষের চিন্তা বলিয়া আপনার দৌর্ব্বল্যকে ধিক্কার দিত। সে মনে করিত, এ সব অনুমান যদি সত্য হয়, তথাপি অনুমান যে সত্য, সে প্রমাণ না পাইলে সে কখনই আপনার সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে না—সে যে আর তাহার প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ নহে, ইহা মনে করিবে না। আবার কোন কোন লোক স্ত্রীর নিকট আপনার কথার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অত্যধিক আগ্রহশীল হয়—তাহা যে দৌর্ব্বল্য তাহা বুঝিতে চাহে না। কাশেমের তাহাই হইয়াছিল। মেলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপথে সে রসুলানকে যাহা বলিয়াছে—রসুলান তাহা বিশ্বাস করিয়াছে। আজ যদি সে রসুলানকে—তাহার স্ত্রীকে তাহার সঙ্কল্পশৈথিল্য বুঝিতে দেয়, তবে সে স্ত্রীর নিকট কতটা সম্ভ্রম হারাইবে! সেতারের তার যখন "নামিয়া" যায়, তখন বাদক যেমন যন্ত্রের কর্ণ ধরিয়া তার আবার চড়া করেন, তাহার আপনার সম্বন্ধে অতিরিক্ত ধারণা তেমনই তাহার সঙ্কল্পশৈথিল্য ঘটিলেই সে শৈথিল্য দূর করিত।

এই ভাবে অল্পদিন অতিবাহিত হইবার পর কাশেম স্থির করিল, প্রথমে নেজমার সংবাদ লইতে হইবে। সে জন্য দুইটি কায করিতেই হইবে—প্রথম তাহাকে লোকের সন্দেহ আকর্ষণ না করিয়া নবাবের বাস-নগরে থাকিতে হইবে, দ্বিতীয় তাহাকে নবাবের অন্তঃপুর হইতে নেজমার সংবাদ লইতে হইবে। সে মনে করিল, সংবাদ লইয়া সে যদি বুঝে, নেজমা আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট আছে, তবে তাহাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। যেন তাহা হইলেই সে সন্তুষ্ট হয়।

এই ভাব মনে লইয়া কাশেম এক বার নবাবের বাস-নগরে গেল। তথায় যাইয়া সে নবাবের প্রাসাদ সম্বন্ধে যে সব সংবাদ পাইল, সে সব নির্ভরযোগ্য কি না সন্দেহ; কারণ, যে স্থানের ব্যাপার যত অজ্ঞাত, সে স্থানের ব্যাপার তত অতিরঞ্জিত হইয়া রটিয়া থাকে। সুতরাং তাহাকে প্রকৃত সংবাদই লইতে হইবে। আর সে দেখিল, দিল্লীর গজদন্তের দ্রব্য, নাগরা জুতা প্রভৃতি দ্রব্যের আদর তথায় আছে। সুতরাং তাহার পক্ষে ব্যবসায়ী সাজিলে কাহারও সন্দেহের উদ্রেক না করিয়া তথায় থাকা সম্ভব হইবে।

ফিরিয়া আসিয়া সে তথায় দোকান খুলিবার আয়োজনে ব্যাপৃত হইল।

তাহার প্রস্তাবে তাহার মাতা উৎকণ্ঠিতা হইলেন—পুত্রের ব্যবসাবুদ্ধিতে তাঁহার আস্থা ছিল না। সে আস্থা কাশেমের পিতারও ছিল না বটে, কিন্তু তিনি তাহাকে তাহার কার্য্যে বাধা দিলেন না; পরন্তু স্ত্রীকে বুঝাইলেন, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে সে যদি কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও শিক্ষালাভ করে—তাহা হইলে পরে অন্ততঃ তাঁহার ব্যবসা রক্ষা করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতে পারিবে।

সামান্য অর্থে কাশেম ইচ্ছামত পণ্য সংগ্রহ করিল এবং আর এক বার যাইয়া নবাবের বাস-নগরে বাজারে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া করিয়া আসিল—নিম্নতলে দোকান, উপরে থাকিবার স্থান। ফিরিয়া আসিয়া সে যখন বলিল, সে রসুলানকে লইয়া যাইবে, তখন তাহার মাতা তাহাতে আপত্তি

না করিলেও পিতা বিশেষ আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, একে অজানা স্থান, তাহাতে সামন্ত রাজ্য —নির্ব্বান্ধব অবস্থায় তথায় কেবল স্ত্রীকে লইয়া যাওয়া তিনি সঙ্গত বিবেচনা করেন না। আবার পণ্য লইবার জন্য হয়ত সময় সময় কাশেমকে দিল্লীতে আসিতে হইবে। তখন কি হইবে? কাশেম তাঁহাকে বুঝাইল, পণ্যের প্রয়োজন হইলে সে তাঁহাকেই তাহা পাঠাইতে লিখিবে—স্বয়ং আসিবে না এবং কোনরূপ অসুবিধা বুঝিলেই সে স্ত্রীকে দিল্লীতে রাখিয়া যাইবে—হয়ত আপনিও চলিয়া আসিবে। পিতা বুঝিলেন, পুত্রকে সঙ্কল্পচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলে, হয় সে তাঁহার কথা শুনিবে না—নহে ত কায করিবে না। তিনি ভাবিলেন, লেবু অধিক কচলাইয়া তিক্ত না করাই সুবুদ্ধির কায হইবে। কাশেমের মাতাকে তিনি বলিলেন, বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়া বিবাহ করায় এইরূপ ফল ফলিয়াছে —কাশেম এত স্ত্রৈণ হইয়াছে।

কাশেম যতই ভাবিতেছিল, তাহার কার্য্যের পদ্ধতি ততই পরিষ্কার হইতেছিল। যদি রসুলানকে নবাবের অন্তঃপুরে গতায়াত করিতে হয়, তবে সে ছদ্মবেশে যাইলে কর্য্যোদ্ধার সহজে হইতে পারিবে। নবাব যখন দিল্লীতে আসিয়াছিলেন, তখন ভৃত্যদিগের উর্দ্দীর মত বাঁদীদিগের পোশাকও প্রস্তুত করাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যে দোকানে নমুনা দিয়া ঐ সব প্রস্তুত করান হইয়াছিল, সে দোকানের অধিকারী যে বস্ত্রব্যবসায়ীর নিকট হইতে সে জন্য নানা বর্ণের কাপড় কিনিয়াছিল, কাশেম তাহার পত্রাদি লিখিত—কাপড়ের চালান আসিলে পত্রের অনুবাদ করিয়া দিত—ব্যাঙ্কের হিসাব বুঝাইয়া দিত। কাশেম সেই দোকানে যাইয়া দোকানী নবাবের বাঁদীদিগের পোষাকের অনুরূপ পোষাক করিয়া দিতে পারিবে কি না, জিজ্ঞাসা করিল। দোকানী বলিল, নিশ্চয়ই পারিবে—সে যে নমুনা প্রস্তুত করিয়া মজুরী লইয়াছিল, তাহা তাহার দোকানেই ছিল; কারণ, যদি আরও পোশাকের প্রয়োজন হয়, আদেশ পাইলেই প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে পারিবে।

কাশেম যখন সেই নমুনামত দুইটি পোশাক প্রস্তুত করিতে বলিল, তখন দোকানদার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাশেম সাহেব, তোমার বাঁদীর পোশাক কেন? নবাব হইয়াছ না কি?"

কাশেম বলিল, "আমি যে বিবাহ করিয়াছি।"

"তুমি সৌখীন লোক, তোমার বিবি কি বাঁদীর পোশাক পরিবে? বরং বল, একটা বেগমের পোশাক প্রস্তুত করি।"

"বেগম কিনিতে হয়—অনেক দাম। কাযেই বেগমের আশা করি না। বাঁদী বিনাপয়সায় পাওয়া যায়—গরিবরা যেমন চাকর, তাহাদের স্ত্রীরা তেমনই বাঁদী।"

"কিন্তু যাহার বিবি তাহার নিকট সে-ই বেগম; কেহ কি ইচ্ছা করিয়া বিবির অসম্মান করে?"

দোকানদার বড় কথাপ্রিয় বুঝিয়া কাশেম বলিল, এক জন শেখ নমুনা চাহিয়াছেন—যদি নমুনা পশন্দ হয়, তবে সে দোকানীকেই পোশাক করিতে দিবে—তাহাকে লাভের সিকি ভাগ দিলেই চলিবে।

দোকানদার বলিল, পরদিন সন্ধ্যায় সে এক জোড়া নমুনার পোশাক দিবে।

৯

নূতন স্থানে আসিয়া—আপনাদিগের সংসার পাতাইয়া কাশেম ও রসুলান উভয়েই যেন মুক্তির আনন্দে উৎফুল্ল হইল। গৃহ ক্ষুদ্র—কিন্তু ক্ষুদ্র গৃহে তরুণ-তরুণী যেন পরস্পরের অধিক নিকটবর্ত্তী হইবার সুযোগ ও আনন্দ লাভ করে। গুরুজনশূন্য গৃহে কাহাকেও সঙ্কোচ-জড়িত লজ্জা করিতে হয় না। গৃহের নিম্নতলে যে ঘরে দোকান হইবে, আসবাব না আসা পর্য্যন্ত তথায় পণ্য সাজান হইল না। সে কাযে যেন কাহারও সময় ব্যয়ে আগ্রহ ছিল না।

দিল্লী পুরাতন নগর হইলেও ইংরেজের প্রভাবে তাহার প্রাচীন প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু এই নগরে তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোকদিগের বেশের বিশেষ পরিবর্ত্তন দিল্লীতে হয় নাই বটে, কিন্তু পুরুষের বেশে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; এই নগরে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই বেশ সেকালের—নারীর বেশে উজ্জ্বল বর্ণের বৈচিত্র্য, পুরুষের পাগড়ীতেও তাহাই। নবাবের শীকারের চিতা বাঘ আছে; ভৃত্যগণ প্রতিদিন সেগুলিকে সহরের রাজপথে ঘুরাইয়া লইয়া যায়-তাহারা রক্ষকের পার্শ্বে খাটিয়ায় শুইয়া থাকে—যেন পালিত কুকুর। যে দিন নবাব প্রাসাদের বাহিরে আইসেন, সে দিন রাজপথ পরিষ্কৃত হয়—ভিস্তিরা জল দিয়া পথের ধূলি দূর করে; লোক সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া যায়। বাজারের মধ্যে বড় মসজেদ। নবাব প্রতিদিন —এমন কি প্রতি শুক্রবারেও তথায় নামাজ পড়িতে আইসেন না বটে, কিন্তু তিনি যেদিন আইসেন, সেদিন

তাঁহার সঙ্গে রাজকর্ম্মচারীরা যেমন, বাজারের বহু লোকও তেমনই মসজেদে যাইয়া থাকেন। নবাবের যান যখন রাজপথ অতিক্রম করে, তখন তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে কতকগুলি ঘোড়সওয়ার—মুক্ত তরবার হস্তে লইয়া যায়—ফলক রবিকরে ঝক-ঝক করে। কিন্তু গৃহবাতায়নে কোন স্ত্রীলোককে দেখা যায় না—পাছে কাহারও সৌন্দর্য্য নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সামন্ত রাজ্য স্বৈর-শাসনের শেষ আশ্রয়। এই নূতন পরিবেষ্টন রসুলানের পক্ষে আনন্দপ্রদ মনে হইত।

কয় দিন পরে কাশেম দোকান সাজাইতে আরম্ভ করিল। তখনও সে রসুলানকে প্রাসাদে যাইবার কোন কথা বলিল না। সে জানিত, যাহাকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়, তাহার পক্ষে দ্রুত গমন করা সঙ্গত নহে। তাহাকে অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে—হয়ত অনেক বিপদে পতিত হইতে হইবে। সে আপনি হয়ত সাহস করিতে পারে কিন্তু যে রসুলান তাহার ব্যবহারে তাহার ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছিল—তাহাকে বিপদে ফেলিতে কাশেম স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক। কিন্তু যে কাযের জন্য সে আসিয়াছে, তাহা তাহাকে করিতেই হইবে এবং সেজন্য তাহার পক্ষে রসুলানকে প্রযুক্ত করাও অনিবার্য্য। তাই সে রসুলানকে প্রস্তুত করিতে লাগিল। অজ্ঞাত ও রহস্যাবৃত অবস্থা লক্ষ্য করিবার জন্য সে রসুলানের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে লাগিল।

এ দিকে সহরে তাহার আনীত দ্রব্যের চাহিদা দেখা গেল। সে বাছাই করা পণ্যই আনিয়াছিল—সহরের ধনী ও বিলাসীরা সে সকলের আদর করিতে লাগিলেন। কাশেমকে আর এক চালান পণ্যের জন্য পিতার নিকট টাকা পাঠাইতে হইল। সে সব পণ্য যখন আসিল, তখন প্রাসাদেও তাহার পণ্যের প্রশংসা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। প্রাসাদ হইতে তাহার পণ্য লইয়া যাইবার আদেশ পাওয়া গেল; যে কর্ম্মচারী সে আদেশ জ্ঞাপন করিতে আসিল, সে পণ্যের মূল্য শতকরা কত টাকা অধিক বলিতে হইবে, তাহা কাশেমকে শিখাইয়া গেল; কারণ, লাভে অংশ না দিলে পণ্যের মূল্য পাইতে বিলম্ব হইবে এবং দেয় অংশও অল্প নহে। গল্প আছে, যে ব্যক্তি এক রাজবাড়ীতে দুগ্ধ যোগান দিত, মুন্সী হইতে ভাণ্ডারী পর্য্যন্ত তাহার নিকট "দস্তরী" লইলেও সে হাসিয়া বলিয়াছিল—তাহাতেও তাহার "দুধে হাত পড়ে" নাই—জলের উপর দিয়াই যাইতেছিল। এ ক্ষেত্রেও তেমনই করিতে হইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাশেম একটি বাক্সে কতকগুলি উৎকৃষ্ট পণ্য সাজাইয়া বাক্সটি ভারবাহকের মস্তকে দিয়া প্রাসাদে উপনীত হইল। সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু সময়ের মর্য্যাদা রক্ষা না করাই, বোধ হয়, নবাবের মত লোকের রীতি। তাই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরও যখন দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তখন কাশেম একটু চঞ্চল হইল; তাহার মনে হইতে লাগিল, গৃহে রসুলান নিশ্চয়ই তাহার প্রতীক্ষায় থাকিয়া বিলম্বহেতু শঙ্কানুভব করিতেছে। শেষে সে এক জন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কি সেদিনের মত চলিয়া যাইবে? কর্ম্মচারীর ভাব দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন বিষধর সর্পের উপর পদার্পণ করিয়াছেন। নবাবের আদেশ—এখন চলিয়া যাইলে যে তাঁহার অপমান করা হইবে! "আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট?" ইহার অল্পক্ষণ পরেই ভৃত্য আসিয়া পণ্যসহ কাশেমকে নবাবের কাছে লইয়া গেল। যে কক্ষে নবাব বসিয়া ছিলেন, তাহার হর্ম্ম্যতল পুরু গালিচায় আবৃত—কক্ষের প্রাচীরগুলিতে বড় বড় দর্পণ—গৃহ-সজ্জা মূল্যবান। নবাবের আদেশে কাশেম কক্ষে প্রবেশ করিল এবং কুর্ণীস করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর তাহাকে পণ্য দেখাইতে বলা হইল। কাশেম বাক্স হইতে এক একটি পণ্য বাহির করিয়া "সাবরী" দিয়া ঝাড়িয়া নবাবের সম্মুখে রক্ষিত টেবলে স্থাপিত করিতে লাগিল। দিল্লীর গজদন্তের জিনিষ, কাশ্মীরের রৌপ্যের, কাষ্ঠের ও "পেপিয়ারমাসীর" দ্রব্য, বিদরী ফুরসী প্রভৃতি নবাব দেখিতে লাগিলেন। দর্শিত দ্রব্যের অধিকাংশই তাঁহার পশন্দ হইল এবং তিনি সেগুলির মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। মূল্য শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কাঁচা ব্যবসায়ী—রাতারাতি ধনী হইবার চেষ্টা করিতেছ।" তিনি বলিলেন, ব্যবসায়ীর পক্ষে বেগুনের ক্ষেত্রের অধিকারীর মত কায করা ভাল—ক্রমে ক্রমে ফল লইয়া বিক্রয় করিতে হয়; আর সে যদি মূলার ক্ষেত্রের মালিকের মত এক দিনে সব ফশল বিক্রয় করিতে চাহে, তবে তাহার আখেরে লোকসান হয়। উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁহার এই কথায় এমন ভাবে হাসিয়া উঠিল, যেন তিনি যাহা বলিয়াছেন, মৌলিকতায় তাহা অতুলনীয়। কিন্তু তাহাদিগের হাসি যেন যন্ত্রোত্থিত—অর্থাৎ তাহা কৃত্রিম। সে যাহাই হউক, শেষে যে দাম নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহাতেও কাশেমের আশাতীত লাভ

থাকিল। নবাবের আদেশে ঐ টাকার জন্য তাহাকে একখানি পূর্জ্জা দেওয়া হইল—কাশেমকে তাহা দেখাইয়া খাজাঞ্চীর নিকট হইতে টাকা লইয়া যাইতে হইবে। নবাব অন্য কক্ষে চলিয়া যাইলেন—কাশেম অবশিষ্ট পণ্য গুছাইয়া বাক্সে রাখিল। তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে। কাশেম যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতে বুঝিয়াছিল, খাজাঞ্চীখানায় যাইয়া পূর্জ্জা দিলেই টাকা পাওয়া যাইবে না—তথায় তাহাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে এবং তথায় লাভের অংশ বাঁটোয়ারা হইবে। সেই জন্য সে পরদিন কোন্ সময়ে আসিবে তাহা জানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। সে যাইবার পূর্ব্বে যে কর্ম্মচারী তাহাকে আসিবার জন্য ডাকিতে গিয়াছিল, সে পরামর্শ দিল, যদি আর কোন ভাল জিনিষ থাকে, তবে তাহা পরদিন আনিতে পারে—তাহার পণ্য নবাবের ভাল লাগিয়াছে। কর্ম্মচারীটি বলিয়া দিল, তাহার ভাগ্যোদয় হইয়াছে—নবাব যখন তাহার জিনিষ স্বয়ং "তারিফ" করিয়া কিনিয়াছেন, তখন উজীর ও অন্য ধনীরাও তাহা ভাল বলিয়া কিনিবেন। তবে অব্যবস্থিতমতের পশন্দ—নেশার মত ছাড়িয়াও যায়, যতক্ষণ নেশা থাকে, ততক্ষণেই বুদ্ধিমান যাহা পারে করিয়া লয়। কর্ম্মচারীটি কেন তাহাকে এত উপদেশ দিতেছিল, তাহা বুঝিতে কাশেমের বিলম্ব হয় নাই—পুরস্কারের আশা না থাকিলে কি কেহ মনোযোগ সহকারে কায করে?

প্রাসাদে কাযের অভিজ্ঞতা লইয়া কাশেম গৃহে ফিরিল। তাহার এই অভিজ্ঞতালাভের প্রয়োজন ছিল। যে ব্যক্তি নালা লম্ফ দিয়া পার হইবে, সে, বুদ্ধিমান হইলে, লম্ফদানের পূর্ব্বে তাহার বাহিত দ্রব্য পরপারে ফেলিয়া দেয়। রসুলানকে যদি প্রাসাদে পাঠাইতে হয়, তবে তাহার পক্ষে অবস্থাটা জানাই প্রয়োজন।

কাশেমের অনুমানই সত্য—গৃহে রসুলান উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, সে প্রাসাদের বিপদের কথা শুনে নাই—কল্পনামাত্র করিতে পারিয়াছিল! কাশেম প্রাসাদের আলোক ও অন্ধকার উভয়ই বিবেচনা করিয়াছিল—বিবেচনা করিয়া বুঝিয়াছিল, আলোকের তুলনায় অন্ধকার অনেক অধিক। সে কথা সে কখন রসুলানকে বলে নাই বটে, কিন্তু তাহারই জন্য সে রসুলানকে প্রাসাদে পাঠাইবে স্থির করিয়াও সঙ্কল্পে দৃঢ় হইতে পারিতেছিল না। তাহার কার্য্যেও সেই জন্য বিলম্ব হইতেছিল। আপনি যথাসম্ভব জানিয়া লইবে তাহার পর সে তাহার স্ত্রীকে পাঠাইবে, এই কথায় সে আপনার নিকট আপনার বিলম্বের সমর্থন করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, যে রসুলান তাহার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছে, নানা স্থান হইতে আগত বিবাহের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছে, যে রসুলান তাহার স্ত্রী এবং তাহার কথায় দ্বিধা না করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিতেও সম্মত হইয়াছে—তাহাকে যদি বিপদে পতিত হইতে হয়, তবে সে কি আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিবে—সে কিরূপে দিল্লীতে যাইয়া ইরাণী পল্লীতে মুখ দেখাইবে? বাস্তবিক রসুলান তাহার যত নিকটস্থ হইতেছিল, নেজমা তত দূরে সরিয়া যাইতেছিল। সময় সময় তাহার মনে হইত, সে কি মরীচিকায় মরুনন্দন ভ্রম করিয়াছিল? কিন্তু তখন সে মনে করিত, সে যে কেবল নেজমাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছে, তাহাই নহে; পরন্তু রসুলানকেও তাহা জানাইয়াছে। নেজমা আজ দূরে, কিন্তু রসুলান নিকটে। আজ সে যদি তাহার প্রতিশ্রুতি-পালন-বিমুখ হয়, তবে রসুলান তাহার সম্বন্ধে মনে কি ধারণা পোষণ করিবে—তাহার আদর্শ কি চূর্ণ—বিচূর্ণ হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে না? এক এক বার তাহার মনে হইত, রসুলানকে তাহার প্রতিশ্রুতির বিষয় জানাইয়া সে কি ভুলই করিয়াছে! তাহার পর সে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে ফিরিয়া যাওয়াও লজ্জার কথা—সে লজ্জা তাহার আপনার নিকটে। সে মনে করিতে লাগিল, সে আপনার কার্য্যে আপনি বদ্ধ। তখন সে মনে করিল, তাহার আপনার বয়ন করা জাল হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়—যদি সে জানিতে পারে নেজমা সুখে আছে। সে যে তাহাকে পায় নাই বলিয়া অসুখী হইবে, তাহা সে বিশ্বাস করিতে পারিত না; কারণ, সে কোন দিন তাহার প্রতি আকর্ষণের কোন পরিচয় দেয় নাই। তখন সে মনে করিত, সামাজিক প্রথাহেতু নেজমা সে আকর্ষণের পরিচয় দিতে পারিতেছে না। এখন আর তাহার তাহা মনে হইত না—রসুলানের ভাব দেখিয়াই ত তাহার পিতামাতা নানা স্থানে তাহার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

রসুলানকে প্রাসাদে পাঠাইতে কাশেমের যে ভয়ও ছিল না, তাহা নহে। সে চেষ্টা করিয়া সেই ভয় জয় করিত।

সে রসুলানের নিকট তাহার প্রাসাদের অভিজ্ঞতা বিবৃত করিতে লাগিল। রসুলান মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল। সহসা রসুলান উঠিল; বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! প্রাসাদের গল্প বলিলে কি উদর পূর্ণ হইবে?"

বাস্তবিক তখন অপরাহ্ণ।

কাশেম স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিও খাও নাই?"

রসুলান বলিল, "তুমি খাও নাই; আর আমি খাইব? এ কি কখন হইতে পারে?" সেই কথা বলিবার সময় রসুলান যে ভাবে কাশেমের দিকে চাহিল, তাহাতে তাহার চক্ষুর পূর্ণ সৌন্দর্য্য যেন অন্ধকারে বিদ্যুদ্বিকাশের মত প্রকাশ পাইল।

কাশেমের মনে হইল, এই সৌন্দর্য্যই যে প্রাসাদে রসুলানের বিপদের কারণ হইতে পারে না, তাহা কে বলিতে পারে? সে ভাবিতে লাগিল—ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইল।

সে খাইতেছে না দেখিয়া রসুলান হাসিয়া বলিল—"প্রাসাদের কথাতেই কি পেট ভরিয়া গেল?"

কাশেম বলিল, "তাহাই বটে। দেখ, আমরা বাল্যকালে ইংরেজীতে যে সব উপকথা পড়িয়াছি, তাহার একটি—এক তরুণী গোয়ালার কন্যার। সে দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সে দুধ বেচিয়া যে পয়সা পাইবে, তাহাতে মুর্গী কিনিবে; মুর্গীর যদি তিন শত ডিম হয়, তবে অন্ততঃ দুই শত পঞ্চাশটা বাচ্ছা পাইবে—ঐগুলি বেচিয়া সে যে টাকা পাইবে, তাহাতে সবুজ বর্ণের পোশাক কিনিয়া তাহা পরিয়া সে যখন মেলায় যাইবে, তখন সহরের যুবকদিগের 'মাথা ঘুরিয়া' যাইবে—সে কিন্তু ঘৃণাভরে তাহাদিগের বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবে। অন্যমনস্কভাবে সে যখন কিরূপে তাহাদিগের দিক হইতে মুখ ফিরাইবে মনে করিয়া মুখ ঘুরাইল, তখন তাহার মাথার উপর হইতে দুগ্ধের ভাণ্ড পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল—দুধ পড়িয়া গেল। রসুলান, আমারও কি সেই দশা দেখিতেছ?"

উভয়েই হাসিতে লাগিল।

পরদিন টাকা আনিতে যাইবার সময় কাশেম গজদন্তের কয়টি পণ্য লইয়া গেল। বখরা মিটাইয়া টাকা লইয়া সে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে এক জন কর্ম্মচারী নবাবকে সংবাদ দিয়া তাহাকে নবাবের নিকট লইয়া গেল। নবাব তখন একটি বড় বৈঠকখানায় আরামকেদারায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ধূমপান করিতেছিলেন। মীনা করা রৌপ্যের পাত্রের উপর কাচের গড়গড়া—তুর্কী হইতে আমদানী করা "নারগিলা" তাহার জলে গোলাপের কতকগুলি পাঁপড়ী ভাসিতেছে, সেই জলের মধ্য দিয়া সুগন্ধি তামাকের ধূম যাইতেছে, জলে বুদ্‌বুদ উঠিতেছে—মিলাইয়া যাইতেছে, ফুলের পাঁপড়ীগুলি ডুবিতেছে আর ভাসিতেছে।

নবাব কাশেমকে "দিল্লীওয়ালা" বলিয়া ডাকিয়া জিনিষ দেখাইতে বলিলেন। তিনি দেখিয়া কয়টি জিনিষ কিনিলেন এবং সুরমার কৌটা ও "পাউডারের" কৌটা কয়টা বেগম-মহলে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন।

কাশেমের মনে হইল, সে যে সুযোগের সন্ধান করিতেছিল—অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাই পাইল। সে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, সে কি বেগম-মহলে কতকগুলি জিনিষ পাঠাইবার অনুমতি পাইতে পারে?

নবাব যেন তাহার কথায় ধৃষ্টতায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, যে কেহ বেগম-মহলে যাইতে পারে?"

চতুর কাশেম কথার ইঙ্গিত বুঝিয়া বলিল, "আমি যত অজ্ঞই কেন হই না—সেরূপ ধারণা কখন মনে স্থান দিতে পারি না।" সে বলিল, যদি কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা বেগম-মহলে জিনিষ পাঠাইবার অনুমতি সে পায়, সেই কথা সে বলিতেছে।

নবাবের হিসাব-প্রিয়তা তাঁহার কথায় আত্মপ্রকাশ করিল—বেগমরা এক টাকার জিনিষ হয়ত দশ টাকা দাম বলিলে তাহাই বিশ্বাস করিবেন—স্ত্রীলোকের জিনিষের মূল্যের ধারণা থাকে না।

কাশেম বিনীতভাবে বলিল, তাঁহারা কোন জিনিষ পশন্দ করিলেও তাহা লওয়া না লওয়া ত নবাব সাহেবের অনুমতি-সাপেক্ষই রহিবে।

নবাব একটু ভাবিয়া বলিলেন, বড় বাঁদীকে এক দিন কাহাকেও পাঠাইয়া জিনিষ আনিতে বলিয়া দিবেন।

কাশেম সে কথার জন্য নবাবকে ধন্যবাদ দিয়া ও সেলাম করিয়া বলিল, যে দিন সে অনুমতি পাইবে, সেই দিনই লোক দিয়া বেগম-মহলে জিনিষ পাঠাইয়া দিতে পারিবে।

নবাব যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কে জিনিষ আনিবে? তখন কাশেম বলিল, সে দরিদ্র—তাহার অপেক্ষাও এক দরিদ্রের কন্যা "পেট ভাতায়" তাহার

রন্ধনাদি করে—সে জিনিষ লইয়া আসিতে পারিবে, কাশেমই তাহাকে প্রাসাদে পৌঁছাইয়া দিবে।

নবাব হাসিয়া বলিলেন, "তুমি পাকা ব্যবসাদার হইবে বটে।"

নবাবের আদেশে মীর মুন্সী কাশেমকে একখানি ছাড় দিলেন—সেই ছাড় লইয়া সে তাহার লোকসহ প্রাসাদে আসিলে প্রহরীরা তাহার সঙ্গিনীকে বেগম-মহলে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

কাশেম প্রাপ্য টাকা লইয়া বিদায় লইল।

১০

রসুলানের জন্য বেগম-মহলে প্রবেশের ছাড় লইয়া গৃহে ফিরিবার সময় সমস্ত পথ কাশেম ভাবিতে ভাবিতে আসিল—সে যাহা আনিল, তাহা রসুলানের বেগম-মহলে প্রবেশের ছাড়, না তাহার আপনার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ? বেগম-মহলে রসুলানের কত বিপদ হইতে পারে, তাহা সে যতই মনে করিতে লাগিল, অতিরঞ্জিত বিপদের সম্ভাবনা ততই তাহাকে চঞ্চল করিতে লাগিল, সে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। নেজমা তাহার কে? নেজমা তাহার জন্য কি করিয়াছে? তবে সে কেন তাহার উদ্ধারসাধনের জন্য রসুলানকে বিপন্ন করিতে পারে? নেজমা সুন্দরী সন্দেহ নাই, সেই সৌন্দর্য্যই তাহাকে দরিদ্রের কুটীর হইতে নবাবের বেগম-মহলে লইয়াছে। কিন্তু রসুলান? রসুলান নেজমার তুলনায় যেমনই কেন হউক না, সে তাহার ভালবাসার দ্বারা কাশেমের ভালবাসা লাভ করিয়াছে—সেই জন্যই কাশেম আর তাহার সৌন্দর্য্যের অভাব অনুভব করে না; রসুলানের বর্ণ গৌর না হইলেও যৌবন তাহার পুষ্পিত দেহে লাবণ্যদান করিয়াছে। তাহার পর তাহার প্রফুল্লতা ও তাহার চক্ষু সত্য সত্যই চিত্তাকর্ষক। কে জানে, কে তাহার সংবাদ কিরূপে নবাবের কর্ণে তুলিবে?

কাশেম যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মনের ভাব তাহার মুখভাবে লক্ষ্য করিয়া রসুলান বলিল, "আজ কি ভাগ্য অপ্রসন্ন? জিনিষ কি বিক্রয় হইল না?"

কাশেম বলিল, "জিনিষ প্রায় সবই বিক্রীত হইয়াছে।"

সে পূর্ব্বদিনের বিক্রীত পণ্যের জন্য লব্ধ অর্থ ও সঙ্গে সঙ্গে দুইখানি কাগজ বাহির করিয়া রসুলানকে দিল।

রসুলান বলিল, "তবে কি আরও জিনিষ আনাইতে হইবে?"

"হুঁ, যদি—"

কাশেম একটু ভাবিয়া বলিল, "যদি ব্যবসা তুলিয়া দিয়া তোমাকে লইয়া ফিরিয়া না যাই।"

দুই কারণে এই প্রস্তাব রসুলানের চিত্তাকর্ষক হইল না। প্রথম কারণ, আত্মীয়স্বজন—বিশেষ গুরুজনদিগের নিকট হইতে দূরে তাহাদিগের স্বাধীনতা—যৌবনের যে ভালবাসা ভাবী প্রেমাস্পদকে নিকটে পাইতেই চাহে, গুরুজনপূর্ণ গৃহে তাহার অবাধ গতি পদে পদে বাধা পায়। দ্বিতীয় কারণ—কাশেম যেরূপ অর্থার্জ্জন করিতেছে, তাহাতে আর কিছু দিনেই সে যে অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবে, তাহাতে তাহাদিগকে আর অভাবের দংশন-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। এমন সুযোগ কি ত্যাগ করিতে আছে? ভাগ্য বার বার প্রসন্ন হয় না।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"ভাল লাগিতেছে না।"

রসুলান হাসিয়া বলিল, "দুই দিনেই বিরক্ত হইলে?" সে স্বামীর দিকে চাহিল—তাহার কটাক্ষের আকর্ষণ যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

কাশেম তাহাকে বাহুপাশবদ্ধ করিয়া বলিল, "তোমার ঐ চক্ষুর জন্যই আমার ভয়।"—বলিয়া সে রসুলানের চক্ষু চুম্বন করিল।

"কিসের ভয়?"

"ঐ যে দুইখানা কাগজ দেখিতেছ; একখানা আজ যে জিনিষ বিক্রয় করিয়াছি, তাহার মূল্যের জন্য পুর্জ্জা, দ্বিতীয়খানা তোমার বেগম-মহলে যাইবার ছাড়।"

উৎফুল্লভাবে রসুলান বলিল, "ছাড় পাইয়াছ?"—তাহার দৃষ্টি প্রশংসমান।

"ছাড় পাইয়াছি, আর পাইয়াই ভাবিতেছি।"

"কি ভাবিতেছ?"

"ভাবিতেছি, তোমার ঐ চক্ষু তোমাকে বেগম-মহলে বন্দী না করে।"

"সে ভয় তোমার নাই।"

"কেন তুমি কি চক্ষু বাড়ীতে রাখিয়া যাইবে?"

"না, বোরকার মধ্যে কেহ চক্ষু দেখিতে পাইবে না; আর যদি বোরকা খুলিতে হয়, যে জিনিষ বিক্রয় করিতে যায়, সে কি কখন বেগমদিগের দিকে চাহিয়া কথা বলিতে পারে? তাহার পর সকলেই ত কাশেম নহে যে, রসুলানের চক্ষুর প্রশংসা করিবে।"

কাশেম তখনও চিন্তিত দেখিয়া রসুলান বলিল, "তুমি নেজমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলে, তাহা পালন করিবে বলিয়াই বিদেশে আসিয়াছ। এখন যদি তাহা ভুলিবে, তবে তাহা দিয়াছিলেই বা কেন, আর এই বিদেশে আসিলেই বা কেন?"

কাশেম বলিল, "তাহাই ত ভাবিতেছি, নেজমার জন্য আমি তোমাকে বেগম-মহলে পাঠাইব কেন?"

"সে কথা আজ ভাবিতেছ কেন?"

"পূর্ব্বে যে ভাবি নাই, তাহাই ভুল হইয়াছে। তাহার পিতামাতা তাহার বেগম-মহলে স্থানলাভ সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করিয়াছেন। সে-ও কি তাহাই মনে করে নাই?"

রসুলান হাসিয়া উঠিল, বলিল,—"বেগম-মহলে যাইতে আমার ভয় নাই, কিন্তু ভয়ের অন্য কারণ আছে।"

কাশেম ভাবিল, রসুলান যদি ভয় পায়, তবে সে সেই সুযোগেই দিল্লীতে চলিয়া যাইবে। কিন্তু সে সুযোগ সে পাইল না; রসুলান বলিল, "দেখিতেছি, তোমার মনে এখনও উপেক্ষার অভিমান আছে। ভালবাসা না থাকিলে কি অভিমান হয়?"

কাশেম লজ্জিত হইল, বলিল, "রসুলান, আমাকে বিশ্বাস কর—আমি নেজমাকে চাহি না, আমার তুমিই যথেষ্ট। সেই জন্যই আমি নেজমার জন্য তোমাকে বেগম-মহলে পাঠাইতে চাহি না।"

"তুমি ত অনেক বারই বলিয়াছ, যদি জানিতে পার, নেজমা বেগম হইয়া সুখে আছে, তবে তুমি মনে করিবে, তোমার প্রতিশ্রুতি পালনের আর কারণ নাই। তাহাই দেখা যাউক।"

"আর যদি তুমি দেখ, সে তাহার নূতন অবস্থায় অসুখী, তাহা হইলে কি হইবে?"

"তখন তুমি অবস্থা বিবেচনা করিয়া যাহা করিবার করিবে।"

কাশেম ভাবিতে লাগিল।

সহসা রসুলান বলিল, "পুরুষরা কি স্বার্থপর!"

কাশেম এ কথা শুনিবে এমন মনে করে নাই; সেই জন্য বলিল, "এ অনুযোগ কেন, রসুলান?"

রসুলান হাসিয়া বলিল, তুমি নবাবের সদর মহল দেখিয়া আসিলে, আর আমাকে বেগম-মহল দেখিতে দিবে না?"

কাশেম ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "ভয়—পাছে তুমি বেগম-মহলে যাইয়া গরিবের ঘর ভুলিয়া যাও।"

"সে ভয় তোমার নাই।" সে স্বামীকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়া বলিল, "এই আমার বেহেস্ত—বেগম-মহল জাহান্নম্।"

"বোধ হয়, শের আফগানের আলিঙ্গনবদ্ধা মেহের উন্নিসাও এই কথা বলিত।"

"সে তোমার ভুল। মেহের উন্নিসা সুন্দরী ছিল—সে রূপ যে সুদূর বাঙ্গালায় সামান্য রাজকর্ম্মচারীর গৃহে সার্থক হয় না, তাহাও সে জানিত। মূল্যবান হীরক কি সূর্য্যালোক ব্যতীত তাহার শোভা বিচ্ছুরিত করে? সে কেন চন্দ্রালোক ভালবাসিবে?"

কাশেম হাসিয়া বলিল, "আকাঙ্ক্ষা কি সকল সময় বিচারের অপেক্ষা রাখে?"

"তাহা রাখিবে না? নেজমার রূপ ছিল—উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল, সে বেগম-মহলে স্থান পাইয়াছে, লোক বলিতেছে—সে-ই তাহার উপযুক্ত স্থান। আমি, আমার যে স্থান সন্ধান করিয়াছি তাহা পাইয়াছি।"

কাশেম পত্নীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু সে যেন শঙ্কায়—পাছে সে তাহাকে হারায়।

রসুলানের সাহসের কারণ দুইটি। প্রথমতঃ, এত দিন কাশেম বেগম-মহলকে রহস্যপুরী বলিয়া তাহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়াছে, তরুণীর মন সেই কৌতূহল পরিতৃপ্তির আশায় আগ্রহশীলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সে মনে করিয়াছে, যদি সে কাশেমের প্রতিশ্রুতি পালনের উপায় হয়, তবে কাশেমকে ভালবাসার আরও দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিবে।

সে রাত্রিতে রসুলান নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইল বটে, কিন্তু কাশেম যেন ঘুমাইতে পারিল না। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল—সে যে অনিশ্চিতের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাইতেছে, তাহার তরঙ্গ তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতে পারে, তাহা কে বলিবে? সে যত ভাবিতে লাগিল, ততই আপনার উপর রাগ করিতে লাগিল—আর সেই ক্রোধ—শুভ্র বস্ত্রের উপর এক-বিন্দু কালী পড়িলে তাহা যেমন ব্যাপ্ত হয়, তেমনই ব্যাপ্ত হইয়া নেজমাকেও স্পর্শ করিতে লাগিল। দিল্লীর চাঁদনী চকে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা গণক—অধিকাংশ হিন্দু। দলে দলে লোক—পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাহাদিগের নিকট ভাগ্যলিপি জানিতে যায়। তাহারা প্রথমেই হর্ম্ম্যতলে খড়ি দিয়া ছক আঁকিয়া লয়—তাহার পর বলে—তাহার কোন গ্রহ শুভ আর কোন গ্রহ অশুভ—অশুভ গ্রহের দৃষ্টিতে তাহার সর্ব্বনাশই হইবার কথা, কিন্তু শুভ গ্রহ অশুভ গ্রহের প্রকোপ হ্রাস করিতেছে। সেই কথা

কাশেমের মনে পড়িল—নেজমা তাহার অশুভ গ্রহ, তাহার প্রকোপে তাহার কি দুর্দশা না হইতে পারিত; কেবল রসুলান সে প্রকোপ প্রহত করিয়াছে। তখন সে রসুলানের সহিত নেজমার তুলনা করিতে লাগিল।

নেজমাকে সে বেগম-মহলের ভয়াবহ চিত্র দেখাইয়াছে, কিন্তু তথাপি সে সেই মহলে নীত হইতে কোনরূপ আপত্তি প্রকাশ করে নাই; আর রসুলান, সে যাহা বলিয়াছে, তাহাই বিশ্বাস করিয়াছে —তাহার জন্য সব বিপদ হাসিমুখে বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। অথচ সে রসুলানকে বেগম-মহলে পাঠাইতেছে। কি জন্য? কাহার জন্য? কে জানে, নেজমাই বলিয়া দিবে না—তাহার উদ্ধারসাধনের জন্য কাশেম চররূপে রসুলানকে পাঠাইয়াছে? যদি তাহাই হয়, তবে রসুলানের ও তাহার বিপদের অন্ত থাকিবে না।

কাশেম ভাবিল, সে রসুলানকে বেগম-মহলে পাঠাইবে না; পরদিন প্রাসাদে যাইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই তাহাকে লইয়া চলিয়া যাইবে—জিনিষ সব ফেলিয়া যাইবে।

সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে যেন অকূলে কূল পাইল—সে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রত্যূষে যখন রসুলানের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সে বিস্মিত হইয়া দেখিল, কাশেম তখনও ঘুমাইতেছে। প্রতিদিন কাশেমই প্রথমে জাগিয়া—তাহার চুম্বনে রসুলানের নিদ্রাভঙ্গ করে; সন্ধ্যায় বিকশিত যূথিকা প্রভাতে ম্লান হইলেও যেমন সমস্ত দিন তাহার সৌরভ উদ্যান আমোদিত করিয়া রাখে—স্বামীর সেই আদরের স্মৃতি তেমনই সমস্ত দিন রসুলানের মন আনন্দে পূর্ণ করিয়া রাখিত। আজ সে অগ্রে উত্থিত হইয়াছে। সে কাশেমকে তখনই জাগাইবে কি না, তাহা ভাবিল; কিন্তু সে ভাবনা অধিক কাল স্থায়ী হইল না—আজ অগ্রে স্বামীকে আদরদানের প্রলোভন সে সম্বরণ করিতে পারিল না; সে প্রতিদিনই প্রথমে আদর পায়—আজ সে দিবার অবসর পাইয়াছে।

কাশেমের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিল; কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা আসিল। সে বলিল, "যে দিন আরও অগ্রে নিদ্রাভঙ্গের প্রয়োজন ছিল—সেই দিনই এত বিলম্ব।"

রসুলান বলিল, "কি এত প্রয়োজন?"

"এখনই জিনিষ যত দূর পারা যায় গুছাইয়া লইতে হইবে?"

"বেগম-মহলের জন্য?"

"না। আমরা আজই চলিয়া যাইব।"

"কেন?"

"আমি তোমাকে বেগম-মহলে অজ্ঞাত পুরীতে পাঠাইতে পারিব না।"

রসুলান হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তোমার এত ভয় কেন? শুনিয়াছি, এমন একটা স্থান আছে যে, পুরুষ তথায় যাইলে ভেড়া হয়। নবাবের এই সহর কি তেমনই যাদুর দেশ?"

"আমি স্থির করিয়াছি, আমরা আজই চলিয়া যাইব।"

রসুলান বলিল, "এক বার বেগম-মহলটা দেখিয়া আসিব না?"

"তাহাতে কায নাই।"

কিন্তু যাইবার পথে যে বাধা থাকিতে পারে, তাহা কাশেম ভাবে নাই। সে যখন দোকান ঘরে যাইয়া যে সব জিনিষ সহজে লইয়া যাইতে পারিবে, সেগুলি পৃথক করিতেছিল, তখন প্রাসাদ হইতে এক জন কর্ম্মচারী এক জন সিপাহীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কর্ম্মচারীটি দুই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, একটি প্রকাশ্য, অপরটি গোপন। প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, তাহাকে কখন্ তাহার লোককে বেগম-মহলে পাঠাইতে হইবে তাহা বলিয়া দিতে এবং সিপাহীকে রাখিয়া যাইতে—সে-ই তাহার লোককে লইয়া যাইবে। গোপন উদ্দেশ্য, জিনিষের দাম কত চড়াইতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতে—কারণ, দাম অধিক হইলে তাহাদিগের প্রাপ্যও অধিক হইবে। সে যেন তাহার লোককে দামের কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া—শিখাইয়া দেয়।

তাহার চলিয়া যাইবার চেষ্টা এইরূপে ব্যর্থ হওয়ায় কাশেমের বিক্ষোভের অন্ত রহিল না। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে রোষে ও ক্ষোভে আপনার কেশরাশি ছিঁড়িয়া ফেলে।

সিপাহীসহ নবাবের কর্ম্মচারীকে দোকানে আসিতে দেখিয়া পার্শ্বস্থ গৃহের এক যুবকও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কাশেম কাহারও সহিত মিশিতে চাহিত না বটে, কিন্তু সে এই যুবকের কৌতূহল হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই—যুবকটি মধ্যে মধ্যে তাহার দোকানে আসিত এবং তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে চেষ্টা করিত। তাহাকে নবাবের চর সন্দেহে কাশেম তাহার নিকট আপনার প্রকৃত-পরিচয় দেয় নাই এবং তাহার প্রশ্ন যথাসম্ভব

এড়াইয়া যাইতেই চেষ্টা করিত। কর্ম্মচারীটি চলিয়া যাইবার পর আগন্তুক যুবক কাশেমকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সঙ্গী কি আপনার স্ত্রী?"

কাশেম তখন যে অবস্থায় ছিল, তাহাতে যুবকের এই অযাচিত প্রশ্ন তাহাকে অত্যন্ত উত্যক্ত করিয়া তুলিল—বারুদের উপর জলদঙ্গার পড়িলে যেমন বিস্ফোরণ হয় তেমনই হইল। কাশেম বলিল, "সে সংবাদ কি আপনাকে দিতে আমি বাধ্য?"

যুবক বুঝিল, আর কোন কথা বলিলে অপমানিত হইতে হইবে। সে বলিল, "আমি কেবল বলিতেছি, সঙ্গী যদি স্ত্রী হয়, তবে কেহ তাহাকে প্রাসাদে যাইতে দেয় না—সাবধানে রাখে। যদি তাহাকে হারাইতে কষ্ট হয়, তবে তাহাকে পাঠাইতে নাই।"

যুবক চলিয়া গেল; কিন্তু তাহার কথার বিষ কাশেমের মন হইতে দূর হইল না। সে আরও বিক্ষুব্ধ হইল। কিন্তু তখন আর চলিয়া যাইবার উপায় নাই—সিপাহী বসিয়া ছিল।

আপনাকে অভিসম্পাত করিতে করিতে কাশেম কতকগুলি উৎকৃষ্ট পণ্য একটি ছোট ব্যাগে গুছাইয়া লইল—প্রত্যেকটির মূল্য, কর্ম্মচারীর উপদেশমুসারে—একখানি ফর্দ্দে রসুলানের জন্য লিখিয়া রসুলানকে তালিকা মুখস্থ করাইয়া দিল; তাহার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

সে বার বার রসুলানকে সতর্ক করিয়া দিল। রসুলানও কেশ ও বেশ যথাসম্ভব শ্রীহীন করিয়া লইয়া বোরকায় দেহ আবৃত করিয়া স্বামীর সঙ্গে চলিল। তাহারও যে ভয় হইতেছিল না, তাহা নহে। কিন্তু কাশেমকে তুষ্ট করিবে মনে করিয়া ও অজ্ঞাত মহলের রহস্য জানিবার কৌতূহলে সে তাহার শঙ্কা অতিক্রম করিল।

যাত্রাকালে সিপাহী যখন জিজ্ঞাসা করিল, সে কি স্ত্রীলোকটিকে রাখিয়া যাইবে? তখন কাশেম বলিল, সে-ই লইয়া আসিবে।

শুনিয়া সিপাহী বলিল, তাহার ত বেগম-মহলে যাইবার উপায় নাই।

কাশেম বলিল, সঙ্গিনী গ্রামের কন্যা—একা কখন কোথাও যায় নাই; তাহারও প্রাসাদে খাজাঞ্চীখানায় টাকা লইবার আছে। সে টাকা লইয়া আসিয়া বেগম-মহলের দ্বারের বাহিরে, প্রহরীদিগের নিকট অপেক্ষা করিবে।

১১

কাশেম রসুলানকে বেগম-মহলের দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া গেল। দ্বার রুদ্ধ, তবে দ্বারের লৌহের গরাদের মধ্য দিয়া মহলের কতকাংশ দেখা যায়। সে মহল নিষিদ্ধপুরী—বিশেষ অধিকার ব্যতীত কেহ সেই রহস্যপুরীতে প্রবেশ করিতে পায় না। গরাদের মধ্য দিয়া কাশেম লক্ষ্য করিল, সে দিল্লী হইতে যে বেশ প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছিল, তাহারই অনুরূপ বেশ-পরিহিতা বহু স্ত্রালোক গতায়াত করিতেছে। তাহারা দাসী। সঙ্গী সিপাহী কাশেমকে রসুলানের ছাড় দিতে বলিল। কাশেম তাহার জামার জেব হইতে তাহা বাহির করিয়া যখন সিপাহীর হস্তে দিল, তখন আবার তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে আবার ভাবিল, সে কি আপনার সর্ব্বনাশই করিতেছে? এক বার তাহার মনে হইল, ছাড়খানি ছিনাইয়া লইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া জুতার তলে নষ্ট করে, আর রসুলানকে লইয়া ফিরিয়া যায়। কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল, সে উপায় আর নাই—থাকিলে সে চলিয়া যাইত। এখন সেরূপ চেষ্টা করিলে যে বিপদ না ঘটিতেও পারে, তাহাই আহ্বান করিয়া আনা হইবে—নবাবের লোক তাহাকে ও রসুলানকে ধরিয়া লইয়া যাইবে, রসুলানের ছদ্মবেশ আর থাকিবে না, হয়ত তাহাকেও নবাবের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে হইবে। তাহার পর? তাহার পর মৃত্যু আসিয়া মুক্তিদান না করা পর্য্যন্ত হয়ত তাহাকে কারাগারে বদ্ধ থাকিতে হইবে এবং রসুলানকে অন্তঃপুরে হয় দাসী—নহেত নবাবের বিলাসোপকরণ হইতে হইবে।

কাশেমের মনে হইল, সে পাগল হইয়া যাইবে।

সে যতক্ষণ ভাবিতেছিল, ততক্ষণে সিপাহী গরাদের মধ্য দিয়া ছাড় দ্বারের অপর পার্শ্বে প্রহরিণীকে দিয়াছে এবং সে উহা দেখিয়া দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়াছে। যখন দ্বার সশব্দে মুক্ত করা হইল এবং রসুলানকে বেগম-মহলে প্রবেশ করিতে বলা হইল, তখন কাশেম যেন চমকিয়া উঠিল; সে মৃদুস্বরে রসুলানকে বলিল, "সাবধান।"

রসুলান বেগম-মহলে প্রবেশ করিল—দ্বার আবার সশব্দে বদ্ধ হইল—অর্গলবদ্ধ হইল। কাশেমের মনে হইল, দিনের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

বাল্যকালে সে এক বার তাহার পিতার সহিত বোম্বাই নগরে গিয়াছিল। তথায় চিড়িয়াখানায় সে একটি বৃহদাকার কুম্ভীর দেখিয়াছিল—দর্শকরা

মৎস্য ক্রয় করিয়া কুম্ভীরের নিকট ফেলিয়া দিতেছে, আর কুম্ভীর তাহার বদন ব্যাদান করিয়া তাহা গ্রাস করিতেছে। আজ সেই কথা তাহার মনে পড়িল। বেগম-মহল যেন তাহার দ্বাররূপ বদন ব্যাদান করিয়া রসুলানকে গ্রাস করিল। কিন্তু কে তাহাকে সেই বিকট বদনে ফেলিয়া দিল? তাহার আত্মগ্লানির অন্ত রহিল না। রসুলান অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহাকে নিশ্চল দেখিয়া সিপাহী বলিল, সে কি তাহার প্রাপ্য টাকা আনিতে যাইবে না?

কাশেমের সে স্থান ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইল না। সে জামার জেব হইতে তাহার প্রাপ্যের হিসাবের কাগজ বাহির করিয়া বলিল—তাহার ভুল হইয়াছিল—তাহাকে টাকা পরদিন লইতে হইবে।

শুনিয়া যে সিপাহী তাহাদিগকে সঙ্গে আনিয়াছিল, সে বলিল, "শুনিয়াছি, ঐ স্ত্রীলোকটি পেট-ভাতায় তোমার কায করে; উহাকে বেগম-মহলে পাঠাইতে যাহার হিসাব ভুল হয়, সে কিরূপে ব্যবসা করিবে?" সিপাহী স্বয়ং ও প্রহরী সিপাহী দুই জন এই কথায় হাসিয়া উঠিল এবং দ্বারের অপর দিকের প্রহরিণীদ্বয়ের কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি শুনা গেল। প্রহরিণীদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "বাঁদীর মূল্য যদি এত হয়, তবে বিবির মূল্য কত হইবে?"

তাহার পর দ্বারের এক পার্শ্বে সিপাহীরা ও অপর পার্শ্বে প্রহরিণীরা স্বচ্ছন্দে অশোভন "রসিকতা" করিতে লাগিল।

সেই সব ব্যাপারে কাশেম সেই পুরীর বিষাক্ত আবহাওয়ার পরিচয় পাইল। সে পুস্তকাদিতে লব্ধ সংবাদের সঙ্গে কল্পনা মিশাইয়া নেজমার জন্য সময় সময় বেগম-মহলের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহাকে সে নরকচিত্র বলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, সে চিত্রও বুঝি প্রকৃত অবস্থার চিত্রের নিকট ম্লান।

সে যে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে নাই তাহার কারণ, তাহার মনে হইয়াছিল, যদি কোন কারণে তাহার প্রাপ্য টাকা পাইতে বিলম্ব হয়, আর বেগম-মহলে কায শেষ করিয়া রসুলান ফিরিয়া আইসে, তবে রসুলান কি করিবে? এখন তাহার মনে হইল, সে ভালই করিয়াছে—কারণ, রসুলান আসিয়া এক মুহূর্তের জন্যও এই প্রহরিণী বা প্রহরীদিগের নিকট অপেক্ষা করিবে, এই চিন্তাও সে যেন সহ্য করিতে পারে না।

অথচ সে এই নরকে তাহার স্ত্রীকে পাঠাইয়াছে এবং একান্ত অকারণেই পাঠাইয়াছে! তাহার দোকানের নিকটস্থ গৃহের সেই যুবকের কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে তাহার দ্বারা অপমানিত হইয়াও তাহাকে বলিয়াছিল—কেহ স্ত্রীকে প্রাসাদে যাইতে দেয় না, সাবধানে রাখে; যাহাকে হারাইলে কষ্ট হয়, তাহাকে, সে পুরীতে পাঠাইতে নাই। কিন্তু তখন আর পলাইবার উপায় ছিল না।

কাশেম বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কি হইবে? কোন লঘু দ্রব্য নদীর আবর্তে পতিত হইলে যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই একই স্থানে আইসে—তাহার চিন্তাও তেমনই কেবল একই স্থানে আসিতে লাগিল—কি হইবে? সে রসুলানের কথা ভাবিতে লাগিল। রসুলান যে তাহাকে ভালবাসে তাহার বিশেষ প্রমাণ, সে তাহার ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছে। তাহার সেই ভালবাসাই রসুলানকে অধিক সৌন্দর্য্যে সুন্দরীরূপে তাহার নিকট প্রতিভাত করিয়াছে। সে কি মোহে তাহাকে বিপন্ন করিল? নেজমা তাহার কে? নেজমা তাহার সম্বন্ধে এমন কি ব্যবহার করিয়াছে যে, তাহার জন্য সে আশা করিতে পারে, কাশেম তাহার জন্য কোনরূপ ত্যাগ স্বীকার করিবে? সে যে ত্যাগ স্বীকার করিতেছে, তাহা কি একান্তই অসাধারণ নহে? সে কি জন্য তাহার পত্নীকে বিপদপুরীতে পাঠাইল? সে আপনাকে বিপন্ন না করিয়া যে স্ত্রীকে বিপন্ন করিল, তাহা হীন কাপুরুষোচিত কায ব্যতীত আর কি বলিয়া সে অভিহিত করিতে পারে? আপনার প্রতি তাহার ঘৃণা অনুভূত হইতে লাগিল। সে কি লাভের আশা করিতে পারে? নেজমার উদ্ধার যদি সাধিত হয়, তবে তাহাতে তাহার কি উপকার হইবে? আর সে জন্য যদি রসুলানকে হারাইতে হয়? কাঞ্চনমূল্যে সে কি কাচ কিনিয়া সন্তুষ্ট হইবে? সে নেজমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল? তাহার মূল্য কি? সে প্রতিশ্রুতি ত অকারণ বাহ্বাস্ফোট ব্যতীত আর কিছুই বলা যায়। মোহ? কিসের মোহ? সে যদি মনে করিয়া থাকে, সে নেজমার উদ্ধার সাধন করিলে নেজমাকে পাইবে, তবে সে বিবেচনা না করিয়াই সে আশাকে মনে স্থান দিয়াছিল। কারণ, বোম্বাই সহরে ইন্দোর হইতে পলায়িতা এক নর্ত্তকী-কন্যার জন্য ব্যবসায়ী বণিক বাওলার হত্যার কথা সে জানিত। সে যদি নেজমাকে লাভ করে, তবে তাহাকে লইয়া সে কোথায় যাইয়া শান্তিতে থাকিবার আশা করিতে পারে? কিন্তু সে আশাও সে ত আর রাখে নাই। সে ত রসুলানকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, যদি নেজমার

উদ্ধার সাধিত হয়, তথাপি সে তাহাকে বিবাহ করিবে না। প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। তবে?

তাহার পর তাহার পিতার উপদেশ তাহার মনে পড়িল। তিনি তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন—ওজন বুঝিয়া ভোজন করিবে; আর কাযের জন্য—সংসারের জন্য উপদেশ দিতেন—উত্তেজনার বশে—আপনার ক্ষমতা বিবেচনা না করিয়া কোন প্রতিশ্রুতি দিবে না। তিনি বলিতেন, তাঁহার সহিত যে সব হিন্দুর ব্যবসা ছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, সংস্কৃতে একটি বচন আছে—সহসা অর্থাৎ বিচার-বিবেচনা না করিয়া কোন কায করা সঙ্গত নহে। কাশেম মনে করিল, সে পিতার সেই উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া যে পাপ করিয়াছে, তাহাকে কি তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে?

কাশেম বসিয়া এই সব ভাবিতেছিল। বেগম-মহলের রুদ্ধ দ্বার এক এক বার মুক্ত হইয়া আবার রুদ্ধ হইতেছিল; সে দিল্লী হইতে যেরূপ বেশ প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছিল, সেইরূপ বেশ পরিহিতা কোন কোন বাঁদী মহল হইতে বাহির হইতেছিল, আবার কোন কোন বাঁদী মহলে প্রবেশ করিতেছিল। তাহাদিগের সহিত প্রহরীরা যে রসালাপ করিতেছিল, তাহা অতি হীন সমাজে বাসের পরিচায়ক—বাঁদীদিগের উত্তরও প্রহরীদিগের কথারই মত। কাশেমের মনে হইতেছিল—সেই সব কথায় পাপপঙ্কিল পুরীর দুর্গন্ধ বিষবায়ুর প্রবাহ তাহাকে স্পর্শ করিতেছিল। নৃত্যের মজলিসে বহুলোকের নিঃশ্বাসে ও আলোকের তাপে যে পরিবেষ্টনের সৃষ্টি হয়, তাহাতে যেমন গৃহসজ্জার কুসুম ম্লান হয়, যে স্থান হইতে সেই দূষিত বায়ু আসিতেছিল, সেই স্থানের দুর্নীতির পরিবেষ্টনে যে পবিত্রতা তেমনই ম্লান হয়, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর কাশেম সেই স্থানে তাহার পরিণীতা পত্নীকে পাঠাইয়াছে! কেন? যে কূপের সঞ্চিত দুষ্ট বায়ুতে দীপশিখাও নির্ব্বাপিত হয়, তাহাতে অবতরণ করা কি নিরাপদ হইতে পারে?

কাশেম যত ভাবিতে লাগিল, তাহার আশঙ্কা ততই বাড়িতে লাগিল। সে কি রসুলানকে ফিরিয়া পাইবে? ঐ মহলের দ্বার কি তাহার পক্ষে রুদ্ধই রহিবে?

কবি বলিয়াছেন—

"নদী আর কালগতি উভয় সমান,
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ।"

কিন্তু দুশ্চিন্তার সময় কালগতি যেন অতি মন্দ হয়, আর দুশ্চিন্তার সহিত যদি আশঙ্কা আসিয়া যোগ দেয় তবে মনে হয়, সময় যেন স্তম্ভিত হইয়াছে। বেগম-মহলের রুদ্ধ দ্বারের বহির্দ্দিকে প্রহরীদিগের নিকটে থাকিয়া কাশেমের তাহাই মনে হইতে লাগিল—সময় যেন গতি হারাইয়াছে। সে এতক্ষণ বার বার তাহার জেব হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিতেছিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া এক জন প্রহরী বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "তুমি কি দূরের জিনিষ বড় হইলেও দেখিতে পাও না?" তাহার উক্তির অর্থ কাশেম বুঝিতে পারিল না মনে করিয়া সে দ্বারের উপর গম্বুজে বদ্ধ বৃহৎ ঘড়িটি তাহাকে দেখাইয়া দিল। কাশেম পূর্ব্বেও সেটি লক্ষ্য করিয়াছিল—ঘণ্টায় যে চারি বার ঘড়ী বাজিতেছিল তাহাও সে শুনিতেছিল; কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল, ঘড়ীর কাঁটা যেন চলিতেছে না—ঘড়ী যেন বহু বিলম্বে বাজিতেছিল। তাই সে বার বার আপনার ঘড়ীতে সময় দেখিতেছিল। এক এক বার আপনার ঘড়ী সম্বন্ধেও তাহার সন্দেহ হইতেছিল এবং সে মনে করিতেছিল, কর্ণের নিকটে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, ঘড়ী চলিতেছে কি না। সে যে তাহা করে নাই, তাহাই ভাল—নহিলে প্রহরীরা আরও শাণিত বিদ্রূপ ব্যবহার করিত এবং তাহাদিগের বিদ্রূপ—সমাজের যে স্তরের, যে শ্রেণীর লোকের, সে সমাজের সেই স্তরের তুলনায় অনেক উচ্চে অবস্থিত।

প্রহরীরা যখন তাহাকে বিদ্রূপ করিল, তখন দ্বারের অপর পার্শ্বে প্রহরিণীরাও তাহাদিগের হাস্যে যোগ দিল। সেই সময় বাহিরে ও ভিতরে প্রহর-পরিবর্ত্তনের সময়; ভিতরে যে প্রধান প্রহরিণী নূতন প্রহরিণীদ্বয়কে আনিল, সে বয়সে যেমন প্রৌঢ়া, তেমনই তাহার পদগৌরবেও ঔদ্ধত্য। সে প্রহরিণীদ্বয়কে ঐ ভাবে হাসিতে দেখিয়া বলিল, "সাবধান! অনেক দিন বুঝি বেত্রের আস্বাদ পাও নাই?" তাহার মুখভাব ও কণ্ঠস্বর উভয়ই রুক্ষ। প্রহরিণীরা নিস্তব্ধ হইল, তাহার পর এক জন একটা মিথ্যা কৈফিয়ত প্রদানের চেষ্টা করিলে সে বলিল, "চুপ কর! মিথ্যা কথা বলিলে, বেগম-সাহেবাকে বলিয়া জিভ কাটাইয়া কুকুরকে দিবার ব্যবস্থা করিব।"

একে এই কথা—তাহাতে বেগম-সাহেবার নামোল্লেখ—প্রহরী ও প্রহরিণী সকলেই নির্ব্বাক হইল।

প্রধান প্রহরিণী যে দণ্ডের কথা বলিল, তাহা শুনিয়া কাশেম চমকিয়া উঠিল—দণ্ড সেই পুরীর

উপযুক্ত বটে! সেই পুরীতে সে স্ত্রীকে পাঠাইয়াছে!

মধ্যাহ্নের অল্পক্ষণ পূর্ব্বে কাশেমের মনে হইল, সে দেখিতে পাইল, একটি বোরকা-পরিহিতা স্ত্রীলোক বেগম-মহলের পথে দ্বারের দিকে আসিতেছে। তখনও সে দূরে ছিল—যে পথ দ্বার হইতে গিয়াছে তাহা যে স্থানে একটি ফোয়ারার নিকটে যাইয়া ফোয়ারা ঘুরিয়া গিয়াছে এক জন বাঁদীর সঙ্গে তাহাকে সেই স্থানে দেখা গেল। আশায় কাশেমের হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল—বুঝি রসুলান আসিতেছে। কিন্তু সে আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আসিলে সে যখন দেখিল, তাহার হস্তে পণ্যাধার "কেশ" নাই, তখন তাহার মনে অবসাদের উদ্ভব হইল। কিন্তু তাহার গতিভঙ্গী যেন রসুলানের! এইরূপে যখন তাহার মনে আশার ও সন্দেহে সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন স্ত্রীলেকটি দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাহার হাতে যে ছাড় ছিল তাহা প্রহরিণীদিগকে দেখাইল। প্রহরিণীদিগের এক জন জিজ্ঞাসা করিল—সে জিনিষ বিক্রয় করিয়া কত টাকা পাইল? বাঁদী বলিল, তাহার জিনিষ বেগম-সাহেবা পরীক্ষার্থ রাখিয়াছেন, ক্রয় করা হয় নাই।

প্রহরিণী আশা করিয়াছিল, তাহারা কিছু পাইবে—সে আশায় নিরাশ হইয়া সে ছাড় চাহিল এবং দ্বার অর্গলমুক্ত করিল। সঙ্গী বাঁদী বলিল, ঐ ছাড়ে পশারিণীতে আবার আসিতে হইবে—ছাড় সে লইয়া যাইবে।

দ্বার মুক্ত হইল, রসুলান আসিয়া কাশেমের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "চল।" কাশেম ব্যস্ত হইয়া গমনে প্রবৃত্ত হইল। এক জন প্রহরী ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "ছুটিও না—পথ ভাল নহে।" ততক্ষণে বেগম-মহলের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে।

প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া কাশেম জিজ্ঞাসা করিল, "সংবাদ ভাল?"

রসুলান বলিল, "দ্রুত চল।"

রসুলানের কণ্ঠস্বর কম্পিত। সে কাঁদিতেছিল, কি হাসিতেছিল কাশেম স্থির করিতে পারিল না। যেমন অন্ধকারে সব বিড়ালই কাল মনে হয়, তেমনই বোরকার মধ্য হইতে আগত—দ্রুতপথাতিবাহনকারিণীর কথা হাসিরই হউক আর ক্রন্দনেরই হউক একরূপই মনে হয়। কাশেমের কেবল যত আশঙ্কার বিষয়ই মনে হইতেছিল। পণ্যপূর্ণ "কেশটি" কোথায়, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না—সে যে রসুলানকে ফিরিয়া পাইয়াছে, তাহাই সে যথেষ্ট বিবেচনা করিল।

তাহারা যখন গৃহে উপনীত হইল, তখন কাশেম লক্ষ্য করিল, যে যুবক তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল, সে নিজ গৃহের সম্মুখে মোড়ায় বসিয়া আছে—বোধ হয়, তাহারা ফিরে কি না তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

কাশেম তালাবদ্ধ দ্বারের চাবি খুলিতে না খুলিতে রসুলান দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করিল এবং দ্বিতলে চলিয়া গেল। কাশেম যখন দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া তাহার সন্ধানে গেল, তখন রসুলান বোরকাটা ফেলিয়া দিয়া শয্যায় লুটাইয়া হাসিতেছে যেন যে হাসি বাহির হইতে না পারিয়া তাহাকে পীড়িত করিতেছিল, তাহা ফোয়ারার জলের মত বাহির হইতেছে; বিবাহাবধি কাশেম কখন তাহাকে সেরূপ হাসিতে দেখে নাই। সে কি পাগল হইয়া গিয়াছে?

১২

কাশেম শুনিয়াছিল, নবাবের মত ধনীদিগের গৃহে পানে যে উগ্র মসলা ব্যবহৃত হয় তাহা সেইরূপ মসলা যুক্ত পান ব্যবহারে অনভ্যস্ত ব্যক্তিরা চর্ব্বন করিয়া তাহার রস গলাধঃকরণ করিলে কিছুক্ষণের জন্য পাগলের মত ব্যবহার করে। রসুলানের কি তাহাই হইল? কিন্তু সে ত সমস্ত পথ তাহার কোন লক্ষণ দেখায় নাই! কাশেম মনে করিল, তাহার মুখে ও চক্ষুতে শীতল জলের ঝাপটা দিয়া দেখিবে। সে ব্যস্ত হইয়া একটা বদনায় জল আনিল।

ততক্ষণে রসুলানের হাসির প্রথম উচ্ছ্বাস শেষ হইয়াছে। সে উঠিয়া বসিয়া স্বামীকে বলিল, "জল দিতে হইবে না।" তাহার পর সে তাহার হাসির কারণ বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখনও মধ্যে মধ্যে হাসির উচ্ছ্বাসে তাহার কথা বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল!

সে বেগম-মহলে উপনীত হইলে তাহাকে মহলের পরিদর্শিকার নিকট উপনীত করা হইল। বাঁদী বেগম-সাহেবার অনুগ্রহভাজন হইলে ক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তিনীর মৃত্যুতে বা তাহার কোন দোষ প্রমাণিত হইলে অথবা বেগম-সাহেবার খোস খেয়ালে এই পদে উন্নীতা হয়। তাহার নিকট পূর্ব্বেই সদর হইতে ভাণ্ডারী সংবাদ পাঠাইয়াছিল, দিল্লীর এক বেচনেওয়ালা সুন্দর সুন্দর জিনিষ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে—তাহার আবেদনে নবাব সাহেব তাহার জিনিষ

বেগম-মহলে লইয়া যাইবার জন্য এক বেচনে-ওয়ালীর যাইবার ছাড় দিয়াছেন। সে যাইবে। পরিদর্শিকা প্রৌঢ়া। সে প্রথমেই বেগম-মহলের অলিখিত নিয়ম জানাইয়া দিল—বিক্রীত পণ্যের মূল্যের একটা অংশ তাহাকে দিতে হয়। সে রসুলানকে বলিল, তাহাকে যে পাঠাইয়াছে, সে নিশ্চয়ই জানে, এই কারণে নবাব বাড়ীতে জিনিষ বিক্রয় করিলে তাহার মূল্য অধিক বলিতে হয়।

শুনিয়া কাশেম বলিল, সে শুনিয়াছে, কোন রাজার ভাণ্ডারে যে ফল আসিত, তাহার মূল্য বাজার দর অপেক্ষা দশ গুণ অধিক লিখিত হইত। এক দিন সেই কথা রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি যখন ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন ভাণ্ডারী প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়া বলিল, রাজা যে দামের কথা শুনিয়াছেন, তাহাই সত্য। তবে তাঁহার প্রাসাদে খাতার মূল্য অধিক কেন লিখিত হয়? উত্তর হইল, যে মূল্যে ঝাড়ুদার কোন জিনিষ কিনিয়া থাকে, সেই দামে রাজবাড়ীর জন্য তাহা কিনিলে লোকের কাছে রাজার সম্ভ্রম থাকে না—ইহাই ভাণ্ডারী শিখিয়াছে। তাহার শাস্তি না হইয়া পুরস্কার প্রাপ্তির ব্যবস্থা হইল।

রসুলান বলিল, সে পরিদর্শিকাকে জানাইল, পণ্য বেগমদিগের মনোনীত হইলে সে যাইয়া তাহার প্রভুকে এ কথাও বলিবে—তিনি সব বুঝিয়া দাম স্থির করিয়া দিবেন।

তাহার পর পরিদর্শিকা তাহার দুই জন সঙ্গিনীর সহিত পরামর্শে প্রবৃত্তা হইল—আজ বেগম-সাহেবার মেজাজ যেরূপ তাহাতে বেচনে-ওয়ালীকে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে কি না? রসুলান জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি অসুস্থ? পরিদর্শিকা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া উত্তর দিল—বেগম-মহলের ব্যাপার বেচনে-ওয়ালীর বুঝিবার চেষ্টা করা হাত বাড়াইয়া সূর্য্য স্পর্শ করিবার চেষ্টারই মত; সে তাহা বুঝিতে পারিবে না। এ অসুখ দেহে নহে—মনে; ইঁহাদিগের সেই "ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ।" ব্যাপারটা সে বাহির হইয়া আসিবার সময় যে বাঁদীর সঙ্গে—যাহার জিম্মায় আসিয়াছিল, সে-ই তাহাকে বলিয়াছিল। বেগম-সাহেবার দুই কন্যা; জ্যেষ্ঠা নবাব সাহেবের ও কনিষ্ঠা মাতার প্রিয়পাত্রী। একই পাত্রে উভয়ে অর্পিতা—কারণ, "উপযুক্ত" ঘরের সংখ্যা অল্প। জামাতাও একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যের অধিকারী। কিন্তু তাঁহার রাজ্য তাঁহার জমিদারীর তুলনায় ক্ষুদ্র। জমিদারী ইংরেজের অধিকারে। ইংরেজ সরকার একটি সেচের খাল কাটাইতেছেন—তাহার একাংশ ঐ জমিদারীর মধ্য দিয়া যাইবে। তাহাতে জমিদারীর অনেক উন্নতি হইবে, অর্থাৎ আয়বৃদ্ধি হইবে। উপর্য্যুপরি কয় বৎসর দুর্ভিক্ষহেতু ইংরেজ সরকার কাযটা এই বারই আরম্ভ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন—যদি জমিদারীর অধিকারী নবাবের জামাতা হিসাবমত ব্যয়ের অংশ দেন, তবে জমিদারী তাঁহারই থাকিবে এবং তিনি প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন—নহিলে ইংরেজ সরকার তাঁহার জমিদারী খাস করিয়া লইবেন। যে দুর্ভিক্ষের জন্য ইংরেজ সরকার খাল কাটাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার জন্যই কয় বৎসর অনাদায়ে জমিদারীর অধিকারীর সঞ্চিত অর্থ হ্রাস পাইয়াছিল। নানারূপ অপব্যয় ও অমিতব্যয়ে তাহা পূর্ব্বেই কমিয়া গিয়াছিল। এখন অর্থের প্রয়োজনে জামাতা নবাব সাহেবের নিকট কয় লক্ষ টাকা ঋণ চাহেন; কিন্তু তিনি প্রার্থিত অর্থের পূর্ণভাগ দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। তাঁহার সেই দ্বিধা দূর করিবার জন্য জামাতা তাঁহার প্রথমা কন্যাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। এরূপ ব্যাপার পূর্ব্বে কখন ঘটে নাই—কন্যা বিবাহের দীর্ঘকাল পরে সে-ই প্রথম পিত্রালয়ে আইসেন। কিন্তু সে আগমন সুখের হয় নাই। কন্যার সঙ্গে তাঁহার যে শিশু কন্যা আসিয়াছিল, অপরিচিতা বেগম-সাহেবাকে দেখিয়া সে এমন কান্দিতে থাকে যে, মাতামহী বিরক্ত হইয়া কন্যাকে তিরস্কার করেন, তিনি কন্যাকে সহবৎ শিক্ষা দিতে পারেন নাই—শিশু ভাল হইবে না। সেই কথায় কন্যাও মাতার প্রতি বিরক্ত হইয়া বলেন, বেগম-সাহেবার মত স্থূলকায়া সে পূর্ব্বে কখন দেখে নাই, তাই ভয় পাইয়াছে। শুনিয়া বেগম-সাহেবা কথাটা হাসিয়া গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাকে ত স্বামীর জন্য পিতার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিতে হয় না যে, আমি ভিখারিণীর মত শীর্ণা হইব।" এই অপমানে কন্যা পিতৃগৃহে জলস্পর্শও না করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। সে ঘটনা পূর্ব্বদিন ঘটিয়াছে এবং সেই জন্য বেগম-সাহেবার মেজাজ ভাল নাই। সে অবস্থায় রসুলানকে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে কি না, তাহাই বিবেচিত হইল। যে কয় জনে পরামর্শ হইতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিল, যখন পূর্ব্বদিন সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তখন তাহাকে লইয়া না যাইলে যদি সে কথা বেগম-সাহেবার মনে পড়ে তবে সে দায়িত্ব কে লইবে?

তখন তাহাকে বেগম-সাহেবার নিকট লইয়া যাওয়াই স্থির হইল।

রসুলান আবার এক বার হাসিয়া বলিল, কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করিয়া সে বেগম- সাহেবার নিকট উপনীত হইল। অন্যান্য বেগমের ঘরে—কোথাও গানের গুঞ্জন, কোথাও এসরাজের তারের বাজনা শুনা গিয়াছিল—বেগম-সাহেবার অধিকৃত মহলাংশে যেন কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজিত। বাঁদীরা অতি নিম্ন স্বরে পরস্পরের সহিত কথা বলিতেছে, নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে যে যাহার কার্য্যে গতায়াত করিতেছে; সকলেরই মুখে আতঙ্কের ভাব।

বেগম-সাহেবার নিকটে কি ভাবে যাইতে হইবে —কয় বার কুর্ণিশ করিয়া কয় পদ পিছাইয়া আসিয়া তবে অগ্রসর হইতে হইবে, কতটা দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে হইবে, প্রধান বাঁদী রসুলানকে সে সব বলিয়া দিয়াছিল। তিনি যে কক্ষে ছিলেন, তাহার দ্বারে নীতা হইলে সে যথাসাধ্য সেই সব শিক্ষা স্মরণ করিয়া এবং বাঁদীর অনুকরণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু প্রথমে সে পুরু-গদীর উপর বড় বড় তাকিয়ার মধ্যে বেগম-সাহেবাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাকিয়া বলিয়াই ভুল করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

বেগম-সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আসিল?" —দেহের তুলনায় কণ্ঠস্বর মৃদু।

কাশেম হাসিয়া বলিল, "তুমি বুঝি মনে করিয়াছিলে বাঘের গর্জ্জন শুনিবে?"

রসুলান বলিল, "কি শুনিব, ঠিক অনুমান করিতে পারি নাই।"

তাহার পর রসুলান বলিল, দিল্লীর বেচনে-ওয়ালা তাঁহার পশন্দের জন্য জিনিষ পঠাইয়াছে, শুনিয়া বেগম-সাহেবা বলিলেন—ভাল। তখন তিনি তাহার দিকে চাহিলেন—মাংসবহুল মুখের মধ্যে চক্ষু দুইটি তুলনায় ক্ষুদ্র। কিন্তু চক্ষুর্দ্বয়ে দীপ্তি আছে—তাহা বুদ্ধিব্যঞ্জক। বেগম-সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জিনিষ আনিয়াছ?"

তিনি ইঙ্গিত করিলে রসুলান দ্বারে পাপোশের উপর বসিয়া "কেশটি" খুলিয়া জিনিষ বাহির করিতে উদ্যত হইল।

বাঁদী আবার কুর্ণিশ করিয়া বেগম-সাহেবাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে জিনিষ কোথায় রাখিবে? আদেশ হইল, "ট্রে" আনিয়া দিতে হইবে—গদীর উপর তাহাতে জিনিষ সাজান হইবে। বাঁদী যাইয়া সোনার হাতল দেওয়া রূপার মীনাকরা পাত্র আনিয়া গদীর প্রান্তে রক্ষা করিল। রসুলান দুই তিনটি জিনিষ সাজাইলেই বেগম-সাহেবা দেহভার বহন করিয়া সেই দিকে সরিয়া আসিবার আয়োজন করিলেন। তিনি মেদাধিক্যহেতু বোতাম দেওয়া বা "হুক" দেওয়া জামা ব্যবহার করিতেন না—জামার পৃষ্ঠের দিকে ঘর কাটা থাকিত, তাহার মধ্য দিয়া ফিতা ঘুরাইয়া লওয়া হইত। বোধ হয় ফিতা পুরাতন হইয়া গিয়াছিল। তিনি সম্মুখের দিকে ঝুঁকিতেই পট্‌-পট্‌ শব্দে ফিতা ছিঁড়িয়া গেল। এক জন বাঁদীর দুর্ভাগ্য—সে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না।

বেগম-সাহেবা তাহার দিকে চাহিলেন—তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় যেন জ্বলিয়া উঠিল—কাল গোক্ষুর সাপ রুষ্ট হইয়া ফণা তুলিলে তাহার চক্ষু যেমন জ্বলে, তেমনই দেখাইল। তিনি রুষ্ট স্বরে বলিলেন, "বেয়াদপ নিমকহারাম।" বাঁদীদিগের মুখ দেখিয়া মনে হইল —তাহারা যেন যে কোন মুহূর্ত্তে সর্পের দংশন-ভয় করিতেছিল।

বেগম-সাহেবার আদেশ হইল—"বিশ জুতি লাগাও।"

রসুলানও আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু ভয়ে সে তাহার হাস্য গোপন করিয়া বলিল, "আমরা দীন দুঃখী—এক বেলা আহার্য্য জুটে ত আর এক বেলা জুটে না; আমরাই কৃশ হইব। আল্লা যাঁহাদিগকে প্রচুর দিয়াছেন—সেই ভাগ্য-বতীরা যদি কৃশ হইবেন, তবে দুঃখীর সহিত সুখীর কি প্রভেদ থাকিবে?"

বেগম-সাহেবা যে তাহার কথায় সন্তুষ্টা হইলেন, তাহা তাঁহার মুখভাবে বুঝা গেল।

ততক্ষণে তাঁহার আদেশ পালনের ব্যবস্থা হইল। দ্বারের সম্মুখে বারান্দায়—বেগম-সাহেবা দেখিতে পায়েন এমন স্থানে অপরাধিনীকে দাঁড় করাইয়া গ্রীবা হইতে কটি পর্য্যন্ত নগ্ন করিয়া পাদুকা-প্রহার চলিল—এক, দুই, তিন। যে প্রহার করিতেছিল, সে জানিত—কবে কাহার ভাগ্যে কি দণ্ডাদেশ হয়, কেহ জানে না। সে বিশেষ বলে প্রহার করিতেছিল না। তাহা লক্ষ্য করিয়া বেগম সাহেবা তাহাকে তিরস্কার করিলেন—সে কি খাইতে না পাইয়া দুর্ব্বল হইয়াছে? না—অপরাধী তাহার ভগিনী? তখন সে ভয়ে, সজোরেই অবশিষ্ট কয় বার প্রহার করিল। যে প্রহৃত হইল, তাহার পৃষ্ঠদেশ ফুলিয়া উঠিল— তাহাতে পাদুকার ছাপ লক্ষিত হইতে লাগিল।

রসুলান বলিল, সে কিন্তু কেবলই অনুভব করিতেছিল—তাহার পক্ষে যেন আর হাস্য সম্বরণ

করা সম্ভব হইতেছে না। তাই সে কেবল কল্পনা করিতে লাগিল, যেন সে হাসিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহাতে রুষ্ট হইয়া বেগম-সাহেবা তাহারও পাদুকা-প্রহারের আদেশ করিয়াছেন—তাহাকে বারান্দায় দাঁড় করাইয়া বাঁদী প্রহার করিতেছে।

বলিতে বলিতে সে যেমন আবার হাসির উচ্ছ্বাস রোধ করিতে পারিল না, কাশেমও তেমনই হাসিতে লাগিল। কাশেম হাসিতে হাসিতে, "বড়ই লাগিয়াছে" বলিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইবার অভিনয় করিল। হাসিয়া এ উহার গাত্রে পড়িল।

তাহার পর রসুলান বলিল, "পিঠে হাত বুলাইলে পেট ভরিবে না। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, আমি রাঁধিতে যাই।"

কাশেম বলিল, "বর্ণনাটা শেষ কর।"

রসুলান বলিল, তাহার সৌভাগ্য যে বেগম-সাহেবার এক জন পরিচারিকা আসিয়া তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল, তাঁহার স্নানের সব ব্যবস্থা বহুক্ষণ পূর্ব্বেই হইয়াছে। বেগম-সাহেবা—উঠিবার সময় আবার যদি কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটে, বোধ হয় সেই আশঙ্কায়, রসুলানকে বিদায় করিয়া দিতে চাহিলেন; বলিলেন—সে সব জিনিষ বাক্সে পুরিয়া রাখিয়া যাউক—তিনি অবসরমত দেখিবেন সে যেন পরদিন এই সময় আসিয়া হাজির হয়।

তিনি এক জন বাঁদীকে ডাকিয়া বলিলেন, পরিদর্শিকা যেন রসুলানের ছাড়ে পরদিন আসিবার অনুমতি লিখিয়া তাহার বাহির হইয়া যাইবার ব্যবস্থা করে। রসুলান বুঝিল, তাহার পক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব চলিয়া যাওয়াই নিরাপদ। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সে যে কুর্ণিশ করিয়া পিছু হটিয়া যাইতে ভুলিয়া যাইতেছিল, তাহা বাঁদী তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। কিন্তু অনভ্যাসহেতু—ত্রুটি সংশোধনের আগ্রহে সে নির্দ্দিষ্ট বারের অধিক কুর্ণিশ করিলে যখন বাঁদী তাহাকে তিরস্কার করিল, তখন বেগম-সাহেবা হাসিয়া বলিলেন, "যাইতে দাও। ও গ্রাম্যলোক—দরবারের নিয়ম জানে না।" রসুলানের মনে হইল, তাহার ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যেন স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

তাহার পর বাঁদী তাহাকে পরিদর্শিকার ঘরে লইয়া গেল—তথায় তাহার ছাড়ে বেগম-সাহেবার নির্দ্দেশ লিখিত হইলে তাহাকে বাহিরে দিয়া আসিবার জন্য এক জন বাঁদীর জিম্মা করিয়া দেওয়া হইল।

তাহার কথা শেষ হইলে কাশেম বলিল, সে দিন আর রন্ধন করিয়া কায নাই, সে বাজারের দোকান হইতে রুটী ও মাংস কিনিয়া আনিবে।

শুনিয়া রসুলান বলিল, "তুমি কি অমিতব্যয়ী! বেগম-মহলে জিনিষ বিক্রয় করিয়া লাভ হইবে, সেই আশায় দমকা খরচ করিতে উদ্যত হইয়াছ! তাহা হইবে না।"

আহারে বসিয়া কাশেম রসুলানকে বলিল, পরদিনই তাহারা চলিয়া যাইবে।

রসুলান তাহাতে আপত্তি করিল। সে বলিল, বেগম-মহলে যাইয়া সে যাহা দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাহা সিংহের গুহা বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই—একটু সতর্ক হইলে ভয় নাই। কিন্তু তাহারা যদি পলাইবার পথে ধরা পড়ে, তবে তাহাদিগের বিপদ অনিবার্য্য হইবে। বরং দুই এক দিন পরে জিনিষ আনিতে যাইতেছে বলিয়া প্রাসাদে জানাইয়া তাহারা যদি চলিয়া যায়, তবে আর বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহার কথা শুনিয়া কাশেম ভাবিতে লাগিল।

রসুলান বলিল, যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন সে এক বার দেখিবার চেষ্টা করিবে, নেজমা বেগম হইয়া কেমন আছে ও কেমন হইয়াছে।

কথাটা কাশেমের মনে বিরক্তির সঞ্চার করিল। এক দিন যে নেজমার নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের আগ্রহে সে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল, আজ তাহাকেই সে যেন তাহার বিপদের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিতেছিল। মানুষের মন অবস্থার পরিবর্ত্তনে এমনই পরিবর্ত্তিত হয়!

তাহার বিরক্তিভাব গোপন করিয়া কাশেম বলিল, আর নেজমাকে দেখিবার চেষ্টা করিয়া কায নাই—এখন তাহারা অব্যাহতি পাইলেই আল্লাকে ধন্যবাদ দিবে।

রসুলান সে কথা শুনিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কোন সূত্রে তাহার সংবাদ পাইয়াছ?"

কাশেম বলিল, "না।"

রসুলানের বিস্ময় বর্দ্ধিত হইল।

১৩

স্বামীর মতপরিবর্ত্তনের কারণ জানিবার জন্য রসুলানের ঔৎসুক্য বর্দ্ধিত হইল এবং সে যখন সে কথা আবার কাশেমকে জিজ্ঞাসা করিল, তখন কাশেম তাহার মনের কথা—আশঙ্কার বিষয় ব্যক্ত করিল।

কাশেম সে কথা বলিয়া উপসংহারে বলিল, "এ না-দলিল, না-উকীল, না-আপীলের দেশ; এখানে বিচার কেবল এক-তরফাই নহে, পরন্তু অত্যাচারী শাসকের ইচ্ছাই বিচার—বিচার সেই ইচ্ছার দাসী—তাই আমি ভাবিতেছি, কবে এ রাজ্য হইতে পলাইতে পারিব।"

রসুলান বলিল, "চল, যত শীঘ্র পারি, আমরা দিল্লীতে ফিরিয়া যাই। কিন্তু ভুল করিয়া যখন নেকড়ে বাঘের গহ্বরে আসিয়াছি, তখন যাহাতে সে সন্দেহ করিতে না পারে, এমন ব্যবস্থা করিয়া পলায়ন করিতে হইবে।"

কাশেমও তাহা বুঝিয়াছিল। কিন্তু নারীর মত ধৈর্য্য পুরুষের নাই, তাই সে ভ্রম বুঝিয়া তাহার প্রতিকার করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল—যেমন বিচার-বিবেচনা না করিয়াই উত্তেজনাবশে নেজমাকে বলিয়াছিল, সে তাহার উদ্ধার সাধন করিবে, তেমনই বিচার-বিবেচনা না করিয়াই এই স্থান ত্যাগের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। আপনার ভ্রমের জন্য সে কেবলই আপনাকে ধিক্কার দিতেছিল।

তাহার কথা শুনিয়া রসুলানও আতঙ্কানুভব করিল। সে যে পরিবেষ্টনে জন্মলাভ করিয়া বর্দ্ধিতা হইয়াছে, তাহাতে তাহার কল্পনাও সীমাবদ্ধ—বেগম-মহল সে কল্পনাসীমার বহির্ভূত। সেই জন্য সেই কল্পনাতীতের রহস্য ভেদ করিবার জন্য তাহার কৌতূহল কাশেমের কথাতেই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তখন কাশেম বিপদের কথা বিবেচনা করে নাই, অবিবেচনা-প্রসূত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিল। হয়ত নেজমার আকর্ষণ সেই ব্যাকুলতার মূলে ছিল। তখন রসুলানকে সে তাহার প্রতিশ্রুতি পালনের অস্ত্ররূপেই দেখিয়াছিল। শিকারী যেমন যত্নে তাহার অস্ত্র কার্য্যোপযোগী করে, সে রসুলানকে তেমনই কার্য্যোপযোগী করিয়াছিল।

তাহার পর অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নেজমা দূরে গিয়াছে, রসুলান নিকটে আসিয়াছে; মোহের স্থান প্রেম অধিকার করিয়াছে; প্রকৃত কল্পনাকে দূর করিয়া দিয়াছে। বাস্তবিক কল্পনার তরঙ্গের উপর মোহই দেখা যায়—বাস্তবের অভিজ্ঞতার ভিত্তি ব্যতীত প্রকৃত ভালবাসা স্থান পায় না। সে লক্ষ্য করিল, রসুলান যেমন তাহার কথায়—তাহার প্রতি প্রেমহেতু সকল বিপদ বরণ করিয়া লইতে হাসিমুখে সম্মত হইয়াছিল, তেমনই আবার এখন এক দিনও বলে নাই, এই অবস্থার জন্য সে-ই দায়ী। স্ত্রীবুদ্ধি তাহাকে এখন ধৈর্য্যের পথই দেখাইয়া দিতেছে। সে-ও বুঝিল, গমনের সুযোগ সন্ধান করিতে হইবে, পলায়ন বিপদ-সঙ্কুল।

তাই পরদিন সে আবার রসুলানকে বেগম-মহলের দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া গেল; ভাবিতে ভাবিতে গেল, কতদিনে এই কর্ম্মভোগ শেষ হইবে—তাহার যে অবিমৃশ্যকারিতা তাহাকে অজগরের মত তাহার বন্ধনে বদ্ধ করিয়া যেন রুদ্ধশ্বাস করিতেছে, সেই অবিমৃশ্যকারিতার ফল হইতে সে অব্যাহতি লাভ করিবে?

রসুলান ছাড় দেখাইয়া বেগম-মহলে প্রবেশ করিলে কাশেম তাহার প্রাপ্য আনিতে গেল, পূর্ব্বদিনের অভিজ্ঞতায় তাহার আর দ্বারে বসিয়া রসুলানের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিবার ধৈর্য্য ছিল না এবং সে বুঝিয়াছিল, সে যত ব্যস্তই কেন হউক না, তাহাতে রসুলানের প্রত্যাবর্ত্তন শীঘ্র হইতে পারে না।

রসুলান বেগম-মহলে প্রবেশ করিয়া যখন পরিদর্শিকার নিকট নীতা হইল, তখন পরিদর্শিকা তাহাকে জানাইল, তাহার ভাগ্য প্রসন্ন, তাহার জিনিষ বেগম-সাহেবার পশন্দ হইয়াছে এবং তিনি অধিকাংশ জিনিষই রাখিয়া মূল্যতালিকা সদরে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তথায় পরীক্ষার পর মূল্য দিবার ছাড় আসিবে।

পরিদর্শিকা আরও জানাইল, আজ সে আসিলে বেগম-সাহেবা তাহাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার আদেশ করিয়াছেন;—এমন সৌভাগ্য সকলের হয় না। তাহার পর সে তাহাকে প্রধানা বাঁদীর জিম্মা করিয়া দিল।

বাঁদীর সঙ্গে যাইতে যাইতে রসুলান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বেগম-সাহেবা ব্যতীত কি নবাব সাহেবের আরও স্ত্রী আছেন?

তাহার অজ্ঞতায় বাঁদী হাসিয়া বলিল, "গাছ থাকিলে কি ফুলের অভাব হয়?"

রসুলান যেন কিছু বুঝিতে পারিল না, এমনই ভাব দেখাইয়া বলিল, "সে কি?"

"এত বড় বেগম-মহল জুড়িয়া যেমন বেগম-সাহেবা একাই থাকিতে পারেন না, তেমনই নবাব সাহেবের মন জুড়িয়া কি এক জনই থাকিতে পারেন? ভাল রত্নের আর নারীর সন্ধান পাইলেই নবাব সাহেব তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন।"

"এখনও তাহাই হয়?"

বাঁদী অশিষ্ট রঙ্গভরে বলিল, "তোমার কি সে ইচ্ছা আছে?"

রসুলান বলিল, "যে মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া রুটি কাপড়ের সংস্থান করে, তাহার সেরূপ ইচ্ছা হইলে লোক তাহাকে পাগল বলিবে।"

"তুমি ত দিল্লী হইতে আসিয়াছ; এই ত কিছু দিন হইল দিল্লীর কোন্ দরিদ্র পল্লী হইতেও এক তরুণী তাহার রূপের জন্য বেগম-মহলে আনীত হইয়াছে।"

"সে এখনও আছে?"

"যমালয় হইতে পলাইবার পথ থাকিতে পারে—বেগম-মহল হইতে পলায়ন অসম্ভব।"

"দিল্লী হইতে যে আসিয়াছে, সে খুব সুন্দরী?"

"সুন্দরী বটে—তবে তেমন সুন্দরী আরও আসিয়াছে। তাহাকে এখন নবাব সাহেবের সম্মুখে লইবার মত সংস্কৃত করা হইতেছে।"

"সে কি?"

"হাব-ভাব বেশভূষা আদব-কায়দা এ সব শিখিলে তবে ত সে নবাব সাহেবের সম্মুখে যাইবার উপযুক্ত হইবে। হীরাও নাকি ঘষিয়া তবে উজ্জ্বল করিতে হয়।"

"অন্য বেগমরা জিনিষ কিনেন না?"

"কিন্তু বেগম-সাহেবার বিনানুমতিতে অন্য কোন বেগমের ঘরে, বাঁদী ব্যতীত, আর কাহারও যাইবার অধিকার নাই। চল, যদি আজ তোমার জন্য অনুমতি করাইতে পারি। কিন্তু আমার ভাগের কথা মনে রাখিও।"

রসুলান সম্মতি জানাইল।

বেগম-সাহেবাকে যখন জানান হইল, দিল্লীর বেচনে-ওয়ালী আসিয়াছে, তখন তিনি তাহাকে লইয়া যাইতে বলিলেন, এবং সে কুর্ণীশের পর কুর্ণীশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপনীতা হইলে তিনি বলিলেন,—তাহার জিনিষ ভাল।

রসুলান বলিল, তাহার তুচ্ছ জিনিষ যে তাঁহার কাছে ভাল বোধ হইয়াছে, তাহাতে সে কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রকৃত কথা, সে যে পূর্ব্বদিন বলিয়াছিল—"ভগবান যাঁহাদিগকে প্রচুর দিয়াছেন, সেই ভাগ্যবতীরা যদি কৃশ হইবেন, তবে দুঃখীর সহিত সুখীর কি কোন প্রভেদ থাকে?" সেই কথাই বেগম-সাহেবাকে তুষ্ট করিয়াছিল। বেগম-সাহেবা বলিলেন, সে তাহার জিনিষের মূল্য পাইবে, আর তিনি যে তাহার জিনিষ পাইয়া তুষ্ট হইয়াছেন, সে জন্য তিনি তাহাকে এক আশরফী পুরস্কার দিতেছেন। তিনি ইঙ্গিত করিলে এক বাঁদী একটি স্বর্ণকৌটা হইতে একটি আশরফী বাহির করিয়া রসুলানকে দিল।

বেগম-সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি পূর্ব্বে কখন স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়াছে?

"না।"—বলিয়া রসুলান সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "দরিদ্রের পক্ষে রৌপই যথেষ্ট—স্বর্ণ হীরা এ সকলের কথা দরিদ্র শুনে—দেখিতে পায় না।"

বেগম-সাহেবা বলিলেন, "সাবধানে রাখিও।"

তাহার পর তিনি নূতন আনীত কয়টা জিনিষ দেখিয়া বলিলেন, পূর্ব্বদিনের মত সে বাক্স রাখিয়া যাউক—পরদিন আসিবে।

যে বাঁদী রসুলানকে সঙ্গে আনিয়াছিল, সে যখন বুঝিল, বেগম-সাহেবার মেজাজ ভাল আছে, তখন—সেই সুযোগে—বলিল, এ বার দিল্লী হইতে যে নেজমা বেগম আসিয়াছেন, তিনি বাঁদীর কাছে বেচনে-ওয়ালীর কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "সুরমার কৌটা আছে কি?"

শুনিয়া বেগম-সাহেবা হাসিয়া একটা তাকিয়ার উপর অঙ্গ এলাইয়া দিলেন। দেহের তুলনায় হাস্য মৃদু—বোধ হয়, এক কালে মধুরই ছিল। তিনি বলিলেন, "সুরমার কৌটা? যেমন ঘর হইতে আসিয়াছে—নজরও ত তেমনই হইবে। টাকার উপর ত আর কখন কিছু দেখে নাই।"

রসুলান বলিল, তিনি যদি তাহার ধৃষ্টতায় রুষ্ট না হয়েন, তবে সে বলিবে, সুগন্ধ গোলাবেরই হয়—শিমুল তাহা পাইবে কি প্রকারে? সেই জন্যই বলে ধুইলে ইল্লৎ পরিষ্কার হয়, কিন্তু স্বভাব যায় না।

বেগম-সাহেবা বড় বাঁদীকে বলিলেন, সে যেন পরিদর্শিকাকে ডাকিয়া আনে; পরিদর্শিকা বলিয়াছে, নেজমা বেগম নবাব সাহেবের নিকট নীতা হইবার মত হইয়াছে, তিনি এক বার তাহাকে দেখিবেন—তাহার পর মহলে তাহার অংশে নবাব সাহেবের যাইবার ব্যবস্থা হইবে। বড় বাঁদী কুর্ণীশ করিয়া আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল।

যে বাঁদী নেজমা বেগমের কথা বলিয়াছিল, বেগম-সাহেবা তাহাকে বলিলেন, সে রসুলানকে নেজমা বেগমের কাছে লইয়া যাইতে পারে; আর সে যেন তাহাকে জানাইয়া দেয়, দুঃখীর নজর বেগমে সাজে না—যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন দশ পনের টাকার জিনিষও না কিনিলে মর্য্যাদা থাকে না।

তত্তক্ষণে রসুলান যে কয়টি জিনিষ "কেশ" হইতে বাহির করিয়াছিল, সে কয়টিও আবার "কেশে" স্থাপিত করিয়াছে।

বেগম-সাহেবা বাঁদীকে বুঝাইয়া দিলেন, নেজমা বেগম যে কয়টি জিনিষ কিনিতে চাহিবে, সে কয়টি স্বতন্ত্র করিয়া এবং অবশিষ্ট জিনিষ ঐ "কেশেই"—তাঁহার নিকট আনিতে হইবে।

বাঁদী কুর্ণীশ করিয়া পিছু হটিতে লাগিল। রসুলানও তাহাই করিল—ইচ্ছা করিয়াই কয়টা অধিক কুর্ণীশ করিল। বেগম-সাহেবা হাসিয়া তাহাকে বলিলেন, তাহার কথা ভাল; যদি কখন বাঁদী হইবার ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহাকে জানাইলে তিনি তাহাকে নিযুক্ত করিবেন। রসুলান আবার কুর্ণীশ করিতে করিতে বাঁদীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

বাঁদীর সঙ্গে রসুলান দীর্ঘ বারান্দায় চলিতে লাগিল। সে লক্ষ্য করিল, বারান্দার পার্শ্বে দুইটি করিয়া ঘরের প্রাচীর এক বর্ণের—সেই দুইটি ঘরের পর্দাও সেই বর্ণের—যে ঘরে আসবাব দেখা গেল সে ঘরের আসবাবের আস্তরণও সেই বর্ণের। বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল, এক এক বেগমের ঘরের আসবাবের এক এক বর্ণ—সেই বর্ণ অনুসারে আবার কাহারও নাম ফিরোজা, জরদা—ইত্যাদি। রসুলান জিজ্ঞাসা করিল, "দিল্লী হইতে যাঁহাকে আনা হইয়াছে তাঁহার নাম কি?" বাঁদী বলিল "বর্ণের নামের সীমা আছে—নবাবের কামনার সীমা নাই—তাই বর্ণের নামের অভাবে তাঁহাকে তাঁহার নামেই পরিচয় দেওয়া হয়—নেজমা বেগম।"

উভয়ে কক্ষের পর কক্ষের সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কোন কোন কক্ষ হইতে কৌতূহল-পূর্ণ চক্ষু তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিল—কিন্তু সে মহলে কৌতূহল দৃষ্টিতে প্রকাশিত হইলেও বাক্যে প্রকাশ পাইতে ভয় পায়।

তবে কোন কোন কক্ষের সম্মুখে পিঞ্জরে পাখী ডাকিতেছিল, আর কক্ষমধ্যে—কক্ষপিঞ্জরে কক্ষাধিকারিণী এসরাজ বা সেতার বাজাইতেছিলেন। কোন কোন কক্ষ হইতে সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। অধিকাংশ কক্ষের একটি মাত্র দ্বার মুক্ত—তাহাতেও পর্দাটানা। ঘরের মধ্য হইতে সৌরভ আসিতেছিল।

বেগম-মহল বহুদূর-বিস্তৃত,—বাঁদী শেষে একটি কক্ষের সম্মুখে আসিয়া রসুলানকে বলিল, "তুমি দাঁড়াও।" সে পর্দার বাহিরে বারান্দায় উপবিষ্ট বাঁদীকে বলিল, বেচনেওয়ালী দিল্লীর কতকগুলি জিনিষ লইয়া বিক্রয় করিতে আসিয়াছে; বেগম-সাহেবা তাহাকে বেগমের নিকট পাঠাইয়াছেন, তিনি যদি পশন্দ করেন—সুরমার কৌটা ও অন্যান্য জিনিষ কিনিতে পারেন—দশ পনর টাকার জিনিষ লইতে পারেন।

নেজমা বেগমের খাস বাঁদী বাহির হইতে সাড়া দিয়া পর্দা ঠেলিয়া কক্ষমধ্যে অন্তর্হিতা হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, বেগমের স্নান হইয়া গিয়াছে—প্রসাধিকা তাঁহার প্রসাধন শেষ করিয়া এখনই বাহিরে আসিবে, তাহার পর রসুলান যাইবে।

শুনিয়া রসুলানের হাসি আসিল—নেজমার প্রসাধন প্রসাধিকা করিয়া যায়; সে কি তবে গোলাব-জলে স্নান করে। নেজমা এখন নেজমা বেগম— গুটি পোকাই অবস্থার সুবিধায় প্রজাপতি হয়—তখন ফুলই তাহার আসন—মধু তখন তাহার খাদ্য।

দিল্লীর ইরাণী-পল্লীর যে পরিবেষ্ঠনে তাহারা বর্দ্ধিত, তাহার সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্র্যের চিহ্ন—জীর্ণ গৃহ, স্থানের সঙ্কীর্ণতা, পল্লীবাসীদিগের স্বল্পমূল্য—কোন কোন ক্ষেত্রে বিবর্ণ বেশ—সে সকলের সহিত এই প্রাসাদের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য—কি প্রভেদ!

রসুলান যখন বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই সব ভাবিতেছিল, তখন প্রসাধিকা তাহার প্রসাধন-দ্রব্য লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। নেজমার খাস বাঁদী আবার সাড়া দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং ফিরিয়া অপর বাঁদীকে বলিল, "তোমরা চল।"

সে দ্বারের পুরু পর্দা সরাইয়া দিল—বাঁদীর সঙ্গে রসুলান কক্ষে প্রবেশ করিল, নেজমাকে কুর্ণীশ করিল।

রসুলান দেখিল, কক্ষ সুসজ্জিত—বেগম-সাহেবার কক্ষ যেরূপে সজ্জিত সেরূপে সজ্জিত নহে—আধা-য়ুরোপীয় রকমের সাজসজ্জা; স্ফটিক পাত্রে পুষ্প—কক্ষপ্রাচীরে চিত্র—কক্ষে মধুর গন্ধ। নেজমা একখানি গদীমোড়া কেদারায় বসিয়া আছে—চুল খুলিয়া দিয়াছে, শুকাইবে। তাহাকে দেখিয়া রসুলানের মনে হইল, এ যেন সে নেজমা নহে, বেগম-সাহেবা সত্যই বলিয়াছেন, সে নবাবের উপযুক্ত হইয়াছে। তাহার পরিধানে রেশমী বেশ।

রসুলান নেজমার নির্দ্দেশে মেঝের গালিচার উপর বসিয়া তাহার পণ্যের "কেশ" খুলিয়া দুইটি সুরমার কৌটা ও কয়খানি গজদন্তের উপর অঙ্কিত দিল্লীর দৃশ্য বাহির করিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া নেজমার পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র টিপয়ে রাখিয়া দিল।

সেই সময় এক বাঁদী অপরাকে লইয়া কক্ষের বাহিরে গেল—প্রাপ্যের ভাগ স্থির করিবে।

সেই অবসরে রসুলান বোরকার ঊর্দ্ধাংশের বোতাম খুলিয়া ফেলিল—নেজমা দেখিল—রসুলান। সে যেন চমকিয়া উঠিল—যেন তাহার অতীত সহসা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়াছে। সে বিস্ময়ে অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিল, "তুমি—রসুলান!"

রসুলান দৃষ্টির দ্বারা তাহাকে সাবধান হইতে ইঙ্গিত করিল, এবং বোরকায় আবার মস্তক ও মুখ আবৃত করিল।

অতি মৃদু স্বরে নেজমা বলিল, "তুমি কোথা হইতে আসিলে?"

তেমনই মৃদু স্বরে রসুলান বলিল, "কাশেম পাঠাইয়াছে।"

নেজমার দৃষ্টিতে সব যেন অস্পষ্ট হইয়া গেল।

রসুলান দেখিল, প্রভাতে ফুলে যেমন শিশির টলটল করে, নেজমার দুই চক্ষুতে অশ্রু তেমনই দেখাইতে লাগিল।

"তুমি আসিলে কেন?"

"আমি কাশেমের স্ত্রী।"

দুই বিন্দু অশ্রু চক্ষু হইতে বাহির হইয়া দুই গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

রসুলান বিপদ গণিল। নেজমা যদি আপনাকে সংযত করিতে না পারে, তবে সর্ব্বনাশ হইবে—তাহার ও কাশেমের বিপদ অনিবার্য্য। তাহারা ধরা পড়িবে।

সে মৃদুস্বরে বলিল, "কি করিতেছ?"

নেজমা চক্ষু মুছিবার জন্য সবুজ বর্ণের রেশমী রুমাল লইতেই রসুলান স্বাভাবিকভাবে বলিল, "তবে যাহা পশন্দ হইল, তাহাই রাখুন।"

বলিয়া সে "কেশ" বন্ধ করিয়া বারান্দায় আসিল।

তাহাকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া বাঁদী দুই জন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইহারই মধ্যে সওদা শেষ হইল?"

রসুলান বলিল, "বেগমের মর্জ্জি।"

বাঁদীরা যখন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন নেজমা চক্ষু মুছিয়াছে—তাহারা লক্ষ্য করিল না—তাহার চক্ষুর পল্লবে সুরমার রেখা কতকটা মুছিয়া গিয়াছে।

যে বাঁদী রসুলানকে আনিয়াছিল, সে টিপয়ের উপর হইতে দ্রব্য কয়টি গুছাইয়া লইয়া বলিল, বেগম-সাহেবাকে দেখাইয়া আনিয়া দিয়া যাইবে।

নেজমা মস্তক নাড়িয়া অনুমতি দিল।

বাঁদী কুর্ণীশ করিয়া বাহির হইল এবং রসুলানকে লইয়া আবার বেগম-সাহেবার কক্ষদ্বারে উপনীত হইল।

বেগম-সাহেবা তখন স্নান-ঘরে যাইতেছিলেন—বলিয়া দিলেন,রসুলান তাহার পণ্য রাখিয়া যাউক—পরদিন আসিলে ব্যবস্থা হইবে।

রসুলান স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁদীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

১৪

কাশেম সে দিন আর বেগম-মহলের দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা না করিয়া দপ্তরখানায় তাহার প্রাপ্য আনিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু যাইয়াই আবার সেই দ্বারের কাছে ফিরিয়া আসিতে ব্যস্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া সে কেবলই মনে করিতেছিল, যদি তাহার ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে রসুলানের কায শেষ হইয়া যায়, তবে সে আসিয়া কোথায় অপেক্ষা করিবে—সেই অশিষ্ট প্রহরীদিগের নিকটে? তাই সে বিশেষ চেষ্টা করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে জন্য তাহাকে কিছু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল;—যে দেশের যে ব্যবস্থা।

রসুলানও সে দিন পূর্ব্বদিনের তুলনায় শীঘ্রই ফিরিয়াছিল। তখন কাশেম ফিরিয়া আসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

উভয়ে প্রাসাদের প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিয়া যাইলেই রসুলান অনুচ্চ স্বরে বলিল, সে নেজমাকে দেখিয়াছে। সে এই কথা ব্যক্ত করিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিল এবং বিশেষ চেষ্টায় তাহার পূর্ব্বেই তাহা বলিবার প্রলোভন সম্বরণ করিয়াছিল।

কাশেম শুনিল, শুনিয়া সবিশেষ জানিবার জন্য তাহারও কৌতূহল অল্প হইল না। কিন্তু সে সেই কৌতূহল সংযত করিয়া বলিল, "চুপ কর—এ যে স্থান সে স্থানে কথা বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে!"

যখন উভয়ে গৃহে উপনীত হইল, তখন তালাবদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করিল। রসুলান বোরকা খুলিয়া ফেলিল।

দ্বিতল কক্ষে যাইয়া রসুলান বলিল, সে নেজমার সহিত—নেজমা বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে। বলিয়াই সে নেজমার কক্ষসজ্জার বর্ণনা করিল এবং বর্ণনা শেষ করিয়া বলিল, সেই ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্রে যে থাকিলে তাহা শোভন হয় সে-ই

তথায় অবস্থিত—নেজমা যে রূপসী তাহা ইরাণী পল্লীতে সকলেই জানিত—সে তথায় কাশেমের মত অনেক যুবককে আকৃষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু ইরাণী পল্লীতে তাহার যে রূপ ছিল, তাহা ভস্মাবৃত অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই নহে—এখন বেগম-মহলে যাইয়া বিশ্রামে ও প্রসাধনে—অনুশীলনে সে রূপ অগ্নি-শিখার মতই উজ্জ্বল হইয়াছে—অগ্নি-শিখায় খেলা করা যদি নবাবের স্বভাব বা অভ্যাস না হইত, তবে নবাব সেই শিখায় দগ্ধ হইতেন।

কাশেম বলিল, "অর্থাৎ সে এই রাজ্যের নূরজিহান হইত?"

"তাহাই বটে।"

কাশেম মনে করিল, সে যাহা চাহিতেছিল তাহাই হইয়াছে—নেজমা তাহার অবস্থায় সন্তুষ্ট আছে, তাহাকে আর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিতে হইবে না। সে জিজ্ঞাসা করিল, "সে বিশেষ আদরে ও যত্নেই আছে?"

রসুলান বলিল, "যত্নের অবশ্য অন্ত নাই। কেহ কেহ মূল্য দিয়া আপনার ব্যবহারের জন্য যাহা সন্ধানের পর সংগ্রহ করিয়া আনে সে কি তাহাকে অযত্ন করে? যে স্বর্ণপিঞ্জরে বহুমূল্য পাখী রাখে, সে কি পাখীর অযত্ন হইতে দেয়? কিন্তু আদরের কথা বলিও না।"

"কেন?"

"আদর দুঃখীর জন্য—দরিদ্রের জন্য—ধনীর জন্য নহে।"

কাশেম হাসিয়া বলিল, "এ অভিজ্ঞতা কি বেগম-মহল হইতে বিপদের বিনিময়ে সংগ্রহ করিয়াছ?"

"তাহাই বটে। নেজমা বেগম-মহলে নীত হইবার পর আজ পর্য্যন্ত নবাবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই।"

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কাশেম বলিল, "কে বলিল?"

রসুলান হাসিয়া বলিল, "আমি। আমার কথায় বিশ্বাস হয় না?"

তখন সে বেগম সাহেবার নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহা বিবৃত করিল। সে কথা সে-ও প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, সেই জন্য বাঁদীর নিকট—কথায় কথায়—তাহা যাচাই করিয়া লইয়াছিল।

কাশেম বলিল, পৃথিবীতে অনেক অবিশ্বাস্য কথাও বিশ্বাস করিতে হয়। সে দিল্লীতে যে সকল ব্যবসায়ীর কাষ করিত, তাঁহাদিগের এক জন সমগ্র শীতকালে হয়ত দুই চারি দিন দুই চারিখানি শাল ব্যবহার করিতেন—কিন্তু ভাল শাল পাইলেই তাহা কিনিতেন। তাঁহার শালের সংগ্রহ অসাধারণই ছিল এবং লোক তাঁহার ব্যবহারে হাসিত।

রসুলান বলিল, দরিদ্রের যদি ফুল পাইতে আগ্রহ হয়, তবে তাহাকে একটি গাছ বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আপনার প্রাঙ্গনে বা একটি ভগ্নপাত্রে রোপণ করিয়া যত্নে রক্ষা করিতে হয়—প্রতিদিন তাহাতে জল দিতে হয়, তাহার পর যখন ফুল ফুটে—তখন কি আনন্দ; সে ফুল পরিশ্রমের ও ধৈর্য্যের পুরস্কার। আর ধনীরা মালী নিযুক্ত করে—পরিশ্রম তাহারাই বেতনের বিনিময়ে করে, সে পরিশ্রমে আন্তরিকতা থাকে না; যখন ফুল ফুটে তখন তাহা প্রভুর কক্ষে শত পুষ্পের একটি হইয়া শোভা পায়—অনেক সময় তাহা প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণও করে না।"

তাহার পর রসুলান তাহার সেদিনের অভিজ্ঞতা বিবৃত করিল এবং বিবৃত করিয়া স্বামীর ও তাহার আহার্য্য প্রস্তুত করিতে গেল।

পত্রের উপর যদি লেখকের অশ্রু পতিত হয়, তবে অক্ষর যেমন অস্পষ্ট হইয়া যায়—রসুলানের কথায় কাশেমের সঙ্কল্প তেমনই অস্পষ্ট হইয়া গেল। সে স্থির করিয়াছিল, নেজমার সম্বন্ধে তাহার প্রতিশ্রুতির আর কোন মূল্য বা স্বার্থকতা নাই। কিন্তু রসুলানের কথায়, সে যে তাহার নামেই অশ্রুপাত করিয়াছে তাহা শুনিয়া, তাহার কর্ত্তব্যসম্বন্ধে কাশেমের সন্দেহ হইতে লাগিল। সে কি করিবে?

সে দিন সে আর দোকান খুলিল না।

সে যে নবাবের দপ্তরখানা হইতে তাহার প্রাপ্য টাকা আনিয়াছিল, তাহাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল—সন্ধ্যার পূর্ব্বে নামাজের আজান শুনিয়া যখন তাহার মনে হইল—মসজেদ সম্মুখে থাকিলেও সে কোন দিন তথায় নামাজ করিতে যায় নাই, তখন সে তথায় যাইবার জন্য যখন আলনায় রক্ষিত জামাটি লইয়া পরিতে গেল, তখন তাহার জেব হইতে টাকা পড়িয়া গেল। সে টাকা কুড়াইতে কুড়াইতে রসুলানকে বলিল, "টাকার কথা, আমিও ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তুমিও মনে কর নাই!"

রসুলান হাসিয়া বলিল, "আমারও ভুল কম হয় নাই। বেগম-সাহেবার আশরফীটা তোমাকে দেখান হয় নাই। তবে নেজমার কথা শুনিয়াই যখন তোমার ভুল হইয়াছে, তখন তাহাকে দেখিয়াও আমার ভুল হইবে না?"

বাস্তবিক রসুলানের ভুল কম হয় নাই বটে, কিন্তু কাশেম তাহার মত নির্ব্বিকার থাকিতে পারে নাই। রসুলান যখন দেখিয়াছিল, কাশেমের নামে নেজমার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল এবং সে কাশেমের পত্নী হইয়াছে শুনিয়া সে অশ্রু আর চক্ষুতে অবরুদ্ধ রহে নাই, তখনও তাহার মনে—সেরূপ অবস্থায় যে আশঙ্কা নারীর মনে স্বতঃই উদ্ভূত হয়, তাহার সহানুভূতি সেই আশঙ্কাকে মনে স্থানলাভ করিতে দেয় নাই। তাই সে সরলভাবে সে কথাও স্বামীকে বলিয়াছিল—সে জানিত, কাশেম এক দিন নেজমার রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। যে সন্ধ্যায় তাহারা নিজামুদ্দীন হইতে আসিবার সময় ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নের জাল বয়ন করিয়াছিল, সে দিনও তাহার মনে নেজমার প্রতি ঈর্ষ্যা ছিল; কিন্তু তাহার পর—কাশেম যখন তাহাকে বলিয়াছিল, সে তাহাকে ব্যতীত আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না, তখনই তাহার ভালবাসা সে ঈর্ষ্যার সমাধি রচনা করিয়াছিল। তাই সে নেজমার অশ্রুপাতের কথাও কাশেমকে বলিয়াছিল—তাহা গোপন করিবার কারণও সে অনুভব করে নাই। কিন্তু কাশেমের যেন মনে হইতেছিল, রসুলানের প্রেমের ভেষজে যে হৃদয়-ক্ষত শুকাইয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহার আবরণ-চর্ম্মের কতকাংশ সরিয়া গিয়াছে, আর ক্ষত হইতে রক্ত বাহির

সে রাত্রিতে সুপ্ত পত্নীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া কাশেম অন্য দিনের মত নিদ্রার শান্তি পাইল না—সে ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন দেখিতে পাইতেছে, নেজমার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। সে যতই তাহা ভুলিতে পারিতেছিল না—ততই নিজামুদ্দীন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পথে রসুলানকে প্রদত্ত তাহার প্রতিশ্রুতি সে স্মরণ করিতে লাগিল। বালক যখন গোরস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী পথ—সন্ধ্যার সময় একাকী অতিক্রম করে, তখন সে যেমন আপনাকে আপনি সাহস দিবার জন্য শিস দিতে দিতে যায়, তেমনই কাশেম আপনার সঙ্কল্প দৃঢ় রাখিবার জন্য কেবলই সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিতে লাগিল। নেজমাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনজন্য সে রসুলানকেও বিপদের গহনে প্রেরণ করিতে পারিয়াছে, আর রসুলানকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সে পালন করিবে না? সে কি এতই হীন? সে মনে করিতে লাগিল, সে কেন সে সব কথা ভাবিতেছে? নেজমা কোথায়—তাহার ও নেজমার মধ্যে বহু বিপদের ব্যবধান রহিয়াছে। যে স্থানে শস্য-লাভের আশা দুরাশা সে স্থানে যে চাষ করে, সে দুর্ব্বুদ্ধি।

কিন্তু তবুও সে তাহার কল্পনার পট হইতে নেজমার অশ্রুসজল চক্ষুর চিত্র মুছিয়া ফেলিতে পারিল না; পরন্তু সে চিত্র যেন জীবনে সমুজ্জ্বল হইতে লাগিল—গভীর হ্রদের জলে যেমন যেন কত রহস্য নিহিত মনে হয়, তেমনই সে চক্ষুতে কি ভাব! সে কি কাশেমের প্রতি প্রেম? না—তাহার বর্ত্তমান মনোভাবকে তিরস্কার? না - কাশেমকে তাহার প্রতিশ্রুতি পালনজন্য মৌন কিন্তু অর্থপূর্ণ আহ্বান? তরঙ্গ-তাড়িত সমুদ্রে যে তরণীতে অবস্থান করে, সে যেমন অস্থির হয়, কাশেম চিন্তার তাড়নায় তেমনই অস্থির হইয়া উঠিল। সে কেবল ভাবিতে লাগিল, কখন রাত্রি শেষ হইবে—সে কাযে দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইবে?

রাত্রি—বিনিদ্র কাশেমের নিকট যত দীর্ঘই কেন মনে হউক না, তাহারও শেষ হয়। মসজেদের ঘড়ীতে পাঁচটা বাজিল—শয্যাত্যাগ করিয়া বাতায়ন মুক্ত করিয়া কাশেম দেখিল, আকাশে তারকার জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া আসিতেছে—অন্ধকারের গাঢ়তা দূর হইতেছে। সে ফিরিয়া দেখিল রসুলান তখনও প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত—তাহার মনের শান্তি যে তাহার স্বামীর প্রতি ভালবাসায় ও স্বামীর কথায় বিশ্বাসের উৎস হইতে উদ্গত হইয়াছে, তাহা কাশেম বুঝিল। সে যাইয়া নিদ্রিতা পত্নীকে বাহুবেষ্টনাবদ্ধ করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল।

রসুলানের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে তখনই চক্ষু উন্মীলিত করিল না—স্বামীর বাহুবেষ্টনে সে যেন তাহার জন্ম সার্থক মনে করিল। তাহার পর সে বলিল, "সকাল হইয়াছে?"

কাশেম হাসিয়া বলিল, "সে তোমার অপেক্ষায় আছে।"

সে ভাবিল, রসুলানের নিদ্রাভঙ্গে এত বিলম্ব হইল? রসুলান ভাবিল, এত শীঘ্র তাহাকে স্বামীর আলিঙ্গনমুক্ত হইতে হইল!

কাশেমও কিন্তু মনে করিতে পারে নাই, সে রাত্রিতে আর এক জন বিনিদ্র হইয়া যেন শয্যা-কণ্টকের যাতনা ভোগ করিয়াছে। সে—নেজমা।

কাশেম যখন অনেক কৌশল করিয়া—অনেক চিন্তার পর রসুলানকে বেগম-মহলে পাঠাইয়াছিল, তখন নেজমার সংবাদ তাহার নিকট একান্তই অপ্রত্যাশিত ছিল না; সেই সংবাদের একটি অংশ

কেবল অতর্কিত—সে নেজমার অশ্রু-বর্ষণ। কিন্তু তাহার অনেক কারণ হইতে পারে। পিতামাতার কথা তাহার মনে পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার মানসিক চাঞ্চল্য উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে; সে বেগম হইয়াছে, কিন্তু আজও সে অনাদৃতা, তাহাতেও তাহার মনে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকিতে পারে।

কিন্তু রসুলানের নিকট নেজমা যাহা অবগত হইয়াছিল, তাহা তাহার কল্পনার অতীতই ছিল। তাহার দরিদ্র পিতা অর্থলোভে তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং সে যে বিক্রীতা হইয়াছিল, সে জন্য তাহার দরিদ্র স্বজন ও প্রতিবেশীরা তাহাকে ভাগ্যবতী বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। সে সবই দরিদ্রের মনোভাব-বিকাশ—যাহাদিগকে সর্ব্বদা অন্নের ও অর্থের অভাব ভোগ করিতে হয়, তাহারা সে অভাব হইতে মুক্তিই মোক্ষ বলিয়া বিবেচনা করে। ভালবাসা, স্নেহ, প্রেম—এ সকলে যেন দরিদ্রের কোন অধিকার নাই। তাহার পর সে যে কাশেমকে ভালবাসিয়াছিল, তাহাও সে অনুভব করে নাই; কারণ, সে জানিত তাহার কোনরূপ স্বাধীনতা নাই—মানসিক স্বাধীনতাও নহে। তাই কাশেমের প্রতিশ্রুতিতে সে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করে নাই। সে যে পুরীতে আসিয়াছে, তথায় যে জীবিতাবস্থায় নীতা হয়, সে মৃত্যু ব্যতীত তথা হইতে বাহির হইতে পারে না। কাহারও কাহারও বাহির হইবার চেষ্টার ফলের কথা সে শুনিয়াছে এবং শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে। এই স্থান হইতে সে যে বাহির হইয়া যাইবে, সে কথা সে কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। তাহার এই অবস্থাই সে তাহার নিয়তি জ্ঞান করিয়াছিল—নিয়তির সহিত কলহ করিয়া লাভ নাই—তাহার সহিত যুদ্ধে কেহ তাহাকে পরাজিত করিতে পারে না।

তাহার পক্ষে মুক্তির যে কোন আকর্ষণ আছে, তাহাও সে অনুভব করিত না।

এই সময় অঘটন ঘটিয়াছে, কাশেম তাহার সন্ধানের উপায় করিয়াছে! বিস্মৃতির যে হ্রদের জলে আমাদিগের অতীত অন্তর্হিত হয়, যদি সহসা ভূমিকম্পে তাহার জল শুকাইয়া যায় এবং সেই অতীত দেখা দেয়, তবে যেমন হয়, নেজমার তেমনই হইয়াছে। যে স্মৃতি দীর্ঘকাল জলতলে অদৃশ্য হইয়া ছিল, তাহা সেই জলে সিক্ত থাকিয়া এবং পরে ভূমিকম্পের কারণ আগ্নেয়গিরির তাপে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তাই তাহা দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল।

সে কি সত্যসত্যই কাশেমের জন্য প্রেম অনুভব করিয়াছিল? সে ত পূর্ব্বে কখন তাহা বুঝিতে পারে নাই! তবে সে জানিত, তাহার আশায় কাশেম রসুলানকে বিবাহ করে নাই। রসুলান বলিয়া গিয়াছে, সে কাশেমের স্ত্রী। তাহাই সম্ভব। নহিলে সে কেন বেগম-মহলে তাহার সন্ধানে আসিয়াছে। কিন্তু সে কি তাহার সন্ধানেই আসিয়াছে? কাশেম রসুলানকে বিবাহ করিয়াছে, মনে করিলেও নেজমা তাহাতে কোনরূপ বিরক্তি অনুভব করিল না। কারণ, সে যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে সমাজে পুরুষের একাধিক ও নারীর একাধিক বার বিবাহ অসাধারণ ব্যাপার নহে।

সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে যে সীমারেখা থাকে, তাহা সূক্ষ্ম এবং হয়ত অতি সহজে অতিক্রান্তও হয়। নেজমা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মনে সব যেন অস্পষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। যখন ঝড় উঠে তখন জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব যেমন খণ্ড খণ্ড দেখায়—অস্পষ্ট হইয়া যায়, তাহার চিন্তাতাড়িত মনে সব যেন তেমনই খণ্ড খণ্ড—অস্পষ্ট হইতে লাগিল। সে কি ভাবিতেছে, তাহাও সে যেন সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল না।

১৫

নেজমার সন্ধান পাইয়া কাশেম ও কাশেমের সন্ধান পাইয়া নেজমা চাঞ্চল্য অনুভব করিয়াছিল—কারণ, সে সন্ধান-লাভের আশা তাহারা করে নাই। কিন্তু কোনরূপ চাঞ্চল্য রসুলানকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। পরন্তু সে বিশেষ আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিতেছিল। তাহার আনন্দের কারণ—যৌবনে অসাধারণ কার্য্যের জন্য যে আগ্রহ ও অসাধারণ ব্যাপারের জন্য যে কৌতূহল মানুষের মনে উদ্ভূত হয়, সে তাহার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। নবাবের "বেগম-মহল" কল্পনার কল্পলোক—গল্পের মণিমঞ্জুষা—তাহার কথা উপকথার মতই মনে হয়—তাহার সম্বন্ধে কত অতিরঞ্জিত কথা শুনা যায়—তথায় সবই রহস্যকুহেলিকাচ্ছন্ন—সে সেই "বেগম-মহলে" গিয়াছে; কেবল যায় নাই, তাহার রহস্য-কুহেলিকা ভেদ করিয়া তাহার স্বরূপ দেখিয়াছে। তাহাতে তাহার যুবতীহৃদয়ে কি আনন্দ! আর তৃপ্তি—সে স্বামীর প্রতিশ্রুতি পালনের সব আয়োজন করিয়াছে। কাশেমেরও আশা ছিল না—সে সত্য সত্যই "বেগম-মহলে" নেজমার সন্ধান পাইবে। শেষ মুহূর্ত্তেও কাশেম তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে

আগ্রহশীল হইয়াছিল; বার বার রসুলানকে বলিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া যাইবে। রসুলান আপনার দৃঢ়তায় স্বামীর দ্বিধা দূর করিয়াছে, তাহাই তাহার নিকট অমূল্য পুরস্কার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই জন্য সে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

তাহার আনন্দ লক্ষ্য করিয়া কাশেমও বার বার ভাবিয়াছে—এই সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা তরুণীর কি কোন আশঙ্কাই নাই? যে গুহায় ব্যাঘ্র থাকে সে গুহা অপেক্ষাও মানুষ যাহাকে বিপজ্জনক মনে করে, সে স্বামীর প্রতিশ্রুতি পালনের কারণ হইবার জন্য সেই "বেগম-মহলে" গিয়াছে—এক বার নহে,—বার বার তথায় গিয়াছে। রাজহংসী যখন সগর্ব্বে—দুই পদে তরঙ্গ তাড়না করিয়া হ্রদের জলে ভাসিয়া বেড়ায় তখন জল যেমন তাহার পক্ষে পতিত হইয়া গড়াইয়া পড়ে,—তাহা সিক্ত করিতে পারে না, তেমনই কি তাহার মন স্বামীর প্রেমে সানন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছে—আশঙ্কা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না? কিন্তু কেবল কি "বেগম-মহলে" বিপদের আশঙ্কা? তথায় নানা আশঙ্কার কারণ আছে—যে কোন দিন তাহার আগমনের দ্বার রুদ্ধ হইতে পারে—এক বার রুদ্ধ হইলে তাহা চিররুদ্ধ হয়। তাহার পর? ভাবিয়া কাশেম শিহরিয়া উঠিত। আর বিপদ—কাশেম তাহার অন্তর পরীক্ষা করিয়া তাহা বুঝিত। এত দিন পরে, রসুলানেরই কাছে নেজমার সংবাদ পাইয়া সে যখন বিচলিত হইয়াছে, তখন রসুলান কি এক বারও আশঙ্কা করে নাই—নেজমার উদ্ধার সাধন করিয়া তাহাকে আনিলে নেজমাই তাহার স্বামীর ভালবাসা লাভে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতে পারে? সত্য বটে, তাহারা যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে সমাজে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর ভালবাসা—ভালবাসা যদি বিভক্ত করা যায় তবে—সপত্নীর সহিত অংশ করিয়া সম্ভোগ করা চিরাচরিত প্রথা, তবুও যুবতী যে স্বভাবতঃই স্বামীর ভালবাসা একাই পাইবার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা সে জানে—এমন কি রসুলানও যে সেই আকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিতা নহে, তাহার প্রমাণ সে নিজামুদ্দীন হইতে ফিরিবার দিন পাইয়াছিল। তখনও সে নেজমাকে ভুলিতে পারে নাই, তখনও সে মনে করিতেছিল—সে নেজমার উদ্ধার সাধন করিবে এবং উদ্ধার সাধন করিতে পারিলে সে নেজমাকে—যে নেজমার জন্য সে দীর্ঘকাল কামনা করিয়া অপেক্ষা করিয়াছে, তাহাকে পাইবে। রসুলানের জন্য সে আগ্রহ পোষণ করে নাই। সে দিন সে যখন ইরাণী-পল্লীর নিকটে আসিয়া রসুলানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে কি নেজমার উদ্ধার-সাধনে তাহাকে সাহায্য করিবে, তখন রসুলান ব্যঙ্গের সুরে বলিয়াছিল—"সপত্নীর দাসীবৃত্তি করিবার জন্য?" তাহার পর আজ যে রসুলান এই কায করিতেছে, সে কেবল স্বামীর কথায় অবিচলিত বিশ্বাসহেতু। সে তাহার কথায় কিরূপ আস্থা স্থাপন করিয়াছে!

কাশেম মনে করিল, সেই যে দিন প্রথম যে রসুলানকে তাহার আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়াছিল, সে দিন রসুলান নেজমার উদ্ধার-সাধন বিপজ্জনক হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাকে বলিয়াছিল—"যদি কোন বিপদ ঘটে তবে তুমি মনে করিতে পারিবে—তোমার কাশেম প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বিপদ বরণ করিতেও ভয় পায় না; সে জানে তাহার কথার মূল্য আছে।"

কাশেম স্থির করিয়াছিল, সে রসুলানের নিকট তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিবে। কিন্তু তখন সে মনেও করিতে পারে নাই—এক দিন তাহার সম্মুখে দারুণ প্রলোভন সমুপস্থিত হইবে। কে জানে কি হইবে, মানব হৃদয় দুর্ব্বল; সামান্য বাতাসে অশ্বত্থের পত্র যেমন কম্পিত হয়, অনেক সময় সামান্য কারণে তেমনই মানুষের মন কম্পিত হয়—তাহার সঙ্কল্প হয়ত স্থির থাকে না।

রসুলান কিন্তু পরদিনও পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে "বেগম-মহলে" যাইবার আয়োজন করিল। সে যখন বাক্সে কতকগুলি পণ্য গুছাইয়া লইতেছিল, তখন কাশেম বলিল, "আজও কি 'বেগম-মহলে' যাইতে হইবে?"

রসুলান স্বামীর দিকে তাহার সেই কমনীয় চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "তুমি বড় ঈর্ষ্যাপরবশ—বড় স্বার্থপর।"

কাশেম বলিল, "রসুলান, যে স্বামী তাহার স্ত্রীকে ভালবাসে, সে তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহে না—তাহাকে বিপদের মুখে পাঠাইতে ভয় পায়।"

"তবে—তুমি যখন আমাকে বিপদও বরণ করিতে বলিয়াছিলে, তখন আমাকে ভালবাসিতে না?"

"সত্য কথা বলিব, রসুলান—তখন তোমাকে এখন যেমন ভালবাসি তেমন ভালবাসিতাম না। তোমার যে এত গুণ—তুমি যে এত ভালবাসিতে পার—তাহা ত তখন জানিতাম না।"

"সেটা বুঝি এখন আবিষ্কার করিয়াছ।"

"হাঁ। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—ঘনিষ্ঠতায় ঘৃণার উদ্ভব হয়। আমার কিন্তু মনে হয়, সে

কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। ঘনিষ্ঠতাই মানুষকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করে; আর শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর যে ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই স্থায়ী হয়।"

"তোমার মতও ভিত্তিহীন।"

"কেন?"

"তুমি যে নেজমাকে লাভ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলে, তাহার কারণ কি? তোমার সঙ্গে তাহার কতটুকু ঘনিষ্ঠতা ছিল?"

"সে, বোধ হয়, সেই প্রবাদ হেতু—

'যা'র হাতে খাইনি, সে-ই বড় রাঁধুনী;
যা'র সঙ্গে ঘর করিনি, সে-ই বড় ঘরণী।'

কিন্তু আমি ত বলিয়াছি, যে ভালবাসা শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হয়ত স্থায়ী হয় না—আবেগের ও মোহের ভিত্তি দৃঢ় হয় না।"

রসুলান হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতদিন ত আমার হাতে খাইলে। এখনও কি রান্না ভাল লাগে?"

"একবারে অমৃত"—বলিয়া কাশেম স্ত্রীর মুখচুম্বন করিল।

কিন্তু রসুলান বুঝিতে পারিল না—কল্পনাও করিতে পারিল না, যে দিন নিজামুদ্দীন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পথে কাশেমের ওষ্ঠাধর প্রথম তাহার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়াছিল সেই দিনের কথা কাশেমের মনে পড়িতেছিল—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিত্তে আশঙ্কার উদ্ভব হইতেছিল।

রসুলান জিজ্ঞাসা করিল, "আর ঘরণী?"

কাশেম বলিল, "ঘরণী যে আবার ঘর আলো করিতেও পারেন, তাহাও বুঝিয়াছি।"

"তোমার সব কথা অত্যুক্তি—কতক হেঁয়ালী।"

"কেন?"

"তুমি যাহাই কেন বল না, আমি জানি, ঘর আলোকরা রূপ আমার নাই। সে রূপ নেজমারই ছিল—সমগ্র পল্লীতে তাহার রূপের তুলনা ছিল না। আর আমি যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, তাহার বর্ত্তমান কালের রূপের তুলনায় ইরাণী-পল্লীতে তাহার যে রূপ ছিল, তাহা—বিদ্যুতের আলোর পার্শ্বে আমাদিগের পল্লীর ঘরের ধূম্রমলিন লণ্ঠনের আলোক ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।"

কাশেমের মনে হইল, সে মনে বিদ্যুতের স্পর্শানুভব করিল। সে বলিল—"রসুলান, তোমার কথাও অত্যুক্তি—কতক হেঁয়ালী।"

"দেখিলেই বুঝিবে।"

"যেন নেজমা তোমার কাছে রহিয়াছে!"

"এখন নাই, কিন্তু দেখিবে—তাহাকে আমি আনিব, আমার স্বামীর প্রতিশ্রুতি আমিই পালন করিবার কারণ হইব।"

"তোমার ভরসা অসাধারণ।"

তাহার পর কাশেম আবার ভাবিতে লাগিল। সে যেন কেমন অজ্ঞাত অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। সে রসুলানকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি যাইবার কোন প্রয়োজন আছে?"

রসুলান বলিল, "আছে।"

"বেগম-সাহেবা কি যাইতে বলিয়াছেন?"

"না।"

"তবে?"

"আমি ত তোমাকে বলিয়াছি, বেগম-সাহেবা বলিয়াছেন—পরিদর্শিকা তাঁহাকে বলিয়াছে, নেজমা নবাব সাহেবের নিকট নীতা হইবার মত হইয়াছে, তিনি এক বার তাহাকে দেখিবেন—তাহার পর মহলে তাহার অধিকৃত অংশে নবাব সাহেবের যাইবার ব্যবস্থা হইবে।"

"সে জন্য তোমার যাইবার প্রয়োজন?"

রসুলান হাসিয়া বলিল, "তুমি কি মনে করিতেছ—বেগম-সাহেবা আমাকে জহুরীর কাষ করিতে ডাকিয়াছেন?"

কাশেম কিছু বলিল না।

রসুলান বলিল, "যদি তাহার উদ্ধার সাধনই করিতে হয়, তবে নবাব সাহেবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই তাহা করিব।"

রসুলানের দৃঢ়তায় কাশেম বিস্মিত হইল।

সে দিন রসুলান আবার অন্য দিনেরই মত "বেগম-মহলে" প্রবেশ করিল। আর কেহ তাহার ছাড়ও দেখিতে চাহিত না। তাহার কারণ, বাঁদীদিগকে সে তাহাদিগের প্রাপ্য অংশ না চাহিতেই দিত এবং সেই জন্য প্রহরিণীরাও শুনিয়াছিল, সে বেগম-সাহেবার প্রিয়পাত্রী হইয়াছে। বেগম-সাহেবার নামে সে মহলে সকলে কম্পিত হইত। যে তাঁহার প্রিয়পাত্রী হইত, সে-ও সকলের ঈর্ষ্যাভাজন হইত, তবে সে মহলের অভিজ্ঞতায় সকলেই জানিত:—

"বড়র পীরিতি বালীর বাঁধ—
ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ।"

হাতে দড়ী পড়িতেও বিলম্ব হয় না।

বেগম-সাহেবার আদেশে বাঁদীরা তাহাকে বরাবর তাঁহার নিকট লইয়া যাইত। সে যে

তোসামোদের কথা বলিত, তাহা তিনি শুনিতে ভালবাসিতেন।

সে দিন সে কুর্ণীশ করিয়া বেগম-সাহেবার কক্ষদ্বারে দাঁড়াইলে পরিদর্শিকা বেগম-সাহেবাকে বলিল, সে নেজমা বেগমের গৃহীত পণ্যের মূল্য কষিয়াছে—মূল্য দশ টাকাও হয় নাই।

বেগম-সাহেবা বলিলেন, "বাস!"

রসুলান বলিল, "বেগম-মহলে আসিলেই বেগম-সাহেবা হয় না—সকলের নজর কি সমান হয়?"

"তাহাই দেখিতেছি।"

"এ মহলে সকলেই ত সেই কথা বলে—আশরফী বক্শিস দিতে যাঁহারা অভ্যস্তা তাঁহারাই তাহা দিতে পারেন। আপনার দয়ায় আমার মত দরিদ্রও আশরফী দেখিতে পাইয়াছে।"

বেগম-সাহেবা অত্যন্ত প্রীতা হইলেন; বলিলেন, "তোমার যখন ছেলে হইবে তখন আরও দুইখানা আশরফী বক্শিস করিব—তিনটায় হার করিয়া দিবে।"

রসুলান অত্যন্ত আনন্দের ভাব দেখাইয়া বেগম সাহেবাকে বার বার কুর্ণীশ করিল।

বেগম-সাহেবা পরিদর্শিকাকে বলিলেন, "ফর্দ্দটা পাঠাইয়া দিও।"

তখন তাঁহার পূর্ব্বদিনের কথা মনে পড়িল। তিনি পরিদর্শিকাকে বলিলেন, "বড় বাঁদীকে বল—নেজমা বেগমকে ডাকিয়া আনুক; দেখি তাহার কতটা সংস্কার হইয়াছে।"

বাঁদী যখন নেজমাকে লইয়া আসিল, তখন তাহাকেও বেগম-সাহেবাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইতে হইল। তিনি "বেগম-মহলে" কঠোর শাসনের জন্য প্রসিদ্ধা ছিলেন। বেগম-সাহেবা—নেজমা মহলে নীতা হইবার পরদিনের পর আর কখন তাহাকে দেখেন নাই। আজ সে আসিলে তিনি তাহাকে ঘুরিতে ফিরিতে বলিয়া পরীক্ষা করিবার ভাবে তাহাকে লক্ষ্য করিলেন।

তাহার পর তিনি রায় দিলেন, "ভাল। আগামী কল্য নবাব সাহেব উঁহার মহলে যাইবেন। সব ব্যবস্থা করিবে।"

তিনি নেজমাকে বলিলেন, "আজ তোমার ছুটি। আজ সন্ধ্যার পরিদর্শিকা যাইয়া তোমাকে আবশ্যক উপদেশ দিবে। সে সব মনোযোগ দিয়া শুনিবে। অনেক ভাগ্যে দরিদ্রের ঘর হইতে 'বেগম মহলে' আসিয়াছ। সাবধান, সে ভাগ্য যেন হারাইও না; নবাব সাহেবের অসন্তোষ অর্জ্জন করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিও না।"

রসুলান লক্ষ্য করিল, নেজমা কাঁপিতেছে—লজ্জায় নহে—ভয়ে; কারণ, তাহার মুখ ভস্মের মত পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল।

বড় বাঁদী যখন তাহাকে যাইবার জন্য আহ্বান করিল, তখন নেজমা বেগম সাহেবাকে সম্মান দেখাইতেও ভুলিয়া গেল। বাঁদী তাহাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিলে সে তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া বাঁদীর সঙ্গে আপনার নির্দ্দিষ্ট মহলে গমনের যাত্রী

নেজমা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর রসুলান বিনীতভাবে বেগম-সাহেবাকে বলিল, সে এক দিন মাত্র মহল দেখিয়াছে—ইহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। তিনি যদি অনুমতি দেন, সে এক বার নেজমা বেগমের সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া আর এক বার মহলটি দেখিয়া দৃষ্টি সার্থক করে।

বেগম-সাহেবা তাহাকে সে অনুমতি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া দিলেন, সে যেন পরদিন আরও পণ্য লইয়া আইসে এবং যে পণ্য ক্রয় করা হইয়াছে তাহার মূল্য পরিদর্শিকার নিকট হইতে লইয়া যায়।

কুর্ণীশ করিয়া রসুলান বাহির হইয়া গেল। পরিদর্শিকার সহকারিণী দালানে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পরিদর্শিকা তাহার প্রাপ্য হিসাব করিয়া আপনার অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট সহকারিণীর নিকট রসুলানকে প্রদান করিবার জন্য দিয়া অন্য কার্য্যে গিয়াছিল। সহকারিণী রসুলানকে অর্থ দিলে সে তাহা বোরকার মধ্যে রাখিয়া—নেজমার অনুসরণ করিল।

বেগম-সাহেবার নিকট কোন বেগমের গমনের আদেশ সচরাচর হয় না। তাহা হয় তিরস্কারের জন্য—নহেত পুরস্কারের। তিরস্কার কিরূপ কঠোর হয় তাহা মহলে কাহারও অবিদিত ছিল না। তাই নেজমার তলবের সংবাদ যখন মহলে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন অনেকেই কি হয় জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

নেজমা যেমন একের পর এক বেগমের অধিকৃত মহলাংশ অতিক্রম করিতে লাগিল তেমনই অনেকের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি—দৃষ্টিতেই বাঁদীর নিকট সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বাঁদী কেবল হাসিয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিল—তিরস্কার নহে পুরস্কার।

রসুলান সঙ্গে সঙ্গে গেল। বড় বাঁদী নেজমাকে তাহার কক্ষদ্বারে রাখিয়া ফিরিয়া গেল এবং নেজমা যখন পর্দা সরাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন সে-ও প্রবেশের চেষ্টা করিল। কিন্তু নেজমার বাঁদী তাহাকে বাধা দিল। সে বলিল, নেজমা বেগমই তাহাকে ডাকিয়াছেন। সে কথা নেজমা শুনিতে পাইল এবং শুনিয়া যেমন বিস্মিতা হইল, তেমনই মনে করিল, কোন উদ্দেশ্যে রসুলান উহা বলিয়াছে। সে পর্দার পার্শ্ব হইতে বাঁদীকে বলিল, "উহাকে আসিতে দাও।"

রসুলান কক্ষে প্রবেশ করিয়া পণ্য দেখাইবার ভাণ করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "পলাইবে?"

নেজমা বলিল, "কিন্তু পিঞ্জরের দ্বার যদি বন্ধ থাকে, তবে পাখী কি করিতে পারে?"

"সে ভাবনা আমার—সে ভাবনা কাশেমের। কল্য সন্ধ্যায় প্রস্তুত থাকিও।"

কয়টি পণ্য কক্ষে রাখিয়া রসুলান, বলিল, "আমি কল্য আসিব। মন দৃঢ় কর।"

রসুলান চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে বস্ত্রমধ্য হইতে কাগজে মোড়া একটি দ্রব্য দিয়া বলিয়া গেল—"গোপনে দেখিও।"

সে যখন ফিরিয়া যায়, তখন বড় বাঁদী তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে রসুলানকে বলিল, "আমার প্রাপ্য?"

রসুলান বলিল, "আমি কি কখন অংশ দিতে অসম্মত?"

বাঁদী বলিল, "আমরা নগদ বুঝি।"

"নিশ্চয়" বলিয়া রসুলান বলিল, "আজ আমার বাড়ীতে জরুরী কায আছে। যদি এক জনকে আমার সঙ্গে দেন—তাহাকেও কিছু দিব।"

বড় বাঁদী তাহাই করিল—সে প্রাপ্যের অঙ্ক বলিয়া দিয়া এক বাঁদীকে রসুলানের সঙ্গে যাইতে বলিল।

রসুলান বাঁদীকে সঙ্গে লইয়া "বেগম-মহল" হইতে বাহির হইয়া গেল এবং গৃহে যাইয়াই বাঁদীকে বাঁদীর প্রাপ্য ও তাহার পুরস্কার দিল।

১৬

কাশেম রসুলানের জন্য প্রবেশ-দ্বারের পরপারে অপেক্ষা করিতেছিল। সেদিন কেন যে এক জন বাঁদী রসুলানের সহিত আসিল, তাহা সে অনুমানও করিতে পারে নাই। গৃহে যাইয়া বাঁদীকে অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া রসুলান বলিল, "এই বার।"

কাশেম বলিল, "কি?"

রসুলান বলিল, "এই বার কেল্লা ফতে।"

"ব্যাপার কি?"

তখন রসুলান সে দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল, পরদিন নেজমার মহলে নবাবের আগমনের পূর্ব্বেই সে নেজমার উদ্ধার-সাধন করিবে। তাহার সাফল্যে দৃঢ় বিশ্বাস কাশেমকে বিস্মিত করিল। কথায় বলে, না আঁচাইলে (আহার্য্য যে খাওয়া যাইবে সে) বিশ্বাস নাই। সেই প্রাসাদ হইতে ছদ্মবেশে রসুলান নেজমাকে লইয়া আসিবে—কেহ জানিতে পারিবে না; তাহার পর তাহারা এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইবে—কেহ বাধা দিতে পারিবে না—ইহাও কি সম্ভব হইবে? পদে পদে বিপদের যে সম্ভাবনা আছে, তাহা কি রসুলান ধারণাও করিতে পারে না?

রসুলান বলিল, "আমার কায—আমি নেজমাকে তোমার কাছে আনিয়া দিব। আমার কায সেই পর্য্যন্ত; তাহার পর—" রসুলান কটাক্ষে যেন বিদ্যুৎ চমকাইয়া হাসিয়া বলিল—"তাহার পর তুমি যদি স্পর্শমণি পাইয়া তাহা রক্ষা করিতে না পার, তবে সে তোমার ভাগ্য বা তোমার দোষ।"

কাশেম সে কথায় চমকিয়া উঠিল। যে আশঙ্কা তাহাকে অধিকার করিয়াছিল, তাহার বন্ধন যেন দৃঢ়তর মনে হইল।

তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া রসুলান বলিল, "তোমরা যে স্ত্রীলোককে ভীরু বল, সে কেবল তোমাদের দৌর্ব্বল্য গোপন করিবার জন্য।"

কাশেম সে কথার যাথার্থ্য অনুভব করিল। রসুলান এই ব্যাপারে যে সাহস দেখাইয়াছে, তাহা তাহার কল্পনাতীতই বটে। সে-ই ভীত—রসুলানের ভয় নাই; সে-ই দ্বিধাবিচলিত—রসুলান দৃঢ়সঙ্কল্প। সে বলিল, "রসুলান, তোমাদের সম্বন্ধে কাফেরদিগের ধারণাই বোধ হয় সত্য।"

সহসা কাফেরদিগের ধারণার কথায় রসুলান বিস্মিতা হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"হিন্দুরা নানারূপ দেবীমূর্ত্তি পূজা করে—দেবীর আসন বা বাহন সিংহ, দেবীর হস্তে অস্ত্র, দেবীর সংহারমূর্ত্তি।"

শুনিয়া রসুলান বিস্মিতা হইল। সে কখন কোন হিন্দু দেবীপ্রতিমা দেখে নাই। সে বলিল, "কিন্তু

তুমিই ত বলিয়াছিলে, হিন্দু নারীরা স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিত।"

কাশেম বলিল, "তোমরা সবই পার। এই দেখ—তুমিই কি করিতেছ। আমার জন্য তুমি কি বিপদের সম্মুখীন হইতেছ! আমার ভয় হইতেছে—তোমার ভয় নাই।"

স্বামীর কথায় রসুলানের মনে হইল, তাহার সব চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। সে চেষ্টা যে সফল হইবে, সে বিষয়ে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। সে স্বামীকে বলিল, "আমি নেজমাকে আনিয়া দিব। তাহার পর কি করিতে হইবে, তাহা তোমাকে স্থির করিতে হইবে।"

কাশেম এই বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে রসুলানের পরামর্শাধীন করিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি করিতে বল?"

"সে কথা আমার নহে।"

কাশেম ভাবিতে লাগিল।

রসুলান্ বলিল, "প্রাসাদের লোক জানিতে পারিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে এ রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে।"

রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলেও যে বিপদের সম্ভাবনা থাকিতে পারে, তাহা কাশেম জানিত—কারণ, বোম্বাই সহরে বাওলা নামক ধনী ব্যবসায়ীর হত্যার কথা দিল্লীতে বিশেষ ভাবেই আলোচিত হইয়াছিল। বিশেষ কয়খানি সাম্প্রদায়িকতা-প্রচারক সংবাদপত্র নর্ত্তকী মমতাজ ও বাওলা উভয়েই মুসলমান বলিয়া বাওলার হত্যা যে হিন্দু সামন্ত রাজার জন্য সঙ্ঘটিত হইয়াছিল—সন্দেহ করা হয়, তাহাকে উগ্রভাবেই গালি দিয়াছিল। কিন্তু পাশা যখন হস্তচ্যুত হইয়াছে, তখন আর ভাবিয়া ফল নাই—"দান" যাহা পড়িবে—তিনটিই হউক, আর ছ'তিন-নয়ই হউক, আর কচে বারই হউক—তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। সে পলায়নের পন্থা নির্ণয়ে মনোনিবেশ করিল।

শেষে স্থির হইল, রাজ্যসীমার বাহিরে যে রেল-ষ্টেশন আছে, তথা হইতে ভাড়াটিয়া মোটর যান আনা হইবে এবং নেজমা যদি আইসে, তবে সেই মোটরে তিন জন পলাইয়া সেই ষ্টেশনের পরবর্ত্তী ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেণে উঠিবে। কিন্তু কোথায় যাইবে? কাশেম বলিল, দিল্লীতে যাওয়া নিরাপদ হইবে না। বাঘ শিকার করিয়া যে জীবের শব, পরে আহারের জন্য রাখিয়া দেয়, তাহার গুহা হইতে কেহ তাহা লইয়া যাইলে সে যেমন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাহার সন্ধান করে, নবাব দিল্লীতে যে তেমনই ভাবে নেজমার ও তাহাদিগের সন্ধান করিবেন—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। সুতরাং দিল্লী তাহাদিগের পক্ষে নিরাপদ না হইয়া বিপদের কেন্দ্রই হইবে।

রসুলান বলিল, "তবে কোথায় যাইবে?"

কাশেম বলিল, "আপাততঃ নিরুদ্দেশ যাত্রা। যে কাযের যে ফল, তাহাই ফলিবে। আপাততঃ প্রদেশের বাহিরে কোথাও যাইতে হইবে, তাহার পর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা।"

এই বার রসুলান একটু আশঙ্কানুভব করিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া কাশেম বলিল, "তোমার সাহসই আমাকে ভীতি হইতে রক্ষা করিয়াছে—এখন কি তুমি ভয় পাইলে?"

রসুলান বলিল, "না।"—কিন্তু তাহার সেই অস্বীকৃতি প্রকাশের ভাবেই তাহার ভাবান্তর বুঝা গেল।

কাশেম বলিল, "তবে চল, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই করা যাউক। নেজমা বেগম-মহল আলো করিয়া থাকুক, আমি আমার কুটীরের আলো লইয়া নিরাপদ স্থানে ফিরিয়া যাই।"

"না, তাহা হইবে না। সাফল্যের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া কে কবে পলাইয়া যায়?"

কাশেম বলিল, পরদিন সে যখন ট্যাক্সী ভাড়া করিতে রেল-ষ্টেশনে যাইবে, তখন ষ্টেশনে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়া আসিবে—আপাততঃ তাহারা কোথায় যাইবে। রসুলানের নিকট কত টাকা ছিল, তাহাও কাশেম জানিয়া লইল।

সমস্ত রাত্রি কাশেমের নয়নে নিদ্রার স্পর্শ অনুভূত হইল না। সে ভাবিতে লাগিল, এ যেন একান্ত অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়া সে তরঙ্গচঞ্চল সমুদ্রে তরী ভাসাইতেছে। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল—কুক্ষণে সে নেজমাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল, আর তদপেক্ষাও কুক্ষণে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। এখন কি সত্য সত্যই ফিরিয়া যাইবার পথ রুদ্ধ? নেজমার উদ্ধার-সাধন যদি হয়, তবে—তাহার পর? তাহাতে তাহার যেমন কেবল দায়িত্বভার বর্দ্ধিত হইবে, তেমনই নেজমার হয়ত কেবল অনিষ্ট করাই হইবে। নবাবের অন্তঃপুরে স্থানলাভ অনেক নারী সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করে—ইরাণী-পল্লীতে অনেকেই নেজমাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়াছে। হয়ত তথায় সে নবাবের চিত্তহরণ করিতে পারিবে। কিন্তু তথা হইতে পলাইয়া আসিয়া

তাহার অনিশ্চিত অদৃষ্ট কর্ত্তৃক সে কোথায় নীতা হইবে? এ সব কথা কি রসুলান বুঝিবে না?

রসুলান গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা ছিল—সাফল্যের সম্ভাবনায় আনন্দলাভ করিয়া সে ঘুমাইয়াছিল।

রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাশেম স্ত্রীকে জাগাইল। জাগিয়াই রসুলান বলিল, "তুমি কি এখনই ষ্টেশনে যাইবে?"

কাশেম হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। সে রসুলানকে তাহার চিন্তার কথা বলিল।

রসুলান কিন্তু কোন কথাই "কাণে তুলিল" না। সে বলিল, "যদি শেষ মুহূর্ত্তে এমন করিবে, তবে দিল্লী হইতে আসিলে কেন—এত কষ্টই বা সহ্য করিলে কেন?"

কষ্ট কে সহ্য করিয়াছে, তাহা কাশেম বিশেষরূপই জানিত—সব কষ্টই রসুলান সহ্য করিয়াছে। কাযেই এখন যদি রসুলান ফিরিয়া যাইতে অসম্মত হয়, তবে তাহা অসঙ্গত মনে করা যায় না। তাহার জন্যই রসুলান বিপদ গ্রাহ্য করে নাই। অগত্যা কাশেম বলিল, "ভাল—তুমি যাহা বলিবে, তাহাই হইবে।"

রসুলান বলিল, "তুমি সকালেই যাইয়া গাড়ী ঠিক করিয়া আইস। গাড়ী যেন অপরাহ্লেই আসিয়া অপেক্ষা করে। গাড়ী আসিলে, দেখিয়া, আমি প্রাসাদে যাইব।"

"আজ কি অপরাহ্লে 'বেগম-মহলে' যাইবে?"

রসুলান হাসিয়া বলিল, "সন্ধ্যার অন্ধকার সঞ্চয় না হইলে কি 'বেগম-মহলের' আলো চুরী করিয়া আনা যায়?"

দোকান-ঘরের দ্বার মুক্ত করিয়াই কাশেম দেখিল, সম্মুখের গৃহের যে যুবকের সহিত সে এক দিন রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিল, সে অন্য দিনেরই মত দ্বারের পার্শ্বে মোড়ায় বসিয়া একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছে। কাশেম পথ পার হইয়া তাহার সম্মুখে যাইতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কাছে কি কোন কায আছে?"

কাশেম বলিল, "এখানে কি একখানা বাইসাইকল ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে?"

"তাহা ত বলিতে পারি না। তবে—বাইসাইকলের দাম যাহা হইয়াছে, তাহাতে ভাড়া লওয়া অপেক্ষা কিনাই ভাল।"

"আমার একঘণ্টার জন্য এক বার প্রয়োজন।"

যুবক হাসিয়া বলিল, "এ-ই কথা। কখন প্রয়োজন?"

"এখন।"

"যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আমার গাড়ীখানি লইলে আমি বাধিত হইব।"

"ধন্যবাদ।"

যুবক যাইয়া গাড়ী আনিয়া দিল।

সেই বাইসাইকলে কাশেম তখনই রাজ্যের সীমার বাহিরে রেল-ষ্টেশনে গেল।

রসুলান উৎকণ্ঠিতা হইয়া স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া নিম্নতলে যাইয়া অর্গলবদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দিল।

কাশেম আসিলেই সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল?"

রুমালে কপালের ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে কাশেম বলিল, "তোমার কায, না হইলে কি চলে?"

রসুলান বলিল, "কাযটা কাহার তাহা তুমি ভালরূপই জান। তবে তোমার কায আমি আমার বলিয়াই মনে করি।"

স্ত্রীকে আদর করিয়া কাশেম বলিল, "সে কথা কি আবার আমাকে বলিয়া দিতে হইবে?"

তাহার পর সমস্ত দিন উভয়ে পরামর্শ হইল। রসুলানের মনে আশা ও আগ্রহ; কাশেমের মনে আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা।

রসুলান যথারীতি গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বস্ত্রাদি গুছাইতে আরম্ভ করিল। তাহার ইচ্ছা, যেন একটুও বিলম্ব না হয়। বিলম্বে যে বিপদের সম্ভাবনা, তাহা কাশেমও বুঝিয়াছিল—রসুলানের অপেক্ষাও অধিক বুঝিয়াছিল।

আহারাদির পরই রসুলান সব কায শেষ করিয়া লইল—একটা পাত্রে সামান্য কিছু আহার্য্যও লইল; ফিরিয়া আসিবার পর আর আহার করিবার সময় হইবে না।

ক্রমে অপরাহ্ল হইল। কাশেম বার বার গবাক্ষের নিকটে যাইয়া ট্যাক্সী আসিল কি না, লক্ষ্য করিতে লাগিল। বার বার যাইয়া ফিরিয়া আসিবার পর যে বার সে দেখিতে গেল, সেই বার দেখিল, ট্যাক্সী আসিয়াছে। তাহার সহিত চালকের ব্যবস্থা ছিল, চালক একটি হরিদ্রাবর্ণের পাগড়ী পরিধান করিয়া আসিবে। চালক জানিত, সামন্ত রাজ্যে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে—সেই জন্য সে তাহার কাযের জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিকও স্থির করিয়া লইয়াছিল এবং কথা ছিল, গাড়ীতে উঠিয়াই সব টাকা দিতে হইবে।

গাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া রসুলান নিশ্চিন্ত হইল।

সে তাহার হাত-বাক্সটিতে গোটা কয়েক সামান্য পণ্য তুলিয়া লইল এবং সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে কাশেমকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিল।

কাশেমের মনে তখন আশা অপেক্ষা আশঙ্কাই প্রবল হইয়াছে। তাহার মনে হইল, সে রসুলানকে বলে—"ট্যাক্সী আসিয়াছে—চল, আমরা দুই জন চলিয়া যাই।" কিন্তু রসুলানের আগ্রহ দেখিয়া এবং রসুলান যে কখনই নিরস্ত হইবে না তাহা বুঝিয়া, সে আর কোন কথা বলিল না।

কিন্তু সে রসুলানের সঙ্গে সঙ্গে যেন কলে চালিত হইয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। সে প্রাসাদের যত নিকটে আসিতে লাগিল, তাহার মন ততই অধিক শঙ্কাকুল হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে তাহার বক্ষের স্পন্দন-শব্দ শুনিতে পাইতেছে।

পথ শেষ হইল। উভয়ে বেগম-মহলের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে আসিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। বেগম-মহলের নিয়ম সন্ধ্যার পর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বাহিরের কোন লোককে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। সেই জন্য প্রহরীরা দ্বার মুক্ত করিল না—রসুলান ছাড় দেখাইলেও বলিল, "তুমিই ত তোমার ছাড়—বেগম-মহল ত তোমার ঘর হইয়াছে—তোমার ভাগ্য ভাল, প্রতিদিনই তোমার জিনিষ বিক্রয় হয়। কিন্তু—"

রসুলান বলিল, "কিন্তু কি?"

"দিনের আলো নিবিলেই ডবল ছাড় প্রয়োজন হয়—তাহাই নিয়ম।"

"আমি বেগম-সাহেবার আদেশে তাঁহার কাযে আসিয়াছি—আমার জন্য নহে। আমার কাছে তাঁহার আদেশই নিয়ম। যদি যাইতে না দাও, আর আমার সন্ধানে তিনি লোক পাঠান, তবে তাঁহাকে বলিয়া দিব—যাইতে দেও নাই।"

সে কপট কোপ প্রকাশ করিয়া কাশেমকে বলিল, "আমরা ফিরিয়াই যাইব।"

রসুলান জানিত, বেগম-মহলে বেগম-সাহেবার নামে সকলেই ভয় পায়। তাহার কথা শুনিয়াই প্রহরীর ভাবান্তর লক্ষিত হইল। সে বলিল, "অত রাগ কর কেন?"

তাহার পর প্রহরী রুদ্ধ দ্বারের অপর দিকে প্রহরিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিব?"

প্রহরিণী একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দিল। বেগম-মহলে সকলেই জানিত, এই পণ্যবিক্রয়কারিণী খাস বেগম-সাহেবার অনুগ্রহ অর্জ্জন করিয়াছে। যে স্থানে ভাল কেহ করিতে পারুক আর না-ই পারুক, মন্দ সকলেই করিতে পারে, সে স্থানে সকলকেই ভয় করিয়া চলিতে হয়। প্রহরিণী বলিল, বিক্রয়কারিণী প্রতিদিনই আসিয়া থাকে; সে নিশ্চয়ই বেগম-সাহেবার আদেশে যাইতেছে—দ্বার মুক্ত করা হউক।

সন্ধ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে তালা বন্ধ করা হইয়াছিল। বাহিরে প্রহরী ও ভিতরে প্রহরিণী চাবী খুলিল। তাহার পর দ্বার অনর্গল হইল। তখন বেগম-মহলের মধ্যে ও বাহিরে বৈদ্যুতিক আলো জলিতেছে।

রসুলান বেগম-মহলের মধ্যে যাইলেই প্রধান প্রহরিণী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ অসময়ে কেন?"

রসুলান বলিল, "বেগম-মহলের ব্যাপারে কখন সময় আর কখন অসময় বুঝা দায়। আজ নবাব কোন নূতন বেগমের মহলে যাইবেন। প্রসাধিকাকে নূতন বেগম বলিয়াছেন, দিল্লীর সুরমায় তিনি নয়ন-পল্লব রঞ্জিত করিতে চাহেন। বেগম-সাহেবা সেই জন্য এই গরিবকে আদেশ করিয়াছেন—দিল্লীর সুরমা আনিয়া দিতে হইবে।"

"তাহাতে আর দুঃখ কি? বুঝিয়া মূল্য লইও।"

"পরিশ্রমের মত মূল্য দরিদ্ররা কি কখন পায়? এই ত আমার প্রভুকে দিল্লীতে যাইতে হইয়াছিল; তিনি আসিয়াছেন—আর আমি আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি। এত শ্রমের ও ব্যয়ের পরিবর্ত্তে কি পাইব, তাহা বেগম-সাহেবাই বলিতে পারেন।"

"দেখ, সে তাঁহার মর্জ্জি, আর তোমার ভাগ্য।"

"গরিবের ভাগ্য সর্ব্বদাই দুর্ভাগ্য—মাতা নহে —বিমাতা।"

রসুলান মহলের দিকে চলিয়া গেল।

১৭

বেগম-মহলে প্রবেশ করিয়া রসুলান যথারীতি পরি-দর্শিকার নিকটে গমন করিল। পরিদর্শিকা অসময়ে তাহাকে দেখিয়া তাহার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "বাঁদী আপনাকে বলে নাই যে, আজ নবাব সাহেব নেজমা বেগমের মহলে যাইবেন?"

শুনিয়া পরিদর্শিকা হাসিল—বলিল, "সে সংবাদও কি তুমি আমাকে দিবে? কিন্তু নবাব-সাহেব সেই মহলে আসিবেন—তাহাতে তোমার কি? তুমি কি—?"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে রসুলান বলিল, "কাল আমি যখন আসিয়াছিলাম, সেই সময় আমাকে

দিল্লীর সুরমা আনিতে আদেশ করা হইয়াছিল। কালই দিল্লীতে লোক পাঠাইয়া উহা আনাইয়া আমার প্রভু পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

"বেগম সাহেবার ফরমায়েশ ?"

"হাঁ—তবে নেজমা বেগমের জন্য।"

"নেজমা বেগমের সৌভাগ্য।"

সন্ধ্যা হইলে বেগম-মহলের প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ হয়—তখন আর বাঁদী ব্যতীত প্রায় কেহ মহলে থাকে না; সেই জন্য দিনের সতর্কতায় শৈথিল্য লক্ষিত হয়। পরিদর্শিকার নিকট দিবাভাগে সর্ব্বদাই এক জন বাঁদী থাকে—কখন কি প্রয়োজন হয়। এখন কেহ তথায় ছিল না। একবার "বাঁদী" বলিয়া ডাকিয়া কাহাকেও না পাইয়া পরিদর্শিকা রসুলানকে বলিল, "তুমি ত পথ জান—বেগম-সাহেবার মহলে যাও।"

রসুলান যাহা চাহিতেছিল, তাহাই পাইল। সে বেগম-সাহেবার মহলে যাইয়া তথা হইতে নেজমা বেগমের মহলে গেল।

মহলের সে অংশে আজ যেন উৎসবের সজ্জা। বারান্দায় চীনামাটীর টবে—প্রস্ফুটিত-কুসুম নানা ফুলগাছ, বারান্দার মধ্যস্থলে একটি ফোয়ারা—গোলাবজল পাঁচটি ধারায় উঠিয়া আধারে পড়িতেছে—সুগন্ধ ছড়াইতেছে, বারান্দার হর্ম্ম্যতল রক্তবর্ণ কোমল গালিচায় মণ্ডিত—তাহার আভা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে প্রাচীরে প্রতিফলিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র মর্ম্মরের টেবলের উপর উজ্জ্বল ধাতুপাত্রে গুগ্‌গুল পুড়িতেছে,—রসুলান তথায় উপনীত হইয়া বাঁদীকে বলিল, "বেগম-সাহেবা যে সুরমা আনিতে হুকুম করিয়াছিলেন—তাহা আনিয়াছি, নেজমা বেগমকে দিতে হইবে।"

বাঁদী বলিল, "এত দেরী ?"

"কি করিব বল, দিল্লীতে লোক পাঠাইয়া আনাইতে হইয়াছে।"

"কিন্তু প্রসাধিকা ত বেগমকে সাজাইয়া চলিয়া গিয়াছে।"

"তুমি সংবাদ দাও—সুরমা আমিও পরাইতে পারি।"

"এখন বেগম বিশ্রাম করিতেছেন"—বলিয়া বাঁদী অনিচ্ছায় পর্দ্দার বাহির হইতে ভিতরে যাইবার অনুমতি চাহিল।

নেজমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাহ ?"

"দিল্লীর সেই বেচনেওয়ালী সুরমা লইয়া আসিয়াছে।"

"আসিতে দাও।"—সে কি রসুলানের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল ?

বাস্তবিক নেজমার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল—কেন না, সে একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মহলে তাহার অধিকৃত অংশে নবাব সাহেব আসিবেন, বেগম-সাহেবার এই নির্দ্দেশদানের পর হইতে তাহাকে আর বিশ্রাম দেওয়া হয় নাই। উপদেশে ও প্রসাধনে—আয়োজনে ও সজ্জা-পরিবর্ত্তনে সে এতটুকু অবকাশ লাভ করিতে পারে নাই। নবাব স্বামী নহেন—প্রভু ও নবাব। সেকালে রঙ্গালয়ে অভিনয়কালে রাজা যেমন কখন রাজবেশ ত্যাগ করিয়া দেখা দিতেন না, নবাব তেমনই তাঁহার বেগমদিগের নিকটেও নবাব ব্যতীত কখন আর কিছু নহেন। দেবতাও তাঁহার তুলনায় সহজলভ্য; কারণ, সাধনার পর তাঁহাকে—

"যে চিনিতে পারে জিনিতে পারে
কিনিতে পারে বিনামূলে।"

সেই খসের গন্ধে সুরভিত কিংখাবের আবরণাবৃত গৃহসজ্জায় সুসজ্জিত কক্ষে—বিলাস-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রসুলান চমকিয়া উঠিল। প্রসাধিকা নেজমার প্রসাধন শেষ করিয়া গিয়াছিল—একখানি পুরু গদীওয়ালা চেয়ারে অঙ্গ এলাইয়া দিয়া নেজমা বিশ্রাম করিতেছিল—সে বিশ্রাম দেহের, মনের নহে। কারণ, তাহার মন চিন্তায় ও আতঙ্কে চঞ্চল হইয়াছিল। ঘরের আলোক নির্ব্বাপিত ছিল—কেবল পার্শ্বে বেশ-পরিবর্ত্তন কক্ষের মুক্ত দ্বারপথে একটি সবুজ বাতির মৃদু আলোক কক্ষে ক্ষীণ আলোক বিস্তার করিতেছিল। পর্দ্দা সরাইয়া রসুলান যখন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন বাঁদী বাহির হইতে বোতাম টিপিয়া দিলে ঘরের বৈদ্যুতিক বর্ত্তিকার ঝাড়ে সব বর্ত্তিকায় আলোক জ্বলিয়া উঠিল। রসুলানের মনে হইল, কে যেন শত শত উজ্জ্বল আলোকস্ফুলিঙ্গ কক্ষে প্রক্ষিপ্ত করিল। নেজমার অঙ্গের অলঙ্কারের হীরকগুলি হইতে সেই সব আলোকস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল। কি ঐশ্বর্য্য! ইহা তাহার মত লোকের কল্পনাতীত।

তাহার পর রসুলান প্রশংসমান দৃষ্টিতে কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু তাহার দৃষ্টি যখন সেই ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্রে অবস্থিতা ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণীর উপর পতিত হইল, তখন সে যেমন মনে করিল—সে ঐশ্বর্য্য সেই রূপবতীর উপযুক্ত বটে, তেমনই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল—তাহার মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুলেপ, তাহার দৃষ্টিতে আতঙ্ক—শিকারী চিতাবাঘ

যখন হরিণীকে ধরিবার মত নিকটস্থ হয়, তখন বুঝি হরিণীর চক্ষুতে এমনই আতঙ্ক-বিকাশ দেখা যায়।

গত রাত্রিতে সে গোপনে রসুলানের প্রদত্ত দ্রব্য পরীক্ষা করিয়াছে—বাঁদীর বসন। কিন্তু সে রসুলানের অর্থাৎ কাশেমের উহা প্রদানের কারণ, অনেক চিন্তা করিয়াও, বুঝিতে পারে নাই। সে ঐ বেশে বেগম-মহল হইতে পলায়ন করিবে, ইহাই কি সঙ্কেত? যদি তাহাই হয়, তবে সেই বিপদবহুল পথে সে কোথায় যাইবে? দীর্ঘকাল যে পক্ষী পিঞ্জরে বদ্ধ থাকে, সে যদি ঘটনাক্রমে এক দিন পিঞ্জর-দ্বার মুক্ত দেখিয়া বাহির হয়, তবে তাহাতেই সে মুক্তি লাভ করে না। উড়িবার অনুশীলনাভাবে তাহার গতি মন্থর হয়, আর অপরিচিত অবস্থায় তাহার অন্য পক্ষীর শিকার হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক হয়। সে কি করিবে? সত্য বটে, রসুলান সন্ধ্যায় প্রস্তুত থাকিবার কথা বলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে নেজমা নির্ভর করিতে পারে নাই—সন্ধ্যাও অতীত হইয়া গিয়াছিল। নেজমা রসুলানের দিকে চাহিল।

রসুলান জিজ্ঞাসা করিল, "প্রস্তুত?"

নেজমা বলিল, "হাঁ।"

"বাঁদীর পোষাক কোথায়?"

নেজমা উঠিল—পার্শ্বের কক্ষে যাইয়া যে স্থানে তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই স্থান হইতে সেটি বাহির করিল। রসুলান বলিল, "বেগমের বেশ ত্যাগ করিতে যদি অনিচ্ছা না হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিয়া বাঁদীর বেশে ঐ রূপ আবৃত কর।"

রসুলান নেজমাকে সেই কক্ষে রাখিয়া আপনি সম্মুখের কক্ষে আসিল—যদি বাঁদী কোন সংবাদ দেয়।

অল্পক্ষণ পরে নেজমা বাঁদীর বেশে—সেই বোরকায় অঙ্গ আবৃত করিয়া আসিয়া রসুলানের সম্মুখে দাঁড়াইল।

রসুলান বলিল, "এই বার একটা জিনিষ আনিবার ছল করিয়া বাঁদীকে সরাইয়া দিতে হইবে।"

এই সময় মহলে একটা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মহলে বাঁদী বদলের তাহাই সঙ্কেত।

নেজমা বলিল, "বাঁদী এখনই চলিয়া যাইবে।"

বলিতে বলিতে বাহির হইতে বাঁদী যাইবার অনুমতি চাহিল।

নেজমা বলিল, "যাও।"

রসুলান নেজমাকে বলিল, সে কথায় কথায় বাঁদীদিগের নিকট জানিয়া লইয়াছিল, বাঁদী বদলের সময় সকল বাঁদীকে বড় বাঁদীর ঘরে উপনীত হইতে হয়—যে দল কায করিতেছিল, তাহারা ছুটি পায়—আর এক দল তখন কাযে প্রেরিত হয়। বেগম-মহলের কায—তাড়াতাড়ি হয় না; এই সময় কিছুক্ষণ অনেক মহলাংশে বাঁদী থাকে না। সে নেজমাকে বলিল "ভগবান আমাদিগের সহায়। চল। তুমি দ্রুত যাইও, যেন বাঁদীর বড় বাঁদীর ঘরে যাইতে বিলম্ব হইয়াছে—সে সেই জন্য দ্রুত যাইতেছে।"

নেজমা এই ব্যাপারে সর্ব্বতোভাবে রসুলানের উপর নির্ভর করিয়া কায করিতেছিল; সব বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। সে জানিত, রসুলান উপলক্ষমাত্র—সে কাশেমের বুদ্ধিতেই চালিতা হইতেছে। যে কাশেম তাহাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য অসাধ্য সাধন করিয়াছে তাহার প্রতি নির্ভরশীলতা নেজমার হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিয়াছিল। সেই নির্ভরশীলতার ভাব তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল—অদৃশ্য কালীতে কিছু লিখিলে তাহা যেমন তাপ পাইলে প্রকাশ পায়, কাশেমের প্রতি তাহার আকর্ষণ তেমনই প্রকাশ পাইয়াছিল। সে কি ভালবাসার তাপে?

কক্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নেজমা রসুলানের নির্দ্দেশে কক্ষের আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

কক্ষ হইতে বাহির হইয়া নেজমা রসুলানের উপদেশানুসারে একটু দ্রুতগতিতে তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইল। মনে মুক্তির আনন্দ আশঙ্কাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিল। কিন্তু রসুলান অবিচলিত ধৈর্য্যে অগ্রসর হইল। এত দিন সে তাহার কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারে নাই—আজ সে তাহা অনুভব করিতেছিল। আজ সামান্য একটু ত্রুটি হইলে আর রক্ষা নাই। পিচ্ছিল পার্ব্বত্য পথে যাহাকে অগ্রসর হইতে হয়, এক বার পদস্খলনেই তাহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হয়। আজ ধরা পড়িলে তাহাকে যে মৃত্যু বরণ করিতে হইবে, তাহা নিষ্ঠুরতায় অতুলনীয়। আর সে অবস্থা কেবল তাহারই হইবে না—নেজমারও তাহাই হইবে। আজ সে কেবল আপনার জন্যই দায়ী নহে।

মহলের একাংশের পর অপরাংশ অতিক্রম করিয়া উভয়ে অগ্রসর হইল। তখনও কোন কোন বাঁদী নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতেছিল—কারণ, যাহারা বেগমদিগের কাযে ব্যস্ত ছিল, তাহারা কায শেষ না করিয়া যাইতে পারে না।

রসুলানের পরিচিত বেশই তাহার ছাড় ছিল। বেগম-সাহেবার মহলের এক জন বাঁদী বলিল, "কি ভগিনী, আজ কত পাইলে?"

রসুলান বলিল, "হিসাব হয় নাই।"

"কিন্তু আমাকে যেন ভুলিও না!"

"ভগিনী কি ভগিনীকে ভুলে?" বলিয়া সে বলিল, "আমার পথটা ঠাহর হইতেছে না—দেখাইয়া দিবে?"

"চল"—বলিয়া বাঁদী পথিনির্দ্দেশ করিয়া দিল। রসুলান ও নেজমা সেই পথে অগ্রসর হইল এবং হর্ম্ম্য অতিক্রম করিয়া উদ্যানের পথে আসিয়া উপনীত হইল।

যে সময় বাঁদী বদল হয়, সেই সময় উদ্যানের ও পথের আলোকের অর্দ্ধাংশ নির্ব্বাপিত হয়। আলোকের মৃদুতা রসুলানের সহায় হইল।

উভয়ে রুদ্ধ দ্বারের নিকটে আসিলে প্রহরিণীদিগের এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "কায শেষ হইল?"

"হাঁ—আধা-শেষ।"

"সে কি?"

"দেখিতেছ না, বাঁদীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি?"—সে নেজমাকে দেখাইল।

"কেন?"

রসুলান মৃদু স্বরে বলিল, "নেজমা বেগমের জন্য সুরমা দিতে গিয়াছিলাম, দেখিয়া বেগম সাহেবার সখ হইল—তাঁহারও সুরমা চাহি!"—বলিয়া একটু চাপা হাসি হাসিল।

প্রহরিণী বলিল, "বল কি? হাতীর চোখে সুরমা!"

"চুপ! চুপ! যদি কেহ শুনিতে পায় তোমারও ধড়ে মাথা থাকিবে না—আমারও নহে।"

প্রহরিণী সে কথার যাথার্থ্য অনুভব করিল; বলিল, "আবার কি আসিতে হইবে?"

"না। বাঁদীই সুরমা লইয়া আসিবে।"

প্রহরিণী দ্বারের চাবী খুলিয়া মহলের দিকের অর্গল সরাইয়া দিল—বাহিরে প্রহরীদিগকে বলিল, দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে—বেগম-সাহেবার আদেশে। সঙ্গে সঙ্গে সে বলিয়া দিল—বাঁদী ফিরিয়া আসিবে। ঐ কথা বলিবার উদ্দেশ্য—প্রহরীরা যাইবার সময় নূতন দলকে সে কথা বলিয়া যাইবে।

বাহিরের দিকেও চাবী খুলা হইল। দ্বার মুক্ত হইলে রসুলান ও নেজমা বেগম-মহল হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাশেম চিন্তাকুলচিত্তে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। বাহির হইয়াই রসুলান তাহাকে বলিল, "বেগম-সাহেবার আদেশ, আজই তাঁহার জন্য সুরমা দিতে হইবে। তাঁহার বাঁদী সঙ্গে যাইতেছে, লইয়া আসিবে। বড়লোকের খেয়াল।"

প্রহরী রঙ্গ করিয়া বলিল, "টাকায় বাঘের দুধও পাওয়া যায়।"

রসুলান বলিল, "কিন্তু যাহারা সে দুধ সংগ্রহ করিতে যায়, তাহাদিগের যে জীবনান্তও হইতে পারে।"

"লোভ।"—তাহার পর রসুলানকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিল, "আজ যে সুগন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছ!"

সুগন্ধ নেজমার কেশ ও অঙ্গ হইতে বাহির হইতেছিল। প্রহরীর কথায় রসুলান চমকিয়া উঠিল—তবে কি সে বিপদ অতিক্রম করিতে পারিল না? প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়া সে বলিল, "কেন, গরিবের কি কোন সখ হয় না?"

প্রহরী বলিল, "বিশেষ সে যদি বেগম-মহলে গতায়াত করে।"

"আমি সুরমা দিতে যাইতেছিলাম; আর নেজমা বেগমের প্রসাধন শেষ করিয়া প্রসাধিকা বাহির হইতেছিল—যে বাটিতে তেল ঢালিয়া সে বেগমের চুলে দিয়াছিল, তাহা তাহার হাতে ছিল। সে ঘর হইতে বাহির হইতেছিল আর আমি ঘরে প্রবেশ করিতেছিলাম—ধাক্কা লাগিয়া বাটির তেল ছিটকাইয়া আমার বোরকায় পড়িয়াছে।"

"তোমার ভাগ্যে বেগমগিরীর ঐটুকুই ছিল।"—বলিয়া প্রহরী অশিষ্টভাবে হাস্য করিল।

রসুলান, কাশেম ও নেজমা বেগম-মহল পশ্চাতে রাখিয়া একটু অগ্রসর হইলে রসুলান নেজমাকে বলিল, "বোরকায় রূপ ঢাকিয়াছ—গন্ধ লুকাইতে পার নাই।"

রসুলানের ব্যবহারে কাশেমের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

তাহারা কাশেমের অধিকৃত গৃহে আসিল—দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তথায় নেজমা বাঁদীর বেশ বর্জ্জন করিয়া রসুলানের একটি বোরকা পরিধান করিল।

তিন জন ট্যাক্সীর কাছে আসিয়া গাড়ীতে উঠিবার আয়োজন করিলে চালক বলিল, "ভাড়া?"

কাশেম প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল—তাহাকে টাকা দিল। চালক তাহা গণিয়া লইল।

ট্যাক্সী চলিল।

১৮

ট্যাক্সীতে আরোহণকালে কাশেমের মনে হইয়াছিল, সে সম্মুখের আসনে—চালকের পার্শ্বে বসিবে; কিন্তু তাহা হয় নাই—চালকের এক জন সঙ্গী ছিল।

অনিচ্ছায় তাহাকে মধ্যস্থ আসনে বসিতে হইয়াছিল। রসুলান প্রথমেই উঠিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া নেজমাকে ডাকিয়া পার্শ্বে বসাইয়াছিল—কাশেম অপর পার্শ্বে বসিয়াছিল। কাশেম যত দিন নেজমাকে পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তত দিন সে কিছুতেই তাহাকে লাভ করিতে পারে নাই—সে দরিদ্র কাশেমের বাসনা-সীমার বহির্ভূত না থাকিলেও তাহার পক্ষে অনধিগম্য ছিল। আর আজ যখন সে নেজমার নিকট হইতে দূরে যাইবার জন্য আগ্রহশীল, তখন সে তাহার নিকট হইতে যাইতে পারিতেছে না। কাশেম ভাবিতে লাগিল, অদৃষ্টের এ কি উপহাস!

সে কেবলই রসুলানের কথা ভাবিতে লাগিল—সে কাশেমের পত্নী না হইয়া যদি কোন উপন্যাসের নায়িকা হইত, তবে তাহাই তাহার উপযুক্ত হইত। কি সাহস! স্বামীর প্রতি কি অবিচলিত বিশ্বাস! আত্মশক্তিতে কি প্রত্যয়! কি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব! বেগম-মহল হইতে বাহির হইবার সময় সে অনায়াসে যে ভাবে সেই শঙ্কাকুল পুরীর বিপদের জাল হাসিতে হাসিতে—অথচ নিপুণভাবে ছিন্ন—বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনি বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং নেজমাকে মুক্ত করিয়া আনিয়াছে, তাহা উপন্যাসেই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। সে পিচ্ছিল পথে বিস্ময়কর ভাবে ভার-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়াছে—গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াছে, শ্রান্ত হয় নাই, ক্লান্ত হয় নাই, বিরক্ত হয় নাই। অথচ স্বামীর তুষ্টি সাধন ব্যতীত তাহার কাযের কোন উদ্দেশ্যই ছিল না! সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল—গন্তব্য স্থান কোথায়—তাহা এখনও কত দূরে? সে দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। ফিরিয়া যাইবার পথে অন্তরায় একাধিক। দিল্লীতে নবাবের লোক তাহার ও তাহাদিগের সন্ধান লইবে এবং সন্ধান পাইলে কি হইতে পারে, তাহা সে অনুমান করিতে পারে। অথচ তাহার পিতামাতা দিল্লীতে। তবে কি তাঁহাদিগের সহিত তাহার আর কখন সাক্ষাৎ হইবে না? দিল্লীতে ফিরিবার আরও প্রবল অন্তরায় আছে। মাদক দ্রব্য সেবন-ফলে যে উত্তেজনার উদ্ভব হয়, তাহার বশে মানুষ যে কায করিতে পারে, স্বাভাবিক অবস্থায়—বিচার-বিবেচনা না হারাইলে যেমন সে সব কায করিতে পারে না—তেমনই তাহার নেজমার উদ্ধার সাধনের যে আগ্রহ রসুলানের প্ররোচনায় উত্তেজনায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার বশে কায করিবার সময় সে আর একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারে নাই—নেজমাকে লইয়া সে কি করিবে? সে দরিদ্র—দরিদ্রের পক্ষে একটি ক্ষুদ্র সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করাই দুঃসাধ্য; যে দরিদ্র, সে তাহার পুত্রকন্যাদিগকে ইচ্ছানুরূপ ভাবে পালন করিতে পারে না—তাহাদিগকে যে সব জিনিষ দিতে স্বভাবতঃ তাহার ইচ্ছা হয়, সে সে সবও দিতে পারে না—যেরূপ স্থানে তাহাদিগকে রাখিতে ইচ্ছা করে, সেরূপ স্থানে রাখিতে পারে না, আপনার স্নেহের সম্বল পুত্রকন্যাও সময় সময় দরিদ্রের পক্ষে ভার বলিয়া মনে হয়। সে কিরূপে নেজমার অতিরিক্ত ভার বহন করিবে? কি ভাবে সে সেই ভার বহন করিবে? বিবাহ? সে রসুলানকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। আর বিবাহ করিলেও সে কখন নেজমার পিতামাতার ও আত্মীয়-স্বজনের অপ্রীতি ও শত্রুতা ব্যতীত আর কিছুই পাইবে না। তাহার পিতামাতা সে সুখী হইবে মনে করিয়াই তাহাকে নবাবের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও আর্থিক হিসাবে লাভবান হইয়াছিলেন। তাহার পিতামাতা যে তাহার সহিত নেজমার বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন না, তাহার কারণ—সে দরিদ্র, নেজমার রূপের মূল্য দিতে পারে না—সে তাহা লাভ করিবার উপযুক্ত নহে। দরিদ্রের সুখ ও সৌভাগ্য সম্বন্ধে ধারণায় স্বাতন্ত্র্য থাকে। সে পার্থক্য তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত হয়। যে উদয়াস্ত শ্রম করিয়াও সকল সময় গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় অর্জ্জন করিতে পারে না, সে যদি অর্থকে পরমার্থ বিবেচনা করে, তবে কি সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায়? সে কোথায় যাইবে? সে কি করিবে?

চিন্তা অনেক সময় তরকারীর ক্ষেত্রে ছাগের মত ব্যবহার করে। যদি ক্ষেত্রের দ্বার রুদ্ধ কর, সে বেড়ার মধ্য দিয়া ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়—যদি বেড়া নূতন করিয়া বাঁধ, সে বেড়া লাফাইয়া আইসে। এই সব চিন্তা তেমনই কাশেমের মনে আসিতে লাগিল—সে কিছুতেই তাহাদিগকে দূর করিতে পারিল না।

সে আজ নেজমাকে পাইয়াছে—কিন্তু—? গল্প আছে—রাজার মাহুতরা প্রভাতে যখন হস্তীগুলিকে "পালা" অর্থাৎ বৃক্ষপত্র ও শাখা আহার্য্য দিবার জন্য বাজারের মধ্য দিয়া নগরের বাহিরে লইয়া যাইতেছিল, তখন বাজারে মদ্যের দোকানের সম্মুখে মদ্যপানরত এক ব্যক্তি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "হাতী বেচিবে?" মাহুতরা তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া হাসিয়া হাতী লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। অপরাহ্ণে তাহারা যখন হাতী লইয়া

ফিরিতেছিল, তখনও সে সেই স্থানে উপবিষ্ট—কিন্তু আর মত্ত নহে। মাহুতরা তাহাকে "হাতী কিনিবে?" জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিয়াছিল, "যে হাতী কিনিতে চাহিয়াছিল, সে চলিয়া গিয়াছে"—অর্থাৎ তাহার মত্ততা দূর হইয়াছে।

কিন্তু নেজমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা কি সে নির্ম্মূল করিতে পারিয়াছিল—সে কি সে আকাঙ্ক্ষার মত্ততা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল? আজ যখন কল্পনাতীত বিপদের মধ্য হইতে সে নেজমাকে পাইয়াছে, তখন—তাহার কেশ ও দেহ হইতে নির্গত গন্ধদ্রব্যের সৌরভ তাহাকে অভিভূত করিয়া মত্ততা দিতেছিল কেন? তাহার পার্শ্বে উপবিষ্টার দেহের তাপ সে তাহার দেহে অনুভব করিতেছিল কেন?

কাশেম ভাবিল, এ কি? সে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল—সে এত দুর্ব্বল! আর সে কখন যাহা হয় নাই তাহাই হইল—রসুলানের উপর বিরক্ত হইল। রসুলানই আপনার অনাবিল প্রেমে তাহার নেজমালাভে অক্ষমতার ক্ষত প্রক্ষালিত করিয়াছে—সে ক্ষত দূর করিয়াছে। কিন্তু সে কেন আবার সেই ক্ষতের কারণ হইয়াছে? আজ রসুলানের অসাধারণ সাহস ও কৌশল ব্যতীত নেজমা কখন বেগম-মহল হইতে ছদ্মবেশে আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপবিষ্টা হইতে পারিত না। রসুলানই আজ তাহার প্রলোভনের উপাদান সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। সে কেন তাহার এই শত্রুতা করিল?

কিন্তু রসুলান কাহার অধিক শত্রুতা সাধন করিয়াছে—তাহার, না আপনার? সে স্বামীর তুষ্টি-সাধনের জন্য আপনার কি বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে! কাশেম রসুলানের উপর যত রুষ্ট হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তত শ্রদ্ধার ও প্রশংসার সম্মিলিত জলোচ্ছ্বাস সেই রোষ ধৌত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তাহার ভালবাসা অসাধারণ—কাশেমের কল্পনাতীত—কাশেমের অভিজ্ঞতা তাহার সীমার সন্ধান পায় না। যে সমাজে সে জাত ও বর্দ্ধিত, সে সমাজে এইরূপ ত্যাগের দৃষ্টান্ত কবিকল্পনার বিষয় হইলেও বাস্তবের অতীত।

কাশেম কেবলই ভাবিতে লাগিল—এখন সে কি করিবে? নবোদ্গত যৌবন হইতে সে যাহাকে অমূল্য সম্পদ বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছে—যাহাকে লাভ করা সকল বাসনার তৃপ্তি বলিয়া মনে করিয়াছে, আজ সে তাহাকে পাইয়াছে—নানা বিপদের মধ্য দিয়া তাহাকে যখন সে পাইয়াছে, তখন সে যেন আপদ বলিয়াই মনে হইতেছে। হায় মানুষের মন! যত দিন তাহাকে পাইবার আগ্রহই প্রবল ছিল, তত দিন তাহাকে পাইলে সে কি করিবে তাহা চিন্তা করিবার অবসর তাহার মনে হয় নাই! আজ যখন সে অবসর আসিয়াছে, তখন সে ভাবিতেছে—সে এ কি করিয়াছে!

"দূরে যে কেবলই আলো তা'রে দূরে রাখা ভাল,
কাছে এলে মনে হ'বে হেথা হোথা—
অন্ধকার।"

কিন্তু অন্ধকার নহে—এ যে "কাল বৈশাখীর" প্রবল ঝঞ্ঝা—ইহাতে জীবনের সব ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তখনও কাশেম কেবল ভাবিতেছিল—মানুষ দুর্ব্বল, সে সকল সময় লোভ প্রহত করিতে পারে না। কি জানি যদি তাহার মন আবার নেজমার প্রতি আকৃষ্ট হয়! রসুলানকে লইয়া সে যে সংসার রচনা করিয়াছে, তাহা সুখ-সুন্দর। কে বলিতে পারে—নেজমার আগমনে তাহার সুখ ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে না? যে দরিদ্র সে যখন বহু কষ্টে বহু যত্নে তাহার কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া মনে করে, সে তাহার প্রিয়জনদিগকে লইয়া সুখে তাহাতে বাস করিবে, তখন যদি বৈশাখের ঝড়ে তাহা নষ্ট হয়, তবে তাহার অবস্থা কিরূপ হয়? যদি তেমনই হয়! এ কথা কি সে কল্পনা করিতেও পারে নাই? সে কি এমনই মূঢ়?

তাহার পর সে নেজমার কথা ভাবিতে লাগিল। নেজমার পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন তাহাকে যে পাত্রে প্রদান করিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছিলেন, যে পাত্র সে যত অপাত্রই কেন বিবেচনা করুক না—কোন্ অধিকারে সে তাহাকে তাহার অধিকারচ্যুত করে? সে নেজমার কে? কাহারও মূল্যবান দ্রব্যে চোরের যে অধিকার, নেজমায় তাহার সেই অধিকার। চোরের শাস্তি হয়—তাহারও শাস্তি হইতে পারে—আইনের বিচারে তাহাই হয়।

কিন্তু সে যে কেবল এই অতি মূল্যবান দ্রব্য আনিয়াছে তাহাই নহে। ইহা লইয়া সে কি করিবে ইহা সে কোথায় রাখিবে? সে কথা সে ভাবে নাই? সে দরিদ্র—তাহাকে সংসার প্রতিপালনের জন্য পরিশ্রম করিয়া অর্থার্জ্জন করিতে হয়। সে যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহার পরিমাণ কত হইতে পারে তাহা সে জানিয়াছে। সে অর্থে একটি ক্ষুদ্র দরিদ্র সংসারের অনিবার্য্য ব্যয় কোনরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে—এইমাত্র। সে উপার্জ্জনে সংসারের ব্যয়ে কোনরূপ বাহুল্য থাকিতে পারে না। সেই

অর্থও সে কিরূপে অপরিচিত স্থানে উপার্জ্জন করিতে পারিবে, তাহাও সে জানে না। দিল্লীতে ফিরিবার উপায় তাহার নাই। সে যে বিদ্যার্জ্জনে আবশ্যক মনোযোগ দেয় নাই, সে জন্য সে পূর্ব্বে কখন অনুতপ্ত হয় নাই; কিন্তু আজ তাহাই হইল—তাহার মনে হইল, সে যদি আবশ্যক মনোযোগ-সহকারে বিদ্যার্জ্জন করিত, তবে সে দিল্লী ব্যতীত অন্য স্থানেও অর্থার্জ্জন করিতে পারিত। ব্যবসায়েও সে মনোযোগ দেয় নাই—তাহাও শিক্ষসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন আর শিক্ষার সময় নাই। এখন তাহাকে অর্থার্জ্জন করিতে হইবে—সংসারে তিনটি লোক—সে, রসুলান ও নেজমা। সে কিরূপে সংসার প্রতিপালন করিবে?

এইরূপ চিন্তা হইতে কাশেম কিছুতেই আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছিল না।

সে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিবার পূর্ব্বেই ট্যাক্সী রেল ষ্টেশনে আসিল। কাশেম আপনি যান হইতে অবতরণ করিয়া নেজমাকে ও রসুলানকে নামাইল।

তখনও ট্রেণ আসিতে বিলম্ব ছিল। প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশের দ্বার বন্ধ ছিল—ষ্টেশনও অন্ধকার। তাহাদিগকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইল। এতক্ষণ কেহই কথা বলে নাই—আশঙ্কার পরিবেষ্টন যেন শ্বাস রোধ করিতেছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় চুপ করিয়া থাকা রসুলানের প্রকৃতির বিরুদ্ধ—তাই সে সর্ব্বপ্রথম কথা বলিল—"ট্রেণ কখন্ আসিবে?"

কাশেম বলিল, "বোধ হয়, আর অধিক বিলম্ব নাই।"

"কখন্ ট্রেণ হইতে নামিতে হইবে?"

"শেষ রাত্রিতে।"

তাহার পর সুপ্ত ষ্টেশনে জাগরণের চিহ্ন লক্ষিত হইল; ষ্টেশন-মাষ্টারের কণ্ঠ শুনা গেল,—এক জন লোক আসিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিল, যে গবাক্ষ হইতে যাত্রীদিগকে টিকিট দেওয়া হয় তাহা মুক্ত হইল এবং তথায় একটি ল্যাম্প আলোক উদ্গীরণ করিতে লাগিল। কাশেম গবাক্ষ-পার্শ্বে যাইয়া তিন জনের টিকিট কিনিল। তাহার পর তিন জন প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল।

কাশেম পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল, সে রসুলানকে ও নেজমাকে স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র কামরায় দিবে না। কারণ, সে জানিত, যেমন বেগম-মহল হইতে বাহির হইলে সৌরভে তাহাদিগের বিপদ-সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, তেমনই একান্ত অপ্রত্যাশিত কারণে বিপদ ঘটিতে পারে। ট্রেণ আসিলে সে একটি কামরায় উঠিয়া তাহাদিগকে সেই কামরায় তুলিল। কামরায় যে স্থানাভাব ছিল, তাহা নহে; তবুও অন্য যাত্রীদিগের মধ্যে দুই এক জন বলিল, "মেয়ে গাড়ীতে, কি স্থান নাই যে, মেয়েদেরও পুরুষের গাড়ীতে তুলিতে হইবে?" কাশেম সে কথার কোন উত্তর দিল না।

ট্রেণ ছাড়িল। তাহার যাত্রা নির্দ্দিষ্ট স্থানের জন্য। কাশেমের মনে হইল, তাহার যাত্রার কোন উদ্দিষ্ট স্থান নাই। অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেণ চলিতে লাগিল। ষ্টেশনের পর ষ্টেশনে যাত্রী নামাইয়া ও যাত্রী লইয়া রাত্রিশেষে ট্রেণ একটি বৃহৎ ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইলে কাশেম ট্রেণ হইতে নামিয়া সঙ্গী দুই জনকে নামাইল। সে যখন টিকিট কিনিয়াছিল তখন রসুলান শুনিয়াছিল, সে বোম্বাইএর টিকিট চাহিয়াছিল। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি বোম্বাই?"

কাশেম বলিল, "না। আজ এই সহরে বিশ্রাম করিয়া আবার যাত্রা করিব।"

ষ্টেশনে কি জনতা, কি গোলমাল!

টিকিট দেখাইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিলেই যানচালকদিগের চীৎকার।

কাশেম একখানি ট্যাক্সী লইয়া চালককে বড় মুশাফেরখানায় যাইতে নির্দ্দেশ দিল।

ষ্টেশনের নিকটেই বড় মুশাফেরখানা। ট্যাক্সী যখন তাহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। মুশাফেরখানার কর্ম্মচারী খাটিয়ায় ঘুমাইতেছিলেন। ভৃত্যদিগের ডাকাডাকির পর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি একটু বিরক্ত ভাবেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয়টি ঘর লওয়া হইবে?"

কাশেম বলিল, "একটি।"

তিনি খাতা বাহির করিয়া কাশেমকে তাহাতে স্বাক্ষর দিতে বলিলেন এবং তাহার পর আর একখানি খাতা দেখিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "তিন তলে—ছাপ্পান্ন নম্বর কামরা। এক 'সাহেব', দুই বিবি।" ঘর যখন একটি লওয়া হইল, তখন তিনি মনে করিলেন—দুই জনই "সাহেবের" বিবি।

কাশেম কথাটিতে চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে আর এক চিন্তা আরম্ভ হইল—নেজমাকে সে কি বলিয়া পরিচয় দিবে?

চিন্তার পর চিন্তা যেন তাহাকে বিশ্রাম দিতেছিল না। এক দল শিকারী কুকুর যেমন হরিণকে ধরিবার জন্য দ্রুত ধাবমান হয়, বহু চিন্তা তেমনই তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল।

ভৃত্যের অনুসরণ করিয়া তিন জন ত্রিতলে ছাপ্পান্ন নম্বর ঘরের দ্বারে উপনীত হইল। ভৃত্য দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল, ঘরে দুইখানি খাট আছে, আর একখানি পরে আনিয়া দেওয়া হইবে। সে যাইয়া লোক পাঠাইয়া দিতেছে, যদি কোন প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলিতে হইবে। স্নানের ঘর পার্শ্বেই আছে—জল উপরে ট্যাঙ্কে পাম্প করা আছে। অতি দ্রুত এত কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বিদ্যুতের বাতি জ্বালিয়া কাশেম বলিল, "আর রাত্রিও শেষ হইয়াছে।" সে বিদ্যুতের বাতি জ্বালিলেই কোথা হইতে আলোকের সূচী যেন ঠিক্‌রাইয়া গেল। সকলেই বিস্মিত হইল। সে আলো নেজমার আঙ্গুরীর হীরক হইতে বাহির হইল।

কাশেম বলিল, "হীরা?"

নেজমা যেন লজ্জিতভাবে বলিল, "আসিবার তাড়াতাড়িতে অঙ্গুরী খুলিয়া রাখিয়া আসিতে ভুল হইয়াছে।" সে সেই প্রথম কথা বলিল।

কাশেম বলিল, "খুলিয়া রাখ—যদি কেহ দেখিতে পায়, সন্দেহ করিবে।"

রসুলান কাশেমকে বলিল, "তুমি হাত মুখ ধুইবে না?"

কাশেম বলিল, "অগ্রে তোমরা সারিয়া লও।"

ততক্ষণে রসুলান বোরকা খুলিয়াছে।

তাহার কথায় নেজমাও বোরকা খুলিল।

কত দিন—যেন কত যুগ পরে কাশেম নেজমাকে দেখিল। তাহার মনে হইল, রসুলান সত্যই বলিয়াছে এ রূপ দরিদ্রের ঘরে শোভা পায় না—যে মণি বহুমূল্য তাহা স্বর্ণেই বসাইতে হয়—নহিলে তাহার মর্য্যাদা থাকে না।

কাশেমের কথা শুনিয়াই নেজমা তাহার অঙ্গুলী হইতে বহুমূল্য হীরক-সজ্জিত অঙ্গুরী খুলিয়া ফেলিয়াছিল। স্নানের ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে সেটি রসুলানকে দিতে গেল। রসুলান হাসিয়া বলিল, "ও বেগমের অলঙ্কার—দরিদ্রের নহে। আমি ও অঙ্গুরী লইব না।"

নেজমা বিষণ্ণভাবে রসুলানের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি—তুমিও কি আমাকে ঐ কথা বলিবে? আমি কি তোমার ভগিনী নহি?"

কথা বলিতে বলিতে নেজমার গলাটা "ধরিয়া আসিল"—তাহার চক্ষুতে জল আসিল। রসুলানের মনে হইল, সেই অশ্রুসজল চক্ষুর দীপ্তি সেই হীরকের দীপ্তি অপেক্ষা মধুর। সে সাগ্রহে নেজমার নিকট হইতে অঙ্গুরীটি লইল এবং তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "হাঁ, নেজমা, তুমি আমার ভগিনী।"

রসুলান মনে করিল, সে যে বিপদের সম্ভাবনা অবজ্ঞা করিয়া বেগম মহল হইতে তাহার উদ্ধার সাধন করিয়াছে, তাহাই মনে করিয়া নেজমা তাহাকে ভগিনীর স্থান দিয়াছে। সে ভাবিল, নেজমা যদি তাহার ঐরূপ কার্য্যের কারণ জানিত, তবে সে কখনই তাহাকে সে জন্য এত কৃতজ্ঞতা জানাইত না; সে কাশেমের জন্যই বিপদ বরণ করিয়াছিল এবং এক বার সে কাযে প্রবৃত্ত হইবার পর যেন তাহার "জিদ" বাড়িয়া গিয়াছিল—মাদক দ্রব্য যেমন উহা সেবনকারীকে মত্ত করে, বিস্ময়কর কার্য্যে আগ্রহ তাহাকে তেমনই মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু রসুলান নেজমার মনের ভাব বুঝিতে পারে নাই। মানুষ স্বাভাবিক আগ্রহে সৈনিককে প্রশংসা করে—মনে করে, বীর সৈনিক মানুষের প্রশংসনীয় সকল গুণের ও বৈশিষ্ট্যের প্রতীক,—সৈনিকের উচ্চ স্তরে উপনীত হইবার উপকরণ—অন্যের উপর তাহার প্রভাব। সেই প্রভাব মানুষ প্রহত করিতে পারে না। নেজমারও কাশেমের সম্বন্ধে তাহাই হইয়াছিল। যেমন উগ্র অগ্নিতাপে অল্পক্ষণ মধ্যে নানা ধাতু গলিয়া মিশিয়া যে অষ্টধাতুতে পরিণত হয়, তাহাই দেবমূর্ত্তির উপকরণ, তেমনই তাহার বিস্ময়ের অগ্নিতে প্রশংসা প্রভৃতি মনোভাব এক হইয়া যাহাতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা প্রেম। আপনার প্রেমের মধ্য দিয়া সে তখন সব দেখিতেছিল—তাহার জগতের কেন্দ্রে কাশেম অবস্থিত। রসুলান যে কেবল তাহাকে সেই কাশেমের নিকট আনিয়া দিয়াছে, তাহাই নহে—সে কাশেমের প্রেমও পাইয়াছে। সেই জন্য রসুলান তাহার ভাগিনী।

রসুলান স্নানের ঘরের তাকের উপর অঙ্গুরী রক্ষা করিল। তাহার পর সে নেজমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"হইল ত?"

নেজমা প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "রসুলান তোমার চক্ষু কি সুন্দর!"

রসুলান বলিল, "বাল্যকালাবধি ঐ কথা শুনিয়া শুনিয়া সময় সময় আমার মনে হইয়াছে—চক্ষু কি উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে হয় না? কিন্তু তাহার পর বুঝিয়াছি, যাহার প্রশংসার এক ব্যতীত দ্বিতীয় উপকরণ নাই, তাহার ঐ এক উপকরণই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তোমার মত রূপসীর কোন্‌টি অধিক প্রশংসনীয়, তাহা স্থির করা যায় না।"

"কিন্তু রূপ যে অনেক সময় বিপদের কারণ হয়, তাহা ত আমিও জানিয়াছি, তুমিও জানিয়াছ।"

"রূপ ত সম্পদও বটে। নারীর উহা অপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ আর কি আছে?"

"গুণ।"

"সে রূপের পরে লোককে আকৃষ্ট করে, সেই জন্যই ত কথায় বলে—

'পহিলে দর্শনধারী
পিছে গুণ-বিচারী।'

রূপ অঘটন ঘটায়।"

"রূপের জন্য মানুষের জীবনে যে ঝড় বহিতে পারে, তাহা সর্ব্বনাশের সঙ্গী।"

উভয়ে এইরূপ কথা হইতে লাগিল।

নেজমা দীর্ঘকাল এমন স্বচ্ছন্দে কাহারও সহিত কথা বলিতে পারে নাই। বেগম-মহলে কথা বলিবার পাত্র কেবল বাঁদীরা; তাহারাও কলের মত কাষ করিত, কথা বলিবার প্রয়োজন বড় হইত না। তাই সে যেন আপনার কণ্ঠস্বর আপনি ভুলিয়া গিয়াছিল। তথায় যে কথার আদেশ ব্যক্ত হয়, তাহাই উচ্চে উচ্চারিত হয়, কিন্তু তাহা কর্কশ; আর সবই যেন সভয়ে আত্মগোপন করিতে চাহে। মানুষ তথায় কৃত্রিমতার মধ্যেই বাস করে। স্বাধীনতা তথায় সর্ব্বপ্রকারে সঙ্কুচিত। তাই মুক্তির আনন্দে আজ নেজমা আনন্দিতা। যে স্বাধীনতা কখন হারায় নাই, সে কখন তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। তাই গল্প আছে, য়ুরোপের কোন যুদ্ধে এক জন সৈনিক শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া দীর্ঘকাল বন্দী থাকিয়া যখন মুক্তি পায়, তখন সে স্বদেশে ফিরিবার পথে এক ব্যক্তিকে একটি পিঞ্জরে কতকগুলি পাখী লইয়া যাইতে দেখিয়া সেগুলি কিনিয়া মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। যাহা হারাই নাই, তাহার মূল্য আমরা বুঝিতে পারি না। তাই নেজমার আজ আনন্দ, আর সেই জন্যই রসুলান সে আনন্দের স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই।

নেজমার আনন্দের দ্বিতীয় কারণ, তাহার মুক্তিলাভের পরে উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা তাহার সমগ্র হৃদয় ব্যাপ্ত করিয়াই বিকশিত হইয়াছিল এবং তাহার সৌরভের মত্ততা তাহার সমগ্র সত্তা যেন আবিষ্ট করিয়াছিল। আজ কাহারও উপর তাহার বিদ্বেষ, কাহারও সহিত তাহার বিরোধ ছিল না। আজ তাহার পক্ষে সংসার আলোকময়, জীবন আনন্দ-মধুর। যেন বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিপদসঙ্কুল সাগর হইতে সে কূলে যে নিরাপদ স্থানে উপনীত হইয়াছে, তাহাই নন্দনকানন—তাহা বিকচকুসুমে শোভিত, বিহগবিরাবে মুখরিত, তথায় সুখ আছে দুঃখ নাই। প্রেমের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে যে সেই অসাধ্য সাধন করিয়াছে, সে আজ তাহার নিকটে—তাহাদিগের এই মিলনে কি কখন বিরক্তি আসিতে পারে?

স্নানশেষে বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া যখন উভয়ে স্নানকক্ষ ত্যাগ করিবে, তখন রসুলান বলিল, "অঙ্গুরী যেন ভুলিয়া না যাই।" সে তাহা লইল।

উভয়ে যখন স্নান-কক্ষ হইতে আসিল, তখন তাহারা দেখিল, শয্যায় শয়ন করিয়া কাশেম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা, চিন্তা—এই তিনটির যে কোন একটি মানুষকে অবসন্ন করে; সে তিনের সম্মিলিত আক্রমণ ভোগ করিয়াছে। তাই রসুলান ও নেজমা যাইবার পর সে ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শয্যায় শয়ন করিলেই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল।

রসুলান তাহাকে ডাকিবার উপক্রম করিতে না করিতে নেজমা মৃদুস্বরে বলিল, "ঘুম ভাঙ্গাইবে?"

রসুলান মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বলিল, "না। প্রবল শ্রান্তির ফলেই নিদ্রা আসিয়াছে। একটু বিলম্ব করি।"

উভয়ে কি করিবে স্থির করিতে না করিতে কিন্তু কাশেমের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহারা যে মৃদুস্বরে কথা বলিয়াছিল, তাহাতেই সেই লঘু নিদ্রার অবসান হইল।

কাশেম চাহিয়া দেখিল। রসুলান তাহার একটি মাত্র বাক্সে সামান্য কয়টি বেশ আনিতে পারিয়াছিল। তাহারা ধনী নহে, কিন্তু তবুও দিল্লী ত্যাগ করিয়া যাইবার পর কাশেম তাহাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বেশ দিয়াছিল—সে সবও সে আনিতে পারে নাই। আজ সে স্বয়ং একটি ফিরোজা বর্ণের বেশ পরিধান করিয়া নেজমাকে যে বেশটি দিয়াছিল, তাহার বর্ণ গাঢ় সবুজ। সেই বেশে তাহাকে সদ্য আহরিত ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা ফুলের মত দেখাইতেছিল। কি সুন্দর!

কাশেম উঠিয়া বসিল।

রসুলান তাহাকে অঙ্গুরী দেখাইয়া বলিল, "এটি কোথায় রাখিবে—রাখ।"

কাশেম বলিল, "বাক্সে রাখ।"

সে তখন রসুলানের দুঃসাহসের বিষয় চিন্তা করিতেছিল। তাহার কি মনে ভয় নাই যে, সে এই সুন্দরীকে স্বামীর কাছে আনিয়াছে? সে বেগম-মহলের

সকল বিপদ-সম্ভাবনা তুচ্ছ করিয়া যে সাহসের পরিচয় দিয়াছে, ইহা কি সেই দুঃসাহসেরই পরিচায়ক নহে? কিন্তু যদি স্বামীর প্রেম দৃঢ়তর করিবার জন্যই সে তখন সেই সাহসের পরিচয় দিয়া থাকে, তবে আজ তাহার কার্য্যে সে কি সেই ভালবাসাই বিপন্ন করিতে পারে না?

রসুলান বলিল, "যাও, স্নান করিয়া আইস। আজ সকলেরই নিদ্রার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। শয্যার যে অভাব, তাহা অনুভূতও হইবে না।"

কাশেম হাসিয়া বলিল, "কতক্ষণ ঘুমাইবে?"

"কেন?"

"সন্ধ্যার সময় যে ট্রেণ।"

"সে তুমি যাহাই কেন বল না—আজ বিশ্রাম না করিয়া যাওয়া হইবে না।"

সকলেরই বিশ্রামের প্রয়োজন কত অধিক তাহা কাশেম বুঝিল, কিন্তু উপায় কি? সে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "বিশ্রাম প্রাচুর্য্যের সঙ্গে থাকে—দারিদ্র্যের নহে। দরিদ্রের ভাগ্যে বিশ্রাম কোথায়?"

আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা ও তাহাতেই তৃপ্তি অনুভব করা স্বামীর সঙ্গসুখে অভ্যস্তা রসুলানের যেন প্রকৃতিগত হইয়াছিল। সে বলিল, "কিসের অভাব? অভাব ভাবিলেই অভাব। আহার্য্যের, বস্ত্রের প্রাচুর্য্য ও বিলাস কে চাহে? আমরা আমাদিগের মনে অভাবকে স্থান না দিয়াই তাহাকে পরাভূত করিয়াছি।"

"কিন্তু সে সেই পরাভবের প্রতিশোধ লইতে পারে, রসুলান।"

"পারে না। তোমরা—পুরুষরা বড় ভীরু—কবে কি হইতে পারে ভাবিয়াই ভয় পাও।"

"তুমি সে-কথা বলিবার অধিকারী বটে। কারণ, তুমি যে সাহস দেখাইয়াছ ও দেখাইতেছিলে, তাহা কল্পনাতীত।"

"যাহা কল্পনাতীত, তাহা কি কখন সম্ভব হয়?"

"তাহাকেই অসাধ্য-সাধন বলে।"

রসুলান নেজমার স্কন্ধে হস্ত দিয়া বলিল, "কেন, সাহসের কি পুরস্কার নাই?"

কাশেমের মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল, "বলিতে পারি না"—কিন্তু সে তাহা না বলিয়া, "আমি স্নান করিতে চলিলাম"—বলিয়া চলিয়া গেল।

সত্য সত্যই তাহার ভাবনার—দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না।

কাশেম চলিয়া যাইলে নেজমা রসুলানকে বলিল, "সত্যই, রসুলান, তোমার সাহস অসাধারণ।"

"সাহস! সাহস কি আমার? শুনিয়াছি, চন্দ্রের আলো তাহার নহে—সূর্য্যের প্রতিফলিত আলো। আমাদিগেরও তাহাই, নেজমা। স্বামীর সাহসে স্ত্রীর সাহস—নহিলে বেগম-মহলের সংবাদ কে জানিত?"

নিজামুদ্দীনে মেলা হইতে ফিরিবার পথে কাশেম যে তাহাকে নেজমার উদ্ধার সাধনে সহায় হইতে প্রতিশ্রুত করিয়াছিল, সেই কথা হইতে তাহাদিগের উদ্ধারের উপায় চিন্তা, দিল্লী ত্যাগ করিয়া নবাবের রাজধানীতে আগমনের সময় কাশেমের বাঁদীর পোষাক প্রস্তুত করান—তাহাকে বেগম-মহলে পাঠাইবার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা, সে সব রসুলান বিবৃত করিতে লাগিল। প্রত্যেক কাযই যে কাশেমের বুদ্ধিজাত, তাহা তাহার কথায় নেজমাও বুঝিতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে কাশেমের সম্বন্ধে তাহার প্রশংসা তাহার অনুরাগ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল।

রসুলান যখন সেই কথা বলিতেছিল, আর নেজমা শুনিতেছিল, তখন মুশাফেরখানার এক জন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া যখন দেখিল, ঘরে দুই জন স্ত্রীলোক, তখন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইয়া বারান্দা হইতে বলিল, তাঁহাদিগের কি কি জিনিষের প্রয়োজন বলিলে তাহার ব্যবস্থা হইবে।

নেজমা অভ্যাসহেতু আপনার বোরকা সন্ধান করিতে উঠিল। রসুলান বলিল, "সাহেব গোসলখানায় গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিয়া কি প্রয়োজন, তাহা বলিয়া আসিবেন।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

কাশেম স্নানঘর হইতে আসিলে রসুলান তাহাকে মুশাফেরখানার ভৃত্যের কথা বলিল। শুনিয়া কাশেম বলিল, "এক বেলা আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

রসুলান বলিল, "আর এক বেলা?"

"তুমি কি সত্য সত্যই আজ যাইবে না?"

"না।"

কাশেম বলিল, "এই একটি ঘর।"

"দুইটির প্রয়োজন? মুশাফেরখানার লোক ত আর একখানি খাট আনিবে বলিয়া গিয়াছে। তাহারও প্রয়োজন নাই। আমরা দুই ভগিনী এক খাটেই ঘুমাইতে পারিব। কি বল, নেজমা?"

নেজমা কিছু বলিল না। সে স্বভাবতঃ মৃদুস্বভাব—সে ভাব সে তাহার মাতার নিকট হইতে লাভ

করিয়াছিল। রস্থলান সে প্রকৃতির নহে। বিশেষ অবিভাবকদিগের নিকট হইতে দূরে স্বামীর গৃহে গৃহিণী হইয়া থাকিয়া তাহার চিত্তের দৃঢ়তা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহার মতই নেজমার মত প্রভাবিত ও তাহাকে চালিত করিতেছিল।

কাশেম ভাবিতেছিল। তাহার ভাবনা বর্ত্তমানেরও বটে ভবিষ্যতেরও বটে—তবে ভবিষ্যতের ভাবনাই অধিক। এত দিন যে চিন্তা মনের মধ্যে শরতের আকাশে লঘু মেঘের মত দেখা দিয়াছে, আজ তাহা নিদাঘ-দিগন্তে ঘন মেঘের মতই হইতেছিল। তাহার বক্ষে বুঝি বিদ্যুৎও ছিল। সে ভাবিতেছিল, নেজমা আসিয়াছে—সে নিতান্ত বিচার-বিবেচনাহীন হইয়া যে কথা বলিয়াছিল, তাহাতে অকারণ গুরুত্ব আরোপ করিয়া—নানা বিপদের মধ্য দিয়া সে—রস্থলানের সাহায্যে—তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছে। তাহাতে তাহার ইষ্ট সাধিত হয় নাই—বরং অনিষ্টের সম্ভাবনা হইয়াছে। আর তাহাতে নেজমারও যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না এবং তাহার অনিষ্টই যে হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? ইহার পর নেজমার কি হইবে—সে তাহার দায়িত্ব কতদূর বহন করিতে পারিবে? সে নিঃসম্বল—কেবল নিঃসম্বল নহে—ভারগ্রস্ত। সে রস্থলানকে বিবাহ করিয়াছে, সে তাহার সব ভার বহন করিতে বাধ্য। আর নেজমার ভার? অকারণে সে সেই ভার গ্রহণ করিয়াছে। সে যত ভাবিতেছিল, ততই সেই ভারের গুরুত্ব সে অনুভব ও উপলব্ধি করিতেছিল। সে কিরূপে তাহার ভার বহন করিবে? কি বলিয়া সে নেজমার পরিচয় দিবে? লোক কি মনে করিবে? লোকের কথা ধনীরা উপেক্ষা করিতে পারে—তাহারা সমাজকে অবজ্ঞা করিতে পারে; কিন্তু দরিদ্র তাহা পারে না। কারণ, দরিদ্রকে সমাজের বিধি-নিষেধ-শাসন মানিয়া চলিতে হয়। সমাজ তাহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিবে, কে বলিবে? রস্থলান এখন তাহার কার্য্যের সাফল্যে মত্ত হইয়া আছে। তাহাকে এখন এ সব কথা বুঝান যাইবে না—শুনিলেও সে বুঝিবে না। শুনাইবার অবকাশও নাই—সে এক বারও নেজমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে না। কিন্তু তাহাকে এ সব শুনাইতে ও বুঝাইতে হইবে। রস্থলানকেও এসব শুনিতে ও বুঝিতে হইবে। সে জন্য অবসরের প্রয়োজন।

কাশেম রস্থলানকে বলিল, "ভাল; তোমারই জয় হইল। আমরা আগামী কল্য বোম্বাই যাত্রা করিব।" সে দুই বেলা আহারের ব্যবস্থা করিতে গেল। সে-ও শ্রান্ত হইয়াছিল; কিন্তু চিন্তার উত্তেজনা তাহাকে শ্রান্তি জয় করাইতেছিল।

যে ঘোড়া বহুক্ষণ শ্রম করে সে যখন মুক্তি পায়, তখন যেমন ভাবে তাহার বিশ্রাম উপভোগ করে, তিন জন আহারের পর তেমনই তাহাদিগের বিশ্রাম উপভোগ করিল। যখন সর্ব্বাগ্রে নেজমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অপরাহ্ণ। সে রস্থলানকে জাগাইল। তাহার পর কাশেম উঠিল।

রস্থলান কাশেমকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সহরে কি দেখিবার কিছুই নাই?"

কাশেম বলিল, "তাহা ত শুনি নাই।"

বাহির হইতে কাশেমের ইচ্ছা ছিল না। তাহার আশঙ্কাও যে ছিল না, তাহা নহে—নবাবের লোক নিশ্চয়ই সন্ধানে বাহির হইয়াছে, হয়ত সন্ধান পাইবে।

সে বোম্বাই নগরে উপনীত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। তথায় যাইয়া—সামান্য সঞ্চয় নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বে তাহাকে অর্থার্জ্জনের উপায় করিতে হইবে। সে উপায়ের সন্ধানলাভ যে সহজ নহে, তাহা সে জানিত। কিন্তু সে কথা বলিয়া সে রস্থলানকেও আতঙ্কিত করিতে চাহিল না। যে ভালবাসে সে সব চিন্তা আপনি লইয়া ভালবাসার পাত্রকে ভবনামুক্ত করিতেই চাহে। তাহাতেই সে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে।

২০

বোম্বাই। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ট্রেণ আসিয়া বোম্বাই ষ্টেশনে উপনীত হইল। এ দেশের ট্রেণে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাই যাত্রীর ভাড়ার অধিকাংশ দেয় এবং তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবজ্ঞাত। যাহাকে "খেয়ার কড়ি দিয়া সাঁতরাইয়া পার হওয়া" বলে, তাহাদিগের অবস্থা প্রায় সেইরূপ। তৃতীয় শ্রেণীতে যাত্রা কখন স্বচ্ছন্দে হয় না। কিন্তু সেই জন্য যে কাশেম শীঘ্র শীঘ্র বোম্বাইয়ে উপনীত হইতে চাহিয়াছিল, তাহা নহে। সে যত চিন্তা করিতেছিল, তাহার চিন্তা তত দুশ্চিন্তায় পরিণত হইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। বোম্বাই সহরের যে তাহার পক্ষে কোন বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তাহা নহে; সে কেবল নবাবের রাজধানী হইতে দূরে একটি বড় সহরে যাইতে চাহিতেছিল; তথায় নবাব চেষ্টা করিলেও তাহাদিগের সন্ধান পাইবে না—সে জনারণ্যে মিশিয়া যাইবে; আর শিল্পব্যবসাপ্রধান

সহয়ে সে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে জীবিকার্জ্জনের উপায় করিতে পারিবে—এখন তাহাকে তিন জনের জীবিকার সংস্থান করিতে হইবে। তাহার যে সামান্য অর্থ আছে, তাহা অল্প দিনেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। সে যত এই কথা ভাবিতেছিল, ততই যেন অস্থির হইয়া উঠিতেছিল।

ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া কাশেম রসুলান ও নেজমাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইল; সঙ্গে যে জিনিষ ছিল, তাহা বহনজন্য ভারবাহকেরও প্রয়োজন হইল না। পাত্র হইতে যখন কোন দ্রব্য ঢালিয়া দেওয়া হয়, তখন যেমন মনে হয়,—এত জিনিষ ছিল!—তেমনই ষ্টেশনে মনে হইল, এত লোক ট্রেণে ছিল!

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া সে মুশাফেরখানার সন্ধান লইল; নিকটে কোন ভাল মুশাফেরখানা নাই শুনিয়া সে একটা ভাল মুশাফেরখানায় যাইবার জন্য গাড়ী ভাড়া করিল। বোম্বাই সহর সম্বন্ধে সে অনেক কথা শুনিয়াছে—উহা ভারতের প্রবেশ-দ্বার। কিন্তু প্রথমেই সহরের যে বৈশিষ্ট্য সে লক্ষ্য করিল, তাহা বড় বড় বাড়ীর দৃঢ়তাহীন চাকচিক্য। দিল্লীর সব পুরাতন ও উল্লেখযোগ্য গৃহ দৃঢ়তার পরিচায়ক। বোম্বাই সহরের গৃহগুলিতে সেই দৃঢ়তার অভাব। দিল্লীতে যে সব সম্রাট ও বিজেতা গৃহ বা মসজেদ—এমন কি সরাই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সে সব স্থায়ী হইবে মনে করিয়াই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা মনে করিতে পারেন নাই, এক রাজবংশের পর আর এক রাজবংশ আসিবে—আবার নূতন রাজধানী রচিত হইবে। মানুষ যে কালজয়ী কীর্ত্তি স্থাপনের দুরাশা-চালিত হয়, দিল্লীর দুর্গে, প্রাসাদে, সমাধিসৌধে ও মসজেদে তাহাই সপ্রকাশ। ভোগের মত্ততায় মানুষ সহজে তাহা মনে করিতে পারে না। সেই জন্যই তাহাকে স্মরণ করিতে বলা হইয়াছে:—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী ও রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা রহিয়াছে—কিন্তু তাঁহারা এখন কোথায়? ইহা চিন্তা করিয়া মন স্থির কর; জগৎ স্থায়ী নহে, ইহা অবধারণ কর।

বোম্বাই সহর যেন পান্থনিবাস। ইহা ব্যবসার কেন্দ্র, অর্থ-সংগ্রহের স্থান।

কেবল মুশাফেরখানায় স্থান সংগ্রহ করিয়া সে যখন এক বার সব সন্ধান লইবার জন্য বাহির হইয়াছিল, তখন সে বোম্বাইয়ের যে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতির দান—মানুষের কীর্ত্তি নহে। সে—সমুদ্র—কামরূপ—গাম্ভীর্য্যে, বিস্তারে ও চাঞ্চল্যে বিস্ময়কর। মোগল বাদশাহরা জল ভালবাসিতেন, তাই তাঁহাদিগের প্রাসাদে কক্ষেও জলের প্রবাহ-ব্যবস্থা ছিল। দিল্লীর প্রাসাদে স্নানাগারে রৌপ্যখচিত প্রস্তরনালায় যখন জল বহিয়া যাইত, তখন মনে হইত, জলে মাছ খেলা করিতেছে; রঙ্গমহলে নানা বর্ণের প্রস্তরখচিত প্রস্তর-পাত্রে যখন জল পড়িত, তখন মনে হইত, জলের তলে নানা বর্ণের কুসুম গুস্ত। কিন্তু তখন যমুনায় যে জল ছিল, এখন আর তাহাও নাই—শীর্ণ স্রোতঃ বেলাবালু বিস্তারের মধ্যে বহিয়া যাইতেছে। আর সমুদ্র! কি সুন্দর! উজ্জ্বলে মধুরে—গম্ভীরে চঞ্চলে কি মিলন!

কাশেম পূর্ব্বে কখন সমুদ্র দেখে নাই। সে মুগ্ধনেত্রে কিছুক্ষণ সেই তরঙ্গ-চঞ্চল জল-বিস্তারের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু যে দরিদ্র তাহার সময় বহুমূল্য—সে তাহার ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়। তাই সে যে দিকে ব্যবসার কেন্দ্র সেই দিকে ফিরিল। কিন্তু কিরূপে কাযের সন্ধান করিবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

সে দুশ্চিন্তাভারাক্রান্তহৃদয়ে গৃহে ফিরিল। কিন্তু তবুও—রসুলানকে ভালবাসিত বলিয়া—তাহাকে সমুদ্রের সৌন্দর্য্যের কথা বলিল। ভালবাসা আনন্দের কিছু পাইলে প্রেমাস্পদকে তাহা অংশ করিয়া না দিয়া থাকিতে পারে না। শুনিয়া রসুলান জিদ করিল, তাহাদিগকে সমুদ্র দেখাইতে হইবে।

পরদিন রবিবার, সে দিন রসুলানকে ও নেজমাকে অপরাহ্ণে সমুদ্র ও সমুদ্রে সূর্য্যাস্তশোভা দেখাইয়া সে গৃহে আসিল—ভাবিতে ভাবিতে আসিল, সে কি করিবে? মুশাফেরখানার নিয়মানুসারে তাহাকে আর দুই দিন পরেই অন্য স্থানে যাইতে হইবে। কিন্তু সে কোথায় যাইবে ও কি করিবে?

তৃতীয় দিন সে কয়টি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে চাকরীর সন্ধান পাইবার চেষ্টা করিল। কোথাও প্রবেশ করিলেই দেখা যায়, বিজ্ঞাপন আছে—"কর্ম্মখালি নাই," কোথাও বা জিজ্ঞাসা করিলে উহাই জানিতে পারা যায়। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই হতাশ হইতে হইল। হতাশা যখন নিরাশায় পরিণতি লাভ করিয়া তাহাকে পীড়িত করিবে, সেই সময় পথে সে শুনিতে পাইল, কে যেন তাহাকে

ডাকিতেছেন। সে মনে করিল, সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। ডিক হুইটিংটনের গল্প সে বাল্যকালে ইংরেজী পুস্তকে পড়িয়াছিল। সেই দরিদ্র বালক শুনিয়াছিল, লণ্ডন সহর সোণায় মণ্ডিত, তাই সে তথায় অর্থার্জ্জন করিতে যাইয়া এক বণিকের দয়ায় তাঁহার রন্ধনশালায় ভৃত্যের কায পায়। পাচকের দুর্ব্যবহারে সে সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া যায় এবং পথে যেন শুনিতে পায়—"ফিরিয়া যাও, তুমি উচ্চপদ পাইবে।" তাহার ভাগ্যে তাহাই হইয়াছি।। সেই গল্প স্মরণ করিয়া আপনার ভ্রমে কাশেম যখন হাসিল, তখন সে আবার সেই আহ্বান শুনিল। সে এ দিক ও দিক চাহিয়া দেখিতে পাইল, দিল্লীর এক ব্যবসায়ী মোটরযান হইতে মুখ বাড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছেন। দিল্লীতে সে সময় সময় তাঁহার কায করিয়াছিল; সেই সূত্রে সে জানিতে পারিয়াছিল, বোম্বাই সহরে তাঁহার কারবার ছিল।

কাশেম তাঁহার নিকটে যাইয়া অভিবাদন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে?"

কাশেম বলিল, "কাযের সন্ধানে আসিয়াছি।"

তিনি বলিলেন, "আমার সঙ্গে চল।" যানে তিনি কাশেমকে বলিলেন, "দেখ, যে পাতর কেবলই গড়ায়—এক স্থানে স্থির থাকে না, তাহাতে কখন শেয়ালা জন্মায় না। তোমার বুদ্ধি আছে–কাযও খুব ভাল কর। কিন্তু তুমি এক কাযে কখন স্থির থাক না, সেই জন্য উন্নতি করিতে পারিলে না এখন কি দিল্লীতে যাইবে?"

"না।"

"বোম্বাই সহরে কায পাইলে করিবে?"

"করিব।"

ততক্ষণে যান আসিয়া একটি হোটেলের দ্বারে দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসায়ী অবতরণ করিয়া চালককে ভাড়া চুকাইয়া দিলেন এবং কাশেমকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিয়া হোটেলে প্রবেশ করিলেন। ঘরে যাইয়া কাশেমকে বসাইয়া তিনি বলিলেন, "তুমি ত জান, এই সহরে আমার কারবার আছে। তুমি যদি কায কর, আমি সেই কারবারে তোমাকে কায দিতে পারি। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, আর স্থির হইয়া কায করিতে হইবে।"

কাশেম যেন আশাতীত প্রস্তাব শুনিল। সে বলিল, "আমি সম্মত আছি। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"শুনিয়াছি বোম্বাই সহরে সব জিনিষের মূল্য অধিক, এই স্থানে বাস ব্যয়সাধ্য। আমি সস্ত্রীক বাস করিতে পারি, এমন বেতন পাইব ত?"

"তুমি বিবাহ করিয়াছ? ভাল। ভাল। তাহা হইলে আর স্রোতের শেয়ালার মত ভাসিয়া বেড়াইবে না। যাহাতে স্বচ্ছন্দে চলে, তাহার ব্যবস্থা হইবে।"

কাশেম জানিত না, সে কায পাইবার জন্য যেমন আগ্রহান্বিত হইয়াছিল, ব্যবসায়ী তাহাকে পাইবার জন্য তেমনই আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। কেহ কাহারও প্রকৃত অবস্থা জানিতেন না। ব্যবসায়ী জানিতেন না—কাশেম কায না পাইলে তাহাকে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং তাহার স্ত্রী ব্যতীত আর এক জনও তাহার পোষ্য। কাশেম জানিত না, ব্যবসায়ীকে দুই দিনের মধ্যে দিল্লীতে ফিরিতেই হইবে—তিনি তথায় যে জিনিষ বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া আসিয়াছেন, তাহার দর বাজারে চড়িয়া গিয়াছে এবং তিনি বোম্বাই হইতে তাহার কতকাংশ সরবরাহের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে যাইয়া সময় না লইতে পারিলে তাঁহাকে অনেক লোকশান দিতে হইবে। এ দিকে বোম্বাইয়ে যে ব্যক্তি তাঁহার ব্যবসায় প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি অন্য কায পাইয়া চলিয়া গিয়াছেন—বিশ্বাসী লোক না পাইলে তাঁহাকে ব্যবসা বন্ধ করিতে হইবে—তাহাতেও লোকশান অনিবার্য্য। সেই জন্য তিনি কাশেমকে লইতে ব্যস্ত হইলেন। কাশেমের পিতার সাধু বলিয়া খ্যাতি ছিল এবং পুত্রও সেই খ্যাতি রক্ষা করিয়াছে।

তিনি স্থির করিলেন, পরদিনই কাশেমকে কায বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার পক্ষ হইয়া কায করিবার ক্ষমতা দিয়া তাহার পরদিন দিল্লী যাত্রা করিবেন। কাশেম যেরূপ বুদ্ধিমান, তাহাতে সে সহজেই কায বুঝিয়া লইতে পারিবে।

ব্যবসায়ী তাহাকে লইয়া তাঁহার ব্যবসার কার্য্যালয়ে গমন করিলেন—পথে তাহার বেতন স্থির হইল। বেতন অধিক না হইলেও কাশেমের তাহাতে সংসারপালন হইতে পারে। বিশেষ তাহার পক্ষে তখন তাহাই যথেষ্ট। সে ব্যবসায়ীর প্রস্তাবেই সম্মত হইল। বাজারের মধ্যেই ব্যবসায়ীর কার্য্যালয় একটি ত্রিতল গৃহে—নিম্নতলে ঐরূপ কার্য্যালয়ের বা দোকানের শ্রেণী; আর উপরে লোক বাস করে। উভয়ে সন্ধান করিয়া জানিলেন, উপরে বাসব্যবস্থা—প্রত্যেকের দুইটি ঘর, বারান্দায় একটু স্থানে স্নানাগার প্রভৃতি—আর একটুতে রন্ধনশালা। কেহ

রন্ধনের ব্যবস্থা করে, কেহ বা নিকটস্থ ইরাণী হোটেল হইতে আহার্য্য আনে বা আনায়। বোম্বাই সহরে বস্তীতে যেমন বহু লোককে একই স্নানাগার প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়, এই স্থানে তাহা করিতে হয় না—সেই জন্য ভাড়াও অপেক্ষাকৃত অধিক। কিন্তু কাশেম তাহাই পশন্দ করিল। আর ব্যবসায়ীও তাহা পশন্দ করিলেন—সে কার্য্যালয়ের উপরেই থাকিবে। এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দিতে হয়—ব্যবসায়ী তাহা দিয়া ঐ বাসস্থান কাশেমের জন্য লইলেন।

তিনি অনেক লোকশান হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন, মনে করিয়া ব্যবসায়ী এবং সে যেন অকূলে কূল পাইল মনে মনে করিয়া কাশেম—উভয়েই সন্তুষ্ট হইলেন—ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলেন।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশেম যখন তাহার কায পাইবার সংবাদ দিল, তখন রসুলান তাহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া কয় দিন সে কিরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারিল। নদীর জলের উপর মেঘের ছায়া পড়িলে তাহা যেমন মলিন মনে হয়, এ কয় দিন কাশেমের মুখভাব সেইরূপ ছিল। আজ যেন সে ছায়া সরিয়া গেল। রসুলান মনে করিল, আবার তাহা রবিকরে জলের মত উজ্জ্বল দেখাইবে। কিন্তু সে তখনও বুঝিতে পারে নাই, কাশেমের চিন্তার আরও কারণ ছিল—সে কারণ তাহার অন্নসংস্থানের উপায়ে দূর হয় নাই। সে চিন্তার কারণ—নেজমা।

সে যাহাই হউক পরদিন কাশেম দিল্লীর ব্যবসায়ীর কার্য্যভার গ্রহণ করিল এবং মুশাফেরখানা হইতে আপনার নূতন আবাসে গেল।

ব্যবসায়ী তাহাকে কাযের প্রকৃতি বুঝাইয়া দিলেন। বুদ্ধিমান কাশেমের তাহা বুঝিয়া লইতে অধিক সময় লাগিল না। তাহার পর ব্যবসায়ী বলিলেন, "কাশেম, তুমি যুবক। তোমার বুদ্ধি আছে, কায করিবার ক্ষমতা আছে, সাধু বলিয়া খ্যাতি আছে। কেবল একাগ্রতার অভাবে তুমি এখনও কোনরূপ উন্নতি লাভ করিতে পার নাই। এখন বিবাহ করিয়াছ—সংসার ক্রমে বড় হইবে। স্থির হইয়া ধীর ভাবে কায কর; আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি, আমার এই কাযেই তোমার উন্নতি হইবে। আমি পরবার আসিয়া যদি দেখি, তুমি ভাল কায করিতেছ, তবে তোমাকে লাভের অংশী করিব।"

কাশেম ভাবিতেছিল, ব্যবসায়ী যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। তিনি দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় তাহাকে তাহা বলিলেন।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ব্যবসায়ী বলিলেন, "তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও—স্থির হইয়া, মনোযোগ দিয়া কায করিবে।"

কাশেম বলিল, "আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।"

ব্যবসায়ীর নির্দ্দেশে সে তাঁহাকে তাহার বাসা দেখাইতে লইয়া গেল। দেখিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন—"এ কি, কাশেম, কোন জিনিষ যে নাই!"

কাশেম বলিল, "না।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তোমার 'ভবঘুরে' প্রকৃতির এখনও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই! আমি তোমাকে এক মাসের বেতন অগ্রিম দিতেছি; এ টাকা এক বৎসরে শোধ হইবে। তুমি আবশ্যক জিনিষ আজই কিনিয়া আনিয়া সংসার পাতাইয়া কায আরম্ভ কর। সর্ব্বদা দুইটি জিনিষ মনে রাখিও—সংসারীর কর্ত্তব্য সংসার সুখে ও সন্তোষপূর্ণ রাখা, স্ত্রীপুত্রাদির যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহা করা; আর অসাধুতা বর্জ্জন করা। তোমাকে এখন এই দুই কায করিতে হইবে—সংসারের ভার ও কাযের ভার বহন করিতে হইবে। পারিবে ত?"

কাশেম বলিল, "ঈনশা আল্লা।" (তাহাই যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয়)

"আল্লা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে তাহার পুরস্কার দেন। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি সাফল্য লাভ কর।"

কাশেম বলিল, তাঁহাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে—তাহার কোন সংবাদ তিনি দিল্লীতে কাহাকেও দিবেন না।

ব্যবসায়ী বলিলেন, "আমি সে প্রতিশ্রুতি দিতেছি। কিন্তু তুমি কি তোমার পিতামাতাকে জানাইবে না, তুমি বোম্বাই সহরে আছ?"

"জানাইব। কিন্তু আপনি কাহাকেও কোন কথা বলিবেন না।"

"তাহাই হইবে।" তিনি ভাবিলেন, হয়ত কাশেম পিতামাতাকেও না জানাইয়া বিবাহ করিয়াছে, তাই সে কথা এখন জানাইতে চাহে না। বাসায় দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়া তাঁহার সেইরূপ সন্দেহই হইল। কেবল তাঁহার মনে হইল, কাশেমের ব্যয়ও ত অল্প হইবে না! কিন্তু তখন আর তাঁহার সঙ্কল্প-পরিবর্ত্তনের বা বিষয়টির পুনর্ব্বিবেচনার সময় ছিল না—কারণ, তাঁহাকে দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতেই

হইবে। তিনি স্থির করিলেন, অল্পদিনের মধ্যে এক বার আসিয়া কাশেম কিরূপ কায করে, দেখিয়া তবে কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

তিনি যখন প্রতিশ্রুতি দিলেন, কাহাকেও তাহার কোন কথা বলিবেন না, তখন কাশেম বিস্মিত হইল না। সে জানিত, চাঁদনীচকের বড় ব্যবসায়ীদিগের সহিত দরিদ্র ইরাণী পল্লীর অধিবাসীদিগের ঘনিষ্ঠতা নাই এবং তাঁহারা সে পল্লীর সংবাদও বড় রাখেন না; কেবল সময় সময় সেই পল্লীর কোন কোন কন্যা রূপের জন্য তাঁহাদিগের গৃহে স্থান পায়।

ব্যবসায়ী চলিয়া যাইলে, কাশেম তাহার ব্যবসার কায লইয়া ব্যস্ত হইল। দূরে থাকায় ব্যবসায়ী বোম্বাইয়ে তাঁহার ব্যবসার যে সব ক্রটি বুঝিতে পারিলেও সে সকলের সংশোধন করিতে পারিতেন না, কাশেম সেইগুলির সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে সে সাফল্যলাভও করিতে লাগিল।

এ দিকে রসুলান সংসার পাতিতে প্রবৃত্তা হইল। সে সব কাযে নেজমাকে সহকর্ম্মী করিয়া লইতে লাগিল। সে তাহাকে বলিত, "তোমার উদ্ধার সাধনের চেষ্টায় যখন গিয়াছিলাম, তখন জানিতাম, সেই স্থানে বাস—বেদিয়ার 'টোল' ফেলা হইবে। তবুও সংসার পাতিতে হইয়াছিল। এ বার বাসা বাঁধিতে পারিব বলিয়াই মনে হইতেছে। আর তখন আমি একা ছিলাম, এখন আমরা দুই ভগিনী। নেজমা কোন কথা না বলিলে সে বলিত, "তোমার যেন বেগম-মহলের—সেই নরকের শোক আর যাইতেছে না!"

সে কথা শুনিলে নেজমা একটু ম্লান হাসি হাসিত। তাহার মনে কেবল ভাবনা হইত, রসুলানের এই সংসারে তাহার স্থান কোথায়; সে তাহার সহিত স্থান ভাগ করিয়া লইতে চাহিলেও সে তাহা পাইবে কি? কিন্তু সে কথা সে কোন দিন রসুলানকে বলিতে পারিত না; মনের কথা সে মনেই রাখিত।

২১

নূতন স্থানে—নূতন অবস্থায় কাশেমের, রসুলানের ও নেজমার দিন কাটিতে লাগিল। কাশেমের সম্বন্ধে লোকচরিত্রাভিজ্ঞ দিল্লীর ব্যবসায়ী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ সত্য। তাহার বুদ্ধি ছিল—কিন্তু সে একনিষ্ঠ হইয়া কায করিত না। এ বার সে মনোযোগ-সহকারে কায করিতে লাগিল—কাযে উন্নতি হইতে লাগিল; আর সে বুঝিল, কাযে আনন্দ আছে।

কাশেম কায করিত। কিন্তু রসুলান লক্ষ্য করিত, তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সে গম্ভীর হইয়াছে—যেন সর্ব্বদা চিন্তাবিষ্ট। কিন্তু সে যে মনে করিত, কাশেম কাযের কথাই ভাবে, তাহা নহে। নেজমার বিষয় তাহাকে বিশেষ চিন্তিত করিয়াছিল। সে নেজমার সম্বন্ধে কি করিবে? রসুলান স্থির করিয়া লইয়াছিল, কাশেম নেজমাকে বিবাহ করিবে। তাহা ব্যতীত আর কি করা যাইতে পারে? সে তাহা স্থির করিয়া নেজমার সহিত আপনার সংসারের অংশীরূপে ব্যবহার করিত; মধ্যে মধ্যে কাশেমকে বলিত, কবে সে নেজমাকে আচারের দ্বারা যে অধিকার প্রদত্ত হয়, তাহা দিবে? কাশেম অন্য কথায় তাহা এড়াইয়া যাইত।

বাস্তবিক কাশেম আপনার উপর বিরক্ত হইয়াছিল—রাগ করিতেছিল। সে স্থির করিয়াছিল, সে রসুলানের নিকট তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে। নেজমাকে অপ্রাপ্ত অবস্থায়, প্রাপ্তির সম্ভাবনা যখন অসম্ভবের রাজ্যে ছিল তখন, সে বলিয়াছিল, তাহাকে বিবাহ করিবে না; আজ তাহাকে পাইয়াছে বলিয়া সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবে না। রসুলান কেন আজ তাহার সম্মুখে প্রলোভন আনিল? কিন্তু রসুলানের দোষ কি? রসুলান তাহার জন্যই সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া নেজমাকে আনিয়াছে। অপরাধ তাহার।

কাশেমের বিরক্তির—আপনার উপর রাগের আরও কারণ ছিল। দিল্লী হইতে নবাবের রাজধানীতে যাইয়া সে রসুলানকে লইয়া যে জীবন যাপন করিয়াছে—নেজমা আসিয়া তাহাতে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। সে পরিবর্ত্তনও অবশ্য অনিবার্য্য। সমস্ত দিন কাযের পর সে যখন শ্রান্ত হইয়া আসিত, তখন সে রসুলানের সেই আদরের অভাব অনুভব করিত; নবাবের রাজধানীতে বাসকালে সে তাহাতে এমন অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, তাহার অভাব অনুভব না করিয়া পারিত না। যেন স্বাধীনতার মধ্যে সে আপনি আপনাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়াছে—স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। যত্নের কোন ক্রটি ছিল না; কিন্তু সেই যত্নেই তাহার তৃপ্তি হইত না; সে রসুলানকে ভালবাসিত এবং তাহার নিকট যত্নের অতিরিক্ত কিছু লাভে অভ্যস্ত হইয়াছিল। নবাবের রাজধানীতে কায অধিক ছিল না—স্বামিস্ত্রী পরস্পরের অত্যন্ত সন্নিহিত হইয়া—পরস্পরের সঙ্গে

সুখে দিন কাটাইয়াছে। এখন কাশেমের ব্যবসায় কায হইয়াছে—কিন্তু সেই কাযের বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে যখন সেই সঙ্গের সুখ তাহাকে আকৃষ্ট করিত, তখন সে তাহা পাইত না। কারণ, গৃহে আর কেবল সে ও রসুলানই নহে—নেজমা আসিয়াছে এবং নেজমা তৃতীয় ব্যক্তি।

কিন্তু ইহার জন্য রসুলান দায়ী নহে ; রসুলান নেজমাকে আনে নাই—যখন তাহাকে আনা হইয়াছে, তখন যে রসুলান তাহাকে স্নেহ ও যত্ন দিতেছে, তাহাও প্রশংসনীয়। রসুলান স্থির করিয়া লইয়াছে—কাশেম তাহাকে যাহাই কেন বলিয়া থাকুক না, নেজমাকে বিবাহ করিবে। তদ্ভিন্ন তাহার নেজমার উদ্ধার-সাধনের আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? মানুষ যে বহু কষ্টে রত্ন সংগ্রহ করে, সে ফেলিয়া দিবার জন্য নহে। যে অযত্নেও বহুমূল্য মুক্তা লইয়া তাহার মর্য্যাদা ও মূল্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাহেতু তাহা শুষ্ক বরদীভ্রমে ফেলিয়া দেয়, তাহাকে লোক বর্ব্বর মনে করে। যে বহুমূল্য হীরক নেজমা বেগম-মহল হইতে আসিবার সময় রাখিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আদরই করিতে হয়। কিন্তু কাশেম নেজমাকে বিবাহ করিবে এই বিশ্বাস করিয়াও রসুলান নেজমাকে স্নেহ যত্ন করে। তাহার স্বামীর প্রতি ভালবাসা কত অধিক যে, সে তাহার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে? রসুলান স্বামীর প্রতি প্রেম-প্রাচুর্য্যে তাহার জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, তাহার পরিচয় সে নেজমার উদ্ধার-সাধনেই দেখাইয়াছে। কাশেম মনে করিত, সেই রসুলানের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সে ভঙ্গ করিতে পারিবে না। সে প্রতিশ্রুতি রসুলান তাহার প্রেমে ও ত্যাগে পূত করিয়াছে।

কিন্তু নেজমা? নেজমার সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্য কি? আজ সে তাহার আত্মীয়-স্বজন সকলের নিকট হইতে দূরে যাযাবরের জীবন যাপন করিতেছে, কেহ কোন কথা জানিতেছে না। কিন্তু দিল্লীতে থাকিলে সে কি করিত? তাহার পিতামাতা ও নেজমার পিতামাতা কোন পক্ষই যে তাহাদিগের এই অবস্থার অনুমোদন করিতে পারিতেন না—ইহার প্রতিবাদ করিতেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তাহাকে নেজমাকে বিবাহ করিতেই হইত। তাহাদিগের সমাজে এইরূপ বিবাহ ও একাধিক বিবাহ অপ্রচলিত নহে। সুতরাং তাহাকে তাহাই করিতে হইত এবং তাহাতে নেজমার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইত।

সেই বিষয় কাশেম যতই ভাবিত, ততই নেজমার সম্বন্ধে তাহার কাযের গুরুত্ব তাহাকে অভিভূত করিত। বালক বিচিত্রবর্ণ মনোহর প্রজাপতি দেখিয়া তাহা ধরিবার জন্য উগ্র কামনায় ছুটিয়া যাইয়া—সেই প্রজাপতি যখন প্রস্ফুটিত গোলাপে বসে, তখন তাহাকে ধরিয়া যেমন কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হয়, সে তেমনই হইতেছে। আবার সে যখন সেই প্রজাপতি ধরে, তখন প্রজাপতিও তাহার স্পর্শে শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়। নেজমারও কি তাহাই হইবে? কে বলিতে পারে?

কাশেম ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিত না। সে যত ভাবিত, তাহার ভাবনা ততই বাড়িত—যেন আষাঢ়ের আকাশে এক বার মেঘসঞ্চারের পর মেঘের উপর মেঘ পুঞ্জীভূত হইত। নেজমার চিন্তা, কার্য্যের দায়িত্ব ও রসুলানকে অভ্যস্তভাবে অপ্রাপ্তি-জনিত ক্ষোভ, এই তিন তাহার মনে দারুণ ভারের মত অনুভূত হইত। সে সকলের মধ্যে নেজমার জন্য চিন্তাই তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পীড়িত করিত।

রসুলানের ব্যবহার তাহার এই পীড়ায় সমধিক উৎকণ্ঠার সঞ্চার করিত। রসুলান ধরিয়া লইয়াছিল, নেজমাও তাহারই মত কাশেমের পত্নী। তাহারা যে সমাজে জন্মিয়াছে ও যে পরিবেষ্টনে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ ব্যবস্থা অপরিচিত নহে। আপনি তাহাকে বিবাহ করা ব্যতীত কাশেম যে অন্য কোন উদ্দেশ্যচালিত হইয়া নেজমার উদ্ধার-সাধন করিতে পারে, তাহা রসুলানের ধারণায় আসিত না—সে অন্য কোন উদ্দেশ্য কল্পনা করিতেও পারিত না। সত্য বটে, সে এক দিন কাশেমের নেজমাকে বিবাহ করিবার কল্পনায় অভিমানাহত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও সে কাশেমকে পায় নাই। তাহার পর এই কয় মাস উভয়ে একযোগে নেজমার উদ্ধার-সাধনের যে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, যে ভাবে উভয়ে সে চেষ্টা করিয়াছে ও চেষ্টায় সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বদাই সেই বিষয়ের চিন্তায় যাহা কল্পনাতীত ছিল, তাহাই সম্ভব হইয়াছে—যাহা আশঙ্কার ছিল, তাহা অনিবার্য্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, যাহা অনভিপ্রেত ছিল, তাহা আর অপ্রীতিকর নাই। ঘনিষ্ঠতা যদি মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে অপরের উৎকর্ষ উপেক্ষা করায়—গুণ সম্বন্ধে দৃষ্টিহীন করে, তবে তাহাই আবার বহু ক্ষেত্রে অপরের ত্রুটির উপর আবরণ প্রদান করে—অপ্রিয়কে সহনীয় করে। সপত্নী সম্বন্ধে রসুলানের তাহাই হইয়াছিল। আবার

নেজমার সম্বন্ধে চিন্তা—আলোচনা—বিপদবরণ এই সকলের পর তাহার উদ্ধার-সাধনের পর সে আর তাহাকে দূরস্থ মনে করিতে—পর ভাবিতে পারে না। তাহার হৃদয়ের পরিপূর্ণ ভালাবাসা যে সে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, তাহা রসুলান মনেই করিত না। স্বামীর ভালবাসা অংশ হইলেও তাহার দৈন্য সে কখন অনুভব করিবে না, ইহাই তাহার বিশ্বাস ছিল।

রসুলান নেজমাকে তাহার স্বামীর সংসারে অবাঞ্ছিত আগন্তুক মনে করা ত পরের ক'া, কিছুতেই তৃতীয় ব্যক্তি মনে করিতে পারিত না। সেই জন্য নেজমার উপস্থিতিতে স্বামীর সহিত তাহার ব্যবহারে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত না। কাশেম মনে করিত, ইহাতে নেজমাও মনে করিয়া লইবে, সে কাশেমের স্ত্রী। তাহার মনে সেই বিশ্বাস—সেই ভাব দৃঢ় হইতে দেওয়া সঙ্গত নহে। কিন্তু এখন উপায় কি? কাশেম তাহাই ভাবিয়া পাইত না। কিন্তু রসুলানের ব্যবহার তাহাকে যখন তখন বুঝাইয়া দিত—উপায় স্থির করিতে বিলম্ব করা অসঙ্গত—এমন কি অন্যায় হইবে। তাহা নেজমার সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অন্যায় হইবে।

কিন্তু কাশেমের হিসাবে ভুল হইয়াছিল। সে ভুলের কারণ, সে আপনার মনোভাবে নেজমাকে বিচার করিয়াছিল। সেই জন্য সে যাহা হইয়াছে, তাহাই হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াছিল। সে রসুলানকে বলিয়াছিল—নেজমা তাহার স্ত্রী হইবে না। রসুলান স্বামীর কথায় বিশ্বাস করিত। কিন্তু তবুও রসুলান—পুরুষের মনস্তত্ত্বের জটিলতা বিবেচনা করিয়া মনে করিতে পারে নাই, নানা বিঘ্ন ও বিপদ অতিক্রম করিয়া তাহারা যে নেজমার উদ্ধারসাধন করিয়াছে, সে তাহাকে বিলাইয়া দিবার জন্য—তাহাকে ত্যাগ করিবার জন্য। মানুষ—বিশেষ পুরুষ বহুকষ্টে যে রত্ন সংগ্রহ করে তাহা সে পথের ধূলিতে ফেলিয়া দেয় না—আপনার সম্পদ বলিয়াই রক্ষা করে, তাহা পাইয়া প্রীত ও গর্ব্বিত হয়। সংসার-জ্ঞানে অনভিজ্ঞা নেজমা কল্পনাও করিতে পারে নাই, কাশেম এক দিন বিচার-বিবেচনা না করিয়া তাহাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, কেবল সেই প্রতিশ্রুতি-রক্ষার জন্য—সেই প্রতিশ্রুতি তাহার প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া—আপনার পত্নীকেও বিপন্ন করিয়া তাহার উদ্ধার-সাধন করিয়াছে। সে প্রতিশ্রুতির কথা সে ত ভুলিয়াই গিয়াছিল; তাহা পালন করা যে সম্ভব, তাহা সে কখন মনে করিতেও পারে নাই। সেই জন্য তাহার উদ্ধার-সাধনে সে তাহার প্রতি কাশেমের ভালবাসারই পরিচয় সপ্রকাশ মনে করিয়াছিল এবং সে ভালবাসা ভোগবিলাসের লীলা-ক্ষেত্র বেগম-মহলে পাওয়া যায় না বলিয়াই সে তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া—বিপদের সম্ভাবনা তুচ্ছ করিয়া, ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া রসুলানের সঙ্গে বেগম-মহল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। বেগম-মহলের প্রাচুর্য্যের সহিত কাশেমের সংসারের অপ্রাচুর্য্যের তুলনা সে কোন দিন করে নাই—এই সংসারে অভাবেও সে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। তাহার কারণ, সে কাশেমের প্রেম সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিল, তাহাতেই সে কাশেমকে তাহার প্রেম নিবেদন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিল। রসুলান তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিত এবং তাহার স্বভাবতঃ মৃদুভাব রসুলানের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া তাহার ভগিনীর স্নেহ অধিকার করিয়াছিল। রসুলানের প্রফুল্লতার চাঞ্চল্য ও নেজমার গাম্ভীর্য্য যেন পরস্পরকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল।

কিন্তু রসুলানের ব্যবহারে ও কথায় সে যাহা মনে করিতেছিল, রসুলানের কথাতেই আবার তাহাতে তাহার বিশ্বাস শিথিল হইয়া সন্দেহকে স্থানদান করিয়াছিল। নদী যেমন বর্ষাবারিপাতে পরিপূর্ণতাহেতু আপনার পরিপূর্ণতা আর সংযত ও সংহত করিয়া রাখিতে না পারিয়া তাহা কূলে ছড়াইয়া দেয়, ফুল যেমন ফুটিলে আপনার সৌরভ আর বক্ষে বদ্ধ রাখিতে না পারিয়া তাহা বাতাসে ছড়াইয়া দেয়, রসুলান তেমনই তাহার ও কাশেমের বিবাহিত জীবনের আনন্দসুখের কথা আপনার মনেই বদ্ধ রাখিতে না পারিয়া সে যাহাকে একান্ত আপনার মনে করিত সেই নেজমাকে বলিত। তাহাতে নেজমা যে জীবনের পরিচয় পাইত—বর্ত্তমান জীবনের সহিত তাহার প্রভেদ সে সহজেই লক্ষ্য করিত, সে চিত্রের ঔজ্জ্বল্যের পার্শ্বে বর্ত্তমানের চিত্রের ম্লানত্ব তাহার মনোযোগ অতিক্রম করিতে পারিত না। তাই সে ভাবিত—সে-ই কি ইহার কারণ? সে-ই কি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে আসিয়া উপনীত হইয়াছে? কাশেমের সঙ্কোচ ও রসুলানের প্রগল্ভতা লক্ষ্য করিয়া সে মনে করিত, সে-ই কি তবে পরিবর্ত্তন আনিয়াছে? তবে কি জন্য কাশেম তাহার উদ্ধার-সাধন করিল? সে কি ভুল করিয়াছিল? মানুষ কি এত বড় ভুল করিতে পারে?

নেজমা তাহা বুঝিতে পারিত না। কিন্তু সে কাশেমের জন্য আশঙ্কানুভব করিত; সে রসুলানের জন্য দুঃখানুভব করিত। আর সে আপনার জন্য

কি অনুভব করিবে, তাহা আপনি বুঝিতে পারিত না। তাহার জীবন কি একটা দুঃস্বপ্ন? সে কেবলই ভাবিত—ভাবিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিত না।

রসুলানের স্নেহ তাহার চিন্তার—দুশ্চিন্তার মধ্যে শান্তি ও সান্ত্বনা ছিল। সে যেন নারীর এক অভিনব আদর্শ।

এইভাবে মাসাধিক কাল কাটিল। রসুলান এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করিতে পারিল না—কাশেম সত্য সত্যই নেজমাকে বিবাহ করিবে না। কারণ, সে অবস্থায় নেজমার কি হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইত না।

এক দিন কাশেম বলিল, দিল্লীর ব্যবসায়ী আসিতেছেন। ব্যবসায়ী যখন আর কোন সুবিধা নাই দেখিয়া কাশেমকে কার্য্যভার দিয়া গিয়াছিলেন, তখন তিনি সত্য সত্যই কল্পনা করিতে পারেন নাই—স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লৌহ স্বর্ণ হয়, তেমনই কাশেমের চেষ্টায় ও যত্নে তাঁহার ব্যবসায় এত দ্রুত উন্নতি হইবে। তিনি পত্রে ও হিসাবে যে উন্নতির সংবাদ পাইতেছিলেন, তাহা ঐন্দ্রজালিকের রচিত ভ্রান্তি কি না, দেখিবার জন্য কৌতূহলবশেও বটে, আর কয়টা জিনিষ সওদার সুবিধা অসুবিধা বুঝিবার জন্যও বটে, তিনি দিল্লী হইতে আসিতেছিলেন।

বোম্বাইয়ে আসিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি যেমন বিস্মিত তেমনই পরিতুষ্ট হইলেন। বোম্বাইয়ে তাঁহার কারবার অতি সামান্য ছিল। এখন যেন শীর্ণা নদী জলে পরিপূর্ণা হইয়াছে। বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যালয়ে লোকসমাগম—কেহ ক্রয় করিতে, কেহ বিক্রয় করিতে—কেহ পণ্যের সংবাদ লইয়া আসিতেছে। কাশেম হাসিমুখে সকলের সহিত আলোচনা করিতেছে এবং চতুর ব্যবসায়ীর মত অতিরঞ্জনের ফেনপুঞ্জতলে সত্যের সন্ধান পাইতেছে। সে এত অল্প দিনে এই শিক্ষা কিরূপে অর্জ্জন করিল, তাহা ব্যবসায়ী বুঝিতে পারিলেন না। হিসাব পরীক্ষা করিয়া ও ব্যাঙ্কের মজুত টাকার পরিমাণ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, বোম্বাইয়ের কারবার এখন তাঁহার দিল্লীর কারবারের প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

তিনি বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন। তাঁহার তিন বিবির গর্ভে যে পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে তিন জন প্রাপ্তবয়স্ক। তাহারা কেবল বিলাসী ও শ্রমবিমুখই নহে, পরন্তু পরস্পরের সম্বন্ধে ঈর্ষ্যাসম্পন্ন। তাহাদিগের কাহাকেও বোম্বাই-সহরে কারবারের ভার দিলে ভয়ের একাধিক কারণ থাকিবে; পরিশ্রমের অভাবে ব্যবসার উন্নতি অসম্ভব হইবে, বিলাসীর অমিতব্যয়িতায় ব্যবসার লাভ ত পরের কথা, মূলধনও ছিদ্রপাত্রে জলের মত বাহির হইয়া যাইবে; আবার পরস্পরের অবিশ্বাসে মামলারও সৃষ্টি হইবে। তাই তিনি স্থির করিলেন, বোম্বাই সহরে কারবারের ভার কাশেমকেই দিবেন। তিনি মনে করিলেন, তাহা তাহারই প্রাপ্য। তিনি কাশেমকে বলিলেন, "কাশেম, তোমার কাযে আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বোম্বাই সহরের কারবার আমি স্বতন্ত্র করিব এবং তোমাকে তাহার অংশী করিব। ব্যবসা আমার এবং মূলধনও আমার, সেই জন্য আমি চারি অংশের তিন অংশ রাখিব,—তুমি কায করিবে ও সেই জন্য এক-চতুর্থাংশের অধিকারী হইবে। কি বল?"

কাশেম সম্মতি জানাইল।

ব্যবসায়ী বলিলেন, "আমি দিল্লীতে যাইয়া এ সম্বন্ধে অবশ্যক দলিল উকিলের দ্বারা লিখাইয়া এক মাস পরে আবার বোম্বাইয়ে আসিব। তখন ঐ দলিল রেজেষ্টারী করা হইবে। আশা করি, তাহার পর আমার আর পুনঃ পুনঃ বোম্বাইয়ে আসা প্রয়োজন হইবে না, তুমিই সব কায, নিজ দায়িত্বে করিবে। কারবারে যত লাভ হইবে, তত তোমার লাভ অধিক হইবে।"

কাশেমের মনে হইল, তাহার সম্মুখে উন্নতির রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইল। পরিশ্রমের ও নিষ্ঠার পুরস্কার লাভে বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু সে পুরস্কারলাভ অনিবার্য্য; তাহার ভাগ্যে তাহা লাভে বিলম্বও হয় নাই।

সংবাদ শুনিয়া রসুলান বিশেষ আনন্দলাভ করিল। সে নেজমাকে বলিল, "এবার প্রথম কায কি বল ত।"

নেজমা বুঝিতে পারিল না।

রসুলান হাসিয়া বলিল, "বলিতে পার না? নেজমার সহিত কাশেমের বিবাহ।"

২২

মাস পূর্ণ হইতে না হইতে ব্যবসায়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্যবসায়ের অংশ সম্বন্ধীয় দলিল দিল্লী হইতেই লিখাইয়া আনিয়াছিলেন। যে দিন তিনি আসিলেন সেই দিনই তাহা রেজেষ্টারী করা হইবে।

রেজেষ্টারী আফিসে যাইবার পথে তিনি কাশেমকে বলিলেন "কাশেম, এখন তুমি যদি ইচ্ছা

কর, বড় বাসা লইয়া বাস করিতে পার। কিন্তু আফিস ঘরটির পরিবর্ত্তন করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। ঐ ঘরেই বহু দিন আছি। তোমরা হয়ত ইহা বৃদ্ধের কুসংস্কার বলিবে, কিন্তু জানিয়া রাখিও, সংস্কারমাত্রই কুসংস্কার নহে। তোমারই বা এখন বাসা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? ব্যয় বাড়াইতে বিলম্ব হয় না, আয় বাড়ানই কষ্টসাধ্য। গৃহীর পক্ষে সঞ্চয় একটা ধর্ম্ম।"

দলিল রেজেষ্টারী করিয়া ব্যবসায়ী হোটেলে যাইলেন। কাশেম আফিসে ফিরিল।

ফিরিয়া আসিয়া কাশেম দ্বিতলে তাহার বাসায় সে সংবাদ দিতে গেল। রসুলান ও নেজমা তাহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল। উভয়েরই মন আজ আনন্দে পূর্ণ।

কাশেম আসিয়া সংবাদ দিল, দলিল সম্পাদিত হইয়াছে, সে দিন হইতে সে ব্যবসার এক-চতুর্থাংশের অধিকারী। তাহার মুখে যেন তাহার মনের আনন্দ বিকশিত হইয়াছিল।

তাহার পর কাশেম আফিসে চলিয়া গেল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই দ্বারের ঘণ্টা বাজিলে রসুলান যাইয়া তাহা খুলিলে দেখিল, কাশেম ফিরিয়া আসিয়াছে—তাহার হাতে একটি ক্ষুদ্র কাঠের বাক্স।

রসুলানের মনে হইল তাহারা যখন নবাবের রাজধানীতে নেজমার উদ্ধার সাধনের জন্য গিয়াছিল তখন কাশেম যখন তখন দোকান হইতে উঠিয়া আসিত—তাহাকে দেখিতে—ভালবাসার আকর্ষণে।

রসুলানের ইচ্ছা হইল, সেই সময়ের মত সে সাগ্রহে কাশেমের মুখচুম্বন করে। কিন্তু কাশেম বলিল, "রসুলান, নেজমা যে অঙ্গুরীটি আনিয়াছিল, সেটি কোথায়?"

এত দিনের মধ্যে সেটির কথা কখন উত্থাপিত হয় নাই। সেই জন্য কাশেমের কথায় রসুলান বিস্ময়ানুভব করিল; বলিল, "সেই বাক্সের মধ্যেই পড়িয়া আছে।"

"সেটি আন।"

চাবী রসুলানের কাছেই ছিল। সে দ্বিতীয় কক্ষে যাইয়া বাক্সটি খুলিল, নেজমাকে বাক্সের ডালাটি ধরিতে বলিল। নেজমা সেটি ধরিলে সে সেই বাক্সের মধ্য হইতে অঙ্গুরীটি বাহির করিয়া পার্শ্বের ঘরে যাইয়া কাশেমকে দিল। সে বলিল, "এ বার কি এটি আঙ্গুলে পরিবে?"

কাশেম ব্যস্তভাবে বলিল, "না। আজ তাড়াতাড়িতে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সংবাদপত্রে দেখা গেল, নবাব সহসা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছেন —আরোগ্যলাভের কোন আশাই নাই।"

"শরীর তাহার উপর অত্যাচারের শোধ লয়।"

"সুদে আসলে বুঝিয়া লয়।"

দুই কক্ষের মধ্যে দ্বার মুক্তই ছিল। নেজমা তাহাদিগের কথা শুনিতেছিল।

"সেই সংবাদে বুঝি অঙ্গুরীর কথা মনে পড়িল?"

"হাঁ।"

কাশেম যে ছোট বাক্সটি আনিয়াছিল, তাহার ডালা খুলিল, তাহার মধ্যে তুলা ছিল। সে তাহার উপর অঙ্গুরীটি রাখিল—তাহার পর একখানি ভাঁজ করা কাগজ তাহার উপর রাখিয়া ডালাটি বন্ধ করিয়া উহা লইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কি মনে করিয়া সে বলিল, "অনেক দিন—যে দিন নেজমার আঙ্গুলে এটি লক্ষ্য করি, সেই দিন হইতেই মনে করিয়াছি, নেজমা যখন বেগম-মহলের আর কিছুই আনে নাই, তখন ঐটিই বা রাখিবে কেন? উহা নবাবকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।"

রসুলান কাশেমের মুখে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিল। কাশেম দেখিল, বিস্ময়ে যেন তাহার চক্ষুর সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরও সুন্দর দেখাইতেছে।

কাশেম বলিল, "যাহারা ভোগকেই পরমার্থ মনে করে—বিলাস-লালসারই অনুশীলন করে, তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মানুষ—বিশেষ স্ত্রীলোক—ত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝে—ভোগীরা যাহা মূল্যবান মনে করে তাহা ধূলির মত—আবর্জ্জনার মত—লালসা-কলুষিত বলিয়া ফেলিয়া দিতে পারে।"

রসুলান মুগ্ধ হইয়া সে কথা যেন সাগ্রহে পান করিতে লাগিল। আর পার্শ্বের কক্ষে নেজমা তাহাতে যেন আপনাকে অভিভূতা অনুভব করিতে লাগিল।

কাশেম বলিল, "নবাবের বাঁচিবার আশা নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই সত্য বুঝিয়া আপনার ভ্রম অনুভব করিবার সুযোগ লাভ করুন। সুতরাং আর বিলম্ব করা চলিবে না। এত দিন যে আমি উহা পাঠাইয়া দিতে পারি নাই তাহার কারণ, হয়ত প্রেরিত দ্রব্য কোথা হইতে প্রেরিত তাহার সূত্র ধরিয়া আমাদিগের সন্ধান করিবে। কোন কুকার্য্য উহাদিগের অসাধ্য নাই।

তাহার কথায় বাধা দিয়া রসুলান বলিল, "এখন কি তাহা আর হইবে না?"

কাশেম তাহার আশঙ্কায় হাসিয়া বলিল "না। তুমি কি মনে করিতেছ, আমি ইচ্ছা করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিব ?"

"কিন্তু—"

"এই বাক্সে অঙ্গুরী রাখিয়াছি। ইহার সঙ্গে যে কাগজখানি দিতেছি তাহাতে কি লিখিত আছে জান ?"

"না।"

"উহাতে লিখিয়া দিয়াছি—'মুক্তির মূল্য'।"

"চমৎকার!"

"বাক্সটি গালামোহর করিব। সে জন্য একটি বাজে মোহর তৈয়ার করাইয়াছি।"

"তাহার পর ?"

কাশেম বলিল, "ব্যবসায়ী দলিল সম্পাদিত করিয়াছেন, দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবেন। তাঁহাকে অনুরোধ করিব, তিনি উহা দিল্লীতে রেজেষ্টারী ডাকে দিবেন—নবাবের নামে উহা যাইবে।"

"যে পাঠাইতেছে, তাহার নাম কি জানা যাইবে না ?"

"না। সে-ও একটা ছদ্মনাম লিখিয়া দিব।"

রসুলানের সন্দেহ যেন তখনও ঘুচিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, "যাঁহাকে দিয়া উহা দিল্লীতে পাঠাইবে, তিনি যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন—কি বলিবে ?"

"তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

"জিজ্ঞাসা করিবেন না ?"

"না।"—কাশেম ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "মানুষ আপনার আদর্শে অপরকে দেখে—তাই বুঝি স্ত্রী-লোকরা মনে করে, সকলেরই কৌতূহল তাহাদিগের কৌতূহলের মত প্রবল ?"

"দোষ যত বুঝি আমাদিগের ?"

"উনি পাকা ব্যবসায়ী; অপরের কথায় কখন অকারণ কৌতূহল প্রকাশ করেন না। এই দেখ—আমি ত উঁহার কর্ম্মচারী ছিলাম, আজ অংশীদার হইয়াছি—কোন দিন আমার পারিবারিক জীবনের কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। আমি যে বলিয়া-ছিলাম, দিল্লীতে কাহাকেও আমার কোন সংবাদ দিবেন না, সে কথা কাহাকেও বলেন নাই, আমার সহিতও আর কখন সে কথার আলোচনা করেন নাই।"

"তুমি কি দিল্লীতে কোন সংবাদ দাও নাই ?"

তাহার পিতামাতা ও কাশেমের পিতামাতা তাহাদিগের কোন সংবাদ না পাইয়া হয়ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন মনে করিয়া রসুলান উৎকণ্ঠা অনুভব করিল।

কাশেম বলিল, "বোম্বাইয়ে আসিবার ও আসিয়া কোন সংবাদ দিই নাই। যদি কথাটা প্রকাশ হয়, তবে বিপদ ঘটিতে পারে। আর তাহার অন্য কারণও যে নাই, তাহা নহে।"

"আবার কি কারণ ?"

"সে তোমাকে পরে বলিব।"

তাহার বিমোহন চক্ষুর দৃষ্টি কাশেমের মুখে স্থাপিত করিয়া রসুলান বলিল, "সে কারণ কি তাহা আমি বলিতে পারি।"

কাশেম তাহার সেই চক্ষু চুম্বন করিতে প্রলুব্ধ হইল। কিন্তু নেজমার উপস্থিতিতে সে এই কয় মাস যে সংযম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, আজও তাহা অক্ষুণ্ণই রাখিল। সে হাসিয়া বলিল, "তুমি কি মনের কথা গণিয়া বলিতে পার ?"

রসুলান তেমনই হাসিয়া বলিল, "পারি কি না—দেখিবে ?"

"দেখিব।"

"নেজমার বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন সংবাদ দিবে না।"

কাশেম কোন কথা বলিল না, কিন্তু তাহার হাসিতে রসুলান বুঝিল—সে তাহার মনের কথা জানিতে পারিয়াছে; যে স্বামী কোন দিন তাহার নিকট কোন কথা গোপন করে নাই, তাহার মনের কথা সে যেন সহজাত সংস্কারেই জানিতে পারে।

রসুলান বলিল, "কিন্তু তাহাতে আর বিলম্ব কেন ? ব্যবসার অংশের দলিলও ত হইয়া গেল।"

তাহারা কেহই মনে করে নাই, পার্শ্বের কক্ষে নেজমা যেন রুদ্ধশ্বাস হইয়া তাহাদিগের কথা শুনিতেছিল—আশায় ও আশঙ্কায় সে যেন অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিল।

কাশেম বলিল, "এই বার নিশ্চিন্ত হইয়া উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিব।"

রসুলান মনে করিল, কাশেম ব্যঙ্গ করিতেছে; সে বলিল, "সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। আমি পাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছি।" তাহার মুখে হাসি—চক্ষুতে প্রফুল্লতার বিকাশ।

কাশেম বলিল, "তুমি যে পাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছ, সে আমার পরিচিত। কিন্তু এই অঙ্গুরী যেমন আমার আঙ্গুলে শোভা পায় না, তেমনই নেজমার রূপ দরিদ্রের ঘরের জন্য নহে।"

রসুলান বলিল, "যদি রূপের মূল্যই হিসাব করিতে হয়, তবে যে তাহার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দিয়াছিল, তাহার প্রতি বিমুখ হইলে কেন? তুমিই ত বলিয়াছ—মানুষ—বিশেষ স্ত্রীলোক ত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝে, ত্যাগের জন্য ভোগ আবর্জ্জনার মত ফেলিয়া দিতে পারে!"

কাশেম এই কথার কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া না পাইতেই রসুলান, যেন তাহার যুক্তি অবজ্ঞা করিয়া —বলিল, "তোমরা পুরুষরা চক্ষু থাকিতে অন্ধ। তোমরা রূপই দেখ—রূপই মূল্যবান মনে কর— কিন্তু যাহা রূপ অপেক্ষা শতগুণ মূল্যবান ও মর্য্যাদার সেই গুণ তোমার দেখিতে পাও না। এই কয় মাস এক সঙ্গে বাস করিয়াও কি তুমি বুঝিতে পারিলে না —নেজমার রূপ যত অসাধারণই হউক না, তাহার গুণের তুলনায় তুচ্ছ—উপেক্ষণীয়? তুমি যখন তরুণ যুবক, তখন তাহার রূপ তোমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার গুণ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—তাহাকে আমার স্নেহ অর্জ্জন করিয়া দিয়াছে।"

কাশেম কিছু বলিতে পারিল না।

রসুলানের মুখে উত্তেজনার ভাব দেখা গেল— তাহার কথায় উপেক্ষার ও ব্যঙ্গের ভাব মুক্ত হইয়া তিরস্কারের ঝঙ্কার ঝঙ্কৃত হইল। সে বলিল, "তুমি দরিদ্র—সেই কথা বলিতেছ? কিন্তু দরিদ্র হইয়া ধনীর অধিকৃত রত্নলাভে তোমার যে আগ্রহ তোমাকে তখন দারিদ্র্যের কথা ভুলাইয়া দিয়াছিল— সেই আগ্রহ অপেক্ষা প্রবল আগ্রহ ব্যতীত নেজমা কখন ধনীর বিলাস পদদলিত করিয়া—বহু বিপদ তুচ্ছ মনে করিয়া আমার সঙ্গে তোমার কাছে চলিয়া আসিত না। তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই? তোমরা পুরুষরা এই বুদ্ধির গর্ব্ব কর!"

কাশেম যেন স্তম্ভিত হইল। এ সবই কি সত্য? এ সব অসত্য মনে করিবারই বা কি কারণ থাকিতে পারে?

রসুলান বলিল, "তুমি আমার কাছে অস্বীকার করিতে পার—আপনার কাছেও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে পার, কিন্তু তুমি নেজমাকে ভুলিতে পার নাই তাহার কারণ, তাহার প্রতি ভালবাসা তোমার চিত্তে তাহার অধিকার-চিহ্ন রাখিয়াছিল—তাহা প্রক্ষালিত হয় নাই। তবে তুমি জানিয়া রাখিও— তোমার প্রতি নেজমার ভালবাসা তাহার প্রতি তোমার ভালবাসা অপেক্ষা প্রবল ও উজ্জ্বল।"

কাশেমের মনে হইল, চিন্তার যে দ্বার সে অর্গলবদ্ধ করিয়া মনে করিয়াছিল, তাহা আর কখন মুক্ত করিতে হইবে না, আজ রসুলান তাহাই মুক্ত করিয়া দিয়াছে। নেজমা যে তাহাকে ভালবাসে, এ কথা এত দিন সে মনে করে নাই। কিন্তু রসুলান যে যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছে, তাহা সে কিরূপে খণ্ডন করিবে—কিরূপে খণ্ডন করিতে পারে? বাস্তবিক সে যদি বিচার-বিবেচনা না করিয়া যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল, তাহার পালনজন্য তাহার উদ্ধার-সাধন-চেষ্টা করিয়া থাকে, তবে নেজমা ভালবাসা ব্যতীত আর কিসের আকর্ষণে বেগম-মহল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে; কি জন্য দরিদ্রের গৃহে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে? সে এ কি করিয়াছে? সে কি মানুষের মন লইয়া খেলা করিয়াছে?

তাহার মুখ চিন্তায় গম্ভীর হইল। সে ধীরে ধীরে বলিল—"রসুলান, নিজামুদ্দীন হইতে যে দিন আমরা ফিরিতেছিলাম, সে দিনের কথা তোমার মনে আছে?"

রসুলান হাসিয়া বলিল, "সে দিনের কথা ভুলিবার নহে—উহা আমার জীবনের সুখ ও সম্বল।"

"তাহা স্মরণ করিয়াও তুমি আমাকে এই কথা বলিতেছ?"

"নিশ্চয়।"

কাশেম বিস্মিত ভাবে রসুলানের দিকে চাহিল। তখন তাহারা পরস্পরের কথাই ভাবিতেছিল— আর কাহারও উপস্থিতি অনুপস্থিতির কথা তখন তাহাদিগের মনে স্থান পাইতে পারে না।

"নেজমাকে আমি যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলাম তাহাই প্রতিশ্রুতি, আর তুমি আমার স্ত্রী— আমার জন্য অসাধ্য সাধন করিয়াছ—কোন বিপদই বিপদ বিবেচনা কর নাই—তোমাকে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তাহা কি প্রতিশ্রুতি নহে?"

রসুলান হাসিল। স্বামীর প্রেমের এই পরিচয়ে কোন্ স্ত্রীর হৃদয় পূর্ণ না হয়? সে প্রেম এতই প্রচুর যে, কাহাকেও তাহার অংশ দিতে সে কার্পণ্য করিতে পারে না।

সে বলিল, "তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলে। আমি সে প্রতিশ্রুতির বন্ধন লৌহ-শৃঙ্খল করিতে চাহি না—তাহা ফুলের মালা মনে করি। আমি তোমাকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সেই প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তি দিতেছি।"—বলিয়া রসুলান কাশেমের কণ্ঠলগ্না হইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

কাশেমের ওষ্ঠাধর রসুলানের ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিতে না করিতে দ্বারের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

কাশেম দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিল, ভৃত্য সংবাদ দিতে আসিয়াছে, ব্যবসায়ী হোটেল হইতে আসিয়াছেন। সে অঙ্গুরীয়ের কৌটাটি লইয়া আফিস ঘরে চলিয়া গেল।

বিজয়ীর আনন্দ লইয়া রসুলান পার্শ্বের কক্ষে গেল। নেজমা তথায় পাষাণ-প্রতিমার মত বসিয়া ছিল। সে মুখ তুলিল না। যেমন বসিয়া ছিল, তেমনই রহিল।

রসুলান বলিল, "নেজমা, ভগিনী, কি ভাবিতেছ ?"

নেজমা ধীরে ধীরে মুখ তুলিল। সে "কিছু না"—বলিতে গেল, কিন্তু কথা যেন রোদনোচ্ছ্বাসে অস্পষ্ট হইয়া গেল।

রসুলান তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "আমার কাছেও মনের কথা গোপন করিবে ?"

তাহার কথায় অভিমানের আভাস নেজমাকে ব্যথিত করিল। সে বলিল, "না। তোমার কাছে আমার গোপন করিবার কিছুই নাই।"

"তবে বল, কি ভাবিতেছিলে।"

"ভাবিতেছিলাম—ভাবিতেছি, এই কি মুক্তির মূল্য ?"

বলিতে বলিতে নেজমার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু বর্ষার মেঘে বর্ষণের মত ঝরিতে লাগিল।

রসুলান অগ্রজার স্নেহে নেজমাকে তাহার বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল, "মূল্য স্থির করিবার ভার—আমার উপর, তোমার ভগিনীর উপর দিয়া তাহার উপর নির্ভর কর।"

নেজমাকে এই আশ্বাস প্রদান করিবার সময় রসুলানও যেন আপনাকে অচঞ্চল রাখিতে পারিল না—তাহার গলা যেন "ধরিয়া" আসিল।

প্রবল রোদনোচ্ছ্বাসে নেজমা রসুলানের কথা শুনিতে পাইল কি ?

সম্পূর্ণ